শিক্ষা সেমিনার
প্রবন্ধ সংকলন

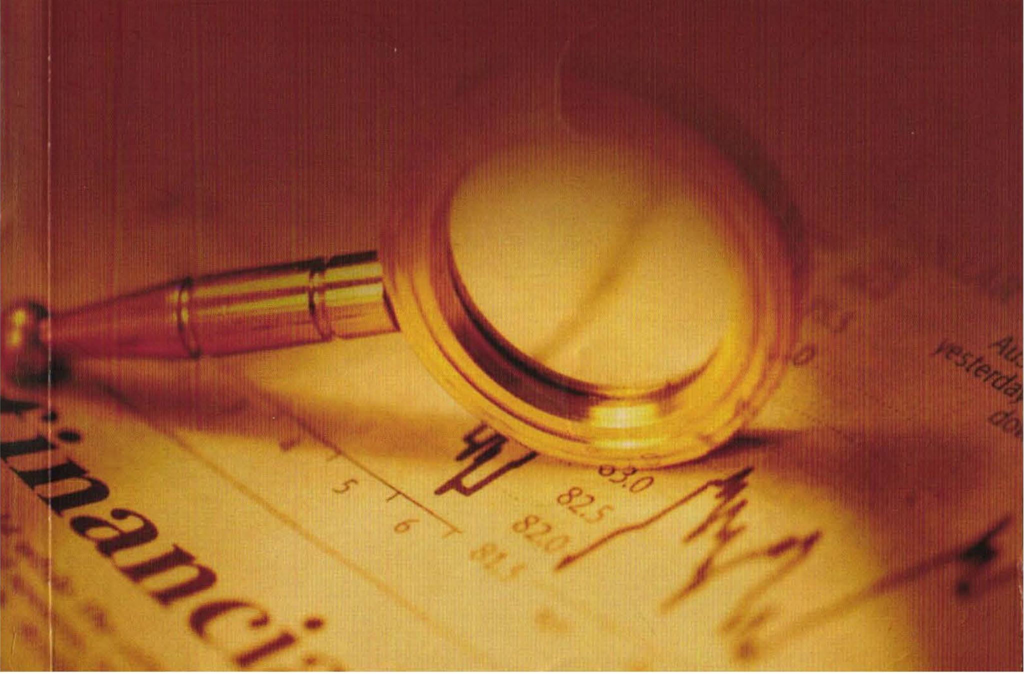

শিক্ষা সেমিনার
প্রবন্ধ সংকলন

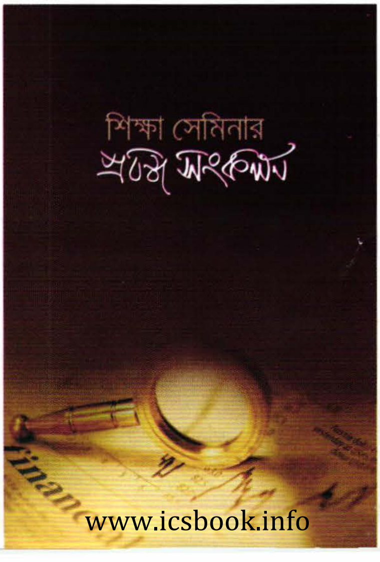

www.icsbook.info

শিক্ষা সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি

ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

সম্পাদক

মোঃ দেলাওয়ার হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক

মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

সম্পাদনা সহযোগী

মু. আতাউর রহমান সরকার
মুহাম্মদ আবদুল জব্বার
মোঃ সোহেল খান
গোলাম মর্তুজা
শামসুল আলম গোলাপ
মোঃ আতিকুর রহমান
মোঃ মনির উদ্দিন মনি
মোঃ তারেকুজ্জামান
মোহাম্মদ আবু নাছের
আবু সালেহ্ মোঃ ইয়াহ্ইয়া
মাসুদ পারভেজ রাসেল
তৌহিদুর রহমান সুইট
মোঃ মাকসুদুর রহমান
আল মুত্তাকী বিল্লাহ
নূরুল ইসলাম আকন্দ
মাসুদুল ইসলাম বুলবুল
স. ম. আব্দুল্যাহ আল মামুন

প্রকাশনায়

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৪৪০
www.shibir.org.bd

প্রকাশকাল

জুন ২০১১

মূল্য :

২৫০ টাকা মাত্র

www.icsbook.info

উৎসর্গ

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ

শহীদ আবদুল মালেকসহ

যাঁদের রক্তে রঞ্জিত হল এ বাংলার সবুজ জমিন

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সে সমস্ত শহীদদের উদ্দেশে

www.icsbook.info

কেন্দ্রীয় সভাপতির কথা

শিক্ষা সুষ্ঠু সমাজ গঠনের হাতিয়ার। শিক্ষার মানদণ্ডেই নির্ণীত হয় কোন জাতি কতটুকু উন্নত ও সভ্য। শিক্ষাকে তাই সমাজ গঠনের হাতিয়ার বলা হয়। আর তাই, সে শিক্ষার লক্ষ্য হতে হয় সেই জাতির আদর্শ, মূল্যবোধ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই। আদর্শিক কোনো ভিত্তি নেই। ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামনে কোনো জীবনদর্শন নেই। উপরন্তু এদেশে অন্য সকল ক্ষেত্রের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অপ্রতুল। আর বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাসমূহ কী তা যদি অল্প কথায় চিহ্নিত করতে হয় তাহলে বলা যায় প্রকৃত সৎ, যোগ্য এবং চরিত্রবান মানুষের অভাবই মৌলিক সমস্যা। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করে প্রণীত হলেই কেবলমাত্র এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের গোটা শিক্ষা কাঠামোর অবস্থা হলো- ছাত্র হত্যা, পঙ্গু করা, নকল প্রবণতা, অস্ত্রের মহড়া, নির্মমভাবে সহপাঠীর বুকে খুন ঝরানো, লুটপাট, শিক্ষক প্রহার ও লাঞ্ছিতকরণ, গাড়ি পোড়ানো, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, সর্বোপরি টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, সিটবাণিজ্য, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি। আর অতি সম্প্রতি যোগ হয়েছে অশ্লীলতা নামক যথেচ্ছ যৌনাচারের বিষয়টি।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি কী হবে তা নিয়ে ১৯৬৯ সালের ১২ আগস্ট ঢাকার টিএসসিতে আয়োজন করা হয় এক সেমিনারের। সেমিনারে আগত ছাত্রসমাজের দাবির মুখে আয়োজকরা তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেককে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। নিপা আয়োজিত ওই সেমিনারে আবদুল মালেক ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি বেশ যৌক্তিকতার সাথেই তুলে ধরেন। তাঁর উপস্থাপিত কারিকুলামের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সবাই একমতও হয়। কিন্তু যারা এদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চায় না, জাতিকে ধর্মহীন মেধাশূন্য করতে চায়, বিদেশী রাষ্ট্রের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী রাখতে চায়– তারা আবদুল মালেকের ওই বক্তব্যে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের সকল রোষ গিয়ে আছড়ে পড়ে প্রতিশ্রুতিশীল এই অকুতোভয় বীরের ওপর। ফলে নির্মম আঘাত হেনে নৃশংসভাবে আহত করে সম্ভাবনাময় টগবগে এই যুবককে। দুই দিন পর ১৫ আগস্ট তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মূলত প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে আবদুল মালেকই প্রথম শহীদ। শহীদ আবদুল মালেকের সেই দাবি এখন গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

ছাত্রসমাজের আপন ঠিকানা, পথহারা তরুণের মুক্তির মোহনা দায়িত্বশীল ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের আপামর জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের নিরিখে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বিষয়টি সামনে রেখে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে। ইসলামী ছাত্রশিবির এদেশে সৎ, যোগ্য এবং চরিত্রবান ছাত্রদের একটি প্রতিষ্ঠান। জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী শিক্ষা এবং আদর্শের অনুপস্থিতিতে জাতীয় যুবচরিত্রের অবক্ষয়ের

প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্রশিবির পালন করে যাচ্ছে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্রশিবির ১৯৭৮ ও ১৯৮৮ সালে শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৯৭ সালের আগস্টে আয়োজন করে দুই দিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের। ২০০৪ সালেও জাতীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রকাশ করা হয় জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সঙ্কলন। ২০১০ সালে যখন দেশের শিক্ষানীতি কী হবে এই নিয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে এবং দেশবাসীর কাছে মতামত আহ্বান করে, তখন ছাত্রশিবির বরাবরের মতো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে একটি প্রস্তাবনা পেশ করে। পোস্টার, বুকলেট ও স্বাক্ষর অভিযানের মাধ্যমে আপামর জনগণের মাঝে ইসলামী ভাবধারার সমন্বয়ে একটি প্রকৃত শিক্ষানীতি প্রণয়নের উপযোগিতাটুকু স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়। দেশের আলেম-ওলামা ও বিশিষ্টজনেরাও বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করেন। সরকার কর্তৃক পেশকৃত শিক্ষানীতির দুর্বলতা ও অসঙ্গতির দিকগুলো বারবার তুলে ধরা হয়। কিন্তু সেক্যুলার সরকার জনগণের মতামত ও প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ধর্মহীন নৈতিকতাশূন্য জাতি গঠনের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে তাদের পেশকৃত শিক্ষানীতিই বাস্তবায়নের কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে শুরু করেছে। ইসলামী ছাত্রশিবির এখন পর্যন্ত এই শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করে যাচ্ছে এবং দেশের কল্যাণে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিকুলাম সমৃদ্ধ একটি সুষ্ঠু ও প্রকৃত শিক্ষানীতি প্রণয়নের জোর দাবি জানাচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছতে পারেনি। পারেনি তার কারণ জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার মতো করে মানুষ গড়ার যে প্রক্রিয়া সেই শিক্ষাব্যবস্থা সবসময়ই দারুণভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এজন্য বরাবরই পিছিয়ে পড়ছি আমরা। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাই জাতি গঠনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ কাঠামো দ্বারাই সংস্কার করতে হবে- মানুষকে ধর্মহীন বা ধর্মবিমুখ করে প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। আদর্শবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে সুনাগরিক তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা আশা করি শিক্ষাবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নৈতিকতা ও ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে পারে না। সরকারকেও এটা উপলব্ধি করতে হবে। সুতরাং অবিলম্বে বাস্তবায়নাধীন শিক্ষানীতি বাতিল করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় তাহজিব-তমদ্দুনের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও সুন্দর আগামীর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন শুধু ছাত্রশিবিরের নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের। তাই একটি সঠিক, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রকৃত তথা ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বিষয়গুলোকে তুলে ধরে সেই আলোকে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বানকে সামনে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সঙ্কলন-স্মারক থেকে বাছাইকৃত কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বক্তব্য-বিবৃতি, আলোচনা-সমালোচনা নিয়ে বর্ধিত এই সঙ্কলনটি বের করা সম্ভবপর হচ্ছে বলে মহান রবের দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সঙ্কলনটি বিদগ্ধ পাঠককুলের অনেক ভুল ধারণা ও বিশ্বাসকে শুধরিয়ে দিয়ে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং ইসলামী তথা বাংলাদেশের জন্য প্রকৃত উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আল্লাহপাক আমাদের সহায় হোন।

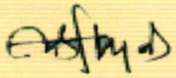

(ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার বয়স যতদিন, শিক্ষার বয়সও ততদিন। কারণ প্রথম মানুষ সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ যেদিন তাঁকে (হযরত আদম আ.) সবকিছুর নাম শেখালেন, সেদিন থেকে মানব সভ্যতায় জ্ঞানের সূত্রপাত। এই শিক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন মহাকবি মিল্টন এভাবে- 'শিক্ষা হলো দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন।' মূলত সমাজ পরিচালনার মূল বিষয়টিই হচ্ছে শিক্ষা। একটি জাতির উন্নতি অবনতি নিরূপণের মানদণ্ড এটি। আর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে মানব জাতির আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন। এর বাইরের যাবতীয় বিষয়টিই শিক্ষার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই এই মহত্তম বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন সেই আলোকে প্রণীত একটি শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষানীতি। আর সেজন্য প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন শিক্ষানীতি গ্রহণীয় হতে পারে না।

বাংলাদেশ আল্লাহপাকের অশেষ রহমতের বারিধারায় সিক্ত একটি সবুজ-শ্যামল জনপদ। প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এখানে প্রতিদিন ভোরে আজান শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং মহান রবের প্রশংসা করতে করতেই রাতে নিদ্রা যায়। তাই এটাই উচিত বরং স্বাভাবিক যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকেই একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। কেননা, একটি জাতির চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং জাতীয় মনন ও বিকাশধারা শিক্ষানীতির মৌলিকত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণীত না হওয়ায় ১৯৭২ সালের ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৮ সালের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আলোর মুখ দেখতে পারেনি মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশনও। অথচ এদেশের মানুষের মন-মানস চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে তৌহিদী জনতা বারবার সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী সে দাবিকে বাস্তবে রূপ দিতে আজও সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি একটি শিক্ষানীতি জাতির ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজও জোরেশোরে শুরু হয়েছে। অথচ এই শিক্ষানীতি নিয়ে ব্যাপক আপত্তি

www.icsbook.info

জানিয়েছেন দেশের প্রতিষ্ঠিত আলেম ও বিশিষ্টজনেরা। সেক্যুলার তথা ধর্মহীন নাস্তিক তৈরি করার যাবতীয় কারিকুলাম সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে মানুষগুলো আগামী দিনে জাতির নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে, তাদের কাছে দেশপ্রেম, মানবিকতা, পরোপকার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি সুকুমার মৌলিক মানবীয় গুণাবলির কোনোটিই আশা করা যায় না। ফলে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান দেশটি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হবে।

মানব জাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে দিনাতিপাত করে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা তাই ইসলামের আলোকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর ইসলাম মূলত শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, বরং সকল মানবের কল্যাণ সাধন করে থাকে। তাই নৈতিকতা বিবর্জিত ধর্মহীন শিক্ষানীতি নয়, একটি ইসলামী তথা নৈতিক বিষয়গুলোর সন্নিবেশে কল্যাণধর্মী শিক্ষানীতিই এ দেশের জন্য প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও ইসলামী শিক্ষার যৌক্তিকতা ও রূপরেখা তুলে ধরে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন সময় সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করে আসছে। জনগণ বেশ যৌক্তিকতার সাথেই এতে সাড়া জাগাতে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন সময় শাখা ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন করে। প্রকাশ করা হয় জাতীয় শিক্ষা সেমিনার সঙ্কলন। ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিভাগের মেধা তালিকার প্রথম পাঁচজনকে নিয়ে আয়োজন করা হয় সেমিনারের। সারা দেশের প্রথম সারির শিক্ষাবিদরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারটি বেশ ফলপ্রসূ হয়। আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা ও প্রস্তাবনা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় আরো কয়েকটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন এবং শিক্ষা সঙ্কলন প্রকাশ করা হয়। আর বর্তমান সঙ্কলনটিতে সেই সব সঙ্কলন থেকে বাছাইকৃত কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক দিকটি সকল মানুষের সামনে স্পষ্ট করার মহান তাগিদেই এবং জাতির আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষার দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করা হলো। এটি ইসলামী শিক্ষানীতি তথা বাংলাদেশের জন্য একমাত্র গ্রহণীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে উৎসুক পাঠকের জানার ঔৎসুক্য অনেকাংশে নিবারণ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর ধর্মহীন সেক্যুলার নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষানীতির বিপরীতে ইসলামী শিক্ষানীতির প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সামান্য আগ্রহ মানব মনে সৃষ্টি করতে পারলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

www.icsbook.info

সূচিপত্র

- **কেন্দ্রীয় সভাপতির কথা**
- **সম্পাদকীয়**
- **শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপ** ১০
  অধ্যাপক গোলাম আযম
- **শিক্ষার আদর্শ** ২৭
  অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান
- **আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা** ৩৮
  মুহাম্মদ কুতুব অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
- **বাংলাদেশে শিক্ষার সঙ্কট ও সমাধান** ৫৬
  আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ
- **আমাদের শিক্ষাসঙ্কট উত্তরণের উপায়** ৭২
  আব্দুল কাদের মোল্লা
- **ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি ও উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা** ৮৫
  আবদুস শহীদ নাসিম
- **আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন : আদর্শিক ভিত্তি ও জাতীয় মূল্যবোধ** ১৩৩
  আব্দুল মান্নান তালিব
- **ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** ১৩৯
  ড. এম. এ. সালেহ
- **আমাদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা** ১৪৩
  ড. কাজী দীন মুহাম্মদ
- **শহীদ আবদুল মালেকের কলম থেকে** ১৫৮
  সংগৃহীত
- **সুখ, শান্তি ও শিক্ষা** ১৭৬
  ড. আহসান হাবীব ইমরোজ
- **ইসলামে নারী শিক্ষা** ১৯৫
  প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী
- **বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ** ২১১
  প্রফেসর তাজুল ইসলাম

www.icsbook.info

- **চিকিৎসাবিদ্যার ইসলামীকরণ** ২২৪
  ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়াযযাম
- **ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ** ২৪১
  অধ্যাপক আ. ন. ম. নূরুল করিম
- **মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আপগ্রেড করতে হবে** ২৪৯
  শাহ আবদুল হান্নান
- **মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানে প্রস্তাবনা** ২৫৫
  আব্দুলাহ্ আল আরিফ
- **Islamic Education Movement Recent History & Objectives** ২৬৪
  Shah Abdul Hannan
- **একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবনা** ২৭০
  প্রফেসর আবুবকর রফিক আহমদ
- **শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার** ২৮৫
  ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
- **আমরা কি পড়তে চাই, কি পড়ছি, কি পাচ্ছি?** ২৯২
  শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
- **শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা ও আমাদের প্রত্যাশা** ৩০০
  নূরুল ইসলাম বুলবুল
- **ধর্মভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা** ৩১৫
  সৈয়দ আলী আশরাফ
- **শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত ও ইসলামী মূল্যবোধ** ৩২৩
  একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
  প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান
- **সময়ের পরিক্রমায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা** ৩৪৪
  মুহাম্মদ শামীমুল বারি
- **এক নজরে বিগত সময়ের শিক্ষানীতি ও কমিশন রিপোর্ট** ৩৫৫
  মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম
- **প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আমাদের বক্তব্য** ৩৭৫
  বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
- **বিগত সময়ের শিক্ষানীতি বিষয়ক সুপারিশমালা ও জাতীয় শিক্ষা সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি** ৪১০
- **অ্যালবাম**

www.icsbook.info

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কথাটি যেরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন, ইসলামী শিক্ষা কথাটিও তেমনি অস্পষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এদেশে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষাই যদি ইসলামী শিক্ষা হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রদের এ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হবার কোন কারণ নেই এবং সমাজে উন্নতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো অভিভাবকই তাদের সন্তানদিগকে এ শিক্ষা দিতে রাজি হবেন না। আর ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাই যদি আদর্শ শিক্ষাকে বলে প্রচারিত হয় তাহলে এ শিক্ষার ফল দেখে কোন ইসলামপন্থী লোকই সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করতে পারে না। যারা ইসলামী মূল্যমান ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব দেখতে চায়, তারা প্রচলিত দুটি শিক্ষাব্যবস্থার কোনটিই আদর্শ শিক্ষা বলে স্বীকার করতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে দুনিয়াতে শান্তি ও মর্যাদার সহিত জীবন-যাপন করে আখেরাতের আদালতে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যেসব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার অন্বেষণ করেন, তারা রীতিমত এক মহা সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা পার্থিব কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আর আধুনিক শিক্ষায় ইসলামী চরিত্র সৃষ্টিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক দুনিয়ার উপযোগী ইসলামী শিক্ষা কোন ধরনের হবে, তা আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। সরকারি পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু না হলেও যাতে আগ্রহশীল লোকদের প্রচেষ্টায় একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করছি।

www.icsbook.info

যেহেতু বর্তমান শিক্ষাসঙ্কট হতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই ইসলামী শিক্ষার রূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি, সেহেতু দেশের পটভূমিকে সম্মুখে রেখেই আমাদেরগকে অগ্রসর হতে হবে। শুধু অবাস্তব মতবাদ নিয়ে চর্চা করায় কোন লাভ নেই। এরূপ কল্পনাবিলাসের অবসরও আমাদের নেই। তাই প্রচলিত শিক্ষব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশেষ করে আমাদের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করা অত্যন্ত জরুরি মনে করি। **প্রথমত:** শিক্ষা বলিতে কী বুঝায়, তাহা পরিষ্কার হওয়া দরকার। **দ্বিতীয়ত:** মানুষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা রচনাকালে মানুষের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করলে শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার বিকাশ লাভের কোন বন্দোবস্তই থাকবে না । আবার মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষা করে একমাত্র আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম হবে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। **তৃতীয়ত:** যে ধরনের লোক তৈরি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে নির্ধারিত হবে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে তদানুযায়ী পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত জাতীয় জীবনাদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে আদর্শকে জাতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সে আদর্শের উপযোগী চরিত্র গঠন করতে হবে। **চতুর্থত:** মূল ত্রুটি কোথায়, তা সঠিকরূপে অবগত না হলে শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কেননা রোগের প্রকৃত কারণ না জানলে নির্ভুল চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ চারটি বিষয়ের মীমাংসা শিক্ষা পুনর্গঠনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে শিক্ষার বাহ্যিক কাঠামো, আধুনিক উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, শিক্ষার স্তর, বিভাগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদির শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক আলোচনা নিতান্তই অর্থহীন। রোগ নির্ণয় ও নির্ভুল চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করে রোগীকে যত সুন্দরভাবে রাখা হোক এবং যতই শুশ্রূষা করা হোক- রোগীর অবস্থার উন্নতি এ বাহ্যিক ব্যবস্থা দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। সুচিকিৎসার সহিত এসব বাহ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত হলে উদ্দেশ্য সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা কাকে বলে ?

শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের দার্শনিক জটিলতা হতে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের বোধগম্য ও সরল আলোচনায় প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের যেসব জীব-জানোয়ারের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের মধ্যে শিক্ষার কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। স্রষ্টা তাদের স্বভাবের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর বিচার বিবেচনা করে পরামর্শ ও গবেষণা ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করে না। এদের সহজাত বৃত্তির তাগিদেই প্রাকৃতিক নিয়মে এরা

www.icsbook.info

প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে থাকে। কোন উস্তাদের কাছে ছবক নিয়ে তারা শিক্ষা লাভ করে না। বয়স্ক জীবেরা ছোটদের শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে বলেও আমরা জানি না। জীব শিশুদের পিতামাতাকে তাদের সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষার জন্য পেরেশান হতেও দেখা যায় না।

কিন্তু তাই বলে কি তাদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই ? প্রত্যেক জীবেরই জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। নিতান্ত বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাদেরকে কাজ করতেও আমরা দেখতে পাই। জীবশিশু তার পূর্ণ বিকাশ লাভের উপযোগী গুণী চিন্তাধারাবলিও অর্জন করে থাকে। এসব মেনে নেয়া সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে মানুষের ন্যায় বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করে তাদেরকে শিক্ষা করতে হয় না।

মানবশিশুর বিকাশ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত তার পিতামাতা এবং অন্যান্য শিক্ষকের ওপর যেরূপ নির্ভরশীল, অন্যান্য জীবের মধ্যে সেরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। মানবশিশু আগুনকে খেলার জিনিস মনে করে তাতে হাত দেয়, নিজের পায়খানাকে হালুয়া মনে করে মুখে পুরে বসে। কিন্তু কোন বিড়াল শিশুকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যে কুকুর মানুষের মলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তার শিশুকেও কোনদিন নিজের পায়খানা মুখে দিতে দেখা যায় ন। মানুষের শৈশবকাল এত দীর্ঘ যে, পনের-বিশ বছর পর্যন্ত তাকে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে উপযোগী গুণাবলি অর্জন করতে হয়। অথচ মানুষের চেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীদের বেলায়ও এরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, মানব শিশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম প্রচেষ্টার দ্বারা যা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবশিশু তা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা-আপনিই লাভ করে থাকে।

কিন্তু মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে মানুষের শিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নরূপ : আপন প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থার নামই শিক্ষা।

এ ধরনের শিক্ষা একমাত্র মানুষেরই প্রয়োজন। অন্যান্য জীব-জানোয়ার এ ঝামেলা থেকে মুক্ত। কোন্‌টা খাওয়া ঠিক এবং কোন্‌টা ঠিক নয়, তা জানার জন্য ছাগশিশুর নাসিকা যন্ত্রের সহজাত ক্ষমতাই যথেষ্ট। কিন্তু মানবশিশুকে তা বড়দের নিকট হতে শিখতে হয়।

শৈশবকালে মানুষও সহজাত বৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু যতই তার বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই উক্ত সহজাত বৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব চরিত্র গঠনের প্রাথমিক স্তরে বালক-বালিকারা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা না করলেও বড়দের ইচ্ছাকৃত চেষ্টার ফলে তখন তারা শিক্ষা লাভ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে তারা নিজেরাই চেষ্টা করে জ্ঞান অর্জন করতে অভ্যস্ত হতে থাকে।

www.icsbook.info

মানুষ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ব্যতীত যদি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় তাহলে প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন।

মানুষ সৃষ্টি জগতের বহু রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই বস্তুজগতের বিভিন্ন শক্তিকে নিজের উপকারে ব্যবহার করেছে। কিন্তু অহির জ্ঞান ব্যতীত এবং নবীদের শিক্ষা ব্যতীত কোনকালেই মানুষ তার নিজের পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে এত বিপুল শক্তির অধিকারী করেছে যে, মানুষ আজ পাখির চেয়েও দ্রুত উড়তে সক্ষম। দ্রুততম প্রাণীর চেয়েও অধিকতর বেগে চলার উপযোগী যানবাহনের অধিকারী। এমনকি গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচরণের ক্ষমতায়ও ভূষিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করার উপযোগী শিক্ষা হতে আধুনিক মানুষ বঞ্চিত রয়ে গেল। এর মূল কারণ এই যে, মানুষ নিজকে ভালরূপে চিনতে সক্ষম হয়নি। শুধু বিবেক বুদ্ধি-প্রয়োগ করে মানুষ নিজকে চিনতে অক্ষম বলেই মহান স্রষ্টা রাসূলের মারফতে যুগে যুগে মানুষকে আত্মজ্ঞান দান করেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আমাদিগকে কোরআন মজিদের নিকট 'ধরনা' দিতে হবে।

কোরআন অন্যান্য জীবের সহিত মানুষের যে ব্যবধান নির্দেশ করে তা এই যে , মানুষ নৈতিক জীব আর অন্যান্য জীব নৈতিকতার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য ও মিথ্যার বিচার করার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। মিথ্যার বেসাতি যার সম্বল, সে মানুষটিও মিথ্যা বলা অন্যায় বলে স্বীকার করে। মিথ্যা বলাকে ভাল কাজ মনে করলে সে 'মিথ্যুক' উপাধিতে ভূষিত হওয়া পছন্দ করত। 'চুরি করা খারাপ' এ কথা স্বীকার করে বলেই চোর প্রকাশ্যে না যেয়ে গোপনে চুরি করতে যায়। ভাল-মন্দের এ বিচার জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করেছে। যারা এ নৈতিক দিককে উন্নত করার চেষ্টা করে না, কোরআন তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে, ' তারা পশুর ন্যায় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।' নৈতিকতার উন্নতি ব্যতীত মানুষ তার যাবতীয় শক্তি যখন ব্যবহার করে তখন সে পশুর চেয়েও অনিষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি মানুষের এক বিরাট অস্ত্র। এই অস্ত্রের সাহায্যে শারীরিক আকারে ক্ষুদ্র হয়েও সে বিরাট বপু-বিশিষ্ট হাতির ওপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু নৈতিকতার বিকাশ না হলে এই বুদ্ধি শক্তিকেই সে মানবজাতির অকল্যাণে প্রয়োগ করে। কথা বলার শক্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষকে

www.icsbook.info

শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। কিন্তু নৈতিক অবনতির ফলে যখন কেহ মিথ্যা বলে তখন সে কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে। কেননা কুকুর মিথ্যা বলতে পারে না। তাই বস্তুগত শক্তির সঠিক ব্যবহার নৈতিকতার ওপর নির্ভরশীল। এক তরবারি নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ব্যবহৃত হলে তা মানুষের উপকারই করবে, কিন্তু নৈতিকতাহীন দানবের হিংস্র থাবা দ্বারাই এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কোরআন

হাত, পা, চোখ, কান বিশিষ্ট শরীরটাকে প্রকৃত মানুষ মনে করে না। কোরআনের মতে এ দেহ সৃষ্টির বহু পূর্বে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। কোরআনের পরিভাষায় সেই মানুষটিই হল রূহ বা আত্মা। এই আত্মাই নৈতিকতার আধার। রূহকে উন্নত করার ব্যবস্থা না করলে এই শরীর পশুর মতো ব্যবহার করবে। শরীরের যত সব বস্তুগত দাবি আছে তা পূরণের জন্য মানবদেহ সকল সময়ই ব্যস্ত। পেট খালি হলেই সে খাদ্যের জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ সে খাদ্য চুরি করে আনল, না পরিশ্রম করে অর্জন করল সে বিষয়ে পেটের কোন মাথাব্যথা নেই। তার খাদ্যের প্রয়োজন। অন্যায়ভাবে খাদ্য এনে দিলেও সে নিশ্চিন্তে খেতে থাকে। কিন্তু তখন রূহ বলতে থাকে যে, কাজটা অন্যায় হল। গৃহপালিত পশু রজ্জু ছিঁড়ে নিজেরাই দয়ালু মনিবের সাজানো বাগান খেতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। নৈতিকতার বন্ধন ছিঁড়তে পারলে মানবদেহও তেমনি একটি পশুতে পরিণত হয়। মহানবী (সা) তাই নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষকে এমন এক ঘোড়ার সহিত তুলনা করেছেন যা রজ্জু দ্বারা এক খুঁটির সাথে আবদ্ধ। এ ঘোড়াটি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতাও নৈতিকতার রজ্জু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই একমাত্র রজ্জুর সীমা পর্যন্তই সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সক্ষম।

উপরিউক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের আত্মার সাথে তার দেহের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগে আছে। মানুষ অনেক নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু অনেক সময় দেহের তাগিদের কাছে পরাজয় বরণ করে। এ দ্বন্দ্বে দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নৈতিকতার চাপে বৈরাগী হবার প্রেরণা লাভ করে। তারা 'দরবেশ' ও 'সন্ন্যাসী' হলেও মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অন্য দিকে অধিকাংশ গাছের মতো জীবন-যাপন করে মনুষ্যত্বের উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়। আবার অন্য দিকে অধিকাংশ লোক দেহের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মাকে পঙ্গু করে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। কোরআন মানুষকে এ দ্বন্দ্বের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যে বিধান দিয়েছে তা দেহের সকল দাবিকে নৈতিকতার সীমার ভেতরে পূরণ করতে সাহায্য করে। দেহের দাবিকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে কোরআন বলে : ' বৈরাগ্য সাধনের নীতি মানুষ নিজেই আবিষ্কার করেছে-আমরা তাকে এই নির্দেশ দান করিনি।'

www.icsbook.info

আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্বে দেহকে অস্বীকার করার বৈরাগ্য নীতি যেমন মানুষের উপযোগী নয়, তেমনি আত্মাকে পরাজিত করে পশুর ন্যায় ভোগবাদী জীবন-যাপনও মানুষের অপমৃত্যু বৈ আর কিছু নয়। বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মাঝামাঝি মনুষ্যত্বের সিরাতুল মুস্তাকিমই কোরআনের শেখানো পথ। তাই কোরআনের মতে মানুষ আত্মাহীনও নয়, দেহহীনও নয়। আবার আত্মাসর্বস্বও নয়, দেহসর্বস্বও নয়, বরং সে দেহ ও আত্মা উভয়েরই সমন্বয়। এইখানে দেহ আত্মার বাহন আর আত্মা দেহেরই সহিস।

সাধারণ অর্থে দেহের দাবিকে প্রবৃত্তি এবং আত্মাকে বিবেক বলে অভিহিত করা চলে। মানব দেহের ইন্দ্রিয়সমূহকে বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ আকর্ষণই প্রবৃত্তি। একদিকে দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের প্রতি মানুষের তীব্রভাবে আকৃষ্ট হবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে- অপরদিকে তাকে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে সচেতন বিবেক শক্তি দান করা হয়েছে। এরূপে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের বিপরীতমুখী তাড়না সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখনই বিবেকের বিপরীত কাজ করে তখনই বিবেক তাকে দংশন করতে থাকে। দেহ অসুস্থ হলে যেমন তা আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না, তেমনি বিবেক অসুস্থ হলেও তার দংশন করার শক্তি হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করলে কোন দেহ যেমন অসুস্থ হয় তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে বারবার চললে বিবেকশক্তি লোপ পেতে থাকে। এ দু'শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপরই মানবজীবনের শান্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মানুষকে যারা আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করেন তার শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার বেলায় মানুষের শুধু বস্তুগত প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখেন। আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবার ফলে সে ব্যবস্থায় মানুষকে অন্যান্য জীবের ন্যায়ই দেহ-সর্বস্ব মনে করে গড়ে তোলা হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ ও খোদাবিমুখ বলে তার পক্ষে মানুষকে আত্মাপ্রধান হিসেবে চিনবার সুযোগ হয়নি। ডারউইন মানুষকে বানরের উন্নত সংস্করণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছেন। এ শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আবার যাঁরা মানুষকে আত্মাসর্বস্ব মনে করেন অথবা তার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রচলন করেন, তাঁরাও মানুষের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা দিতে অক্ষম। এ শিক্ষা মানুষকে যতই খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করুক, বাস্তব জীবনে বস্তুগত প্রয়োজনের তাগিদ

www.icsbook.info

তাকে ঈমানের বিপরীত পথে যেতে বাধ্য করে। তাই এ প্রকার শিক্ষাও মানুষের স্বভাবের বিপরীত।

তাই যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে এ জগতের রূপ-রস-গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করার যোগ্যতা দান করে, সে শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানবতার উন্নতি ও নৈতিকতার বিকাশে প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তা-ই মানুষের উপযোগী শিক্ষা। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দান করা সত্ত্বেও যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব ও আত্মার উন্নতিকে ব্যাহত করে, তা প্রকৃতপক্ষে মানব-ধ্বংসী শিক্ষা, তাকে কিছুতেই মানুষের উপযোগী শিক্ষা বলা চলে না।

দুনিয়ার সকল শিক্ষাবিদই এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্রকে গঠন করার চেষ্টায় প্রত্যেকটি সজাগ জাতির কার্যসূচির প্রধান অঙ্গ। উন্নত জাতিসমূহের শিক্ষাব্যবস্থায় বাহ্যিক দিক দিয়ে অনেক সামঞ্জস্য থাকলেও মূলত তাদের সকলেরই একই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয়। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রকার মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে; রাশিয়ায় হুবহু তার অনুকরণ হচ্ছে না। এর প্রকৃত কারণ হল তাদের আদর্শের পার্থক্য। ভাল-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান, মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি চরিত্রের মান নির্ণয় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কতক ধারণা ইত্যাদির সমন্বয়েই একটি আদর্শ গড়ে ওঠে। যে জাতির নিকট যে আদর্শ গ্রহণযোগ্য, সে আদর্শকে সম্মুখে রেখেই উক্ত জাতির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক দেশের কোন না কোন আদর্শ থাকে। সে আদর্শ নিজস্বও হতে পারে, অথবা অপর কোন দেশের নিকট হতে ধার করাও হতে পারে; কিন্তু কোন আদর্শ নির্ধারণ ব্যতীত কোন জাতিই উন্নতির পথে পদক্ষেপ রাখতে পারে না। আদর্শ একটি জাতির লক্ষ্য। যে জাতির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই সে অপরাপর জাতির উচ্ছিষ্ট ভোগী হতে বাধ্য। একটি বিশেষ আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক, তা শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যের দিকে দেশকে পরিচালিত করবে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের বেলায় জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ অপরিহার্য।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কোন্ ধরনের মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করছি, তা-ই এ ক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন। আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবনদর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহল আমাদের

www.icsbook.info

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা আমাদের তাহজিব তমুদ্দুনকে ভিত্তি করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

আজ বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানবজাতির মুক্তির বিধানরূপে পেশ করার যোগ্য লোক তৈরি করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্যে ইসলামে, নৈতিকতা মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে। বস্তুগত জ্ঞানের সহিত নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধনই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে। আমরা যদি গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই তাহলে দিশেহারার মতো অনিশ্চিত পথে চলে জাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়েই যাব।

আমাদের শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হল প্রাচীন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অপরটি ইংরেজি শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি 'ইসলামী শিক্ষা' বলে দাবি করে। এবং দ্বিতীয়টি 'আধুনিক শিক্ষা' হিসেবে গৌরববোধ করে। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে, তারা কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদির অধ্যয়ন করে বটে। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার কোনই সুযোগ পায় না। ফলে মানবজীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত প্রকার সমস্যা আছে, এর আধুনিক রূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই লাভ করে না। ফলে মানব সমস্যার যে সুষ্ঠু সমাধান আল্লাহর কোরআন ও রসূলের হাদীসে দেয়া হয়েছে, তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারে না। এ কারণে দীর্ঘকাল মাদ্রাসায় কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা লাভ করে তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করে, তারা প্রচলিত দুনিয়ায় ভাল-মন্দ জ্ঞান অনেক কিছুই হাসিল করতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপনের কোন প্রেরণাই তারা লাভ করে না। চিন্তা ও কর্মে তারা প্রায়ই অমুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা পাবার পরও যারা ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তাঁরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরের পরিবেশে নিজদিগকে খাঁটি মুসলিমরূপে গঠন করেন, তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম।

এমতাবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষা পুনর্গঠন করা রীতিমত জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দেশের নাগরিকদেরকে উপযুক্তরূপে গড়ে তুলবার জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। দু'ধরনের শিক্ষিত লোক সমাজকে দু'বিপরীত দিকে টানতে থাকলে দেশের বিপর্যয় অনিবার্য। উপরিউক্ত দু'প্রকারের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশের আদর্শ ইসলাম বলে স্বীকার

www.icsbook.info

করার পর ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা বলে দু'প্রকার শিক্ষা চলতে থাকার কোন অর্থই হয় না। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষায় রূপ দিতে হবে। উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে এ কাজ অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয়নি। এ পর্যন্ত যতগুলি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাদের কোনটিতেই ইসলামী আদর্শেও ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়বার সুপারিশ করতে পারেনি। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষব্যবস্থায় খ্রিষ্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেয়া হয়েছে।

বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে গঠন করে এর সাথে Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা) এর লেজুড়টুকু জুড়ে দিলেই কোন শিক্ষাপদ্ধতি ইসলামী হয়ে যায় না। এ ধরনের অস্বাভাবিকতা সংযোগ দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদ

ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে শিক্ষা পুনর্গঠন করতে হলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক গলদটুকু তালাশ করে বের করতে হবে।

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার মূলে যে প্রশ্নটি বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে, তা এই যে, ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা কোন ধরনের মানুষ গঠন করা হবে? এদেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাটি ইংরেজদের অবদান। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজগণ নিশ্চয়ই এদেশের আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেনি। এমনকি তারা নিজ দেশে যে প্রকার নাগরিক গঠন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে, সে ধরনের উদ্দেশ্য এখানে ছিলো না, বরং এমন কতক লোক তৈরি করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো যারা মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসকদের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে এদেশে ইংরেজ শাসন জারি রাখতে সাহায্য করবে। তাদের এমন কতক লোক জোগাড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যারা ইংরেজদের কথা বুঝতে পারে, তাদের আদব-কায়দা, চাল-চলন, রীতি-নীতি অনুকরণ করতে সক্ষম এবং তাদের আদর্শকে ভালোবাসতে রাজি।

www.icsbook.info

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সে শিক্ষাব্যবস্থাকেই বর্তমানে অধিকতর উন্নত করার চেষ্টা চলছে। সে ব্যবস্থার সাথে Religious Instruction নামে দ্বীনিয়াত সংযোগও ইংরেজদের অনুকরণ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্ম লাভ করে, বিশ্বাস ও জ্ঞান যে পথে ধাবিত হয়, আমাদের দেশে এর ব্যতিক্রম হবার কোনই কারণ নেই।

বিশাল শিক্ষাবৃক্ষকে যদি ইসলামের জীবনদর্শন হতে নিরপেক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে সে শিক্ষাবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত দ্বীনিয়াতের আলাদা কলাম বেঁধে দিলে যে কী পরিণাম হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে এ পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়েছিলো। পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই সব কিছু শিক্ষা দিবার সংগে দ্বীনিয়াতের অস্বাভাবিক সংযোগ সেখানেও ছিলো। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এরূপ ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এক প্রকারের জীবের শরীরে অন্য জীবের অংশবিশেষ বেঁধে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা বেশি ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

আধুনকি শিক্ষাব্যবস্থায় পার্থিব সকল শাস্ত্র এমনভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে ও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে দেখানো হচ্ছে যে, এ বিশাল বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই। ইহা নিজে নিজেই চলছে এবং সাফল্যের সাথে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিধান শিক্ষা দেয়ার ভেতর দিয়ে ছাত্রদের মগজে এ ধারণাই জন্মাচ্ছে যে, আল্লাহ, রাসূল, অহি, কোরআন ইত্যাদি ব্যতীতই জগৎ উন্নতি লাভ করছে। সমগ্র শিক্ষার মাধ্যমে তারা গোটা জীবনব্যবস্থা সম্বন্ধেই তারা স্রষ্টা-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে যখন হঠাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত, অহি ইত্যাদির কথা প্রথম প্রথম তাদিগকে অবাক করে। অতঃপর এ সকল বিষয় তাদের নিকট বিদ্রূপের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে হেয় মনে করা হয়, ধর্মকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ধরনের ব্যবস্থায় বড়জোর ধর্মকে শুধু একটি নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করা কিছু লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ইহা জীবনকে ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালনা করার যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি করবে না। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনে ইসলাম একটি অপ্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে স্থান পাবে।

ইসলাম এমন কোন ধর্মের নাম নয় যে, মানুষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজ করার অনুমতি দেবে আর সে সঙ্গে কিছু কর্মহীন বিশ্বাস ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই রাজি হবে। কারো গড বা ভগবান হয়তবা এতে রাজি হতে পারে যে, গীর্জা ও মন্দিরে তাকে ডাকলেই সে সন্তুষ্ট হবে এবং জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও কর্মে তাকে ত্যাগ করলে কোন আপত্তি করবে না। কিন্তু কোরআনের আল্লাহ

www.icsbook.info

অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি কারো সাথে আপস করতে রাজি নন। এই কারণেই তিনি মুমিনদের পরিপূর্ণরূপে দাখিল হও বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরা একে অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক মনে করি যে, আল্লাহ্ আছেন বলে মানবো, অথচ পার্থিব জীবনে আমাদের পথ-প্রদর্শক হবেন না। যে আল্লাহ্ দুনিয়ার চলার পথে আমাদের সঠিক হেদায়েত দেন না, তাকে শুধু মসজিদে মেনেই বা লাভ কী?

সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে যে শিক্ষার মাধ্যমে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই তা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এর সাথে দ্বীনিয়াতের শিক্ষাকে জুড়ে দিয়ে ইসলামকেও একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব নির্জীব ধর্মেই পরিণত করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ধরন

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে ইসলামের ধর্মীয় দিকটুকুই চর্চা হয় না। ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবে স্বীকার করার নাম ইসলামী শিক্ষা বলা কিছুতেই উচিত নয়। ইসলাম একটি জীবন-দর্শন ও জীবন-বিধান। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের জন্যই এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান রয়েছে। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ বলে স্বীকার করলে, নামাজ, যাকাত, বিবাহ, তালাক, ফরায়েজ ইত্যাদি শিক্ষাদান করার দ্বারাই ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে না। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার বন্দোবস্ত থাকে তা-ই ইসলামী শিক্ষা। যে শিক্ষা লাভ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে উঠবে, যাতে ইসলামের আদর্শে একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সে শিক্ষলাভ করলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোরআন যে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে চায়,তাই লাভ করা যাবে। এ শিক্ষা ব্যক্তি জীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল দিকেই ইসলামের আদর্শকে মানবরচিত সকল আদর্শ হতে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে প্রমাণ করবে। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চতম মান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায়ই কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাবতীয় শিক্ষা দান করতে হবে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কনীতি এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে মানব রচিত মতবাদসমূহের সহিত তুলনা করে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোটকথা, যে শিক্ষা মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি সৃষ্টি করবে তাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যদি ইসলামই আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তাহলে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে ছয়টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (১) শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতে হবে। (২) পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে যত প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করতে হয় সে সবকেই ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা দিতে হবে। (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোটা পরিবেশই ইসলামী ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। (৪) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের সাথে মানবরচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল করতে হবে। (৫) যেহেতু কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস, সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চস্তরে উন্নতমানের মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ কোর্স থাকতে হবে। (৬) শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার বাস্তবরূপ

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়, তাহলে ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপ কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

দ্বীন ও দুনিয়া

প্রথম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ করার যোগ্য হতে হবে। দ্বীন ও দুনিয়া কথাটি দ্বারা সাধারণত ধর্মীয় ও পার্থিব বলে কথিত দু'টি পৃথক দিক মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া দু'টি সামঞ্জস্যহীন পৃথক সত্তা নয়। অন্যান্য ধর্মে যেহেতু জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ বিধান নেই (অন্তত অন্য কোন ধর্মের নেতৃবৃন্দ এরূপ দাবি করেন না) সেহেতু সে সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে তাদের পার্থিব শিক্ষার যোগাযোগ নেই। তারা দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মের প্রভাবমুক্ত। তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিশ্বাস করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে তারা ঐ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার পরিশিষ্টটুকু জুড়ে দেন।

কিন্তু ইসলাম ঐ ধরনের কোন ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য সে শিক্ষাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয় তাহলে তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়।

www.icsbook.info

ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন ও বিচার, পারিবারিক ও সামাজিক কাজ কর্ম সকল মানুষকেই করতে হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকারই করে না তাদেরও এসব কাজ না করলে চলে না। জীবনের সকল কাজ কর্মে তারা নিজেদের মনগড়া নীতি বা অন্য কোন মানুষের রচিত নীতি ও বিধান অনুসরণ করে চলে। কিন্তু এ কাজগুলি যদি কোরআন ও হাদীসের নীতি ও আইন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়, তাহলে এই চিন্তাধারা সবই ইবাদতে পরিণত হয়। ইসলামে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান শুধু ইবাদত নয়-গোটা জীবনটাকে ইবাদতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তব জীবন হতে পৃথক কোন নিষ্ক্রিয় শিক্ষা হতে পারে না। দুনিয়ায় আল্লাহর প্রকৃত দান হিসেবে জীবন যাপন করার উপযোগী শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা নামে অভিহিত করার যোগ্য। তাই ইসলামী শিক্ষায় দ্বীন ও দুনিয়ার প্রচলিত কৃত্রিম পার্থক্য অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনকে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দেখাও অসম্ভব।

পার্থিব ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান পরোক্ষ (Indirect) শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মানুষের মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং বাস্তব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা-বিজ্ঞানীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিক্ষার্থীদিগকে নীতিজ্ঞান ও তত্ত্বতথ্য পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যতটা কার্যকরী হয়, বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমে সে শিক্ষা দিলে অবচেতনভাবেই তা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও অভ্যন্তরীণ প্রেরণায় যা করতে চায় তাকে শিক্ষামূলক করে তোলার নামই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষা এ নীতির ওপর ভিত্তি করেই খেলার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান, শব্দ গঠন ইত্যাদি শিক্ষাকে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষাপদ্ধতির এ পরোক্ষ নীতি অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে শিক্ষা দিলে বাস্তব দিক দিয়ে অধিক কার্যকরী হবে। সুদ যে একপ্রকার জঘন্য জুলুম তা পৃথকভাবে মুখস্থ না করিয়ে যদি সুদের অংক কষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে অবচেতনভাবেই শিক্ষার্থীর মনে তা সহজে কায়েম হবে। আমরা স্কুল জীবনে গোয়ালা কর্তৃক দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করার অংকের মাধমে যা শিখেছি, তাকে এরূপ সমাজবিরোধী কার্যের প্রতি অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়নি। সেখানে পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কিরূপে বেশি দামে কিনে পানি মিশাবার ফলে কম দামে বিক্রি করেও গোয়ালা লাভবান হতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এ অংকে "গোয়ালা কত লাভ করেছে" জিজ্ঞাসা না করে যদি "গোয়ালা" মানুষকে কত পরিমাণ ঠকিয়েছে? জিজ্ঞাসা করি তাহলে এ কাজের প্রতি ছাত্রদের ঘৃণার উদ্রেগ হবে।

www.icsbook.info

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পড়ানোর সংগেই পবিত্রতার ইসলামী ধারণা মনে করা হলে 'পবিত্রতা সম্পর্কে পৃথকভাবে মাসয়ালা শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা বেশি উপকারী হবে। সৌরজগৎ সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান দান করার সংগেই যদি সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত আয়াতসমূহকে শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে ভূগোল বিজ্ঞানেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করবে।

এভাবে সকল স্তরের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা দেয়া সম্ভব এবং সকল বিষয়কেই কোরআন হাদীসের জ্ঞান দান করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিক্ষার পরিবেশ

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গোটা পরিবেশ একেবারেই ইসলামবিরোধী। এ পরিবেশে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবেশন করলেও শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ইসলামের কোন প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হবে না। নামাজ ইসলামী জীবন-বিধানের দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট উহা ফরজ বলে গণ্য নয়। সেখানে নামাজ বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মুবাহ (যা করা ও না করার কোন লাভ ক্ষতি নেই) কাজ মাত্র। ইসলাম পর্দার নির্দেশ দেয়; কিন্তু সেখানে পর্দা 'হারাম'। মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা সাক্ষ্য ইসলামে হারাম, কিন্তু সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে এসবই আর্টের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার অধিকাংশ সীমাই সেখানে লংঘন করা সহজ আর নৈতিকতা পালন করা সেখানে অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্বাস ও মূল্যমান সম্পর্কে যেটুকু শিক্ষা ছোট সময় হতে শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসে, কলেজ জীবনে যখন তাদের বিশ্বাস ও মূল্যমানের বিপরীত চলাই সহজতর মনে হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিশ্বাস ও কর্মে প্রথমে দ্বন্দ্ব ও পরে স্পষ্ট বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। তাদের নৈতিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়। গোটা শিক্ষা জীবনেই বিপরীত কাজ করার এক ব্যাপক ট্রেনিং লাভ করতে থাকে।

এর ফলে তাদের বাস্তব জীবন কোন বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। তারা ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় বলে বিশ্বাস করলেও এ বিশ্বাসের বিপরীত চলারই শিক্ষা লাভ করেছে। জাতির খেদমত করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজের খেদমত করার মহান ট্রেনিংই এ শিক্ষাব্যবস্থায় লাভ করেছে।

জাতির মূল্যমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোটা পরিবেশ গড়ে তোলা না হলে শুধু কেতাবি বিদ্যা দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। বিদেশে সে সমস্ত বই পড়ান হয়, আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও সে সমস্ত বই আছে। কিন্তু ঐসব দেশে

www.icsbook.info

সমাজের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সহিত শিক্ষার পরিবেশের বিরোধ আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত নয়। সুতরাং তাদের বিশ্বাস মোতাবেক চরিত্র সেখানে সৃষ্টি হয়। ফলে সেসব দেশের শিক্ষিত লোকদের এতটা নৈতিক অধঃপতন দেখা যায় না।

প্রকৃত কথা এই যে, চরিত্র সৃষ্টির জন্য কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। যদি মূল্যবোধ ও বাস্তব শিক্ষা একরূপ হয় তবেই চরিত্রের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের সাধারণ মূল্যবোধের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং হয় আমাদের মূল্যবোধের বিশ্বাসকে বদলিয়ে শিক্ষার পরিবেশ গঠন করতে হবে, না হয় পরিবেশকে ঈমান অনুযায়ী সংস্কার করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আমরা বিশুদ্ধ অনৈসলামী চরিত্র সৃষ্টি করব, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যিকার চরিত্র গঠিত হবে।

উচ্চশিক্ষার ইসলামী রূপ

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দান করে। কারণ চিন্তার নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব। বর্তমানে আমাদের দেশে অনৈসলামীরা ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিত লোকের নেতৃত্বের ফলেই সমাজে ইসলামের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই উচ্চ শিক্ষাকে 'ইসলামী' করে গঠন না করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার কিছুতেই সম্ভবপর নয়। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ইসলামী জীবন দর্শন; ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান এবং কোরআনের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা শিক্ষার্থীদের মনে বদ্ধমূল হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ ব্যতীত প্রচলিত পন্থায় এসব বিষয় শিক্ষা দিতে থাকলে পৃথকভাবে দ্বীনিয়াত শিক্ষা যতই দেয়া হোক তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজ কিছুতেই ইসলামের ছাঁচে গঠিত হবে না।

ইসলামের জড়বাদী ব্যাখ্যা মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত করার পর শুধু কোরআনের অনুবাদ ও তফসির শিক্ষা দ্বারা কিছুতেই ইসলামের ইতিহাস দর্শনকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের উচ্চ শিক্ষায় কোরআনের ইতিহাস দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা দ্বারাই তা সম্ভব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দেবার পর হজরতের শাসনব্যবস্থার ভাসাভাসা আলোচনা কিছুতেই মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সৃষ্টি করবে না। তাই শিক্ষার বিষয়বস্তুকে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে, যাতে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীগণ মুসলমান বৈজ্ঞানিক, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং মুসলমান অর্থনীতিবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একাংশ মসজিদে মুসলমান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রী,

www.icsbook.info

অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী এবং পারিবারিক জীবন ফ্রয়েডপন্থী হিসেবে গঠিত হয়ে কিছুসংখ্যক কার্টুনে পরিণত হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গঠন করতে হলে শিক্ষার সকল বিষয়কেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গঠন করতে হবে।

ইসলামী জ্ঞানের উৎস

কোরআন ও হাদীসই ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। আরবি ভাষায় মূল কোরআন ও হাদীসকে পূর্ণরূপে বোঝার লোকের অভাব হলে জীবনের সকল দিকেই ইসলামের প্রভাব ক্ষুন্ন হবে। তদুপরি বহু শতাব্দীর কঠোর সাধনার ফলে কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যে ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফেকাহ গড়ে উঠেছে, তাও আরবি ভাষায়ই রচিত। সুতরাং কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর গবেষণার যোগ্য প্রতিভাশালী লোক তৈরি না হলে ইসলামী শিক্ষা তো দূরের কথা, ইসলামী সমাজই টিকতে পারবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা থাকে, তেমনি কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য শিক্ষার উচ্চস্তরে বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর মাধ্যমে যে সকল মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি হবে প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই ইসলামী দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য হবে। কিন্তু তারা যদি মানব সমস্যা, আধুনিক জগৎ ও প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে তাদের কোরআন-হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের কোনই উপকারে আসবে না। সুতরাং তাদেরকে ডিগ্রি পর্যায়েও বিভিন্ন প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে হবে, যাতে তারা কোরআন ও হাদীসের আলোকে জাতিকে যোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষকদের আদর্শ

শিক্ষার ব্যাপারে সকল অবস্থায়ই শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাধিক। শিক্ষকের বিদ্যা ও চরিত্রের মানের ওপর চিরদিনই শিক্ষার ফল প্রধানত নির্ভরশীল। "কী পড়ান হচ্ছে" তার চেয়ে কী ধরনের শিক্ষক পড়াচ্ছেন" এর মূল্য ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকগণকে চিন্তা ও কর্মে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। কিতাবিবিদ্যা অপেক্ষা বাস্তব উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকরী হয়। যদি শিক্ষকগণ ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ স্থানীয় হন, তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হবে।

আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের উন্নতি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান আজ বিরাট উন্নতি লাভ

www.icsbook.info

করেছে। এ উন্নতিকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেদিকেও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইসলামের চর্চা করার জন্য আমরা যেমন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণার ফলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়েছে, তাও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

উপসংহার

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ প্রবন্ধে শিক্ষাপদ্ধতির ইসলামী রূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সরকারি পরিকল্পনা ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রচলন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর যে সরকার ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেনি সে ধরনের কোন সরকারকে এরূপ কোন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বললেও কোন সুফল ফলবে না।

সমাজে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন কিছুসংখ্যক মুজাহিদের সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদিগকে চিন্তা ও গবেষণার সংগে ক্ষুদ্রাকারে হলেও এরূপ একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবেই যখন কোন সমাজে একটি পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন চলতে থাকে, তখন জীবনের সকল দিকেই উপযুক্ত চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের দল তৈরি হতে থাকে। কোথাও এরূপ একটি আন্দোলন বিজয়ী হলে অতি সহজেই উপরিউক্ত রূপে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে পরিণত হবে। সুতরাং যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেন তাদিগকে একটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনাকেও নিজেদের কর্মসূচির একটি বিশিষ্ট অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ভাষা সৈনিক ও সাবেক আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.icsbook.info

শিক্ষার আদর্শ

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

আফ্রিকার ঘানার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং পণ্ডিত যিনি এক সময় ঘানার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই ডক্টর কুফি বুসিয়া আফ্রিকান দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে স্বাধীন অবস্থায় আমরা যদি অগ্রসর হই তাহলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবে। এই কারণে ক্ষতি হবে যে আমরা স্বাধীনতার তাৎপর্য অনুভব করতে পারব না এবং পূর্বতন শিক্ষাধারার অনুসরণে আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবো। তার ফলে জীবনের যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটবে না।" তিনি সেজন্য চেয়েছিলেন যে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অর্থাৎ আফ্রিকার মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে এবং তাদের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠুক। তিনি এ জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পেরেছিলেন এটা বলা যায় না।

কুফি বুসিয়ার এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীরা বিশেষ করে ইংরেজরা পৃথিবীর যে সব দেশ অধিকার করেছিল সে সমস্ত দেশে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতবর্ষেও তেমনি ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। সেখানে কতকগুলো প্রয়োজন ছিল। একটি হচ্ছে প্রশাসনের জন্য কর্মচারী তৈরি করা, দ্বিতীয় হচ্ছে দেশের পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং পুলিশ ব্যবস্থাকে একটি ধারায় গতিমান করার জন্য পুলিশি প্রশিক্ষণের একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা, যে ব্যবস্থাটি এদেশে ছিল না। তেমনি আবার সাধারণভাবে কতকগুলো নৈতিক শিক্ষা এবং কতকগুলো বিশ্বাসের প্রতিফলন তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আরোপ করেছিল। এভাবে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংল্যান্ড ভারতের জন্য কী করেছে সেই রকম একটা গ্রন্থ ছিল স্কুলের

www.icsbook.info

পাঠ্যসূচিতে। তাছাড়া খ্রিস্টানদের যে বাইবেল সেই বাইবেলও পাঠ করার ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভাল ইংরেজি শিখবার জন্য। যেভাবেই হোক অর্থাৎ সেই শিক্ষার বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল খ্রিস্টান এবং দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষার প্রয়োজনের ভিত্তিও ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনকে দৃঢ়ও স্থায়ী করা। এই ইংরেজ শাসনের সময় এখানকার মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল, হিন্দুদের জন্য টোল শিক্ষা ছিল কিন্তু এই মাদ্রাসা অথবা টোল সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অর্থাৎ, মাদ্রাসা থেকে যারা বেরিয়ে আসত অথবা টোল থেকে যারা বেরিয়ে আসত তারা প্রশাসনিক কর্মের জন্য উপযুক্ত হতো না। তারা দেশের ধর্মীয় কর্মের জন্য উপযুক্ত হতো। বলা যেতে পারে মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল এক রকমের থিয়োলজিক্যাল স্কুল। অর্থাৎ দ্বীনি শিক্ষা। মুসলমানরা তাদের ধর্ম আচরণের জন্য যে সমস্ত শিক্ষার প্রয়োজনবোধ করেছিল মাদ্রাসার মধ্যে থেকে বেড়িয়ে যারা আসত, সেই সময় তারা সাধারণ জীবনের উপযোগী হতে পারতো না। এই ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাটা মোগল আমল থেকেই চালু হয়েছিল। মোগলরাও সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনতে চাননি এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চৈতন্যোদয় হোক এটাও তারা চাননি। সেই কারণে সাধারণ মানুষকে তারা একটি বদ্ধকূপের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই অগণিত হিন্দু জনসাধারণ ও মুসলমান জন- সাধারণ তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার একটি প্রবন্ধের মধ্যে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। বলেছেন, "আমাদের দেশের রাজার পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন হয় না এবং তারা জানেও না কোথা দিয়ে কোন পরিবর্তন হচ্ছে।" অর্থাৎ দেশের প্রশাসনের যে মূলধারা, সেই মুলধারার চৈতন্য থেকে সাধারণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই বিচ্ছিন্নতা সংরক্ষিত হয়েছিল বৃটিশ আমলেও।

শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ নামক একজন প্রাজ্ঞ বিবেচক পণ্ডিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন, একটা নতুন কাঠামো নির্মাণ করেন এবং সেই কাঠামোকে নিউ স্কিম আখ্যা দেন। এই নিউ স্কিমের মধ্যে তিনি ইংরজি শিক্ষা আনেন; বিজ্ঞান শিক্ষা আনেন আবার আরবি শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাও রাখেন। ধর্মীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তিনি একটি স্কিম তৈরী করেছিলেন, সেই স্কিম এক সময় এদেশে বেশ সুন্দরভাবে চালু ছিল। এর ফলে এই শিক্ষার মাধ্যমে যারা তখন বেরিয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই জীবন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কর্মকাণ্ডে তারা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং খ্যাতিও পেয়েছিলেন প্রচুর। অর্থাৎ এই শিক্ষাটা একদিন থেকে সেই সময় একটা সুন্দর সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তান যখন হলো, পাকিস্তান আমলে সর্ব প্রথম আক্রান্ত হলো মাদ্রাসার নিউ স্কিম শিক্ষা ব্যবস্থা।

www.icsbook.info

নিউ স্কিম শিক্ষাব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেয়া হল। প্রথমে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে বন্ধ করে মাদ্রাসার পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রাখা হল এবং ইংরেজি শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। আবু নসর ওহীদ সাহেবের চেষ্টা ছিল নিউ স্কিমের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দ্বৈততা বিদ্যমান অর্থাৎ, একদিকে ইংরেজি শিক্ষা আরেক দিকে আরবি শিক্ষা- এই দ্বৈততা দূর করার জন্য একটি মধ্যবর্তী পথ নির্মাণ করা। তাতে সেই পথে মাদ্রাসার ধারায় ছাত্ররা এসেছে, সাধারণ শিক্ষার ধারা থেকেও ছাত্ররা এসেছে। এই সমন্বিত ধারাটা একক ধারা হিসাবে যখন গড়ে উঠতে যাচ্ছিল; সেই সময় পাকিস্তান আমলে এই শিক্ষা ধারাটকে বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দিয়ে আবার শিক্ষাব্যবস্থার দ্বৈততা বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় অর্থাৎ এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা আরেক দিকে আধুনিক শিক্ষা-এই দুই শিক্ষার মধ্যে তারা কোন সমন্বয় সাধন করেননি। আরেকটা জিনিস এই পাকিস্তান আমলে ঘটে তা হচ্ছে-এই শিক্ষার যে মূল ভিত্তি নেই ভিত্তিটা কী হবে সেটা তারা গুরুত্বভাবে চিন্তা করেননি। শুধু সাধারণভাবে একথা বলা হয়েছে শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে জাতীয় ঐক্য সম্পাদন। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন। ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন তারা গঠন করেছিলেন তাতে জাতীয় পুনর্গঠন, অর্থাৎ পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জাতি আছে সেই সমস্ত জাতি সম্মিলিত হয়ে একক পাকিস্তানি জাতি নির্মাণ করবে এদিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা সাধারণ শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করলেন এবং সিলেবাস পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করলেন সেগুলো কিন্তু আমাদের নৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়নি, সেগুলো মূলত ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থারই একটু পরিবর্তন মাত্র।

সেই সময় আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এবং আমেরিকার কিছু শিক্ষাপদ্ধতি আমরা আমাদের দেশে গ্রহণ করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, আরেকটি হচ্ছে হোম ইকোনমিকস, আরেকটি হচ্ছে বিজনেস অ্যাডমিনস্ট্রেশন। এই প্রধান প্রধান তিনটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে নতুন করে আনা হয়। এই তিনটি শিক্ষাব্যবস্থাই কিন্তু কর্মসংস্থানের জন্য। বিজনেস অ্যাডমিনস্ট্রেশনের মাধ্যমে একজন ছাত্র দক্ষতা অর্জন করে জীবনে কর্মসম্পাদনের জন্য উপযুক্ত হবে। হোম ইকনমিকস ও কর্মসংস্থানের জন্য তেমনি সোস্যাল ওয়েলফেয়ারও কর্ম সংস্থানের জন্যই। এই তিনটি কর্মসংস্থানগত শিক্ষাব্যবস্থা এই দেশে আসে কিন্তু এর কোন আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। এই আদর্শগত ভিত্তি বলতে আমি বুঝেছি এর পেছনে মানুষের ঐতিহ্যের কোন সাড়া ছিল না, মানুষের ধর্মের কোন সাড়া ছিল না, ধর্ম চিন্তার, ধর্ম বিশ্বাসের কোন ভিত্তি ছিল না। এগুলো ছিল কর্মসংস্থানগত শিক্ষা। অর্থাৎ এক কথায় এগুলো ছিল এক অর্থে ধর্মবিহীন শিক্ষাধারা। সুতরাং এই পাকিস্তান আমলে কর্মসংস্থানগত শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে ধর্মবিহীন একপ্রকার শিক্ষাধারা গড়ে ওঠে এবং মূল

www.icsbook.info

শিক্ষার মধ্যে একটি নতুন সংযোজন হিসাবে এই শিক্ষাটা এসে উপস্থিত হয়। এই শিক্ষাটা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত নয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সে সময় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান অনুভব করেছিল যে উদ্দেশ্য হচ্ছে; আধুনিক জগতে আধুনিক মানুষের সমতুল্য মানুষ আমরা আমাদের দেশে তৈরি করবো। সুতরাং ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাকে সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে। তার ফলে বিদেশী শিক্ষার ধারাক্রম এখানে এসে উপস্থিত হয় আরো প্রবল পরিমাণে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে যে বিদেশী শিক্ষার ধারা আমাদের ছিল এই শিক্ষাই একটু নতুন করে নতুন পটভূমিতে নতুন প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগলো। পাকিস্তান আমলে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় শিক্ষা কমিশনের মধ্যেও শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে কোন আদর্শের কথা বলা হয়নি এবং সেটা বোঝা গেছে সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সেটা হচ্ছে ছাত্রদেরকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার মানুষকে সময়ের উপযোগী করে গড়ে তোলা তখনই সম্ভব যখন সে মানুষের একটা নৈতিক চরিত্র থাকে, একটা নৈতিক আদর্শ থাকে। সে নৈতিক আদর্শ তার জন্য নির্মাণ না করে সময়ের উপযোগী করে তুলবার যদি চেষ্টা করি তাহলে সে মানুষ ধর্মচ্যুত হবে, ধর্মকে অস্বীকার করবে। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিপূর্ণ করা, মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচকিত করা এবং মানুষকে এই পৃথিবীতে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। ধর্ম তার সংস্কার নিয়ে নয় বরং ধর্ম হচ্ছে বিশেষ বিশ্বাস এবং আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শের ভিত্তি আমাদের শিক্ষার মধ্যে ছিল না, অতীতে এটা ছিল না এবং পাকিস্তান আমলেও শিক্ষার এই ভিত্তিটা আমরা নির্মাণ করার চেষ্টা করিনি এবং সক্ষমও হইনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সে আন্দোলনের ইতিহাস আমরা জানি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এই বিরোধভাবটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। অর্থাৎ আমরা একটা কলোনিতে পরিণত হয়েছিলাম প্রায় এবং সেই কারণে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, আমাদের দেশের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের একটা সংঘর্ষ বেধেছিল। সে সংঘর্ষের ফলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯৭২ সাল থেকে আমরা একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে উল্লেখিত হতে থাকি।

কিন্তু এই সূত্রপাতে অর্থাৎ বাংলাদেশ হওয়ার সূত্রপাতে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা যোগ করা হয়েছিল। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ জানতো না এবং নেতৃবৃন্দও যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন তারাও জানতেন কি না-এ নিয়ে সন্দেহ আছে। তার কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেতে লাগলো ধর্মবিরোধিতায় রূপান্তরিত হলো এবং মুসলমান শব্দটিও

www.icsbook.info

তারা সব স্থান থেকে মুছে ফেলতে লাগলেন। যেমন- 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' হয়ে গেল 'সলিমুল্লাহ হল', জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। মোহামেডান স্পোর্টিংকেও ব্যান্ড করে দেয়া হলো; কেননা সেখানে মোহামেডান শব্দটা আছে। অর্থাৎ কী ধরনের বিফল চিন্তা, বিফল মানসিকতায় এরা ভুগছিল এর দ্বারাই বোঝা যায়। অর্থাৎ দেখা গেলো ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো সে অবস্থা হচ্ছে ধর্মবিরোধী অবস্থা। প্রত্যেক দেশেই সব সময় কিছু লোক থাকে, থাকতে পারে যারা ধর্মকে মান্য করে না বরঞ্চ ধর্মবিরোধী চৈতন্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকে। তারা সকলেই একটি সাড়া পেয়ে গেলো, আনন্দিত হলো, উৎসাহিত হলো এবং এই উৎসাহের জোগান আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তখন পেয়েছিলাম। এর ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলো সে পরিবর্তন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা।

ড. কুদরত-এ-খুদাকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই শিক্ষা কমিশন শুধুমাত্র শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন অবিকল সেই ধরনের। এখানেও শিক্ষার কোন ভিত্তি হিসাবে ধর্মবিশ্বাসকে আনা হয়নি, ধর্মীয় চৈতন্যকে আনা হয়নি। ধর্মকে পুরোপুরি শিক্ষা থেকে বিছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। আমি বারবার এই বিচ্ছিন্নকরণের কথা বলছি এই জন্য যে বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত। একজন মানুষ একটি ধর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তার পরিবেশে তার পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে, তার সামাজিক চৈতন্যের মধ্যে কাজ করে সুতরাং তার সাহিত্য ও অন্যবিধ শিক্ষার মধ্যেও এই ধর্মীয় চৈতন্য কোন না কোনভাবে আসবেই, একে বাদ দিলে চলে না।

একটি ইংরেজ শিশু যখন বড় হয় সে কিন্তু তার ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়। সে বাইবেলের সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হয়, বাইবেলের গল্প কাহিনীর সঙ্গে সে পরিচিত হয় এবং খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন সংগ্রাম, বিভিন্ন ইতিহাস, বিভিন্ন ঘটনা তার সঙ্গে পরিচিত হয়। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের একটি ছেলে মূলত খ্রিস্টান হিসাবে কিন্তু গড়ে ওঠে। খ্রিস্টান হিসাবে গড়ে ওঠে তার অর্থ ধর্মান্ধ হয়ে গড়ে ওঠে না, তার উপলব্ধির মধ্যে ধর্মীয় একটা চেতনা সব সময় কাজ করে কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সে ধর্মীয় চেতনাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হলো। পূর্বেও বাদ দেয়া হয়েছিল, পাকিস্তান আমলেও বাদ দেয়া হয়েছিল এবারও বাদ দেয়া হলো। আমরা যে চিন্তা করে বাদ দিয়েছি সে কথা আমি বলব না। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে অস্বীকার করে যে শিক্ষা সিলেবাস পাঠক্রম তৈরি হয়েছিল তাও আমি বলব না। আমি বলব এদিকে তারা চিন্তাই করেননি। চিন্তা না করে তারা প্রথাগত যে পাঠ্যক্রম আছে তাকেই বজায় রেখেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য যেটার প্রয়োজন সেই বইগুলোই থাকবে, বাংলা ভাষার জন্য, সাহিত্য শিক্ষার জন্য সে ধরনের পাঠ্যসূচি তারা তৈরি করেছেন কিন্তু এই পাঠ্যসূচির বিষয় বলে একটা বস্তু আছে, সেই বিষয়টা কি শূকর নিয়ে আলোচনা না

www.icsbook.info

ডারউইন নিয়ে আলোচনা? সেই বিষয়টাতো আনতে হবে সেই বিষয়টাতো জীবনের বিষয় হবে সেই বিষয়ের বিশেষ একটা ভিত্তি থাকবে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়ের মধ্যে সেই ধরনের কোন ভিত্তি ছিল না। তার ফলে কুদরাত-এ-খোদা কমিশন একটা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের শিক্ষা কমিশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ ধরনের একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাক্রম হিসাবে এটা যে তৈরি হয়েছিল তা বলবো না।

বর্তমানে আমাদের সামনে এই কুদরত-এ-খোদা কমিশন আছে, তারপরে আরেকটি স্বল্পকালীন কমিশন গঠিত হয়েছিল, জাফর কমিশন বলা যেতে পারে, সে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা জানি না। সম্প্রতি আরেকটি কমিশন গঠিত হয়েছে তারাও যে কী করেছেন তাও আমরা জানি না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোন সময়েই শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্য এদেশের অতীত, এদেশের বিশ্বাস এদেশের মানসিকতা, এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। কেননা এই শিক্ষা কমিশনের সদস্যবর্গ তারা বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, বিদেশ ভ্রমণ করে বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেশের সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, সাধারণ মানুষে বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে তারা কিন্তু এটা করেননি। কারণ যখনই কোন শিক্ষা কমিশন হয়েছে দেখা গেছে শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা বিদেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহী, ব্যাকুল হয়ে যান। একজন জাপানে যান, একজন রাশিয়া যান, একজন আমেরিকায় যান এবং পাঁচদিন, পনের দিন থেকে এসে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেন কিন্তু একথাও শুনিনি কখনো যে শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা গ্রামের ভেতরে গেছেন গ্রামের মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন, তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তাদের বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা কিভাবে গড়ে উঠছেন সেটা চিন্তা করেছেন। তাতো করেনা। চীন দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে সে শিক্ষাব্যবস্থা তাদের দেশের মানসিকতার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত। চীন দেশে সে শিক্ষাব্যবস্থা এককভাবে চীন দেশের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক দেশ, তাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা তাদের যে শ্রেণী চৈতন্য সেই শ্রেণী চৈতন্যের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গড়ে উঠেছে। সুতরাং এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক আমাদের বিশ্বাসের, আমাদের জীবন যাপনের, আমাদের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেনি। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এমন একটা সময় এসেছে, যখন আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করা, দেশের মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করা, দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা, দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাপন প্রণালির সাথে যুক্ত করা। যে পর্যন্ত তা আমরা করতে সক্ষম না হচ্ছি সে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ ঠিক আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত হবে না। অর্থাৎ

www.icsbook.info

আমাদের দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের পাশাপাশি দাঁড়ালে অন্য দেশের মানুষের চিন্তা চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েই কাজ করবে কিন্তু নিজেদের দেশের চিন্তা চৈতন্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন কাজ করবে না। এখন একটি পরিশীলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যে পরিশী-লিত ব্যবস্থার সাহায্যে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে পারবো।

শিক্ষার একটি আদর্শগত ভিত্তি আছে। সেই আদর্শগত ভিত্তি মূলত ধর্মের ভিত্তি। আমরা জানি যে ধর্ম মানুষকে অনুশাসন দেয়, ধর্ম মানুষকে নির্ভরতা দেয়, ধর্ম মানুষকে আদর্শ সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ মানুষ যে পৃথিবীতে জীবন যাপন করবে সেই জীবন যাপনের অধিকার তার অর্জন করতে হবে। এই অধিকার সে অর্জন করে বিজয়ের সাহায্যে, বিশ্বাসের সাহায্যে এবং অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সাহায্যে। যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে এবং অন্তর্গূঢ় কোন চৈতন্য না থাকে তাহলে শিক্ষা শুধু সাধারণ অবস্থায় পর্যবসিত হবে এবং সে শিক্ষার দ্বারা একটি জাতি কখনও উপকৃত হবে না। মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা, মানুষকে পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, মানুষকে তার জাতি এবং মানুষকে পৃথিবীর সঞ্চয় সম্পর্কে সাবধান করা। এটা না হলে শিক্ষার আদর্শ হয় না অথচ ধর্ম এই আদর্শগুলো আমাদের শিক্ষা দেয়। অথচ পাশ্চাত্যের যে শিক্ষা আমাদের দেশে এসেছে সে শিক্ষার মধ্যে ধর্মের এই ভিত্তি নেই। আমরা ইংল্যান্ডে লক্ষ্য করি, ইংল্যান্ডের চার্চ প্রশাসনের অধীনে যে সমস্ত স্কুল আছে তাদের একটা ধর্মীয় ভিত্তি আছে শিক্ষার কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় ভিত্তি তারা স্বীকার করেননি। যার ফলে জ্ঞান লাভটা শুধুমাত্র জ্ঞান লাভেই পর্যবসিত হয়েছে। জ্ঞানলাভের প্রয়োজনটা কী তা কিন্তু ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। জ্ঞানের একটা প্রয়োজন হচ্ছে মানুষ যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা, জ্ঞানের একটা প্রয়োজন হচ্ছে মানুষকে পূর্ণাবয়ব মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। জ্ঞানের একটা লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। আমরা জানি ধর্ম আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। তার মধ্যে প্রধান শিক্ষা হচ্ছে মানবতাবোধের শিক্ষা, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষ মানুষে হৃদ্যতা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি এগুলো ধর্মের মাধ্যমেই আমরা শিক্ষা লাভ করে থাকি। এটা না হয়ে শিক্ষাটা যদি হয় শুধুমাত্র প্রয়োজনের জন্য, অর্থাৎ জীবন ক্ষেত্রে কর্মের উপযোগী হওয়ার জন্যই যদি শিক্ষা হয় তাহলে মানুষ এই মেটেরিয়াল পৃথিবী যেটা, এই যে রূঢ় বাস্তবজগৎ সেই জগতের প্রয়োজনের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রাখবে। নিজের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখবে। সকল মানুষের জন্য সে কল্যাণকামী হবে না। এই যে, স্বার্থপরতা সেটা এক প্রকার স্বার্থপরতার শিক্ষা দেয় কিন্তু ধর্ম স্বার্থপরতা শিক্ষা দেয় না। ধর্ম স্বার্থবিমুক্ত শিক্ষা দেয়। সেই কারণে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমলের কাঠামোকে ঠিক রেখে পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোকে অবিকল রেখে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মূলত কোন পরিবর্তন আসেনি। দেশের প্রয়োজন ও ধর্মের প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অনেকে মনে

www.icsbook.info

করতে পারেন যে, শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা যদি বিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ করে তাহলে ধর্মীয় শিক্ষাটি একটি ভিন্ন উপকরণ হিসাবে লোকেরা গ্রহণ করবে। যেমন একজন ইতিহাস পড়ছে আবার সে ভূগোলও পড়ছে আবার সে-ই-ইংরজি পড়ছে আবার সে অংক করছে। এই ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের অথবা ইতিহাসের সঙ্গে অংকের এগুলোর কোন সম্পর্ক নাই। পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। এগুলো প্রতিটি বিদ্যাই যেন স্বয়ং সম্পূর্ণ। তেমনি ধর্মীয় শিক্ষা যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেটাও একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন শিক্ষা হিসাবে এর সঙ্গে যুক্ত হবে। বিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষাটাও পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং অন্য শিক্ষাটাও পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আমি কথাটা আরেকটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলছি একটি পাঠ্যক্রমের মধ্যে কতগুলো পাঠ্যসূচি অনুসারে আমি একটা জ্ঞান লাভ করতে পারি। কিন্তু ধর্মীয় পাঠ্যসূচি একটি ভিন্নভাবে যদি থাকে তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে ধর্মীয় পাঠ্যসূচির বিপরীত জিনিস এই পাঠ্যসূচিতে এসে উপস্থিত হয়েছে কেননা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এটাকে করা হয়নি সুতরাং ধর্মীয় পাঠ্যসূচি যা শিক্ষা দেয় এই পাঠ্যসূচি হয়ত তার বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ একটি কথা বলা যায়, যেমন ডারউইনের অরিজিন অব স্পেসিসে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বক্তব্য। ধর্মীয় শিক্ষা বলে, বাইবেলের শিক্ষাও বলে, ইসলামের শিক্ষাও বলে এবং অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাও বলে যে, মানুষকে বিধাতা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটেনি এবং পরবর্তীতে মানুষ অন্য কোন প্রাণীতেও পরিণত হবে না। মানুষ হিসাবে মানুষের আকৃতি বা স্বভাবের যুগে যুগে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। আকৃতির পরিবর্তন বলছি আমি এই অর্থে যে এক সময় মানুষ হয়ত খুব বেশি লম্বা ছিল। বর্তমানে মানুষ অন্য আকৃতি ধারণ করেছে, তার চেয়ে সাইজে ছোট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের অবয়ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু ডারউইন যে কথা বলেছেন তার সাথে এ কথা মেলে না। তাছাড়া সৃষ্টির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ডারউইনের যে ধারণা এবং বিশ্বাস তার সঙ্গে ইসলামের অথবা বাইবেলের অথবা অন্য ধর্মের বিশ্বাস মেলে না। কিন্তু আমি পাঠ্যপুস্তকে হয়ত ডারউইনের জীবনী পড়াব, আর জীব সৃষ্টির অন্য উৎস পড়ার এ দুটোতে মিলছে না। সেই কারণে প্রয়োজন হচ্ছে ধর্মের যে মূল আদর্শগুলো সেই আদর্শের দ্বারা অন্য পাঠ্যক্রমকে পরিশোধিত করা।

ফিজিকসই পড়ি, কেমেস্ট্রিই পড়ি অথবা সাহিত্য পড়ি যা কিছুই পড়ি না কেন ধর্মের আদর্শের দ্বারা তা যেন পরিশোধিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যে বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ যেন থাকে এবং বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিটি পাঠ্যসূচি যেন পরিশুদ্ধ হয় এবং প্রতিটি পাঠ্যসূচি যেন বিবেচিত হয়। এটার প্রয়োজন আছে কিন্তু এটা আমাদের দেশে হয়নি, পৃথিবীর কোন দেশেই এ রকম হয়নি। কিন্তু বর্তমানে একটা চেষ্টা চলছে পৃথিবীর সর্বত্রই যে একটা বিশ্বাসের পটভূমি শিক্ষার জন্য রাখা প্রয়োজন। জীবন

www.icsbook.info

ধারণের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার জন্যও তেমনি প্রয়োজন। যারা নাস্তিক এবং যাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে নাস্তিকতা তারাও নাস্তিকতাকেই তাদের সমস্ত শিক্ষার পটভূমি করে অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসটি হচ্ছে নাস্তিকতা। সে নাস্তিকতকে পটভূমি করেই তারা কিন্তু তাদের সকল পাঠ্যসূচি নির্মাণ করেছে। ইতিহাসের, ভূগোলের, অর্থনীতির, সকল ধরনের পাঠ্যসূচি তারা এই নাস্তিক্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি করেছে। তাই দেখা যায় অর্থনীতি বিষয়ে তাদের যে শিক্ষা সে শিক্ষার সঙ্গে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক শিক্ষার সাথে মেলে না অথবা ইতিহাস সংক্রান্ত তাদের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার সঙ্গে অন্য দেশের ইতিহাসের শিক্ষার সাথে মেলে না। একেবারেই মেলে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এদিক থেকে বিরাট একটা সততা আছে। তারা যা বিশ্বাস করে সে বিশ্বাসকে তারা তাদের পাঠ্যক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে করেনি, সেই বিশ্বাসের দ্বারা পাঠ্যক্রমকে তারা পরিশোধিত করেছে, পাঠ্যক্রমকে সংশোধন করেছে এবং পাঠ্যক্রমকে লালন করেছে।

তাদের বিশ্বাস হচ্ছে নাস্তিকতা, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। সেই কারণে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসকে পরিমার্জনা করা এবং নতুন সময়ের উপযোগি করে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে আমি আরেকটি কথা বলবো যে কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জীবনের জন্য, আমাদের দেশের জন্য সে কথাটি হচ্ছে একটি দেশের রাজনৈতিক বিতর্ক থাকতে পারে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন মনোভঙ্গির মানুষ পাওয়া যায়। কোন মানুষ হয়তবা নাস্তিক কিন্তু এইসব মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এরা সমাজকে শাসন পর্যন্ত করছে না এবং এরা বিশ্বাসী ধারার স্রোতের বাইরে, এই অর্থে বাইরে যে অজস্র মানুষের বিপুল স্রোত চলেছে সে স্রোতের মধ্যে এরা যুক্ত নয়। সুতরাং এদের দ্বারা স্রোত নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, স্রোতের গতিতো এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে এমন হয়েছে যে আমরা এই স্রোতের গতি এই দুই একজন মানুষের জন্য পরিবর্তন করতে চাই, চেষ্টা করছি অথবা এই দু একজন মানুষের চিৎকারে বিচলিত হয়ে এই স্রোতের গতির মধ্যে আমরা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই স্রোতের গতিতে পরিবর্তন আনা যায় না। আনা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। সেই কারণে বিশ্বাসকে ভিত্তিমূল করে আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে কুরআন শরীফের সূরা আল ফাতেহা যে ভালভাবে পাঠ করে সে খ্রিষ্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক অথবা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক সে ন্যায়বান, আদর্শবান, প্রজ্ঞাবান যথার্থ কুশলী মানুষ হতে বাধ্য। তার কারণ এই সূরা আল ফাতেহার মধ্যে সকল বিশ্বাসের অন্তঃসারটা আছে। সৎপথে যাবার জন্য প্রার্থনা আছে, অসৎ পথগামী যারা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবার আকাঙ্ক্ষা আছে এবং বিশ্বাসের অনুকূলে সত্যকে আবিষ্কার করবার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল বিদ্যমান।

www.icsbook.info

মাওলানা আজাদ বলেছেন এভাবে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সূরা আল ফাতিহা হচ্ছে একটি আদর্শ ভাষণ। এর ভিত্তি করেই সাহিত্য ও শিক্ষাকে নির্মাণ করতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্যের মূল আদর্শ হবে ন্যায় পথে চলা, শিক্ষার মূল আদর্শ হবে মানুষকে ন্যায় পথে প্ররোচিত করা, অন্যায় পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং পৃথিবীতে যারা অধঃগামী যারা অন্যায় পথচারী তাদের সাহচর্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। যারা ন্যায়বান, সদাচারী তাদের সঙ্গে মানুষকে একত্রিত করা এটাই হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তি।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসের ভিত্তিটি একান্তভাবে প্রয়োজন। এটা সত্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান দেশেও শিক্ষার ভিত্তি কিন্তু ঠিক আদর্শগতভাবে ইসলামী ভিত্তি এটা বলা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি মক্কা ঘোষণার পর প্রতিটি মুসলমান দেশে এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হচ্ছে। মক্কা ঘোষণায় পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ একটি স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলেছিলেন যে, আমরা একটা সাম্য নির্মাণ করার চেষ্টা করবো মুসলমান উম্মার মধ্যে, একটা সমতা, একটা ঐক্য নির্মাণের প্রয়াস পাবো। দ্বিতীয়, বিশ্বাসকে ভিত্তি করে আমাদের জীবন আমরা পরিচালিত করবো। তৃতীয়, আমাদের সকল মুসলমান দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি ঐক্যতত্ত্ব থাকবে অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের সকল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপপাদ্য। এরই উপর নির্ভর করে বর্তমান সৌদি আরবে পাঠ্যসূচি পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়াস চলছে, মিসরের পাঠ্যক্রম সংশোধনের প্রয়াস চলছে, মালয়েশিয়ায় এ প্রয়াস চলছে কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি না।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা একটা বিচ্ছিন্ন শিক্ষা হিসাবে বিদ্যমান। আর সাধারণ শিক্ষা যাকে ইংরেজি শিক্ষা বলি এখনও নাম হল ইংলিশ হাইস্কুল, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সেই শিক্ষাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আলাদাভাবে চলেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে নানাভাবে আধুনিকায়নের চেষ্টা চলছে এবং এই শিক্ষাকেও বিভিন্নভাবে আধুনিকীকরণের চেষ্টা চলছে। তার ফলে না মাদ্রাসা শিক্ষা যথার্থ থিয়োলজিক্যাল শিক্ষা হচ্ছে না আধুনিক শিক্ষা যথার্থ আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে। মূলত একটি দেশে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা না হলে একটি জাতি সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে আনতে হবে। এ ব্যবধান ঘুচিয়ে আনা সম্ভবপর এই ভাবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বলি কিংবা স্কুল বলি কিংবা কারিগরি শিক্ষা বলি সকলের জন্য একই কারিকুলাম থাকবে। একই ধরনের মৌল পাঠ্যসূচি থাকবে, এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারবে না। সমপ্ত শ্রেণীর পর পার্থক্যগুলো আসবে। যে কারিগরি শিক্ষায় যেতে চায় সে কারিগরি শিক্ষায় যাবে, যে পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষায় যেতে চায় সে ধর্মীয় শিক্ষায় যাবে, যে বিজ্ঞান শিক্ষায় যেতে চায় সে বিজ্ঞান শিক্ষায় যাবে, যে

www.icsbook.info

প্রকৌশল শিক্ষায় যেতে চায় সে প্রকৌশল শিক্ষায় যাবে, যে সাধারণ শিক্ষায় যেতে চায় সে সাধারণ শিক্ষায় যাবে। কিন্তু ঐ যে মৌল কাঠামোটি তাকে এমন করতে হবে যে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হলে একজন কারিগরী শিক্ষার ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হলে একজন কারিগরী শিক্ষার ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে এবং সাধারণ ধারাক্রম অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ নিম্ন পর্যায়ের ঐ শিক্ষাটাই হচ্ছে Basic শিক্ষা। সেই শিক্ষার মধ্যে এই ধর্মীয় ভিত্তিটা এনে দিতে হবে, বিশ্বাসের ভিত্তিটা এনে দিতে হবে এবং সকল শিক্ষার উপযোগী কার্যক্রম, উপযোগী ভূমিকা এবং সূত্রপাত এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে দিতে হবে। যে পর্যন্ত না এনে দিতে পারছি সে পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে সক্ষম হবো না।

বর্তমান কালে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শিক্ষার এই দ্বিধাবিভক্তি দূরীকরণ। আমরা বহুদিন আগে থেকে এ দূরীকরণের কথা বলেছি কিন্তু আমরা পূর্ণভাবে শুধু নয় একেবারেই সক্ষম হয়নি। সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে নিউ স্কিমের সেই মৌল ভিত্তিটাকে নতুন করে আবিষ্কার করে তাকে আমাদের পাঠ্যসূচির মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করা। এবং তারপর বিভিন্ন ধারাক্রম নির্ধারিত করা। যদি এভাবে অগ্রসর হতে পারি তাহলে বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমুচ্চারিত হয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন পথ নেবে এবং আমরা জীবনে যথার্থ সমৃদ্ধ এবং সার্থক ও সফল হতে পারবো।

লেখক : সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় অধ্যাপক।

'ফিজিকসই পড়ি,
কেমেস্ট্রিই পড়ি অথবা
সাহিত্য পড়ি যা কিছুই
পড়ি না কেন
ধর্মের আদর্শের দ্বারা
তা যেন পরিশোধিত হয়'

.......অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

www.icsbook.info

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা

মুহাম্মদ কুতুব
অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলার সাথে সাথেই আমাদের সামনে প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক এক বিশেষ ধরনের ধর্মীয় পাঠদানের চিত্র ভেসে ওঠে। ধর্মীয় শিক্ষার এই স্বাভাবিক সীমার বাইরে যদি চিন্তাকে প্রসারিত করি, সেখানে ধর্মোপদেশ বা ওয়াজ নসিহতের চৌহদ্দিতে গিয়ে তা আটকে পড়ে। তার বাইরে আর এক কদমও অগ্রসর হওয়া যাবে না। বস্তুত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যা শিখাই, তা ধর্মীয় শিক্ষা নয়। ইসলামী শিক্ষা তো নয়ই।

মুসলিম দুনিয়ায় অধিকাংশ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে একটা দায়সারা ভাব বিদ্যমান। ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্নে এ অনাগ্রহ উদ্দেশ্যমূলক হলে ফলাফল যা দাঁড়ায়, এ শিক্ষা প্রচলনের আগ্রহ সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি না জানলে তার ফলাফলও ভিন্নরূপ হবে না। অর্থাৎ এ উভয় অবস্থায় ফল হবে অভিন্ন। তাহলো আমাদের ছেলে-মেয়েরা ইসলামী শিক্ষার সত্যিকার আদর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। আমাদের পাঠ্যক্রমে যথাযথ ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনার প্রভাব অনুপস্থিত। প্রচলিত ধারার ধর্মবিষয়ক আনুষ্ঠানিক পাঠ সমকালীন মানবীয় চাহিদা পূরণেও যথেষ্ট নয়। মাত্রাতিরিক্ত ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতা ধর্মকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়করূপে উপস্থিত না করে বরং বিরক্তি উদ্রেক করে এবং ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। আমাদেরকে খোলাখুলি ও দ্ব্যর্থহীন অকপটতার সাথে এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, ধর্ম এখন আমাদের জীবন ও উপলব্ধি থেকে চরমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মকে যেভাবে অনুসরণ করা দরকার আমরা সে ভাবে করি না। মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকায় শরিয়ার অনুশাসন মানা হয় না। আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও বিধানসমূহ ইসলামী শরিয়ার নীতি থেকে উৎসারিত নয়। মোদ্দা কথা, আমাদের জীবন আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিগঠিত নয়। ইসলামী শরিয়ার বিধানে ঈমান, ইবাদত, আমল, অনুভূতি,

www.icsbook.info

আচরণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সকল দিক ও বিভাগেরই নির্দেশন বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের চিন্তা-চেতনা বোধ-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আবেগ অনুভূতি, আমাদের নৈতিকতা ও আচরণ ধারা ইসলাম থেকে উৎসারিত নয়। বরং আমরা যা অনুসরণ ও অবলম্বন করি তার অধিকাংশই পৃথিবীর এমন সব অঞ্চল ও উৎস থেকে পেয়েছি, যেখানে ইসলাম অপরিচিত ও অপরিশ্রুত। অর্থাৎ যারা ইসলামে বিশ্বাসী নয়, তাদের আদর্শই আমাদের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে বসেছে। ধর্মকে এখন আমরা যেভাবে উপলব্ধি করি, আমাদের কাছে ধর্মের যে আবেদন, তার সাথে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের উপলব্ধির পার্থক্য অনেক বেশি। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কাছে ধর্ম যে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে নিয়ে উপস্থিত ছিল, আমাদের অবস্থান তার থেকে অনেক দূরে। আমাদের ধর্মীয় উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের পাদ্রিতন্ত্রের সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যমূলক। ধর্ম যেখানে বাস্তব জীবনের বাইরে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যের এক আবেগপ্রবণ সম্পর্কের বেশি কিছু নয়। ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত এ আলোচনায় আমরা সৎ ও ঐকান্তিক হলে এ সত্য আমরা মুক্ত মনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করবো যে, আমাদের সার্বিক জীবনের ধর্মের পাদ্রিতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা গভীর ও দুর্ভেদ্য অপচ্ছায়া বিস্তার করে আছে। সে অপচ্ছায়ার প্রভাব আমাদের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অত্যন্ত প্রবল।

প্রাথমিক যুগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তির ওপর। ধর্মীয় শিক্ষা ছিল সে সমাজের অন্তঃকরণ। ধর্মীয় শিক্ষাই সে সমাজে পালন করতো কেন্দ্রীয় ভূমিকা। শরিয়া ছিল সে সমাজের জীবন পরিচালন বিধি। ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী আচরণ বিধি সে সমাজের সর্বাধিক কর্তৃত্বশীল ও সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তারক উপাদানরূপে কাজ করতো । এ কথায়, প্রাথমিক মুসলিম সমাজে ইসলাম ছিল মূল চালিকাশক্তি এবং সকল কিছুর নিয়ামক। গৃহকোণে কিংবা বিদ্যালয়ে, মসজিদে কিংবা পথ ঘাটে এবং অন্য সকল যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার ও বিকাশের আয়োজন ছিল। সে সমাজের প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস, তার ইবাদত, তার যাবতীয় আচরণ সম্পর্কে ঘরে কিংবা মসজিদে সর্বত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। শিক্ষাদানের এ সার্বিক দায়িত্ব অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে পালনের ব্যবস্থা থাকার কারণে ধর্মীয় বিষয়ে তাই প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমও ছিল প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতিপূর্ণ। ধর্ম বিষয়ে তাই প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ ধর্মীয় শিক্ষার নামে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজন হতো না। সে কাজটি শিক্ষার অন্য মাধ্যমগুলোই অব্যাহতভাবে আঞ্জাম দিত। বিশেষতঃ তা বাড়িতে এবং পরিবারেই সম্পন্ন হতো প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সীমিত সময়ের ওপর এ ব্যাপারে নির্ভল করার প্রয়োজন হতো না।

গোটা মানবজাতিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুস্থ ব্যবস্থার অধীনে গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করার যে বিধান তাও একান্তভাবে শিক্ষামূলক। ইসলামের সামগ্রিক আচরণ ধারা একটি সুসমন্বিত সুবিন্যস্ত, ঐকান্তিক ও

www.icsbook.info

গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত ব্যবস্থার অধীন। ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী শিক্ষার অবিচল অনুসরণে এ ব্যবস্থা শিশুদেরকে সাহায্য করে আল্লাহ নির্দেশের পূর্ণ অনুসারী। কথা, কাজে, ওয়াদা পালনে ও ইবাদতে নিবিষ্টচিত্ত একজন মানুষের দৃষ্টান্তও হতে পারে এক ধরনের শিক্ষা, যা অনুসরণীয় আদর্শরূপে শিশুদের আচরণে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এ ধরনের দৃষ্টান্ত সহজেই উপস্থাপন করা যায়। এমনি সব টুকরো টুকরো আদর্শিক দৃষ্টান্ত ও ধর্মীয় তথ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে সন্নিবিষ্ট করার মধ্যে অবাক হবার বা আপত্তি করার মতো কিছুই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেনিকক্ষের পাঠ্যক্রমের সীমিত গণ্ডির মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে যা কিছু শিখানো হবে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের পরিবেশেও নিশ্চিত করা গেলে তা আমাদের নবীন শিক্ষার্থীদের মনে ধর্মীয় শিক্ষা দৃঢ়মূল করার পূর্ণ ও মৌল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অস্বীকার করার যো নেই যে, ধর্মের সাথে আমাদের সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের মন থেকে ধর্মীয় চেতনা ক্রমশ লোপ পেয়েছে। আমাদের ঘরের ও ঘরের বাইরের পরিবেশ ধর্মীয় শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তাকে নানাভাবে হেয় করার নেতিবাচক কাজটিই সম্পন্ন করছে। এমন এক পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমরূপে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই অবস্থায় শ্রেনিকক্ষে বা মসজিদে প্রদত্ত বাস্তব বিবর্জিত, পরিবর্তন বিমুখ শতাব্দী প্রাচীন বর্তমান পাঠ কি পর্যাপ্ত এবং কার্যকর বিবেচিত হতে পারে? তা ছাড়া শিক্ষার এ মাধ্যম কি ধর্মীয় বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশের বর্তমান ধারাকে স্বাগত জানানোর জন্য আগ্রহী থাকবে? নসিহত ও ধর্মীয় বক্তৃতার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। সে ঐতিহ্যকে এখন এমন এক চমৎকার ইমরাতের সাথে তুলনা করা যায়, যা এক সময় ছিল, কিন্তু এখন বিধ্বস্ত। সে ইমারতের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পাথর এখন শুধু এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার জন্যই বিদ্যমান যে, এক সময় এখানে বিশাল আকৃতির একটি দেয়ালের অস্তিত্ব ছিল। এ পাথরগুলো সেই সুরম্য অট্টালিকার কাঠামো দাঁড় করাতে কি এখানে সাহায্য করতে পারে?

প্রকৃত অবস্থা আরো খারাপ। আমাদের এতক্ষণের আলোচনার ভিত্তিতে সংক্ষেপে এ কথাই বলা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন থেকে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ালো, সে দায়িত্বের সম্পূর্ণ ভারী বোঝাটা গিয়ে পড়লো একান্তভাবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার বাহনের ওপর। সে অবস্থায় ধর্ম বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় বক্তৃতা ভাষণ ও নসিহত অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর হয়ে পড়লে এ কথাটি ধর্মীয় শিক্ষার অকার্যকারিতার ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ অবস্থায় স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ কিংবা রেডিও টিভির ধর্মীয় বক্তৃতা যদি ধর্মের মূল প্রেরণা ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যায় এমনকি অধর্মীয় রূপ লাভ করে তখন অবাক হবার কিছুই থাকে না। এ প্রবন্ধে আমি গণমাধ্যম বা তথ্যমাধ্যম সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি না। এখানে আমি শিক্ষার পাঠ্যক্রমেই আলোচনা সীমিত রাখবো। ধর্ম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ যেখানে দেয়া হয়, সে সাধারণ শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের বা এর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির

www.icsbook.info

পরিবেশই থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখে সেটিকে কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে করার সুযোগ থাকে না। শ্রেনিকক্ষে যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, কিংবা সেখানে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা ধর্মবিরোধী পাশ্চাত্য দেশগুলো শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পাঠদান পদ্ধতি থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়। পাশ্চাত্য তার ধর্মবিরোধী স্বভাব প্রকৃতিকে সেক্যুলারিজমের দেয়াল দ্বারা আড়াল করার চেষ্টা চালায়। তার দাবি হলো, সে অধার্মিক মাত্র, ধর্মবিরোধী নয়।

ইউরোপ তার রেনেসাঁ-পরবর্তী সময়গুলো কী পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত করেছে সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই ভালোভাবে, নিশ্চিতভাবে জানি। এই বিশেষ পরিস্থিতি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বহু যোজনের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। লোকেরা ধর্মকে বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলেছে। দু'য়ের মাঝে তারা এক প্রচ্ছন্ন বিরোধ সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান গবেষণার কোন পর্যায়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণও এখন তাদের বিবেচনায় আপত্তিকর।

তারা মনে করে আল্লাহর নামে বলার ফলে সব কিছুই দূষিত হয়ে পড়বে। ডারউইন তাঁর একটি বইতে এ সম্পর্কে বলেছেন, এটি 'সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বস্তুগত অবস্থার মধ্যে এক অতিপ্রাকৃতিক অবস্তুগত উপাদান যোগ করবে।' এ বিষয়ে ইউরোপীয়দের নিজস্ব যুক্তি যা-ই থাক, আল কোরআন এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে : "মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালো করে জানে, যতোই সে অজুহাত খাড়া করুক না কেন।" (সূরা কিয়ামত, আয়াত : ১৪-১৫)

আমরা মুসলমানরা ইউরোপীয়দের অনুসারী হয়ে তাদের অনুকরণের বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বিভেদের দেয়াল রচনা করে এ কাজের জন্য কি অজুহাত দাঁড় করতে পারি? মানুষের সহজাত প্রকৃতির মধ্যই বিজ্ঞান ও ধর্মের পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত পাশাপাশি অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানব প্রকৃতিতে বিজ্ঞান ও ধর্মের কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর বন্দেগি করা মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। 'যখন তোমাদের রব বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বললো : 'নিশ্চয়ই, আপনি আমাদের রব।' (সূরা আরাফ, আয়াত ৭২) দুনিয়া জাহানের সব কিছু সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং দুনিয়ার সীমাহীন সকল সম্পদরাজি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই মানবিক।

সকল ব্যাপারে জ্ঞান লাভের এক সুতীব্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। অন্যদিকে পৃথিবীর সকল কিছুর উত্তরাধিকার দান করা হয়েছে এই মানুষকেই। এই উভয় বিষয়ই পরস্পরের পরিপূরক। এ পৃথিবীতে বসতি বিস্তারের জন্য মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। "অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন।" (সূরা বাকারা, আয়াত ৩১) "যিনি জমিন ও আকাশ মণ্ডলের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের

www.icsbook.info

জন্য অধীন নিয়ন্ত্রিত করেছেন, সব কিছুই তাঁর নিজের নিকট থেকে।" (সূরা জাসিয়া, আয়াত ১৩) "পড়! আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।" (সূরা আলাক, আয়াত ৩-৫) বস্তুত সুস্থ মানব প্রকৃতিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুই সহজাত প্রবণতার মধ্যে কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। এই দুইয়ের মধ্যে একটি প্রবণতা মানুষকে পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধি বিধানের অনুগামী ও অনুসারী হতে, সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে সাহায্য করে। অন্য প্রবণতাটি মানুষকে আল্লাহর নামসমূহ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে এবং মানুষরূপে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ ও ব্রতী করে।" প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞানবান লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির আয়াত ২৮)

বিজ্ঞান ও ধর্মে পরস্পর সুসংবাদ ও অবিচ্ছেদ্য এই সম্পর্ক একমাত্র জাহেলিয়াতই পৃথক করে দেখে। বিশেষত সমকালীন ইউরোপীয় জাহেলিয়াত এই দুইয়ের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত। আমাদের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তা প্রাথমিক প্রিপারেটরি, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয় যে পর্যায়েই হোক না কেন, কোন পর্যায়েই বিজ্ঞান ও ধর্মকে পৃথক করে দেখার এ মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না। ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান, কিংবা বিজ্ঞান বাদ দিয়ে শুধু ধর্ম সম্পর্কে পাঠ দানের এ অসঙ্গত ব্যবস্থা এখানে চলতে দেয়া উচিত হবে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন সীমারেখা টানা অত্যন্ত খারাপ কাজ। তা এক জঘন্য পাপ। এ পাপ পঙ্কিল কাজটি আরো মারাত্মকরূপ ধারণ করে তখনি, যখন আমাদের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহুবিষয় এমন পদ্ধতিতে পড়ানো হয়, যা ইসলাম নীতি ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ডারউইনের মতবাদ পড়াই। কিন্তু তা নিছক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বা হাইপোথিসিসরূপে কিংবা নিছক বৈজ্ঞানিক সূত্র হিসেবে সঠিক বা ভুলরূপে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হয় না। বরং এ মতবাদটি আমাদের সন্তানদের সামনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এক বাস্তব সত্যরূপেই তুলে ধরা হয়। এ মতবাদটির যতটুকু গুরুত্ব রয়েছে, তারচে' অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ করে তা আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে পেশ করি। আমরা এ মতবাদটিকে চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত এক বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রামাণ্য দলিলরূপে আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দান করি। অথচ ডারউইনের মতবাদ তার জন্মের পর থেকে অদ্যাবধি বৈজ্ঞানিকদের সর্বসম্মত স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। নব্য ডারউইনবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা জুলিয়ান হাক্সলিও স্বীকার করেছেন যে, মানুষ তার মনোগত, দেহগত ও জৈবিক দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিষ্ঠাবান ডারউইনবাদী ও কট্টর নাস্তিক এই জুলিয়ান হাক্সলিও একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'ম্যান ইন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড।' এই বইতে তিনি 'দি ইউনিকনেস অব ম্যান' বা ' মানুষের অনন্যতা' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেছেন যে, মানুষ আর ' এইপ' বা লাঙ্গুলবিহীন বানরের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান, তা পিঁপড়ার সাথে 'এইপের' ব্যবধানের চাইতেও বেশি। তিনি এখানে আরো বলতে চেয়েছেন যে,

www.icsbook.info

মানুষের যে পৃথক অবস্থানগত ভিত্তি রয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাকে সেই সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। ডারউইনবাদ সম্পর্কে খোদ একজন কট্টর ডারউইনবাদী নাস্তিক যখন এই বক্তব্য রাখছেন তখন আমরা মুসলমানরা আমাদের নবীন বংশধরদেরকে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উক্ত মতবাদ শিক্ষাদানে অনেক বেশি সজাগ ও সচেতন থাকা কি উচিত নয়? ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবিক মুল্যবোধ এবং উন্নততর নীতি নৈতিকতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদ তার অব্যাহত ও অবিশ্রান্ত প্রচারণার কৌশলরূপে ডারউইনবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের সে কৌশলের সাফল্যই ডারউইনবাদের ব্যাপক প্রচার সম্ভব করেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে, এ মতবাদটি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানার পরও কি আমরা চোখ কান বন্ধ করে থাকতে পারি?

নৃতত্ত্ব সম্পর্কেও একই কথা। ডারউইনের বিবর্তনবাদী মতবাদের প্রত্যক্ষ ফসলরূপে এবং উক্ত মতবাদের ধারাবাহিকতা হিসাবেই নৃবিজ্ঞানের জন্ম। আমাদের নিজস্ব পাঠক্রমে এটি আরেকটি বহিরাগত উপাদান। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সন্তানরা নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন করছে। তাদেরকে শিখনো হয় যে, প্রথম মানুষ 'এইপ; বা লাঙ্গুলবিহীন বানরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যমুলক ছিল। সে মানুষ তার হাত ও পায়ের পাতার ওপর ভর করে হাঁটতো। গাছ থেকে ফল ছেড়াঁর জন্য সে তার পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতো। তখন তার দেহ সোজা হতো। ধড়ের ওপরে তার মাথাটি ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। তারপর সে মুখের শব্দ উচ্চারণ করতে শিখে। তার বুদ্ধি যথেষ্ট বিকশিত হবার সাথে সাথে সে অনেক কিছু করতেও সক্ষম হয়।

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো শেখানো হয় যে, মানুষের জীবন, তার অভ্যাস, তার রীতি রেওয়াজ, আবেগ ও চিন্তা এবং তার আচরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে তার পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশই এসব কিছু পরিগঠন করে। এখানে প্রথম বক্তব্যটি ডারউনবাদেরই সরাসরি প্রতিধ্বনি। এ ব্যাপারে অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা সাক্ষ্য সাবুদ বর্তমান নেই। দ্বিতীয় বক্তব্যটিও একই মতবাদের ধারাবাহিকতা মাত্র। ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্বহীন, পরিস্থিতিতেই কোন মানুষের ওপর এ মত আরোপ করা যায়। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কোন অজ্ঞবাদী জাহেল নাস্তিকের কাছেই শুধু এমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ধর্মবিশ্বাসহীন একজন মানুষই পরিবেশের সহজ শিকার হবে। পরিবেশ তাকে দাসে পরিণত করবে এবং তার জীবনকে যথেচ্ছভাবে পরিগঠন করবে। কিন্তু মানুষ যখন তার জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধান সম্বলিত আদর্শের বর্মে সুসজ্জিত হয়, সে আদর্শই তখন তার জীবন, অভ্যাস, রীতি-প্রথা, আবেগ অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণ ধারাকে বিন্যস্ত ও পরিগঠন করে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ নয়, আদর্শের ভূমিকাই মুখ্য। ইসলামের ইতিহাসের প্রতি তাকালে আমরা দেখবো, ইসলাম এমন জাতি গঠন করেছে, যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা নিজেই আল- কোরআনে ঘোষণা করেছেন : "মানবতার জন্য তোমরাই সর্বোত্তম

www.icsbook.info

জাতি।" (সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১১০) আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার কারণেই সে জাতি আজ তার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য থেকেও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, মানুষের ওপর পরিবেশের কোনই প্রভাব নেই। ইসলাম বিশ্বের দিক-বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বিস্তার লাভ করেছ। ইসলাম যেখানেই গেছে, সেখানকার পরিবেশ থেকে সর্বোত্তম জিনিসগুলো আহরণ করেছে। আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে জিনিসগুলোকে পুনর্গঠন করেছে। পরিবেশগত বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করে ইসলাম আদর্শ, মুল্যবোধ ও নীতিমালার সাথে সমন্বিত করা হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নও আমরা আসলে পশ্চিমা নৃতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার প্রতিই বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করি মাত্র, আমাদের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে তা দেখি না। আমাদের অধ্যয়নে বার বার ঘুরে ফিরে, পশ্চিমা মতবাদসমূহই স্থান লাভ করে। সেগুলোই প্রশ্নাতীতরূপে প্রমাণিত সত্য বলে গ্রহণ করে আমরা তার নকল করি এবং নীরবে সেসব মতবাদ মেনে নিই। অথচ সেসব মতবাদ ইসলামী ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আধুনিক নৃতত্ত্ব আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে মানুষ শুধুই তার পরিবেশের সন্তান আর পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয় শুধুমাত্র পরিবেশেরই দ্বারা। ইসলাম এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে।

ইতিহাসের ব্যাপারে আমরা একই ভুলে নিমজ্জিত। মানুষের ইতিহাস দু'টি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা হয়। সে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী মতাদর্শের বিরোধী প্রথম মতবাদটি মানব জাতির ইতিহাসকে অব্যাহত ও ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা হিসেবে বিশ্লেষণ করে। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটি মানবজাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে নিছক বস্তুগত ও স্থাপত্যগত উন্নতির নিরিখে বিচার করে। তার ফলে আমরা ফেরাউনি, গ্রিক, রোমান, বেবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার মতো ধর্মহীন সভ্যতাগুলো স্তুতিবাদে লিপ্ত হই। এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বর্তমান সভ্যতা রাসূল (সা) এর সাহাবীগণের যুগের চাইতেও অধিকতর উন্নত ও পরিশীলিত হিসেবে প্রায়শ আমাদের অভিনন্দন ও প্রশংসা লাভ করে। এই স্তুতি ও প্রশংসা যদিও আমরা খুব উচ্চ নিনাদে ঘোষণা করি না, কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস পাঠের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষ বৈষয়িক দিক থেকে যত উন্নতি বা অগ্রগতি অর্জন করুক, ইসলামের দৃষ্টিতে তার মাত্র দুটি অবস্থা। হয় সে সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর না হয় সে নিকৃষ্টতমদেরও নিম্ন পর্যায়ের। "আমরা নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে নামিয়ে দিয়েছি নিকৃষ্টতমদেরও নিকৃষ্ট স্তরে; তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।" (সূরা ত্বিন, আয়াত ৫-৬) মানুষ যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর নির্দেশসমূহ কঠোরভাবে পালন করে, তখন সে সৃষ্টির সেরা। আর যখন সে আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী হয়, কিংবা তাঁর নির্দেশ পালনে হয় পরাঙমুখ, তখন সে

www.icsbook.info

নিকৃষ্টতমদেরও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে যায়। বস্তুগত দিক থেকে সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক না কেন, মানবজাতির অগ্রগতির মাপকাঠি তা নয়। পবিত্র কোরআন এক্ষেত্রে তাদের কথাই বলছে, যারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল জাহেল বা অজ্ঞ। তারা এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি; তাঁর নির্দেশ পালন করেনি। তাদের কাজে বিজ্ঞান ছিল, সে বিজ্ঞান দ্বারা তারা আলোকিত হয়েছিল। কিন্তু তা থেকে তারা বেশি কিছু ফায়দা হাসিল করতে পারেনি। তারা যে বিজ্ঞান অনুসরণ করেছে, তা ছিল আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন। অথচ আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে বিজ্ঞান তা-ই তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দিতে পারতো। ইসলাম ফেরাউনি, গ্রিক, রোমান বেবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার মতো প্রাচীন সভ্যতাকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা বলে বিবেচনা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের সময়কালই বিশ্বে সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোত্তম যুগ অন্যদিকে বিরাট বস্তুগত সভ্যতা এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও বর্তমান যুগের জাহেলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্নতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন এখন ভয়াবহ আকারে সর্বত্র সর্বনাশের যে কালোছায়া বিস্তার করেছে, অতীতে আর কখনো এমনটি ঘটেনি।

আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তা নিছক ইহজগৎকেন্দ্রিক। এই সীমিত গণ্ডিতে মানবজাতির অর্জিত সাফল্য বা ব্যর্থতাকে বিশেষ একটি মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার করা হয়। সে মানদণ্ড অনুযায়ী কোন একটি ঘটনা বা বিষয় কতটা পরিশীলিত বা প্রগতিশীল কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল তা নির্ধারণ করা হয়। মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপের ক্ষেত্রেও ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী সাফল্য বা ব্যর্থতাই বিচার্য বিষয়রূপে বিবেচনা করা হয। ইসলাম ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামের মতে, ইতিহাসকে শুরু ও শেষ, এই উভয় প্রান্ত হতেই বিবেচনা করা উচিত। "তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, কেউ ঈমানদার হয়, কেউ হয় অবিশ্বাসী।" বিশ্বের বস্তুগত সভ্যতাও একটি মাপকাঠি। তবে আল্লাহতায়ালা মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। "তিনিই তোমাদেরকে জমিন হতে পয়দা করেছেন এবং এখানেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" (সূরা হুদ, আয়াত ৬১) শুধুমাত্র মানুষের বস্তুগত সাফল্য বিবেচনা করলেই চলবে না। বস্তুগত সাফল্য তো প্রকৃত সাফল্যের ভিত্তিরূপে কাজ করে মাত্র। এ ক্ষেত্রে বিচারের প্রধান মাপকাঠি হলো, বস্তুগত সাফল্য আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতেই অর্জিত কি-না। ঈমানদার ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যে কেউ-ই পৃথিবীতে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম। কিন্তু দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো : ঈমানদার বান্দাই সভ্যতাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কাজে ব্যবহার করে। অপর দিকে অবিশ্বাসীরা তা ব্যবহার করে শয়তানের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্যের দিকটি উপেক্ষা করা হয়। ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমাদের সন্তানদেরকে ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়। নির্ভরযোগ্য পাণ্ডিত্যের উৎস ও প্রামাণিক গ্রন্থাদির সূত্ররূপে আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরকেই স্বীকার করি। যে কোন সমস্যার জবাব পাবার

www.icsbook.info

জন্য আমরা তাদেরই দ্বারস্থ হই। আমাদের শেখা বুলির সত্যতা প্রমাণের জন্যও প্রায়শ তাদেরকেই সাক্ষীরূপে উপস্থিত করি। সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নকালে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে ইহুদি ডারউইনের মতবাদ শিক্ষা দেই, অথচ এই মতবাদ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। ডারউইনের মতবাদে মানুষের সকল স্থায়ী মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। ডারউইন বলেন, ধর্ম, নৈতিকতা, বিবাহ কিংবা পরিবার সামাজিক ইউনিটরূপে মানুষের স্বভাবসঙ্গত নয়। সেগুলো সমষ্টিগতমনে কর্ম মাত্র, যা কোন কিছু ইচ্ছা মতো গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। মনস্তত্ত্বে আমরা ফ্রয়েডের যৌন সম্পর্কীয় মতবাদসহ এমনসব মতবাদ শিক্ষা দেই যেগুলো ধর্মকে মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা ভিত্তি বলে স্বীকার করে না।

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, প্রকৌশল, ভেষজ, প্রভৃতি ভৌত বিজ্ঞানকে খোদায়ী জ্ঞানের উৎস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। আমরা আরো মারাত্মক ভুল করি তখন, যখন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এই শিক্ষা দেই যে, প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং প্রকৃতিই তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে; আর প্রকৃতির আইনই হচ্ছে সর্বোচ্চ, চরম ও অলংঘনীয়। 'ন্যাচার' শব্দটি 'প্যাগান' বা প্রকৃতি পূজার মতবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইউরোপে এই শব্দটি 'গড' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি বড় হরফের 'এন' এর আদর্শিক তাৎপর্য প্রকৃতির মাহাত্মের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়। গির্জাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়দের, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। উপাস্যের নামে গির্জা তাদেরকে গোলামে পরিণত করে যে নিপীড়ন চালাতো তার ফলে ধর্ম ও গির্জা ইউরোপবাসীর কাছে নির্যাতনের প্রতীকে পরিণত হয়। সে কারণেই ইউরোপীয়রা যাযকতন্ত্রের সৃষ্ট গডকে বর্জন করে এবং গির্জার সাথে সম্পর্কহীন এক নতুন ঈশ্বরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে। এই নব্য গডকেই তারা প্রকৃতি বা ন্যাচার নামে অভিহিত করে। এই নতুন উপাস্যের প্রতি তাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এ উপাস্যটি সম্পর্কে ডারউইন বলেন, প্রকৃতিই সব কিছু সৃষ্টি করেছে এবং তার সৃষ্টি ক্ষমতার কোন সীমা নেই।

মুসলমান হয়ে আমরা কী করে কুফরি ও জাহেলি এই 'প্রকৃতি' শব্দটি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করি? এমন কি আরো একধাপ এগিয়ে আমরা বইপত্রে এই শব্দটিকে স্থান করে দেই এবং আমাদের সন্তানদের জন্যও তা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করি? সব কিছুই যখন এভাবে চলছে এভাবে যখন ডারউইনের মতবাদ গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে, এবং অনৈসলামী চেতনা ও ইসলামবিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস ভুগোল, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বশিক্ষা, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান তথা সকল বিষয়ে পাঠ দেয়া হচ্ছে, তখন আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মুসলিম বংশধররূপে বেরিয়ে আসবে? বস্তুত, যতদিন আমাদের প্রতিটি কারিকুলামে, প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে ইসলামবিরোধী প্রচারণা এই বিপুল ও ব্যাপক আয়োজন অব্যাহত থাকবে ততদিন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলমানরূপে গড়ে তোলার আশা

www.icsbook.info

করতে পারি না। অধ্যাত্মবাদবিরোধী ও ধর্মহীন পরিবেশ ধর্ম সম্পর্কে আত্মকেন্দ্রিক কিছু খণ্ডিত বিষয় পাঠদানের কতটুকুই বা মূল্য থাকতে পারে? ইসলামবিরোধী এই স্রোত, প্রবল এই অন্তঃপ্রবাহ আর বিপরীতমুখী এই প্রচণ্ড তোড়ের মধ্যে একটু ধর্মীয় শিক্ষার তাৎপর্য কতটুকু? ক্ষুদ্র পাঠ্যসূচির কিছু অংশ মুখস্থ করা এবং বছরের শেষে পরীক্ষা দেয়ার মধ্যেই এ শিক্ষাদান সীমিত। এ পরিস্থিতি সত্যি উদ্বেগজনক। অবিলম্বে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সার্বিক পদ্ধতির ভিত্তিভূমি নাড়া দিয়েই এ সংস্কার সাধন করা জরুরি। শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচিতে ধর্মকে তার যথাযথ স্থান দেয়ার ব্যাপারে আমরা যদি আন্তরিক হই তবে দুটি কাজ আমাদেরকে প্রায় একই সাথে করতে হবে। প্রথমত, ধর্মের ব্যাপারে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রচলিত আছে, ধর্মীয় নির্দেশনা শুধু তার মধ্যেই সীমিত রাখা চলবে না। দ্বিতীয়ত, এই বিশেষ শিক্ষাদানের সিলেবাস আমাদেরকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ এলাকার সিলেবাস এ উদ্দেশ্যে পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে।

ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষত ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে মুসলিম পুরুষ বা মুসলিম নারীরূপে গড়ে তোলা। ধর্মীয় কিছু তথ্য মুখস্থ করে বছর শেষে পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন কোন মতেই সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তির চিন্তা চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতা ও আচার আচরণ সার্বিকভাবে অনৈসলামী বা ইসলামবিরোধী হয়ে গড়ে উঠলে সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা পাসের জন্য কিছু ইসলামী তথ্য মুখস্থ করিয়ে তাকে মুসলিমরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

বর্তমানে আমরা যদি ইসলামী শিক্ষার সকল প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণের অধিকারী না হই এর দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি, যদি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলামের আইন ও বিধান প্রয়োগ না করি এবং বাড়িতে ও রাস্তায় এ বিধানকে সমুন্নত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারি, ইসলামী শিক্ষাও মূল্যবোধকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি। তাহলে আমাদের জীবন বা এর অংশ বিশেষ ইসলামের বিরাট শূন্যতা পূরণের চেষ্টায় একমাত্র অবলম্বন হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থার সবটুকু সম্ভাবনার 'সদ্ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আমাদের সকল শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষাপদ্ধতি সংশোধন করতে হবে এবং সেগুলোকে সঠিক ইসলামী ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে অবস্থায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরেও ইসলামী শিক্ষার জন্য আমাদের হাতে একাধিক কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি থাকবে। ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে স্কুল জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম বর্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষ পর্যন্ত কার্যকর রাখতে হবে। তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, আমাদের সকল পাঠ্যসূচিকে নিছক ধর্মোপদেশে পরিণত করা হবে। মোটেই তা নয়। বাস্তব অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কেননা, ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি এটা নয়। নিছক ধর্মোপদেশমূলক? শিক্ষা এককভাবে আমাদেরকে ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে তেমনি পরিচালিত করে না, তেমনি কাঙ্ক্ষিত ফলও

www.icsbook.info

প্রদান করে না। সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে অনুসারীদের সবচে' প্রিয় বন্ধু ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মহানবী (সা) সাহাবীগণকে শুধু প্রয়োজনের মুহূর্তেই উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন। যখন তখন নয়। তিনি উপদেশ দানের এ নীতি গ্রহণ করতেন, যাতে উপদেশ গ্রহণে ক্লান্ত বা অনাগ্রহী হয়ে না পড়েন। আমরা সাধারণ মানুষেরা ধর্মীয় নসিহতকে বিরামহীন সার্বক্ষণিক বিষয়ে পরিণত করলে তা সুফল বয়ে আনবে না। ধর্মীয় উপদেশ যতো অপরিহার্যই হোক, সারাদিনের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি সময় এজন্য নেয়া উচিত নয়। বরং শিক্ষার অন্যান্য কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় কাঙ্ক্ষিত ধর্মীয় সচেতনতা সৃষ্টিতে ধর্মীয় হিতোপদেশের চাইতে অনেক বেশি কার্যকর ও বাস্তব অবদান রাখবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা জীববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। যদি আমরা আমাদের পাঠ্যসূচি থেকে 'প্রকৃতি' শব্দটি বাদ দেই এবং তার পরিবর্তে যথাযথভাবেই 'আল্লাহ' শব্দটি বসাই, তাহলে ফলটা কী দাঁড়াবে? এখানে আমরা আমাদের পাঠের সমগ্র সময়জুড়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি ক্ষমতার অতি সংবেদনশীল পবিত্র উপস্থিতি অনুভব করবো। জীববিজ্ঞানে এমন কোন বিষয় আছে, যা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষাদান করলে সে জ্ঞান সত্যিকারের একমাত্র স্রষ্টারূপে আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করবে না? প্রাণীদেহের কোন অংশটি আমাদের মনকে আলোড়িত করে না? জমিতে বীজ থেকে চারার উৎপাদন ঘটান কে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত দিকে চারার কাণ্ডকে উপরের দিকে ঠেলে দেয় কোন শক্তি? ফুল কে ফোটায়, আর ফল কে সৃষ্টি করে। কে এতে বিচিত্র রং, স্বাদ ও গন্ধ জোগায়? আল্লাহ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায়?

এমনি ধরনের বহু 'কে' এবং 'কি' থাকতে পারে। বিস্ময়কর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে এমনি হাজার হাজার, লাখ লাখ প্রশ্ন থাকতে পারে। আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই এমনি সকল প্রকার বিস্ময়কর বিষয়ের স্রষ্টা।

পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান থেকেও আমরা দৃষ্টান্ত নিতে পারি। এক একটি পদার্থকে আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে কে রূপদান করেছেন? বস্তুকে তাপের মাধ্যমে প্রসারিত এবং ঠাণ্ডা হলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজটি কে সম্পাদন করেন? কে পানি সৃষ্টি করেছেন? এই পানি যখন জমাট বাঁধে একে তখন প্রসারিত আকার দান করেন কে? একমাত্র পারদ ছাড়া আর সকল তরল পদার্থের উপরিভাগ সমতল করে দিয়েছে কে? পারদেরই বৈশিষ্ট্য হলো, এটা বৃত্তবৎ ক্রমোন্নত তলা বিশিষ্ট। একটি নির্দিষ্ট উপাদানের সাথে আর একটি নির্দিষ্ট উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটান কে? সেখানে অন্য কোন উপাদান ক্রিয়া করে না কেন? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দু'টি উপাদান দিয়ে পানি কে সৃষ্টি করেছেন? এ দু'য়ের মধ্যে একটি উপাদান দাহ্য এবং অপরটি অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে। অথচ এই দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি পানি আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয় কেন? আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে?

www.icsbook.info

ভূ-প্রকৃতি বিদ্যা থেকে আমরা ভুত্বক ও আবহাওয়া, পর্বত, উপত্যকা, সাগর, নদী, মেঘ, বাতাস ইত্যাদি উদাহরণ টানতে পারি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সত্যকে আধুনিক জাহেলিয়াতের মোড়কে আবৃত না করে আমরা সহজেই বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে একে তুলে ধরতে পারি। আধুনিক জাহেলিয়াত যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অতি প্রাকৃতিক কোন উপাদানের প্রবর্তন মানতে রাজি নয় বরং প্রকৃতির বাইরের কোন কিছুকে গ্রহণ করার ফলে গবেষণার বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে বলে সে অজুহাত দাঁড় করায় আল্লাহর নাম ব্যবহারে এভাবেই সে আপত্তি তোলে। আধুনিক জাহেলিয়াত প্রকৃতির প্রতি এমন অন্ধ হলো কেমন করে? যার দরুন প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি ক্ষমতার আরোপের বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আনাটাকেও তারা ক্ষতিকর মনে করেন? প্রকৃতি জিনিসটি আসলে কী? কখন এবং কিভাবে এটি তার বিশাল সৃষ্টি ক্ষমতা ধারণ করলো? সমকালীন ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের ধারকরা যেভাবে চায়, আমরা কি সেভাবেই প্রকৃতির সৃষ্টি ক্ষমতার ওপর নিরঙ্কুশ বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদেরকে প্রতারিত করবো? আমরা কি সে প্রতারণার শিকার হয়ে একক স্রষ্টার কথা ভুলে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয়, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞানতা প্রকাশ করবো? এর দ্বারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চেতনার বিপরীত মিথ্যা জিনিসের নামই কি ব্যবহার করা হবে না?

জ্যোর্তিবিদ্যা থেকে আমরা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমরা আল্লাহ তায়ালার এই মহাবিশ্বের বিস্ময়কর পরিবেশে বারবার আধ্যাত্মিক সফল করতে পারি। আর প্রত্যক্ষ করতে পারি তাঁর মহাসৃষ্টির আশ্চর্যজনক বিশালত্ব, যা এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত। আমাদের মন, আর আমাদের সর্বাধুনিক সুনিপুণ, যন্ত্রপাতি মহাবিশ্বের এই বিশালতাকে ভেদ করতে বা এর গভীরে পৌঁছতেও সক্ষম নয়। মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্ররাজির বিস্তৃতিকে আমাদের কল্পনা শক্তিও ধারণ করতে অপারগ। এদের নির্বিঘ্ন আবর্তনের বিস্ময়কর শৃঙ্খলা আমাদের বোধশক্তির অগম্য। “সূর্যের ক্ষমতা নাই চাঁদকে ধরে ফেলার, কিংবা দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নাই রাতের; সব কিছু সাঁতার কাটছে মহাশূন্যে।” (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০)। ছাত্রছাত্রীদের অন্তঃকরণে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার ব্যাপারে মহান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এজন্য কোন ছলনা বা কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। এসব বিষয় যখন যথার্থভাবে শিক্ষা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর মহানুভবতার ধারণা আমাদের হৃদয় মনকে পূর্ণ করে তুলবে। তাঁর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা আমাদেরক অন্তরকে আলোকিত করবে। আল্লাহ যে অনন্য, অসাধারণ, সে ধারণা তাঁর সৃষ্টির সামনে প্রকাশ করার এ পদ্ধতি আল কোরআনই আমাদের শিক্ষা দেয়। “শীঘ্রই আমরা এদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দিকচক্রবালে দেখাইব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও যেন তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কোরআন বাস্তবিকই সত্য।” (সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত ৫৩)

সমকালীন ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের ধারকরা এ পদ্ধতি সহজভাবে মেনে নিতে ও প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে। কারণ আল্লাহর সাথে তারা একটি নিরন্তর ও হাস্যকর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহকে তারা তাদের সবচে’ ঘৃণ্য ও ভীতিপ্রদ দুশমন মনে করে।

www.icsbook.info

এখানে আমরা আবার জুলিয়ান লিওএর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন, অজ্ঞানতা ও অসহায়ত্বের যুগে মানুষ আল্লাহর ওপর শক্তি আরোপ করেছিল। কিন্তু এখন তারা জ্ঞানের বর্মে পুরোপুরি সজ্জিত। পরিবেশের ওপর তারা নিজেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। তাই (আল্লাহর ওপর আরোপিত) সে শক্তি এখন মানুষের নিজের ওপরই আরোপ করা উচিত। মানুষের এখন নিজেকেই খোদা বলে চালিয়ে দেয়া প্রয়োজন।' হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এই অন্ধ নাস্তিকের হাত থেকে হেফাজত করো।

দীক্ষিত আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কথা বলছি। কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে তাঁরাও তাঁদের ইউরোপীয় দীক্ষাদাতাদের মতোই অস্বীকৃতি জানান। মানুষের মন এর ফলে মহাবিশ্বের গতি, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আপতন সূত্রের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তারা ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। এই বুদ্ধিজীবীদেরকে আমরা বলি, ইসলামী শিক্ষা মানুষকে আপতন সুত্রের সাথে সংশিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে অন্ধ করে দেয় না। বরং ইসলামী শিক্ষা এ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করে এবং এই সূত্রের যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহর দিকেই মানুষকে চালিত করে। আল্লাহর সৃজনশীল ক্ষমতা সম্পর্কে যতই আমরা অধ্যয়ন করবো, ততই আমাদের মন তাঁরই দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর ভাষায় এটাই সত্য: "প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির, আয়াত ২৮)

এই পাঠ্যসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের জন্য ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি ও বিকাশের সুযোগ বয়ে আনবে। তখন আমরা অন্য ধরনের কিছু ইসলামী পাঠ্যসূচি নিয়েও অগ্রসর হতে পারবো, যা ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেক পর্যায়ে ভূমিকা পালন করবে। এই ভূমিকা মানুষকে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে ফেলবে এবং সে তখন প্রতিটি বাহ্যিক বিষয়ের ভেতরের স্বভাবের প্রতি সম্পূর্ণ ইসলামী দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে পারবে। ইতিহাস, মানবীয় ভূবিদ্যাশিক্ষা, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় তখন সে ইসলামের চোখ দিয়েই দেখতে সক্ষম হবে।

ইতিহাস সংক্রান্ত পাঠ্যসূচি কার্যত শিক্ষারই একটি অঙ্গ। আমরা জানি কি জানি না, তার ভিত্তিতে নয় বরং আমরা চাই কি চাই না তার ভিত্তিতেই সে পাঠ দেয়া হয়। ইতিহাস শিক্ষা দানের যে পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করি, সে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ওপর তার নিজস্ব ছাপ ফেলে। ইতিহাসের কোন পাঠে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। যদি এই প্রভাব সুস্থ ও শুভ হয় তবে তা শিক্ষার্থীদের সঠিক অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করবে। পক্ষান্তরে তা ভুল ও অসুস্থ হলে তা ক্ষতিকর ও দুঃখজনক ফল দান করবে।

ইতিহাস পড়ানোর ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো: বস্তুত, ইতিহাস শিক্ষাদানের যে পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, সেখানে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব আমরা আমাদের মনের মাঝে অবশ্যই অনুসন্ধান করি। এটা

www.icsbook.info

এড়ানো যায় না। সে ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড এবং যে জবাব আমরা পাব, তা মানুষ ও তার ঘটনাবলির আলোকে মুল্যায়ন করতে পারবো এখানে মৌলিক প্রশ্ন হলো : এ পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? এ প্রশ্নের যথেষ্ট পরিষ্কার জবাব ছাড়া ইতিহাস নিছক কতগুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা ও বর্ণনার সমষ্টিতে পর্যবসিত হবে। এটা কোন মতেই ইতিহাস নয়। প্রকৃত ঘটনা পরীক্ষা ও দিন তারিখের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর পরই ঐতিহাসিক ঘটনাবলরি ব্যাখ্যা দেয়াই হচ্ছে একজন ঐতিহাসবিদের প্রকৃত কাজ। তাঁর ব্যাখ্যার ভিত্তি কী হবে, এবং কিসের মাপকাঠিতে তিনি ঘটনাবলি যাচাই করবেন, এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। এই পৃথিবীতে মানব জন্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, বস্তুবাদী সভ্যতা গড়ে তোলা এবং এখানে যা পাওয়া যায় তা ভালোভাবে উপভোগ করা।' এই ধারণাটির ওপর ভিত্তি করেই জাহেলি ও ধর্মহীন পরিবেশে পাশ্চাত্যের ইতিহাস চর্চার সূচনা। এর ভিত্তিতেই দেশ ও জাতি, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিচার বিবেচনা করা হয়। বৈষয়িক শক্তি, সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, জীবনের সুযোগ সুবিধা ও তা ভোগের রেকর্ড যাচাইয়ের মধ্যেই পাশ্চাত্যের ইতিহাস রচনার কাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকে। সেখানে চিন্তাধারা, শিল্পকলা, এবং নৈতিক সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধের মতো মুষ্টিমেয় অবস্তুগত মূল্যবোধ ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র জায়গা লাভ করলেও এর কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিত্তিভূমি নেই।

ইসলামী বিদ্যায় যে দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তার জন্য ইসলামী বিশ্বাসের পরিবেশে এ পদ্ধতিটি অন্যান্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে অন্যান্য ইতিহাসে যেসব বিষয়ে উল্লেখ ও লালন করা হয়, এখানে সেসব কিছুকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় না। ইসলামী ইতিহাস বিদ্যার মৌল ও সার কথা হলো, শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্যই এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম। "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবলমাত্র এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার বন্দেগি করবে।" (সূরা আয যারিয়াহ আয়াত ৫৬) 'বল আমার সালাত, আমার সব ইবাদত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য।' (সূরা আনআম-১৬২৯)

পশ্চিমা ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা এই দৃষ্টিভঙ্গিটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ, সীমিত ও গণ্ডিবদ্ধ বলে শুরুতেই ধরে নিতে পারেন। আল্লাহর ইবাদতের ধারণাটি পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কাছে সংকীর্ণ হতে হতে বর্তমানে নিছক কতক অনুষ্ঠানে এসে ঠেকেছে। কিন্তু ইসলামে ইবাদাতের ধারণাটি এর কম নয়। মানুষের জীবনের সকল কিছু তার বিশ্বাস, কর্ম, চিন্তা, অনভূতি ও আচরণ, সকল দিক ও বিভাগ নিয়েই হচ্ছে ইবাদাত। সূরা আল আনয়ামে এ দিকটির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেখানে বলা হয়েছে : আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। মানুষের পরিপূর্ণ, সমগ্র জীবন, এমনকি তার মৃত্যুও, সারা জাহানের একমাত্র প্রভু আল্লাহর জন্য। আল্লাহর

www.icsbook.info

ইবাদাত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা মানুষের সকল কর্ম, চিন্তা ও অনুভবের মধ্যে ন্যস্ত। সেখানে শর্ত মাত্র একটি। তাহলো, মানুষকে তার দেহ ও আত্মা, হৃদয় ও মন দিয়ে আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহর সকল নির্দেশের কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নের পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি তাই ইতিহাস রচনার অন্যান্য পদ্ধতির বিষয়সমূহকেও উপেক্ষা করে না। এতে সকল কিছুই সংরক্ষণ ও বিবেচনা করা হয়। সামান্যতম একটি ঘটনাও এখানে দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আল্লাহর দেয়া মাপকাঠিতে ইসলাম সবকিছুই যাচাই ও পরিমাপ করে নেয়। পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের যে মূল লক্ষ্য, আল্লাহ ইবাদাত বন্দেগি করার সে একমাত্র লক্ষ্য মানুষের সকল চিন্তা, অনুভূতি, কর্ম নিয়োজিত রয়েছে কি? " তোমাদের পূর্বেও বহু জীবনপদ্ধতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল, সেসব যুগ অতীত হয়েছে, পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে দেখ, আল্লাহর (আদেশ ও বিধান) অমান্যকারীদের পরিণতি কী হয়েছে? (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৩৭) অতঃপর আমাদের পরিণতি কী হবে?

ইতিহাস রচনার ইসলামী কিংবা অনৈসলামী, কোন পদ্ধতিতেই প্রকৃত ঘটনাবলি পরিবর্তিত হবে না। ঐতিহাসিক সত্যকে ইসলামী রীতিতে কিছুমাত্র উপেক্ষা করা হবে না। ফেরাউনদের কথা যখন বলা হয়, তখন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সভ্যতা, তাদের মূর্তি, পিরামিড, মন্দির, নগরী, নির্মাণ প্রকল্প, সামরিক ব্যয়, যন্ত্রপাতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা বা অবমূল্যায়ন করা হবে না। যখন আমরা গ্রিকদের কথা বলি, তখন তাদের কোন দর্শন ও বিজ্ঞানকে উপেক্ষা বা অবমূল্যায়ন করা হবে না। আমরা যখন রোমানদের কথা বলি, তখন তারা যা কিছু নির্মাণ করেছিল, তাদের যত স্থাপত্য নিদর্শন, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন সব কিছুই বিবেচনা ও উল্লেবখ করা হবে। এই সকল কিছুকে আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডের সাহায্যে মূল্যায়ন করতে হবে। এসব সভ্যতার ধারক ও বাহকরা কি সকল প্রভুর প্রভু একমাত্র আল্লাহর জন্যই জীবন ধারণ এবং কেবলমাত্র তারই নিমিত্ত মৃত্যুবরণ করেছে? অথবা তারা কি মানব অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে অন্য কিছুর জন্য বেঁচে থেকেছে এবং সে ভুল লক্ষ্য পথেই মৃত্যুবরণ করেছে? অন্যভাবে বললে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তারা কি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানদার ছিল নাকি তারা জাহেলিয়াতের অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল? ঐসব জাতি জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে ছিল বলে যদি প্রমাণিত হয়, তবে যথাযথ ইতিহাসের দৃষ্টিতেই তাদের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হবে।

একজন ছাত্র যখন কোন স্বতন্ত্র বিষয়ের বাহ্যিক প্রকৃতির ভেতরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাতে অভ্যস্ত হবে, তখন সে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষা, মনস্তত্ত্ব সাহিত্য বা শিল্পকলা তথা জ্ঞানের যে কোন শাখাতেই অধ্যয়ন করুক না কেন, তার চিন্তাশক্তি ইসলামের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে এবং তার আদর্শ ও ইসলামী ছাঁচ অনুযায়ী গড়ে উঠবে। অধিকন্তু, ইতঃপূর্বে যে প্রথম পাঠ্যসূচির কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহকে সর্বত্র উপস্থিত জানা, তাকে ভয় করা ও ভালোবসার জন্য মানব মনকে

www.icsbook.info

তৈরি করবে। "তারা তাঁর রহমত লাভের প্রত্যাশা করে এবং আজাবকে ভয় করে।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৫৭)। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মোপদেশ প্রচার করা হয় না, কিংবা ধর্মোপদেশ প্রদানের কাজকে উৎসাহিত করা হয় না প্রচলিত অর্থে সে শিক্ষাব্যবস্থাই পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক বলে পরিচিতি। অথচ কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞানই বান্দাহকে তার প্রভুর নিকটতর হওয়ার ব্যাপারে সচেতন করতে পারে। সে বিজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমেই বান্দাহ তার চারপাশের বিষয় সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হতে পারে।" বল! হে পরোয়ারদিগার, আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান কর।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত ১৪৪)

ইতঃপূর্বে যেসব বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব নিয়ে, বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ এখানকার সীমিত পরিসরে অনুপস্থিত। বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনাতেই তা সম্ভব হতে পারে।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশসমূহ সকল বিষয়কে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে। কম্যুনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আবার এই অভিন্ন বিষয়গুলো কম্যুনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মুসলিম স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব বিষয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পড়ানো হয় না। আমাদের মধ্যকারই কিছু লোক তো বরং এটিকে এক অদ্ভুত ধারণা বলেই বিবেচনা করে থাকেন। কেননা এসব বিষয় শিক্ষাদানে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা হলে তা তাদের মতে আমাদের মনে যুক্তিহীন খেয়াল সৃষ্টি করবে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের সত্যিকার চেতনার বিরুদ্ধে এক বেমানান কুসংস্কাররূপে পথ রোধ করে দাঁড়াবে। কিছু লোক তো নিজেদের ধর্মীয় বিষয়ে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করতে পারে যে, এ ধরনের বস্তুগত বিষয়ের সাথে ইসলামী উপাদান কি আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হবে? বিজ্ঞানও কি শুধুই বিজ্ঞান নয়, যার সাথে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই এবং থাকা উচিতও নয়।

তাদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে নিশ্চিত এবং চূড়ান্তভাবেই বলা যায় : নাহ্! আমরা আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ধর্মীয় চেতনার উজ্জীবন ও বিকাশের কাজে যদি নিয়োজিত করতে পারি, আর আমাদের জীবনকে যদি ইসলামী আদর্শের মজবুত ভিত্তির ওপর স্থাপন করি, তাহলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় আমরা সফলতা অর্জন করবো এবং তা আমাদের সার্বিক জীবনে বয়ে আনবে বিরাট, সীমাহীন সাফল্য। ক্রুসেড সাম্রাজ্যবাদ অধিকাংশ মুসলিম দেশের স্কুল শিক্ষার কারিকুলামে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণের পথ রুদ্ধ করেছে। সে অবস্থা থেকে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যাবর্তন এবং আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক সত্তার পরিচয় উদঘাটনের এখনই চূড়ান্ত এবং উপযুক্ত সময়। সম্মেলন এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

www.icsbook.info

আমাদের স্কুলগুলোতে নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির পূর্বোল্লিখিত বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট করার পর বাকি থাকবে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়। অন্য সকল বিষয় সমন্বিত ও সম্মিলিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সে অনুকূল পটভূমিতে প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় তথ্য সম্বলিত বিষয় যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তা সকল মূল্যমানের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এ নিয়ে তখন কারো কোন আপত্তিও থাকবে না। এসব ধর্মীয় তথ্যের মধ্যে ঈমান, ফিকাহ শাস্ত্র, কিরাত, হাদীস শামিল হবে। এছাড়া অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিত বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব কিছুর সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয় পাওয়া যাবে। সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য, উপাত্ত ও উপাদান ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন, ব্যাখ্যা ও প্রমাণের লক্ষ্য যদি আমাদের নির্দিষ্ট হয়,তবে যে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় অধ্যয়ন কিংবা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত যে কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের আলোচনায় পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতি দিলে তাতে ক্ষতির কিছুই থাকবে না।

সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিবেদিত পাঠ্য বিষয়ের আশু লক্ষ্য হবে ইবাদত, আচার-আরচণ, বিচারের সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা কিন্তু ইসলামের আকর্ষণীয় সহনশীলতা এবং এর আলোক উজ্জ্বল চেতনার সাথে বিরাট অসঙ্গতি সৃষ্টি করে এ শিক্ষাকে কঠিন, প্রাণহীন ও নিরসভাবে উপস্থাপিত করার জন্য জেদ করার কোন কারণ নেই। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা,

সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিবেদিত পাঠ্য বিষয়ের আশু লক্ষ্য হবে ইবাদত, আচার-আরচণ, বিচারের সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা কিন্তু ইসলামের আকর্ষণীয় সহনশীলতা এবং এর আলোক উজ্জ্বল চেতনার সাথে বিরাট অসঙ্গতি সৃষ্টি করে এ শিক্ষাকে কঠিন, প্রাণহীন ও নিরসভাবে উপস্থাপিত করার জন্য জেদ করার কোন কারণ নেই।

www.icsbook.info

রসায়নশাস্ত্র কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ধর্মীয় প্রেরণার উজ্জীবন ও বিকাশের কাজে প্রয়োগের কথা কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? প্রচলিত ধর্মীয় পাঠ্যসূচিকে কেন আমরা এত অনমনীয় ও মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী উপাদানে ভরে তুলবো? সে শিক্ষা ইসলামী আদর্শের কোন কাজে আসে না এবং মানুষের অন্তরকে তা এক ইঞ্চি পরিমাণও আল্লাহর নিকটবর্তী করে না। মানুষের বিশ্বাস, তার আইন বিধান, তার ইবাদাত ও আচরণ সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষাদানের জন্য যে কোরআন নাজিল হয়েছে, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আল-কোরআনের সে পদ্ধতি ও ধারা আমরা অনুসরণ করি না কেন?

আল্লাহ, পরকাল, হাদীস, নৈতিকতা, বিচার ফয়সালা, কিংবা জিহাদের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে আল-কোরআন ধর্মীয় সচেতনতার এক প্রসারিত মহা সড়কে আমাদেরকে পরিচালিত করে। ইসলামী আইন বিধান সম্পর্কিত আল কোরআনের এমন একটি আয়াতও নেই, যা আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। বস্তুত, এমনি ধরনের প্রতিটি আয়াতই মানব মনকে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে সমর্পিত হবার জন্য উন্মুখ করে তোলে। আমাদের ধর্মীয় পাঠ্যসূচি প্রণয়নের বেলায় আমরা কেন কোরআনপন্থী হবো না? মুসলমানরা এক সময় তাদের ধর্মকে দর্শন ও অধিবিধ্যা বা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক এক অন্তহীন ও জটিল বিতর্কের বিষয়বস্তুত পরিণত করেছিল। সে যুগটি ইসলামের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সময়ের অংশ ছিল না। ইতিহাসের সে বিশেষ সময়টিতে বিদেশী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ মুসলমানদেরকে পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছিল; ফলে ইসলামী আদর্শের বিশুদ্ধতা, ইসলামী বিশ্বাসের সহজতা ও ঋজুতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং তার জীবনীশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

আমরা যদি যুগ সঞ্চিত সব মালিন্য ঝেড়ে ফেলে ইসলামের সঠিক, দ্ব্যর্থহীন সুস্থ ও প্রকৃত দৃষ্টান্তসমূহ অবলম্বন করে অসংকোচে উঠে দাঁড়াই, যদি আমরা আবার কোরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি, রাসূল (সা) এর জীবন এবং তাঁর সাহাবাদের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং বিশেষভাবে কোরআনের পথ ও পদ্ধতিকে আমাদের সকল বিতর্ক নিরসনের উপায়রূপে অবলম্বন করি, তবে আবার আমরা সম্মান ও মর্যাদার মস্তক উন্নত করে দাঁড়াতে পারবো।

এ প্রবন্ধে কোন কিছু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। সঠিক পথের ওপর আলোক সম্পাতের জন্য কিছু টুকরো টুকরো বিষয়ের অবতারণাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন, আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।

লেখক : প্রফেসর, শরীআ'হ বিভাগ, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

www.icsbook.info

বাংলাদেশে শিক্ষার সঙ্কট ও সমাধান

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

ভূমিকা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আকণ্ঠ সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য সরকার সমূহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ এ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুমোদিত হয় সেই বছরই ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আরও কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমশ সংকটমুখী যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাংগে ব্যথা ঔষধ দেব কোথা অবস্থা হলেও জাতীয় স্বার্থে এ অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি বা রুহ হল তার আদর্শ ও দর্শন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন স্থির আদর্শ নেই। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কথা বললেও তা যে সোনার পাথর বাটির মতো একটি অবাস্তব কল্পনা বিলাস তা সকলেরই জানা। মূলত আদর্শের সংকটে আক্রান্ত বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে কাঠামো সিলেবাস কারিকুলাম রয়েছে তাও রক্তশূন্যতায় ভুগছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার রয়েছে বহুমুখী সংকট। এর প্রধান প্রধান দৃষ্টিকটু দিক গুলো হল : ১. আদর্শিক ২. সিলেবাস কারিকুলাম পদ্ধতি ৩. পাঠ্যপুস্তক ৪. শিক্ষক ৫. ছাত্ররাজনীতি ৬. সন্ত্রাস ৭. সেশনজট ৮. মেধাপাচার ৯. শিক্ষা খাতে বাজেট ১০.সর্বোপরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গোলামি মানসিকতা।

এদেশের শিক্ষা অবকাঠামো বিগত ২৫ বছরে খুব যে বেড়েছে তা বলা যায় না। জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে এ অবকাঠামো

www.icsbook.info

খুবই দুর্বল। যা-ও অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে। তার সিংহ ভাগ হয়েছে, বিশ্বব্যাংক ইউনিসেফ, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন ডোনার এজেন্সির বদান্যতায়। জাতীয় বাজেটে মাত্র ৭% বরাদ্দ রেখে শিক্ষাকে আর কতদূর পুষ্ট করা সম্ভব ? একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির সিলেবাস, শিক্ষা কারিকুলাম আমাদের নেই। যা আছে তা কেবল আমলা মুৎসুদ্দি আর কেরানি তৈরির ক্ষেত্রে ভাল ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের জ্ঞানীজন টেক্সট রচনায় আগ্রহ পান না তাদের মেধা ব্যয়িত হয় নোট তৈরির কাজে। কারণ নোটের বাজার বড় অনেক বড়। শিশুশ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষা যে দিকেই তাকানো যায় না কেন মানসম্পন্ন পাঠ্যবইয়ের অভাব।

সন্ত্রাস, সেশনজট আমাদের ভাগ্যলিপি । আর এরও মূল কারণ অস্থির রাজনীতি। শিক্ষাঙ্গনে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছাত্র সংগঠন যাদের প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অন্ধ লেজুড়বৃত্তি। মেধা ও মননের বিকাশের পরিবর্তে এখানে চলছে সন্ত্রাস ও হননের অপ্রতিরোধ্য ধারা। এ শিক্ষাব্যবস্থার কুফল হিসেবেই পত্রপত্রিকায় ধিকৃত হতে অনেক বলাবলি লেখালেখির পরও আমাদের শিক্ষাঙ্গন আদুভাই মুক্ত হতে পারছে না। আদুভাই মারণাস্ত্র লাশ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের প্রতি লাঞ্ছনা পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন এগুলোই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বড় অবদান। এসব কি আমাদের জন্য সংকট নয়? অবশ্যই সংকট।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতকরা ৪৫ জন শিক্ষক ডিগ্রির জন্য বৃত্তি নিয়ে বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেন না। ছাত্ররাও বৃত্তির জন্য ছুটছে এবং কোনমতে একটি জুটলেই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে সময়ের ব্যবধানে গাড়ি বাড়ি নারীতে মত্ত হয়ে ওখানেই থেকে যাচ্ছে। মেধাবী তরুণ তরুণীরা এমন কোন উৎসাহ পাচ্ছে না যার জন্য তারা এদেশে থাকবে। আজ আমাাদের গোটা জাতিকে হাড়ে হাঁড়ে মেধাপাচারের পরিণাম ভুগতে হচ্ছে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে অবশ্য সংকটসমূহের বাহ্যিকরূপ ও তার বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরা হয়নি বরং সংকটের মূল কারণগুলোকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা কী ?

শাব্দিক অর্থের দিক থেকে শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি Education , education শব্দটি e,ex . ducre due শব্দ গুলো থেকে আগত। শাব্দিকভাবে যে অর্থ দাঁড়ায় pack the information in and draw the talents out মূলত এর অর্থ অবগতি বা জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। বস্তুত মানুষকে মানুষ করার আয়োজনই শিক্ষা। মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই প্রকৃতির নিজস্ব আয়োজনে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কৃত্রিম কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য

www.icsbook.info

দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। মূলত মানুষই হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ও সংঘবদ্ধ জীব। এজন্যই তার এত আয়োজন।

প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। জীব জগতের অন্যান্য শিশুর মতই মানব শিশুই অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায় তার মা-বাবা আত্মীয় স্বজন সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। তাকে মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্য শিখায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল, মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায় সত্য মিথ্যার পার্থক্য ধরিয়ে দেয়।

প্রত্যেক মানুষেই তিনটি সত্তার সমন্বয় । দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে এক একজন মানুষের অস্তিত্ব । মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে। নানা সামাজিক বিক্রিয়ায় তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের ওপর । এই জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন, eduction is the harmonious development of body mind and soul, দেহ মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা ।

সক্রেটিস কিংবা তার শিষ্য প্লেটোর মতে নিজকে জানার নামই শিক্ষা।

কোন জাতির সন্তানগণকে সে জাতির উপযোগী যোগ্য, দক্ষ, সামর্থক ও কল্যাণমুখী সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা । স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক জাতির শিক্ষাব্যাবস্থা এক হবে না। কারণ প্রতিটি জাতির প্রয়োজন এক নয়, সংস্কৃতি এক নয়, আধ্যাত্মিক চিন্তা এক নয়, সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার এক নয় বরং তা ভিন্ন ভিন্ন।

শিক্ষা একটি সামগ্রিক বিষয়

মিসরীয় দার্শনিক professor muhammad qutub the concept of islamic education প্রবন্ধে বলেছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হচ্ছে পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা গড়ে তোলা, এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা তার বস্তুগত আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না। আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত বিকাশের ফলে শিক্ষাকে নানারকম বিভাজনের শিকার হতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারপরও শিক্ষা তার অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতার ধর্ম পরিহার করেনি। সারা দুনিয়া আজ তার সাক্ষী ।

www.icsbook.info

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কাঠামো

প্রায়শই এ দুটি কথাকে এক করে দেখা হয় এবং এটা মস্ত বড় ত্রুটি।

যে কোন কাজের জন্য প্রথমে প্রয়োজন নীতির তার পরই আসবে তার কাঠামো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের দুনিয়া নীতি ও কাঠামোর তারতম্য যেমন ভুলে আছে তেমনি ভুলে আছে এ দুটির প্রয়োগ। বাংলাদেশের কথাই যদি ধরে নিই তাহলে দেখা যাবে এখনি একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। দেশে কয়েকটি শিক্ষা কমিশনও এজন্য হল। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন, মজিদ খান শিক্ষা কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু সবশেষে কী হলো ? শিক্ষা নীতির ব্যাপারে কারো বক্তব্যই পরিষ্কার হল না। সবাই শুধু শিক্ষা কাঠামো নিয়ে কথা বললেন নীতি নিয়ে নয়।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চতর শিক্ষা ইত্যাদি কাঠামোগত বিষয়ে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের মধ্যে শিক্ষার গুনগত মান কমতে বাড়তে পারে এতে মৌল উদ্দেশ্যের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তেমনি জাতীয় উন্মুক্ত, আনুষ্ঠানিক, উপ বা আধা বা অনানুষ্ঠনিক যে কোন ধরনের কাঠামোতে আপনি যান না কেন এতে শিক্ষার মূলত তারতম্য নেই। এসব কাঠামোগত পরিবর্তন কেবলমাত্র পাস ফেল ও ড্রপ আইটের হার কমাতে বাড়াতে সহযোগিতা করতে পারে, মানুষের বাইরের কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না।

সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণ করে জাতে উঠার চেষ্টা করছে এবং পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সংকট মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসার শূন্য আয়োজনে সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় নামী-দামী ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌত উন্নতির ঘাটতি হচ্ছে না অর্থ-বিত্তের অভাব হচ্ছে না অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না। Education does not necessarily mean mere acquisition of degrees and diplomas it emphasises the needs for acquisition of knowledge to live a worthy life. অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্মানজনক জীবনযাপনের জ্ঞান অর্জন।

বৃটিশগণ আড়াইশত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম দেশ শাসন করেছিল। তার আগে কম বেশি প্রায় সারাটা পৃথিবী মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। দুই আড়াই'শ বছরের শাসনামলে ইংরেজদের সবচেয়ে বড় সাফল্য তাদের রেখে যাওয়া 'শিক্ষাব্যবস্থা'। এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শাসিত জনপদের মানুষের সাথে শাসকগোষ্ঠীর যোগাযোগ রক্ষার জন্য একদল কেরানি, আমলা মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান তৈরি। এর দ্বিতীয় ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল যাই হোক না কেন আচার-আচরন ও সংস্কৃতিতে হবে ইংরেজ। হয়েছেও তাই। বিষয়টি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীতসন্ত্রস্ত মুসলিম শাসক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য

www.icsbook.info

ইংরেজদের রেখে যাওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘষে মেজে চালিয়ে যাচ্ছেন, স্বাধীন দেশ ও জাতি সত্তার উপযোগী কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেননি।

বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কথাবার্তা হতে হতে এক পর্যায়ে মুসলিম দেশসমূহের চৈতন্যে আঘাত লাগে এবং ১৯৭৭ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলন হয় পাকিস্তানের রাজধানী শহর ইসলামাবাদে ১৯৮০ সালে, তৃতীয় সম্মেলন হয় ঢাকা মহানগরীতে ১৯৮১ সালে এবং ১৯৮৩ সালে ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। উক্ত সম্মেলন সমূহে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মাঝে দু'টি প্রধান সুর হচ্ছে–

(ক) বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করত একটি মাত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(খ) বিভিন্ন ময়দানে বিশেষজ্ঞ তৈরির সুযোগ সম্বলিত এ অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে চরিত্রগতভাবে ইসলামী তথা এ ব্যবস্থা হবে ইসলাম চরিত্রের অধিকারী ।

এসব সম্মেলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কয়েকটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নত অনেক কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র কিন্তু অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো। যার প্রধান কারণ হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর গোলামি মানসিকতা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও মুসলমানদের মাঝে বিরাজিত সুপ্তি।

বিরাজিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কট

ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিশাল এলাকা ও আফ্রিকায় অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহ শাসন করেছে। যে সমস্ত ইউরোপীয় মুসলিম দেশ ছিল সেখানেতো তারা সকল কিছুকে অনৈসলামীকরণ (De-Islamisation)এবং মুসলিমশূন্য করণের (Elimination) কাজে প্রথমেই হাত দেয় যার প্রক্রিয়া সম্প্রতি বলকান দেশসমূহে আরো সুস্পষ্ট হচ্ছে। যদিও তাদের এ স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। অ-ইউরোপীয় দেশগুলোতে তারা উপরোক্ত দুটি কাজ অসম্ভব ধরে নিয়ে তৃতীয় একটি পথ বেছে নেয়। আর তা হচ্ছে মোনাফেক তৈরির প্রকল্প। উপমহাদেশে পর্তুগিজ ফরাসী ও বৃটিশরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল মূলত দুই দুইবার স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই-ই চালু আছে। এমনকি মাদ্রাসাসমূহও প্রায় একই উদ্দেশ্য সাধন করে যাচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে একের পর এক কমিশন এসেও বৃটিশদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থার তেমন কোন গুনগত বা মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে পারেনি। স্বদেশের মাটি ছেড়ে বিদেশের বুকে বহু যত্নে ইংরেজরা একটি শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিল কেন? ১৮৩৫ সালে শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান দিক নির্দেশনাদাতা লর্ড ম্যাকলের সরকারকে প্রদত্ত পরামর্শে বলেন we must at present do ur best to form a class who may be interpreters

www.icsbook.info

between us and the millions whom we govern; a class of persons Indians in blood and colour but english in taste in opinions in morals and in intellect . অর্থাৎ তারা চেয়েছিল এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে যারা রং আর রক্তে হবে ভারতীয় যা একান্তই বাহ্যিক ব্যাপার কিন্তু মেজাজ, চিন্তা, চেতনা, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ যাদের দ্বারা তারা শাসিত বিপুল জনগোষ্ঠীর সাথে ভাব বিনিময় করবে।

ইংরেজদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়কে খুব শিগগীর কাছে টেনে নিল। আর পর্যায়ক্রমে মুসলমানগণ রাষ্ট্র ও সামাজিকভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে আত্ম মুক্তির সোপান হিসেবে ইংরেজদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করল। শিক্ষাব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয় বরং রাষ্ট্রীয় জীবনের একটি অংগ।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলস্বরূপ একদল তথাকথিত সুশিক্ষিত লোক তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারা জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য নয় বরং বিশ্ব মোড়লের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সদা তৎপর । শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এরা একই লক্ষ্যে নিয়োজিত।

সাম্প্রতিক কালের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ ইউসুফ আল কারজাভী তার Islamic Education and Hassan Al Banna গ্রন্থে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে `The second main reaason lies in the effects of ideological war or the attacks of cultural terrorists which the muslims had to face during the foreign usurpation. This conquering capitalist gave modern views and ideologies and new values to the life of Muslims which were entered through the veins of modern racess by means of educational institutions and through adoption of the cultural sources.

The most dangerous scheme in which the capitalist succeeded, that is raised bred and trained such song among Muslims who called themselves `standard bearers of culture and civilization' He brought them up before his own attentive eyes provided for them and suckled them with new philosophies of life. He fed them with his own point of view and taught their heart and soul th be proud of new civilization. He taught them how to respect his own civilization and love to imitate his way but if he gave them the education of their own reliagion cultural and inheritance it was very little in quantity, very weak in quality and very cheap in value. Its contents opposed each other and its appearance was completely marred and mutilated.

www.icsbook.info

So we are not surprised that today muslims living as strangers in their own country. Their faces are similar to the Arab Muslims but their minds have adoped the americans of European mode of thinking.''

আরব দেশের মুসলমানদের নিয়ে যে সমস্যা আজ বাংলাদেশের মুসলমানদের নিয়েও একই সমস্যা। কারোরই আর (National identity) জাতীয় পরিচয় নাই। হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সন্তানগণ তাদের পরিচয় বিস্মৃত হচ্ছে। এটাই হলো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ক্রটি বা সঙ্কট।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বড় সঙ্কট তার আদর্শহীনতা। ধর্মবিমুখতা। শিক্ষাব্যবস্থার দুটো ধারা থাকতে পারে। ১. নৈতিক নির্দেশনা সম্পন্ন শিক্ষা এবং ২. নৈতিক নির্দেশনা বিহীন শিক্ষা । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বিতীয় ধারার। আদর্শিক নির্দেশনা বিহীন এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না। বিখ্যাত মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, if you give three r,s,i,e, reading writing and arithmatic and do not give the fourth r, i,e religion they are dure top become the fifth R rascal. অর্থাৎ আপনি শিক্ষার্থীকে কেবল পঠন লিখন ও অংক কষা শেখালেন কিন্তু ধর্ম শেখালেন না তাহলে তারা দুষ্ট হতে বাধ্য। আমাদের সংকটটি এখানেই। আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতা বিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে যতই আমরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলকে লিখে রাখি শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবেশ কর সেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড় ততই আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা কার্টুনিস্ট নূর নবীর ভাষায় মানুষ হয়ে ঢুকছে আর ছাগল হয়ে বের হচ্ছে।

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগতভাবে ধর্মহীন ধর্মবিদ্বেষ বা নিদেনপক্ষে অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রহের জন্ম দিচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার নামে বিদেশগামী তরুণ তরুণীরা যতটা ধর্ম বিদ্বেষী হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে পরধর্ম আগ্রহী। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে ভয়ঙ্কর পুনর্জাগরণ এবং ইউরোপ আমেরিকায় সাংঘাতিক ক্রুসেড প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় ভোগ বিত্ত ও খ্যাতির পেছনে ধাবমান তরুণ তরুণীগন সস্তা ও সহজ পথ বেছে নিচ্ছে । উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হলো যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতির উপযোগী লোক তৈরিতে ব্যর্থ। শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হেদায়াত তথা আল্লাহকে পাবার সঠিক পথের অনুসন্ধান লাভ, ইমাম গাজ্জালীর এ বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নিলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় সংকট হচ্ছে এটি ক্রমাগতভাবে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা ও ডিগ্রি প্রাপ্ত মানুষ এক ধরনের অহংবোধ ও আত্ম প্রসাদে তৃপ্ত হতে থাকে যা তাকে স্রষ্টার প্রতি বিনয়ী হতে দেয় না । বরং এ ব্যাপারে উদাসীন করে তোলে। ইহ ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে অস্পষ্টতা কিংবা কেবল জগৎমুখিতা সৃষ্টির ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিত লোক নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক দূরের বাদ্য শুনে লাভ কি

www.icsbook.info

মাজখানে তার বেজায় ফাঁক- জাতীয় জীবনে দর্শন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বাসগত এ অবস্থান নিয়ে কেউই জাতি গঠন কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে না।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় সংকট হচ্ছে এটি ধর্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পরের দুশমন হিসেবে পেশ করে। হাজার হাজার বিকৃতির পথ পাড়ি দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম বিজ্ঞানবিরোধী যা নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় চার্চ ও বিজ্ঞানের যে দ্বন্দ্ব হয় তাকে কেন্দ্র করে ইসলামের মত বিজ্ঞানময় জীবন বিধানকেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানের শত্রু রূপে উপস্থাপন করে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে বুঝার কোনই সুযোগ নেই যে রসায়নশাস্ত্রের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান এলজেবরার জনক আল জাবির চিকিৎসা শাস্ত্রের পথিকৃৎ, ইবনে সিনা কিংবা আধুনিক সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব শাখায় অতুলনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হন। শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কলমের কালি শ্রেয় কিংবা জ্ঞানীর এক ঘন্টা জ্ঞান সাধনা মূর্খের সারারাত্রি নফল এবাদতের চেয়ে কল্যাণকর ইসলামে নবীর এসব অত্যুজ্জ্বল বাণীর সাথে পরিচিত সুযোগ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। বরং আছে বিদ্বেষ বিষোদগার ও বিকার । ইসলাম বর্বর যুগের আইন এটি বিজ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায় সমাজ ও সভ্যতার পথে প্রতিবন্ধক এই হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থ সংকট মানুষ ও সৃষ্টি জগতের সঠিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত রাখা। মানুষ প্রথম থেকেই যে আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়াতে এসেছে শিক্ষা না দিয়ে এই ব্যবস্থায় শেখানো হয় মানুষ একটি বিবর্তনের ফল, অন্য কোন প্রাণী হিসেবে তার পূর্ব পুরুষ দুনিয়াতে এসেছিল এক সময় তার লেজ ছিল পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সে মানুষে পরিণত হয়েছে। এই যদি হয় মানুষের ইতিহাস তখন স্বাভাবিকভাবেই দয়া-মায়া প্রেম-ভালবাসা স্নেহ-মমতা মানবিকতা ও উন্নত গুণাবলি সিক্ত মানুষের ব্যক্তিও সামষ্টিক জীবনের ভিত্তি হয়ে পড়ে খুবই দুর্বল। মানব সৃষ্টি সম্পূর্ণ বিষয়টিই হয়ে পড়ে অর্থহীন। অনুরূপভাবে ইহ; পারলৌকিক জীবনের গুরুত্ব মানব জীবনের জবাবদিহিতামূলক অবস্থান স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবার চিন্তা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ধারণাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেয় না বরং জীবনের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস সবকিছুকে ইহলৌকিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মানব সৃষ্টির মাহাত্মকে খাটো করে দেয়। এমত বস্থায় মানুষের মধ্যে উদার চিন্তা কর্মফলের মাঝে বেচে থাকার বাসনা ও মানবিকতার বিকাশ ব্যাহত হয় ।

শুধু তাই নয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় সংকট তার ইউরোপকেন্দ্রিকতা জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত উৎস পাশ্চাত্যের হাতে তুলে দিয়ে এ শিক্ষাব্যবস্থা দুনিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস সব কিছুকে বিকৃতির হাতে সঁপে দিয়েছে। পাশ্চাত্য তার সুবিধামত ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞান রাজনীতি ও অর্থনীতি সকল বিষয়ের বিশাল গ্রন্থ রচনা করে সেগুলোকেই ইতিহাস তৈরি করছে যা অধ্যয়ন করে ইসলামের সোনালি যুগের আলোকিত মানুষগুলোকে মনে হয় সবচেয়ে বর্বর অসভ্য ও পশ্চাৎপদ আর বিকৃতির

www.icsbook.info

পথে ধাবমান শাসক সাধকদের মনে হয় সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব । এটাই হচ্ছে পাশ্চ্যাত্যের শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদ আর প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এই সাম্রাজ্যবাদের শাখা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কোন নৈতিক বন্ধন মানুষকে শেখায় না বরং নৈতিকতার বল্গামুক্ত শিক্ষার দ্রুতগামী ঘোড়ার সওয়ার করে দেয়। গল্পচ্ছলে একটি শিশুকে শিখানো হয় কিভাবে দাওয়াত দিয়ে লুকিয়ে থেকে প্রতারণা করা যায়। সুদ কষার মত অংকের মাধ্যমে মানবতার দুশমন সুদের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় কিশোর মনকে। লাভ লোকসানের অংকের নামে দেয়া হয় সুদ কষার অংক দেয়া হয় ভেজাল দেয়ার তালিম, বিবর্তনবাদের নামে প্রদান করা হয় মানব ইতিহাসের বিকৃতি সবক। এভাবেই দেশ ও জাতির জন্য উপযুক্ত লোক তৈরির পরিবর্তে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করে একদল ভোগবাদী স্বার্থ পূজারী ও অবিবেচক লোক যা কিনা সদা সর্বাদা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কটময় অবস্থার চিত্র।

ধর্মবিরোধ, ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মহীনতা বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে জঘন্য সংকট মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎচিন্তা সৎকর্ম কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ সৎকর্মশীল ও বিনয়ী হতে শেখায়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোর দিকে তাকালে আরেকটি সংকট লক্ষ্য করা যায় আর তা হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের কবলে নিপতিত শিক্ষাঙ্গনের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আর তাদের অভিভাবকদের সামনে এক চরম হতাশার ছায়া নেমে এসেছে। আজ কয়েক লক্ষ বাংলাদেশী তরুণ তরুণী পাশের দেশসহ বিভিন্ন দেশে পড়ছে প্রতি বছর কয়েকশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে সেসব দেশে। সন্ত্রাস সেশনজট আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই ছুটাছুটি। সন্ত্রাসের কবলে পড়ে প্রতি বছর জীবন দিচ্ছে কত অসহায় নিরীহ ছাত্র বন্ধু, খালি হচ্ছে দুঃখিনী মায়ের বুক। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত এই ২৬ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে ছাত্র হত্যার হার বছর প্রতি ১৩.৫ এর মতো আহত সংখ্যা গড়ে ৩৬৫ এর অধিক এবং বিভিন্ন সংঘর্ষের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের গড় হার বৎসরে ১৫ এর অধিক। এ চিত্রটি শুধু উদ্বেগজনক নয়, শংকাজনকও বটে। কারণ এ হার গত পাঁচ বছরে ক্রমবর্ধমান । বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস ছাত্রদের বলয় ছেড়ে এখন ছাত্রীদের অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ইডেন কলেজে পর পর কয়েক দফা যা ঘটে গেল তা তো কোন শুভ লক্ষণ নয়।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি সঙ্কট হচ্ছে কাঙ্খিত মানের শিক্ষক সঙ্কট।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের ফ্রেন্ড ফিলোসফার ও গাইড হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তা পালনে ব্যর্থ । আজকালকার অনেক শিক্ষকই যেনো শিক্ষা শ্রমিক কিংবা শিক্ষা ব্যবসায়ী মাত্র। যেন তারা কেবল অর্থের জন্যই ছুটছেন জ্ঞানের

www.icsbook.info

সওদাই যেন তাদের একমাত্র কাজ । ছাত্রদের নৈতিক আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টি প্রায় শিক্ষকের কাছেই উপেক্ষিত। জ্ঞান তপস্যার ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকগণ অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে লিপ্ত । তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতির খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অপরিপক্ব অপরিনামদর্শী ছাত্র ছাত্রীগণ। শতকরা ৯০ জন মানুষ যে দেশে মুসলিম সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষক যখন ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে উদাসীন ও নির্লিপ্ত তাদের আচার আচরণ ও দৈনন্দিন চর্চায় যখন ইসলাম উপেক্ষিত তখন শিক্ষাব্যবস্থা সংকটে পতিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ধর্মহীনতার চরম বিকাশ ঘটেছিল সমাজতন্ত্রীদের হাতে। তাদের বস্তুতান্ত্রিক তথাকথিত প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানময় শিক্ষার চোখ ধাঁধানো সাফল্য পৃথিবীর মানুষকে বিমোহিত করেছিল। কিন্তু মাত্র চুয়াত্তর বছরের ব্যবধানে পিতৃভূমিতে সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যা ও এর গগনচুম্বী সাফল্যের বিশাল ভগ্নস্তূপ পৃথিবীবাসীর মনে তৃতীয় এক চিন্তার জন্ম দিয়েছে। আজ ধর্ম ও স্রষ্টার অবিচল বিশ্বাসই তাদের একমাত্র ভরসা। সেক্যুলার আমেরিকার আগামী প্রজন্ম যখন বিয়ের আগে ইয়ে নয় বলে শপথ গ্রহণ করে তখন বুঝতে বাকি থাকে না সেখানেও ধর্ম এক অপ্রতিহত কল্যাণ ধারার জন্ম দেয়া শুরু করেছে। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যপুস্তকগুলো অচিরেই ফুটপাথের অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থে পরিণত হতে কেবল বুঝি সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

সঙ্কট উত্তরণের একমাত্র পথ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিধান। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই ইসলামের নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে । জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ব্যাপারেই ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি তত্ত্বীয় ও ফলিত বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সবকিছুর ব্যাপারেই ইসলামের বক্তব্য রয়েছে। নবী করীম (সা) এর জামানা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের মুসলমানগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

সম্ভাবত কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার প্রথম বাণী পড় যার ছত্রে ছত্রে মানব জীবনের সকল জটিল বিষয়ের সহজ সরল প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ অবতারণা এবং মুহাম্মদ (সা) ই একমাত্র রাসূল যিনি জগতের মানুষের কাছে জ্ঞান ও শিক্ষাকে বড় করে দেখিয়েছেন। ইসলামের সর্বশেষ নবী পরিষ্কার করে বলেছেন জ্ঞান অর্জন সকল নর নারীর ওপর ফরজ-চীনে যেতে হলেও জ্ঞান অর্জন কর। দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি মানবতার মহান শিক্ষক তিনি শিক্ষার একটি পরিপূর্ণতা দিয়ে গেছেন। তাঁর বা পরবর্তী চার খলিফার আমলে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তা চালু না হলেও ইসলামের প্রথম দিক থেকেই শিক্ষাকার্যক্রম চালু হয়েছিল। নবী করীম (সা) নিজের পরিচয়ে বলেছেন আমি প্রেরিত হয়েছি শিক্ষক হিসেবে। তাঁর

www.icsbook.info

কাছে কোরআনের কোন আয়াত নাজিল হলেই তিনি তা সাহাবীদের শোনাতেন কেউ তা মুখস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীতে রাসূল (সা) এভাবেই ইসলামের বিকাশ স্তরেই একটি স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা কারিকুলাম ও ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রথম ব্যাচ আসহাবে সুফ্ফা। রাসূলের (সা) কোন শিক্ষাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ফলে সাহাবীরা কখনও প্রান্তিকতায় ভোগেননি, তারা কেউই বিজ্ঞান বিদ্বেষী ছিলেন না। আবার অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ধর্মের সাথে বিরোধে অবতীর্ণ হননি বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বিজ্ঞানানুরাগী হয়েছিলেন।

জ্ঞানের নানা বিচিত্র শাখার প্রবল বিকাশ ঘটেছিল ইসলামের সোনালি যুগের শাসকদের হাতে। এসবের ওপর বই লিখেছেন । তাদের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে সারা দুনিয়ার জ্ঞান পিপাসু ছাত্রগণ এসে জড়ো হয়েছিল। তারা জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করেছে। জ্ঞানের সাথে রাষ্ট্র ও ধর্মের কোন বিরোধ হয়নি। নির্বিরোধ জ্ঞান চর্চার সুযোগই ইসলামের ইতিহাসে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন মনীষী।

আজ যদি প্রশ্ন করা হয় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কী ? এর সরল সহজ জবাব হবে যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থা থাকে তাই ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালনা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন একদল লোক তৈরি যাদের মন মগজ চরিত্র হবে পূর্ণরূপে মুসলিম। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অন্যান্য সকল মতবাদের চাইতে ইসলামকেই ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে প্রয়োগযোগ্য উন্নত ও ব্যবস্থা কোরআন হাদিসকে প্রাধান্য দেয় এবং এরই আলোকে পাঠদান করে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে যোগ্য ও দক্ষ বিজ্ঞানী দার্শনিক শাসক বিচারক অর্থনীতিবিদ সেনাপতি রাষ্ট্রপতি চিকিৎসক প্রকৌশলী সাহিত্যিক ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যস্ত সেক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল এসব যোগ্যতার পাশাপাশি লোকগুলোকে ভাল মুসলমানে পরিণত করা। আর কেবল তাহলে এইসব লোক অর্জিত জ্ঞান ও অধীত বিষয়কে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এদের কাছে দেখা দেবে অসহায় ক্ষুধাকাতর ও স্নেহবঞ্চিত লক্ষ্য শিশুর মুখে হাসি ফোটানোর বিষয়টি। এই যে মানবতা এই মানবতাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

স্রষ্টার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস জগৎ সৃষ্টির স্রষ্টা প্রদত্ত ইতিহাস ও ব্যাখ্যা ইহলোক ও পারলৌকিক জীবনের মধ্যে সুষম সমন্বয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও অগ্রগতির সাথে সমান্তরাল অগ্রযাত্রা এই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সোনালি ফসল।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে কিভাবে

শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি অংশ । রাষ্ট্র ইসলামের পুর্ণাঙ্গ অনুসারী না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহ ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানকে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে না করার কারণেই কোথাও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্য মডেল নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র না হলেও যে সব লোক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অনস্বীকার্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যক্তি ও সাংগঠনিক পর্যায়ে এর রূপরেখা তৈরি করে বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন। সমাজ বিপ্লবের অংশ হিসেবেই একদল লোককে শিক্ষাব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর আগেই বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন সমূহের পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক চালু করা প্রয়োজন এবং তা হতে হবে ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণকে সামনে রেখে।

বর্ণমালার বই থেকেই শিশুর প্রথম মানুষ গঠনের কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যাবে ঘরে ঘরে আজ ভর্তুকি দেয় ভারতীয় বর্ণমালার বই যা শিশুর মনে জাতীয় ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের একটি হিন্দুয়াণি ও ভারতীয় ছাপ সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

এমতাবস্থায় শিশুপাঠ্যসহ সকল পর্যয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণোয়ন প্রকাশ বিক্রি ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকসমূহে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(ক) প্রচলিত পরোক্ষ নীতিতেই শিশু পাঠ্যসমূহে খেলার মাধ্যমে অক্ষর সংখ্যা ও শব্দ জ্ঞান দিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে ইসলামী বিষয়সমূহকে পরিচিত করার প্রয়াস পেতে হবে।

(খ) পরোক্ষভাবে সুদ ভেজালের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রচলিত শিক্ষায় যে সুদকষা ও লাভ লোকসানের অঙ্ক রয়েছে সেখানের যাদ সুদের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয় যা ভেজাল দেয়ায় লোকের কত ক্ষতি হলো বা গোয়াল ঠকিয়েছে। এ প্রশ্ন করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এ দুটো বিষয়ে ঘৃণাবোধের জন্ম হবে।

(গ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান লিখতে গিয়েই পবিত্রতার ইসলামী ধারণা দিয়ে দেয়া যায়। সৌরজগৎ সম্পর্কে বই লিখতে গিয়ে সেখানে আসমান গ্রহ, তারা ছায়াপথ সংক্রান্ত

www.icsbook.info

কোরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করলে শিক্ষার্থী কোরআন ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে।

পরিবেশ রচনা

কেবল পাঠ্যপুস্তক মানুষকে শিক্ষিত করে না শিক্ষার্থীর ওপর একটি ব্যাপক প্রভাব ফেলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। অথচ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত নয় বরং সেখানকার পরিবেশ একেবারেই ইসলামবিরোধী। এ ধরনের পরিবেশ কোরআন হাদীসের যত কথাই শুনানো হউক না কেন শিক্ষার্থীর চরিত্রে এর কোন প্রভাব পড়বে না। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে প্রায় ক্ষেত্রে নামাজের ঘর বা মসজিদ থাকে কিন্তু সেখানে নামাজ আদায় বাধ্যবাধকতা নয় বরং ঐচ্ছিক। আবার কোথাও নামাজের আয়োজন নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে পর্দার বিষয়টিও উপেক্ষিত। মিথ্যাচার মিথ্যা সাক্ষ্য নির্বাচনকালে দূষণীয় বিষয় হিসাবে গণ্য না হয়ে আর্ট বলে বিবেচিত হয়। ইসলামী নৈতিকতা সেসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকা কঠিন।

আমাদের শিক্ষার্থীগণ অশৈশব পারিবারিক প্রথা ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসের আলোকে যা কিছু ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে তারা সে সবের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতার লাভ করে। আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব শ্রদ্ধাবোধ সালাম বিনিময় নীতি নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয় উপেক্ষিত হতে দেখে তার ভেতর ধীরে ধীরে ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। এমতাবস্থায় তাদেরকে এমন একটি পরিবেশ দেয়া প্রয়োজন যা তার ভেতরে বিষয়গুলোর প্রতি ক্রমাগত শ্রদ্ধা জাগাবে। তা নাহলে গোটা শিক্ষা জীবনে বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করার ট্রেনিং লাভ করতে থাকে যে শিক্ষার্থী সে ঘুষ খাওয়াকে অন্যায় জানার পরও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

মূল্যবোধের উজ্জীবন

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা আল্লাহ-রাসূল (সা) ও আখেরাত সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত চেতনা হালাল হারামের যে সীমা ইসলাম বেঁধে দিয়েছে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা হুবহু মেনে চলতে গেলে মানুষের মধ্যে একটি মূল্যবোধের জন্ম নেয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেইসব মূল্যবোধের সাথে পরিচিত করা না হলে তারা ডিগ্রি লাভ করবে কিন্তু ভেতরের মানুষটি শিক্ষিত হবে না। পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের পার্থক্য মূল্যবোধগত। আর পাশ্চাত্যের প্রচেষ্টা আমাদের মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্যই নিবেদিত। অবশ্যই ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে যারা কাজ করছেন নিজস্ব পরিসরে এসব মূল্যবোধ ধরে রাখার একটি প্রয়াস অব্যাহত থাকে।

www.icsbook.info

দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে পার্থক্য নেই

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা একজন মানুষকে পার্থিব কাজের জন্য বেশ ভাল মানের জ্ঞান প্রদান করলেও আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন করে দেয়। এর মূল শিক্ষাই হচ্ছে জীবনকে অখণ্ডভাবে না দেখে বিভাজিত রূপে দেখা। দুনিয়া ও দ্বীন-এ দু'ভাগে জীবনকে ভাগ করে দেয়া। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম কথাই হলো- 'দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র'। এই দুনিয়ার কাজ কর্মের পরিণতিতে মানুষ আখেরাতের পুরস্কার বা তিরস্কার লাভ করবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে দুনিয়ার সমগ্র সৃষ্টির যথাযথ ব্যবহার, প্রয়োগ ও কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষকে তথাকথিত কল্যাণকর জীবনযাত্রা, দুনিয়া বিমুখ সন্ন্যাসব্রত পরিহার করে দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততার মাধ্যমে আখেরাতমুখী জীবনযাপনের শিক্ষায় অভ্যস্ত করতে হবে। এ কাজটি করা জন্য প্রয়োজন 'হে রব, আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও, দাও আখেরাতেও'-এ দোয়ার আলোকে গড়ে ওঠা মানুষদের জীবন দিয়ে বুঝানো।

একটি সময় ছিল মুসলমানগণ যখন দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং 'দিনে ঘোড় সওয়ার, রাতে জায়নামাজে সিজদায়রত' থেকে এক অনিন্দ্য সুন্দর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে আখেরাতের সাফল্য লাভে তৎপর ছিল। আজকের তরুণকে শেখাতে হবে তার খাওয়া, পরা, নিদ্রা, কথা বলা, চাকুরি করা, ব্যবসা, স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন, সন্তানকে স্নেহের চুমো এঁকে দেয়া সবকিছুই যদি আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মতে হয় তবে তাই হবে ইবাদত। সুতরাং রাষ্ট্রচালনা, বিচারকার্য, যুদ্ধ করা, রাজনীতি চর্চা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন সবকিছুই হতে পারে ইবাদত আখেরাতে মুক্তির পথ-কেবল দুনিয়াদারী নয়।

জ্ঞানের ইসলামীকরণ

ইসলামী সমাজ বিপব বা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালুর আগেই প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামীকরণের কাজ। ইসলামীকরণের নামে জ্ঞানের মূল বিষয় পরিবর্তন করা নয় বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কাজটি করতে হবে। বলা যায় জ্ঞানকে ইসলামের আলোকে পুণর্গঠিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিভাগে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গবেষণামূলক অনুবাদধর্মী ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তারা স্ব স্ব বিভাগে বিষয় সিলেবাস পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি চালু করতে পারেন। সরকারি বেসরকারি গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা সমূহ প্রয়োজনীয় বইপুস্তক রচনা ও প্রকাশের কাজ হাতে নিতে পারে। কেউ কেউ অল্পমাত্রায় হলেও কাজটি করেছেন । কবি সাহিত্যিক বিজ্ঞানী আলেম শিল্পী ও লেখকগণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজ নিজ বিষয়গুলোর ওপর গবেষণা করতে পারেন।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিশেষ কথা

জনমত গঠন

দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মুল্যবোধ নিয়ে জীবন যাপন করেছেন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা তারই অংশ। অতএব জনমত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে । যদি তা নাও হয়ে থাকে তাহলে জনমতকে প্রেষণা ও নির্দেশনার মাধ্যমে পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। জনগণ যে শিক্ষা চায় না তা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জনমত সংগ্রহ খুবই সহজ ধর্মদ্রোহীগণ ছাড়া আজ এর বিরূধিতা করতে পারবে না। আর ধর্মদ্রোহীগণ তো জনবিচ্ছিন্ন সংখ্যা লঘূ।

মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা

প্রায় সমগ্র মুসলিম দেশেই মসজিদ গড়ে উঠেছে মুসলিম সমাজের প্রাত্যহিক মিলনকেন্দ্র হিসাবে। মালয়েশিয়া,ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, মডেলে মসজিদ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়া যায়। মসজিদকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা বা স্কুল পূর্ব শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ সহজ হবে। কারণ লক্ষাধিক মসজিদের সবকটিই স্কুল ভবনের মত ব্যবহার করা সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বেসরকারিভাবে বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার মত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রয়োজন। এ কাজটি কম বেশি চলছে সর্বত্র। আরব বিশ্বে ইখওয়ানুল মুসলি-মুন উপমহাদেশে জামায়াত তুরস্কে নুর জামায়াত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ইসলামী রাষ্ট্র হলে এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজটিকে সহজ করে দেবে। অবকাঠামোগত এসব অগ্রগতি ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

প্রশিক্ষিত শিক্ষকমন্ডলী

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দেবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলীর অভাব। এই জাতীয় সঙ্কট থেকে বাঁচার উপায় শিক্ষাব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী । শিক্ষকমণ্ডলীর ভেতর থেকেই ব্যাপক দাওয়াতি কাজের মাধ্যেমে একদল লোককে বেছে নিতে হক্ষে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসমান থেকে কতিপয় যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী নাযিল হবেন এমনটা কখনই হবে না। এক্ষেত্রে অতীতের চাইতেও বর্তমানে ইসলামপ্রিয় মানুষদের অবস্থান অনেক আশাপ্রদ।

www.icsbook.info

ইসলামী রাষ্ট্র পূর্বশর্ত

তাত্ত্বিকভাবে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যতিরেকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অসম্ভব। রাষ্ট্রের আনুকূল্য ছাড়া বিশাল শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা সিলেবাসভুক্ত বইপত্র প্রকাশ প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র কাঠামোর একটি অংশ মাত্র। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষাব্যবস্থাও ইসলামী হবে। এখন প্রয়োজন এমন এক প্রস্তুতির যাতে আমাদেরকে ৪৭ এর স্বাধীনতাত্তোর পাকিস্তান , ৭১ এর স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ কিংবা একের পর এক স্বাধীনতা প্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোর ভাগ্যবরণ করতে না হয় যারা ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে ঠিকই কিন্তু চিন্তা চেতনা ও মানসিকতায় সাবেক প্রভুদের গোলামির পরাধীনতা থেকে মুক্তি পায়নি।

শেষ কথা

মানুষ কোন বিষয়েই শেষ কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষার মত একটি ক্রমবিকাশমান বিষয়ে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর পঁজিবাদ মনে হচ্ছে যেন আরেকবার দপ করে জ্বলে উঠেছে। আর এটিই তার সর্বশেষ জ্বলে ওঠা। সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুনিয়াকে তেমন কিছু দেয়ার নেই এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের। সমগ্র দুনিয়া জুড়ে নতুন এক পূর্ণর্জাগরণের পদধ্বনি শোনা যায়। আর তা হচ্ছে বিশ্বময় ইসলামী পূণর্জাগরণ ।

বাংলাদেশকে শিক্ষার সংকট থেকে উদ্ধার করতে হলে মানুষ তৈরির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণসংস্কার করতে হবে। ইসলামীব্যবস্থা প্রবর্তনই হচ্ছে সেই সংস্কার কর্মসূচীর সর্বশেষ ধাপ।

লেখক : ডিরেক্টর- ষ্টুডেন্টস এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

www.icsbook.info

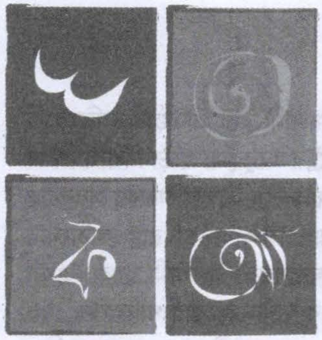

আমাদের শিক্ষাসঙ্কট উত্তরণের উপায়

আব্দুল কাদের মোল্লা

আমরা দু'বার স্বাধীনতা লাভ করার পরও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয়নি, তার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা অন্যতম। জাতীয় জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্র যারা পরিচালনা করেন, যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচলনার কলকাঠি নাড়েন, তাদের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অথচ কে না জানে যে মানুষ গড়ার হাতিয়ার হলো শিক্ষাব্যবস্থা। অতি পুরাতন একটি বাক্য আমাদের মহারথীরা প্রায়ই বলেন, "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। সত্যিকার অর্থে শিক্ষা শুধু মানুষ গড়ার হাতিয়ার নয়, জাতি গঠন বা নির্মাণের অপরিহার্য হাতিয়ারও বটে। একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া একটি জাতি নির্মাণ কখনও সম্ভব নয়।

শিক্ষাসঙ্কট দূর করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে দুয়েকবার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। তবে কখনও আন্তরিকতার অভাবে কোথাও সরকারের অসহযোগিতা, কোথাও ষড়যন্ত্রের কারণে, কোথাও বা গোলামি যুগের মানসিকতার কারণে সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। শুধু যে সফল হয়নি, তাই নয় বরং অবস্থা পূর্বের চাইতে আরও জটিল এবং বিপজ্জনক করা হয়েছে।

শিক্ষা কী?

শিক্ষার সংজ্ঞা এক কথায় দেয়া কঠিন। মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে মানুষের খুদি বা রুহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা। কারণ ভেতরের মানুষটি যদি উন্নত হয়, সংস্কৃতিবান হয়, তাহলে এই ধরনের লোক মিলেই একটি উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম।

www.icsbook.info

কবি রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির উন্নতি ও বিকাশ সাধনই শিক্ষা। কবির সবচাইতে সার্থক উপন্যাস "শেষের কবিতায়" মাসীমার মুখ দিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত যে উক্তিটি উচ্চারিত হয়েছে তা হলো পরশপাথর, আর তার থেকে ছিটকে পড়া আলোটাই হলো কালচার।

জন ডিইউর মতে, সময়ের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জনের নামই শিক্ষা। তবে খাপ খাওয়ানো যোগ্যতা অর্জনের জন্য কোনক্রমেই জাতীয় পরিচয় বা Identity পরিত্যাগ করা চলবে না।

মহাকবি মিলটনের সংজ্ঞাটি শিক্ষার ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক। তার মতে Education is the harmonious development of body, mind and soul. 'দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতির নামই শিক্ষা।'

মানব সভ্যতার সবচাইতে সার্থক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন নবী রাসূলগণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নবীদের কাজ বা শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'তাঁরা আল্লাহর কালাম পড়ে [মানবজাতিকে] শুনান, জীবন যাপনের কৌশল শিক্ষা দেন আর আত্মাকে পবিত্র করেন।' এখানে আল্লাহর কালাম অর্থ হক-বাতিল বা সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জ্ঞান এবং তার সৃষ্টির নিদর্শন ও কৌশল, হিকমত অর্থে জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি পরিচালনার উদ্দেশ্যে যাবতীয় জ্ঞান, আর আত্মাকে পবিত্র করার জন্য যাবতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিক্ষার তাত্ত্বিক অংশকে আর দীর্ঘ না করে সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, আল-কুরআন শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাই সর্বোত্তম এবং ব্যাপক অর্থবোধক।

শিক্ষা ও আদর্শ

আদর্শবিহীন শিক্ষা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুবাদী দর্শনের পুঁজিবাদী শিক্ষা চরিত্রহীন এবং লক্ষ্যহীন যেসব নাগরিক তৈরি করেছে ভয়াবহ রূপ দেখে পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদগণ অস্থির হয়ে পড়েছেন। অধ্যাপক ব্রেব্যাচা, অধ্যাপক তিতাশ, ই, এস, সোনার্স, স্ট্যানলি হল সহ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, নৈতিকতা ও ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা আদর্শ নাগরিক তৈরি করতে পারে না। যা তৈরি করেছে তার পরিণাম এতই জঘন্য এবং ভয়াবহ যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতেও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। তবুও দুয়েকটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের আইন উপদেষ্টার ছেলে তার মাকে ধর্ষণ করেছিল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের লজ্জাজনক কীর্তিকলাপ দীর্ঘ দিন সারা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমকে মাতিয়ে রাখলো। লজ্জাশরম বিন্দুমাত্র থাকলেও ভদ্রলোক অবশ্যই দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসহ বহু গণমাধ্যম নাগরিককে এই একই অপরাধে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে। নাস্তিক্যবাদী ব্যর্থ সমাজতন্ত্র নিজেই

www.icsbook.info

আত্মহত্যা করেছে বলে তা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের উপমহাদেশে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের ওপরের শ্রেণীর কুকীর্তি উল্লেখ করতেও বাধে। অর্থনৈতিক দুর্নীতি এমন সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে যে গণমানুষের সম্পদ নিয়ে রীতিমত দানবীয় লুটপাট চলেছে। পত্র-পত্রিকা খুললে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ডই চোখে পড়ে সবচাইতে বেশি। এক সপ্তাহের দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সংবাদ শিরোনাম একত্রিত করলে যে কোন বিবেকবান মানুষের গা শিউরে উঠবে।

ওপরে শিক্ষার যেসব সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি তাতে ঐসব মনীষীদের কারো মতে আদর্শ নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্ম ছাড়া কোন শিক্ষাই হতে পারে না। Stanly Hull তো খোলাখুলি বলেছেন, 'If you teach your children the theree Rs, [Reading, Writing, Arithmetic] and leave the fourth R [Religion] you will get a fifth R [Rasclality] খোলাখুলি অর্থাৎ তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের পড়া-লেখা এবং মাত্র হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দাও, কিন্তু ধর্মকে বাদ দাও, তাহলে তাদের কাছ থেকে বর্বরতাই পাবে। নৈতিক অধঃপতনের কারণে অর্থনীতি, সমাজ, পরিবার, দাম্পত্য জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনে চূড়ান্তহ ধ্বংসের দ্বারাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী কি বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ কি করে ধর্মহীন তথা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আবদার করেন তা ভাবতে অবাক লাগে। আমরা মনে করি এখনও যতটুকু মানবতা ও কল্যাণধর্মী চিন্তা এবং কর্মকান্ড আছে তা সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে যারা মানব সমাজকে একেবারে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে ফেলতে চায়, একমাত্র তারাই সেক্যুলার এডুকেশনের প্রস্তাব করতে পারে। এদের ব্যক্তিগত চরিত্রের খোঁজখবর নিলে উপরোক্ত মন্তব্যটি দিবালোকের মত সত্য প্রমাণিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালক, বিবেকবান মানুষের ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা জাতিকে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

কুশিক্ষার চাইতে অশিক্ষা কম খারাপ

পাঁচশ বা হাজার বছর আগে আমাদের এতো নগর বন্দর ছিল না, ছিল না পাকা রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিক বাতি আলোর ঝলকানি। জাঁমজমক আর ঠাকঠমক হয়তো ছিল না, কিন্তু তখন আমরা মানুষ ছিলাম। এখন আকার আকৃতি, পোশাক আর প্রসাধনীতে আধুনিক হয়েছি বটে কিন্তু আমরা মানুষ নই। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় আমাদের সুখ-শান্তি নয় বরং দুঃখই বেড়েছে। বর্তমানকালের অন্যতম সেরা কবি আল মাহমুদ তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডাকাতদের গ্রাম হিসেবে তার এক কবিতায় উল্লেখ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পাশ্চাত্যের আধা নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল সত্যিই বলেছেন, 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক [Information Knowledge] যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা [Wisdom] যদি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সেই

www.icsbook.info

জ্ঞান শুধু দুঃখই বাড়িয়ে দেয়। বর্তমান দুনিয়ার ভয়াবহ রূপ দেখে প্রফেসর ব্রেবেচার তাঁর [Modem Philosophy Education] সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই বিজ্ঞান শিক্ষাকেও ধর্মের আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস

শিক্ষার ইতিহাস আর মানবসভ্যতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই শিক্ষার ইতিহাস ততটাই পুরাতন, যতটা মানব সভ্যতার ইতিহাস পুরাতন। কারণ মানব সভ্যতার শুরু অজ্ঞতার মাধ্যমে শুরু হয়নি, বরং জ্ঞানের উজ্জ্বলতার মাধ্যমেই তার শুরু। হযরত আদমকে (আ) খলিফা বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন। কোন জিনিসকে চেনা জানার পরই তা ব্যবহার-কৌশল হিকমত মানুষ আয়ত্ত করতে পারে।

মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু ছেদ পড়লেও মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবনব্যবস্থার ভিত্তিতে শিক্ষা শুরু করেছিলেন, কিছু বিকৃতিসহ ব্রিটিশের অধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশে সেই আদর্শের ভিত্তিতেই একটি সমন্বিত শিক্ষা চালু ছিল। সেখানে থেকে কুরআন হাদীসের দক্ষ আলেম যেমন বের হতেন, তেমনি স্থাপত্য শিল্প, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন একদল আনুগত্য ভৃত্য তৈরি করার উপযোগী করার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছে। ভারতবর্ষেও তারা তার ব্যতিক্রম করেনি।

লর্ড ম্যাকলের দ্বারা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তার ভূমিকায় লর্ড ম্যাকলে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা নুরুল্লাহ এবং নায়েকের বইতে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। তার বাংলা অর্থ মোটামুটি দাঁড়ায়, 'এটি শিক্ষার মাধ্যমে আমরা এরূপ একদল লোক সৃষ্টি করতে চাই যারা রক্তে মাংসে এবং বর্ণে ভারতীয় হলেও চিন্তা চেতনা, অভিরুচি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে ব্রিটিশ সভ্যতার অনুসারী।' অর্থাৎ দৈহিকভাবে এদেশের মানুষ তারা হলেও আসল মানুষটি ব্রিটিশ সভ্যতার প্রসার ঘটাবে এবং ব্রিটিশ জাতির সাথে এদেশের মানুষের সেতুবন্ধন রচনার কাজ করবে। যাতে মুক্তিপাগল ভারতে মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যে প্রতিরোধ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ ছেড়ে চলে গেলেও তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল যে কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আমাদেরকে এতটা হীনমন্য করে দেয়া হয়েছে যে পশ্চিমা সভ্যতার ধারক এবং বাহকরা যদি গ্রীষ্মকালের ভরা দুপুরকে শীতকাল বলে অভিহিত করতে চায়, তাহলে এদেশীয় ভক্তরা তাদেরও আগে আগে তাই বলে চিৎকার করতে থাকবে। তারা যদি কোন ভ্রষ্টা মহিলাকে দুনিয়ার সতী নারী বা রানী বলে সম্মান দেখাতে চায়, তাহলে এদেশীয় ভক্তরা মানস সন্তানের অনেকগুণ বাড়িয়ে তার প্রসংশা করবে। পরাধীন একটা শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা কিছু জোড়াতালি দিয়ে কেন এবং কি উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে বলছি? এ প্রশ্ন

www.icsbook.info

আজ উত্থাপন করার সময় এসেছে। কেননা সমাজও রাষ্ট্রীয় জীবনে সভ্যতা, জীবনবোধ জীবনযাপন তথা মূল জাতিসত্তার পরিচিতির আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন না করি তাহলে কপালে দুর্ভোগ বাড়বেই।

সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকার অর্থেই ব্যর্থ। উদ্দেশ্যহীন এই শিক্ষাব্যবস্থায় কোন ছাত্র, অভিভাবক বা শিক্ষককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ছেলে পড়াশোনা করে কী করবে? প্রায় সকলেই বলবেন আগে পাসটা করুক তো, তারপর দেখা যাবে। রসায়নশাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যার পাস করে চাকরি করে ব্যাংকে বা কোন ব্যবসায়িক ফার্মে। অংকশাস্ত্রে মাস্টার্স করে চাকরি করে ঔষধ কোম্পানি বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে। এমন আজব কান্ড পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই।

ক. আদর্শিক ব্যর্থতা

আদর্শ নাগরিক অর্থাৎ দেশপ্রেমিক ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে দারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আমাদের জাতির কোন পরিচয় নেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার শ্লোগান তুলে দেখা গেল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা মেনে নিলে আমাদের জাতির একটি অংশ দিল্লির পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমাদের সংবিধান ঘোষণা অনুযায়ী সব বাঙালিকে স্বাধীন করার জন্য দিল্লির বিরুদ্ধে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে জয়ী হওয়ার পর এক জাতির একদেশ অর্থাৎ পূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এ সাহস, যোগ্যতা বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, আইন কানুনের কোনটা সমর্থনই আমাদের পক্ষে নয়। এক ভাষায় কথা বললে পার্থক্যগত কারণে শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলিম এবং বাকি অমুসলিম বিশেষ করে উপজাতিদের সমস্যা বাধে। তাছাড়া একমাত্র ভাষা বাঙালি জাতীয়তার আর কোন ভিত্তি নেই।

পঁচাত্তরে পটপরিবর্তনের পর বাঙালি জাতীয়তার পরিবর্তে এল বাংলাদেশী জাতীয়তা। যার ভৌগোলিক পরিচয় ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই। এর প্রবক্তারা মুসলিম জাতিসত্তার চিন্তা মনে মনে রাখলেও প্রকাশ্যে বলার সাহস রাখেন না। ফলে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশী জাতীয়তারও সত্যিকার অর্থে কোন আদর্শিক ভিত্তি দাঁড় করানো গেল না। তাহলে সেক্যুলার বাংলাদেশী জাতীয়তা আর বাঙালি জাতীয়তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রইল কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে যত নব্য শিক্ষিত লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কী? কোন সুস্পষ্ট বা একরকম জবাব পাওয়ার উপায় নেই। সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত লোকেরা জাতীয়তার পরিচয়ের আদর্শিক ভিত্তি সম্বন্ধে একরকম কথা বলতে অক্ষম এমন অদ্ভুত ব্যাপার কিভাবে মেনে নেয়া যায়?

www.icsbook.info

খ. জনশক্তির হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা

শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিভিন্ন সংস্থার জরিপ মতে প্রায় তিন কোটি, Under employed এর সংখ্যা হিসেব করলে অবস্থা আরো বেগতিক। বর্তমান দুনিয়ার প্রযুক্তি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তেমন সুযোগই নেই। শুধু তাত্ত্বিক আর পুরনো বস্তাপচা মতবাদের খন্ড জ্ঞান নিয়ে একটি জাতি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। একেতো আদর্শিক দৈন্য, তার ওপর পেটের ভাত জোগাড় করার কোন ব্যবস্থা নেই। আদর্শহীন, কর্মহীন জীবনের একটি জাতির যুবসমাজ হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, তাহলে জাতির পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে আমরা তার বাস্তব প্রমাণ।

গ. বিভিন্নমুখী শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা

সমন্বিত একটি শিক্ষাব্যবস্থাই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি তৈরি করতে সক্ষম। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা তাও আবার নানা ধারায় বিভক্ত, মাদরাসা শিক্ষা যা দুই ধারায় বিভক্ত এমনি ধরনের নানামুখী প্রবণতার শিক্ষিত লোকেরা নানা চিন্তা, নানা ধারায় বিভক্ত এমনি যে দেশের শতকরা পঁচাশি ভাগেরও বেশি লোক মুসলিম, তাদের মধ্যে অনেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে সংকোচবোধ করে। মাদরাসা শিক্ষিত লোকেরা তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতি একটি মারাত্মক ধরনের বিরূপ ধারণা নিয়ে আছে। আবার স্কুল কলেজ মাদরাসা শিক্ষিত লোকেরা তাদের এক ধরনের অনুৎপাদনশীল এবং পেছনে পরা জনশক্তি বা সমাজের জন্য বোঝা মনে করে। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা ইংরেজি মাধ্যমে বা বিদেশে পড়াশোনা করে একটু ঠোঁট বাঁকা করে বিদেশী ভাষা বলতে পারে, তারা বুনিয়াদি শ্রেণী বলে নিজেদেরকে ধরে নিয়েছে। এদেশের কিছুই তাদের ভালো লাগে না।

ঘ. দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থতা

দেশে সন্ত্রাস, শিক্ষার নির্মাণ, খারাপ পরিবেশ ইত্যাদি অজুহাতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ভারতসহ বিদেশে লেখাপড়া করে। এতে দেশের অর্থ যেমন বিদেশে যাচ্ছে তেমনি একটু মেধাবী ধরনের যারা তারা আর দেশে ফিরছে না। যারা দেশে পড়াশোনায় একটু ভাল তারাও বিদেশের কোন সুযোগ পেলে বিদেশে পাড়ি জমাতে মোটেই দ্বিধা করে না। সবচাইতে মারাত্মক হলো দেশের প্রতি উন্নাসিকতা নিয়ে বিদেশে যাদের মগজ ধোলাই হচ্ছে তাদের হাতে এই দেশের দায়-দায়িত্ব আসলে তারা কতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে, কতটুকু দেশপ্রেম নিয়ে দেশকে গড়ার চেষ্টা করবে, দেশের জনমানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে তাদের কতটুকু সম্পর্ক থাকবে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আর এই প্রশ্নের উত্তর যদি না বোধক হয় তাহলে জাতির জন্য কি ভয়াবহ পরিণাম অপেক্ষা করছে তা আল্লাহই জানে না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে তার জন্য একটি বড়

www.icsbook.info

ধরনেই বই লিখতে হবে। বড় ধরনের ব্যর্থতা তুলে ধরেই এ ব্যাপারে আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই। তবে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন যে অপরিহার্য শুধু অপরিহার্য নয়, বরং আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে ধর্মের ভূমিকা

আমাদেরকে আজ স্বীকার করতেই হবে যে শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা দুনিয়াই নৈতিক পুনর্জাগরণে একটি ধারা শুরু হয়েছে। মানুষ বর্তমানের পুতিগন্ধময় বিকৃত পরিবেশ থেকে মুক্তি চায়। এমনকি যারা এই পুতিগন্ধময় পরিবেশের স্রষ্টা, তাদের বিবেক মাঝে মাঝেই নাড়া দিচ্ছে বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের জন্য। এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের হবু রাজা যিনি Oxford Center of Islamic Studies এর Patron হিসেবে ১৯৯৩ সালে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি বলেছেন–

More than this, Islam can teach today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the Universe. Islam like Buddism and Hindusim refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter and has preserved a mataphysical and unified view of our-selves and the world around us. At the core of Christianity there still liesan integralview of the sanctity of the world and clear sense of the trusteeship and responsibility given to us for our nature surrounding

But the West-gradually, lost This integrated vision of the World with Copernicus and Descartes and the Descartes and comming of the scientific reolution. A comprehensive phlosophy of nature is on longer part of our every day beliefs. I cannot help feeling that if we could now only redoscover that earlier, all embracing approach to the world around us to see and understand its deper meaning, we could begin to get away from the increasing tendency in the West to live on the surface of our sorroundings, where we study our World in order to manipulate and dominate it, turning harmony and beaty into desquilibrium and chaos.

একজন ইংরেজ রাজকুমার যখন বিবেকের তাড়নায় উক্ত কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়েছেন, তখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের মূল জাতিসত্তার আদর্শিক ভিত্তি ইসলমাকে গ্রহণ করতে একটা অনীহা কেন? বিকল্প কোন উপায় ও অনীহা প্রদর্শনকারীরা বলতে পারেন না। তাহলে কি উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যহীন অবস্থায় আমরা এভাবেই চলতে থাকবো? এ প্রশ্নের জবাব দেশের পরিচালক, সমাজবিদ ও শিক্ষাবিদদেরকে স্পষ্ট করে দিতেই হবে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না কোন মতেই।

বাংলাদেশে প্রধানত মুসলিম এবং হিন্দু জাতির লোকেরাই বাস করে। বিভিন্ন ধর্মীয়

www.icsbook.info

গ্রুপ এবং উপজাতীয় লোকজনদের থেকে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে বর্তমানে একটা উল্লেযোগ্য অংশ খ্রিষ্টানও আছে। খুব কমসংখ্যক লোক আছে যাদের কোন ধর্মীয় পরিচিতি নেই অথবা এ সম্পর্কে তাদের কোন চেতনা নেই। এই শতাংশের হিসেবেও পড়ে না। বাকি প্রায় সকলে ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করলেও ধর্মীয় মানসিকতার দিক থেকে খুব আন্তরিক। অর্থাৎ সকলেই ধর্মপ্রাণ।

বাংলাদেশের সকল ধর্মের লোকই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক ও একক। মানুষের ইহলৌকিক জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং সেখানে মানুষের ইহজগতের সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। হিসাব দানে যারা সফল হবে, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত বা অফুরন্ত সুখ ও শান্তি। আর যারা ব্যর্থ হবে তাদের স্থান হবে দোজখে যা হবে চিরন্তন শাস্তি ও অপমানের জায়গা। সকল ধর্মের মানুষই বিশ্বাস করে, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহপ্রদত্ত আইন কানুনের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমেই সত্যিকারের সফলতা।

এটাকে জনগণের সাধারণ বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ হিসেবে ধরে নিলে প্রত্যেক জাতি তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবীয় অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। আমাদের সংবিধানেও এই অধিকার সংরক্ষিত। তাই শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যার যার ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা ধর্মকর্ম এবং তার দার্শনিক ভিত্তি শিক্ষার অধিকার রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় এ সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

এর পর যে কথাটি বলতে চাই, তা হলো ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মপালনকারী লোকজনদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ধর্মের পরিচয় দানকারী, অথচ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ বা আমল আখলাকে অভ্যস্ত নয় এরাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। আর এরাই সুযোগ বুঝে ধর্মকে বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। এই অপকর্মটি সেক্যুলারপন্থী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই করে থাকে।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সামাজিক বিধিবিধান, আইন-আদালত তথা বিচার পদ্ধতি, পারস্পরিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, রাজনীতি, তথা জীবনের অনেক অধ্যায় সম্পর্কে নীরব। এসব ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। সুতরাং ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণসহ অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করলে অমুসলিমদের কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পড়াশুনা করলে একজন হিন্দু ছাত্রের হিন্দুত্বের যদি কোন ক্ষতি না হয়, পুঁজিবাদী তথা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে যদি কোন বৌদ্ধ ছাত্রের ধর্মে কোন আঘাত না লাগে, মানবসৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী এবং ডারউইনের মতবাদ পড়া-শুনা করলে যদি কান খ্রিস্টানের ধর্মানুভূতিতে আঘাত না লাগে, তাহলে ঐ সমস্ত ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পড়াশুনা করলে অন্যান্য ধর্মের লোকদের আপত্তির যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এতে তাদের ক্ষতির পরিবর্তে লাভই

www.icsbook.info

বেশি। জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিই হবে। বাংলাদেশে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া গণতন্ত্রের দাবি। কারণ যে দেশের জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ বা তারও বেশি মুসলিম অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী, সেই ধর্মের মূলনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সহজ-সরল চিন্তার পরিবর্তে বিপরীত চিন্তা এবং বক্তব্য জনমতের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বিদ্রোহের শামিল। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্ত লোকের মতামতের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না।

ভূমিকাতেই বলেছি পরিবর্তনের চেষ্টা দুয়েকবার হয়নি তা নয়। সেসব প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছে তাও উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে প্রচেষ্টা নেয়া হয় ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের মাধ্যমে তাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তারপর আরো দুয়েকটি কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাও পূর্ণাঙ্গভাবে আশার মুখ দেখতে পায়নি। তবে সবচাইতে আলোচিত কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলতে চাই।

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট

কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের মে মাসে। তারপর অনেক পানি গড়িয়েছে। যে সমাজতন্ত্র ও সেক্যুলারিজমের মূলমন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল সময়ের বিবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ঈমান সংবিধানে স্থান করে নিয়েছে। দুনিয়ায় এখন আর সেক্যুলার নাই। বসনিয়া-হারজেগোবিনা, কসোভা, কাশ্মীর, বারবী মসজিদসহ আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি জাতিসংঘ খ্রিষ্টান জগৎ যেভাবে দেখছে তাতে হান্টিংটনের মতে আগামী দিনের সংঘাত হবে সভ্যতা এবং জাতিসত্তার। তাছাড়া প্রযুক্তিগত দিকেও দুনিয়া যতদূর অগ্রসর হয়েছে এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে তার ধারণা নাই বলে চলে। তারপরও কয়েকটি প্রশ্নের জবাব বর্তমান সরকারকে দিতে হবে। যেহেতু তারা এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

তৎকালীন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরও সোয়া দুই বছরের মত জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হত্যা করে একদলীয় স্বৈরশাসন বাকশাল কায়েম করেন। কিন্তু কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তিনি বাস্তবায়ন করে যাননি এবং বাস্তবায়ন করবেন বলে কোন জনসভা, রেডিও বা টিভি ভাষণে জাতির সামনে ওয়াদাও করেননি। পরবর্তী কোন সরকারও এটা বাস্তবায়ন করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

তাহলে কী আছে এই রিপোর্টে?

এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেছে

অনেক প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির কাছে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরির আগে প্রশ্নমালা

www.icsbook.info

পাঠানো হয়েছিল শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্য। সেখানে ধর্ম সম্পর্কে ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নের যে মতামত চাওয়া হয়েছিল তা হুবহু উল্লেখ করছি;

১৭. ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে নিচের কোন প্রস্তাবটা আপনার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য?

১. সাধারণ শিক্ষায়তনে শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।

২. সাধারণ শিক্ষায়তনের সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩. ধর্ম শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

৪. ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ১ নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ১৪৭ জন ২নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ৩৯৯ জন, ৩নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ১৯৫১ জন। আর ভিন্নমত দিয়েছে ১১৫ জন।

১৮. শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত

১. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে থাকবে।

২. ধর্মশিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকবে।

৩. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে থাকবে।

৪. ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা কোন স্তরেই থাকা উচিত নয়।

৫. ভিন্ন মত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ১নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ২১৩ জন, ২নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ১১৫৯ জন, ৩ নং এর পক্ষে মত দিয়েছে ১১২৬ জন। ভিন্নমত দিয়েছে ১৯৬ জন। এখানে যারা সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চেয়েছেন তারা অবশ্যই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে। এই দুই মতের পক্ষে মত প্রকাশকারী লোকের সংখ্যা ৮০% ভাগের ওপর। অথচ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্মের কোন স্থান নেই। আছে ললিতকলার নামে নাচ-গান শিক্ষার বাধ্যতামুলক ব্যবস্থা। শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে দুয়েকটি পিরিয়ড রেখে আর কোন শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে কমিশন শুধু জনমতকে উপেক্ষাই করেনি বরং জনগণের সাথে একটি বড় ধরনের প্রতারণা করে তাদের মতামতের বিপরীতে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল যেমন, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞানসহ অন্যান্য পেশার শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষজ্ঞদের রয়েছে তাতে প্রবল আপত্তি। অন্যদিকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্রায়

www.icsbook.info

চল্লিশ বছরের পুরনো। এরই মধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন রাষ্ট্রধর্মই হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ধর্মীয় আদর্শিক, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ যে কোন বিচারে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিলযোগ্য। বাতিল না করে সংস্কার করতে গেলে এর খোল নলচেসহ একটি পরিবর্তন করতে হবে যে রিপোর্টটির অবস্থা হবে কম্বলের সকল লোম বেছে ফেলার পর কম্বলের মত। সুতরাং এসব পুরনো, সময় ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর অনুপযোগী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের জন্য প্রয়োজন একটি যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থা

উপরের যে সব দিকে আলোচনা করলাম তার শেষ কথা হলো আমাদের একটি আধুনিক ও আদর্শ এবং সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই যে ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষালাভ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি জাতি গঠনে সক্ষম হবে। সে জাতির যেমন থাকবে আদর্শিক পরিচয়, তেমনি থাকবে যুগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতা। দেশের প্রতিটি মানুষ দেশ গড়ার জন্য একজন আদর্শ কারিগর গড়ে উঠবে।

বর্তমান পুরনো পদ্ধতির মধ্যে কিছু জোড়াতালি দিয়ে যেভাবে হাস্যাস্পদ অবস্থায় চলছে, এভাবে চলবে না। ব্যর্থ এই শিক্ষাব্যবস্থার খোল নলচেসহ সবকিছুতেই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার এবং তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ যদি সত্যি আন্তরিক হন তাহলে আর কালবিলম্ব না করে অবিলম্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা উচিত। নতুন শিক্ষা কমিশনের যে সব দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত তা নিয়ে বর্ণনা করছি।

এক -শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি আমরা একটি আদর্শিক জাতি। আমাদের দেশের শতকরা পঁচাশি ভাগেরও অধিক লোক ইসলামের অনুসারী। আমাদের দেশ তার সীমানা, অখন্ডতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক মূল্যবোধ-অর্থাৎ সবকিছুই সেই আদর্শকে ঘিরেই আবর্তিত। বর্তমান বিশ্বে সেক্যুলার বা ধর্মহীন বলে কোন জাতি নেই। ব্যক্তিগতভাবে দু'চারজন গুমূর্খ লোক যাদেরকে প্রাচীন প্রবাদ বাক্য পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এদেরকে বাদ দিলে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার ভারতীয় কংগ্রেস আজ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত। প্রয়াত রাজীব গান্ধী তার নির্বাচনী প্রচার কার্য শুরু করেছিল অযোধ্যাতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে। মার্কিন ডলারের ওপর লেখা থাকে ঈশ্বরের ওপর আস্থা বা বিশ্বাসের কথা। ব্রিটিশরা অলিখিত সংবিধানের অনুসারী বল তাদের রাজা বা রাণীকে বলা হয় Custodian of Faith- অবশ্য প্রোটেস্টান খ্রিস্টান ধর্মের ব্যাপারে। আমাদের সংবিধানে অন্যতম ভিত্তি বা মূল আদর্শ হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর ঈমান। বহুকাল আগে প্লেটো বলেছিলেন নাগরিকদের শিক্ষাদান করা উচিত দেশের সংবিধানের আদর্শ

www.icsbook.info

অনুযায়ী। তাহলে এ ব্যাপারে আর বিতর্ক চলছে দেয়া কোনক্রমেই ঠিক হবে না।

দুই –প্রতিটি বিষয়কে এবং সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আমাদের আদর্শিক মূল্যবোধের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল বিদ্যা, সাহিত্যসহ সব কিছুতেই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সাজাতে হবে। বৈজ্ঞানিক মতবাদের নামে অনেক ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তির মতবাদ যা পাশ্চাত্য পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তার জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই। কিন্তু আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য ঐসব ভূতের আছর এখনো ছুটেনি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী বড় আফসোস করে বলেছেন যে, তিনি হিন্দু ধর্মের অনেক আজগুবি কথাই, যেমন মানুষ মৃত্যুর পর ভূত হয়ে ফিরে আসে, বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মতবাদের ক্ষেত্রে তা বিশ্বাস করেন। কেননা পাশ্চাত্যে যে মতবাদটি প্রত্যাহার হয় বা মরে যায় এ মতবাদগুলি আমাদের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের ঘাড়ে ভূত হয়ে নতুন করে চেপে বসে। নতুন কিছু করতে হলে যারা ভূতের দ্বারা প্রভাবিত তাদের চিৎকার অগ্রাহ্য করেই করতে হবে।

তিন- অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তা অন্যদের কাছে যতই অযৌক্তিক মনে হোক না কেন-শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এটা তাদের মৌলিক মানবীয় অধিকার-এ অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই।

চার- বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। কারণ বেকার তৈরির কারখানা আর চলতে দেয়া যায় না। অর্বাচীনের মত শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা যার কোন বাস্তব প্রয়োগ নেই এমন, তত্ত্ব বা শিক্ষা দিয়ে জাতির শিক্ষিত শ্রেণীকে কর্মহীন বোঝায় পরিণত করা হবে আত্মঘাতী। এখান থেকেও সাহসিকতার সাথেই বের হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।

পাঁচ- শিক্ষাব্যবস্থা হবে সমন্বিত একটিই। যেখান থেকে ধর্মতত্ত্ববিদ, প্রখ্যাত তাফসিরকার, ফিকহবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সমাজবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অর্থাৎ সকল ধরনের গুণীজনই যেন তৈরি হয়ে বের হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। তা না হলে ভুল বুঝাবুঝির কারণে হিতে বিপরীত হওয়ার অবকাশ আছে।

ছয়- প্রশাসনিক স্তরগত বাধ্যতামূলক শিক্ষাসহ সব ব্যাপারেই নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানের পরিধি যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কতদূর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে তাও ঐ কমিশনই নির্ধারণ করবে। আমেরিকার জে. এফ. ব্রনার ও The Process of Education' বইয়ের 'Structure of Knowledge' অধ্যায়ের শিক্ষার্থীকে এতদূর পর্যন্ত শিক্ষিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে তার জ্ঞানের মৌলিক কাঠামো করতে পারে। সেই মৌলিক কাঠামোর জ্ঞানকে পুঁজি করে যে কোন জ্ঞান অর্জন তার জন্য সহজ হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর এবং কোন স্তর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্ররা তাদের পছন্দমত বিভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে তাও ঐ কমিশনই ঠিক করবে।

www.icsbook.info

সাত- আমাদের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক মূল্যবোধ কোনটাই সহশিক্ষা বা পুরুষ মহিলার অবাধ মেলামেশা অনুমোদন করে না। পশ্চিমা দেশগুলো এবং তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাল দিকগুলো ধ্বংস হতে চলেছে যে সব কারণে তার মধ্যে অবাধ যৌন মিলন অন্যতম। তারা এ থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করেছে। আমাদের ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছার আগেই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত এবং সহশিক্ষা কোনক্রমেই প্রাথমিক পর্যায়ের পর আর অনুমোদন করা চলে না। মহিলারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তারা জনগণের অর্ধেক। তাদেরকে অশিক্ষিত বা অন্ধকারে রেখে সমাজ এগুতে পারে না। কিন্তু তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন কাজের ক্ষেত্র ধরন এসব বিবেচনা করে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু আলাদা হওয়া যথেষ্ট নয়, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতেও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। কমিশনকে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আট- শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা। কারণ সৃষ্টিধর্মী জ্ঞান এবং চিন্তা মানুষ মাতৃভাষায় অর্জন করতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শিক ও বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তিগত প্রয়োজন বাস্তব কারণেই ইংরেজি ভাষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহার: সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে নতুন কমিশনকে অবশ্যই একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এমন চিন্তার কারণে আমরা এগুতে পারিনি, যদি এমন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতেও এগুতে পারবো না। আমাদের অবশ্য জাতির জন্য প্রয়োজনীয় একটি শিক্ষাব্যবস্থা পেতে হবে। দ্বিধা-সংকোচ ও দীর্ঘসূত্রতা আমাদেরকে যথেষ্ট ক্ষতি করছে। আর ক্ষতি স্বীকার নয়, সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি সাহসী পদক্ষেপ চাই।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি, সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.icsbook.info

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি

আবদুস শহীদ নাসিম

১. সূচনা

'শিক্ষা' নিয়ে লেখা সহজ কথা নয়। শিক্ষা নিয়ে লেখার জন্যে চাই শিক্ষা। এর জন্যে প্রয়োজনী দীক্ষা, প্রয়োজন সমীক্ষা। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে শিক্ষার সবুজ চত্বর গড়া যায় না।

আমাদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কম চেষ্টা হয়নি এ যাবৎ। কিন্তু আমাদের শিক্ষার নিজস্ব ভিত গড়ে ওঠেনি এখনো। আমাদের শিক্ষার ভিত এবং অবকাঠামো গড়ার জন্য তৈরি হয়েছে এ যাবৎ অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন। প্রথম কমিশন থেকেই দেখা যায়, কমিশনের লোকেরা আমাদের শিক্ষার ভিত গড়ার জন্যে ইট, বালু, রড, সিমেন্ট, পাথর সংগ্রহ করার জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরছেন দেশে দেশে।

কী লাভ হয়েছে তাতে? অনেক কমিশন, সংস্কার কমিটি, উন্নয়ন কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে এ যাবৎ। কিন্তু কূলকিনারা হয়নি কিছুরই।

কেউ বলতে পারবেন -কোন্ কমিশনের প্রস্তাবনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা? আমাদের শিক্ষানীতি?

বরং বিভিন্ন সরকার, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বিভিন্ন সময় নিজেদের চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষার কারিকুলাম এবং সিলেবাসে যে সংস্কার সংশোধন করেছে, সেসব মেরামত নিয়েই চলছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা।

হ্যাঁ, অবকাঠামোগত বেশ উন্নতি হয়েছে (কাঙ্ক্ষিত না হলেও)। তবে সেটা অনেকটা অন্তঃসারশূন্য। দেশে বর্তমানে অনুমোদনপ্রাপ্ত ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেগুলোর মান নিয়ে ব্যাপক লেখালেখির পর সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের

www.icsbook.info

চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এ বছর (২০০৪ ইসায়ী) সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে দেখা যায় ৫২টির মধ্যে মাত্র ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় মানে চলেছে। ১০টির কোন মানই নেই। বাকি ৩২টিও সঠিক মানে নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক শিক্ষক পয়সার জন্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস নিচ্ছেন। একেকজন শিক্ষক একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন।

অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতি আর ধর্মঘটের কারণে সেশন জট লেগেই আছে। ফলে, একদিকে দেখা যায়, আমাদের শিক্ষার কোনো আদর্শিক ভিত নেই। অপরদিকে দেখা যায়, আমাদের শিক্ষার কোনো আদর্শিক ভিত নেই। অপরদিকে দেখা যায়, অবকাঠামো যা-ই আছে তার অভ্যন্তরে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই।

আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবি অনেক দিনের। সেই পাকিস্তান আমল থেকেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জোর দাবি চলে আসছে। '৬৯ সালে এ দাবির কারণেই আবদুল মালেককে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো সরকারই এযাবৎ এ দাবি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়নি।

অবিরত জোর দাবির কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা কিছুটা লেজুড়ের মতো এখনো লেগে আছে। এবং মাদ্রাসাশিক্ষার অস্তিত্ব বহাল আছে। তা না হলে এর ইসলামী শিক্ষা কী? ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা কেমন হবে? ইসলামী শিক্ষানীতি বলতে কী বুঝায়? এসব প্রশ্ন তুলে আসছেন অনেকেই। কেউ তুলছেন ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। তবে জানার আগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন করেন অনেকে।

এই প্রবন্ধে আমার উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর নীতিদীর্ঘ জবাব পেশ করার চেষ্টা করছি।

আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আমাদের শিক্ষানীতিতে নিম্নে বিষয়গুলি স্বচ্ছতার সাথে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে–

- আমাদের জাতীয় আদর্শ কী?

- আমাদের শিক্ষার আদর্শ কী হবে?

- আমরা যুবসমাজকে কোন্ চেতনায় উজ্জীবিত করতে চাই।

- আমাদের শিক্ষার্থীদের নৈতিক মানদণ্ড কী হবে?

- কোন্ আদর্শ-চেতনা এব কোন্ নৈতিক মানদণ্ডে বলীয়ান হলে তারা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

আমরা বলবো, নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ আর ঈমানী চেতনা দ্বারাই এটা সম্ভব। এছাড়া আর কোনো মতবাদ আর মতাদর্শ দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

www.icsbook.info

এই আদর্শিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কর্মমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা অর্জন করবে আমাদের শিক্ষার্থীরা। তখনই আমাদের শিক্ষিত যুবসমাজ হবে জাতির জনসম্পদ। কেবল তখনই তারা স্বপ্ন দেখবে বিশ্বজয়ের, স্বপ্ন দেখবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার।

২. শিক্ষা কী?

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেটো শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন।

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ওপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়। ইংরেজি ও আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, এখানে আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করবো, যাতে করে শিক্ষার মর্মার্থ ও তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো : শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা। Educate মানেঃ to bring up and instruct, to teach, to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষা দেওয়া অভ্যাস করানো। (Samsad English-Bengali Dictionary, Calcutta 22nd pression September 1990)

Joseph T. Shiple Zuvi 'Dictionary of Word Origins' -এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' Ges 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে 'তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া' এবং 'সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া'।

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথনির্দেশক। (মোঃ আজহার আলীঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠক, বাংলা একাডেমী-১৯৮২)

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন :

Education denotes the realization of innate human potentialities of indiveduals through the accumulation of knowledge". (Education in Islamic Society : A.M Chowdhury : Dhaka 1995)

কুরআন, হাদীস এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সে শব্দ গুলোর নিম্নরূপ বিশ্লেষণ ঃ ১. তারবীয়াহ্ (تربية)

www.icsbook.info

২. তা'লীম (تعليم) ৩. তা'দীব (تأديب) ৪. তাদরীব (تدريب) ৫. তাদরীস (تدريس)

এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ :

تربية শব্দটি ربو নির্গত হয়েছে তারবীয়াহ শব্দ থেকে। এর অর্থ : Increase, to grow, to grow up, to exeed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to develop, argment.

আর تربية মানে : Education, up bringing, Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising. (মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়াতুল মু'আসিরাহ By J. Milton Cowan.)

تعليم (তালীম) শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। তা'আলীম অর্থ- Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship, 66 পূর্বোক্ত

تأديب (তা'দীব) শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب (আদব) শব্দ থেকে। 'আদব' মানে ঃ Culture, Refinement, Good breeding, Good manners, Social graces, Decorum. অর্থবহ أدب (আদব) শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب তাদীব শব্দ। তাই তা'দীব শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন এইসব অর্থও নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে তা'দীব দ্বারা Education এবং Disciplinel। বুঝায়। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

تدريب (তাদরীব) মানে : Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring. (উক্ত গ্রন্থ)

تدريس (তাদরীস) শব্দটি গঠিত হয়েছে (দারস) শব্দ থেকে। তাদরীস মানেঃ To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot, to thrash out, tution. (উক্ত গ্রন্থ)

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় গঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আভিধানিক অর্থ থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/বড় করে তোলা।

২. উন্নত করা/ উঁচু করা/অগ্রসর করানো।

৩. পূর্ণতা দান করা/মহত্তর করা/মহান করা/প্রস্ফুটিত করা।

www.icsbook.info

৪. জাগিয়ে তোলা/উত্থাপিত করা/উজ্জীবিত করা।

৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/গড়ে তোলা।

৬. লালন পালন করা/প্রতিপালন করা।

৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা।

৮. অভ্যাস করানো/অনুশীলন করানো/জ্ঞাপন করা/ উপদেশ দেয়া।

৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া/জ্ঞাপন করা/ উপদেশ দেয়া।

১০. অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন করা/ সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্য শাসন করা।

১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/ জন্মগত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া।

১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা।

১৩. পথ প্রদর্শন করা/ পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

১৪. প্রেরণা দেয়া/উদ্বুদ্ধ করা/উদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা।

১৫. সন্ধান দেয়া/সংবাদ দেয়া/তথ্য প্রদান করা।

১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো।

১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান।

১৮. শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হওয়া।

১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতিবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘষে মেজে পরিচ্ছন্ন করা/নির্মল করা।

২০. শালীনতা, ভদ্রতা, শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার শেখানো।

২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও অমায়িক আচরণ শেখানো।

২২. আদব-কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালি শেখানো।

২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/সচ্চরিত্র শিক্ষাদান।

২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো।

২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা।

২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মে অভ্যস্ত করানো/কৌশল শেখানে/নিপুণতা অর্জনে সহায়তা করা।

২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা।

www.icsbook.info

২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিন্তা ভাবনা করা/গবেষণা করা/পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা/অনুসন্ধান করা।

২৯. উদ্ভাবন করা।

৩০. বিদ্যার্জন করা/পাণ্ডিত্য অর্জন করা/শেখা/জানা/দক্ষতা অর্জন করা।

আরবি ও ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, সে হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূণ বিকাশ উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পুরো জীবন পরিব্যাপ্ত। 'দোলনা থেকে কবর' পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ জীবনে যা যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে হলো শিক্ষা।

৩. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : কুরআনের আলোকে

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল-কুরআনেও মৌলিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করছি। শেষের দিকে আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা ও উল্লেখ করবো :

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

অর্থ : "তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দীনের জ্ঞান লাভের জন্য বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।" (সূরা আত তাওবা : ১২২)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ. (ال عمران: ٧٩)

অর্থ : "কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবুয়্যাত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ; তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও। (সুরা আলে ইমরান : ৭৯)

www.icsbook.info

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهٗ مُوْسٰى: هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. (الكهف: ٦٥-٦٦)

অর্থ : "সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললো; আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা আমাকে শিক্ষা দেন?" (সুরা আল কাহাফ : ৬৫-৬৬)

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (محمد: ١٩)

অর্থ : "এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" (সুরা মুহাম্মদ : ১৯)

অর্থ : "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে।" (সুরা আলা বাক্বারা :২০৩)

وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ - (البقرة: ٢٠٣)

অর্থ : "জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আলাহর সাথে মিলিত হবে। (সুরা বাক্বারা : ২২৩)

وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ - (البقرة: ٢٢٣)

অর্থ ঃ "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার বস্তু আর আলাহ্র কাছে রয়েছে অবশ্য বড় পুরস্কার।" (সুরা আনফাল : ২৮)

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ: "জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক; তিনি উত্তম অভিভাবক আর উত্তম সাহায্যকারি" (সুরা আনফাল : ৪০)

فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ .... وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ. (الحديد: ٢٠)

অর্থ : "এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।....................বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আজাব আর আছে আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষ।" (সূরা আল হাদীদ : ২০)

www.icsbook.info

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓءُ ـ (فاطر: ٢٨)

অর্থ : "আল্লাহ্‌র দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির : ২৮)

وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ. (ال عمران: ٧-٩)

অর্থ : "জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে- আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে; হে প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিও না। তোমার রহমতের ভাণ্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু ! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কখনো ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।" (সূরা আল ইমরান: ৭-৯)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ـ (الجمعة: ٢)

অর্থ : "তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও আল হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়।" (সূরা আল জুময়া : ২)

'হিকমাহ্' অর্থ-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ الحديد: ٢٥)

অর্থ : "আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" (আল হাদীদ : ২৫)

www.icsbook.info

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۔
(القصص : ٨٠)

অর্থ : "কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো; তোমাদের জন্য দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য তো আল্লাহ্‌র পুরস্কারই উত্তম।" (সূরা কাছাছ : ৮০)

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো :

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহর দাস হিসেবে তৈরি করা।

২. দ্বীন তথা আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।

৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

৪. তাওহিদের জ্ঞানার্জন করা।

৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষি হওয়া।

৭. আল্লাহকে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।

৮. আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

৯. আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন।

১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।

১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।

১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।

১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।

১৪. মানবসমাজকে সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন।

১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।

১৬. সূরা আল বাকারার ১৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

মোট কথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্‌কে জানা, আল্লাহ্‌র

www.icsbook.info

দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্য নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্‌প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

৪. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : হাদিসের আলোকে

রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদিসেও শিক্ষার দিক-নির্দেশিকা উল্লেখ হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করছি। হাদিসগুলো থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহও শেষে সাজিয়ে উল্লেখ করবো।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةِ فِىْ حُجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتِ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ -

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ্, তাঁর ফেরেস্তাতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মৎস্য পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে, মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।" (তিরমিযি)

اِنَّ رِجَالًا يَّاْتُوْنَكُمْ مِّنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ
فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا - (ترمذى)

অর্থ : "বিশ্বের দিক-দিগন্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ছুটে আসবে দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের কল্যাণকর উপদেশ (শিক্ষা) দান করবে।" (তিরমিযি)

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ غَرَضًا مِّنَ
الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسند احمد وابو داؤد و ابن
ماجة: ابو هريرة)

অর্থ : "যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবে না।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

www.icsbook.info

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থ : "প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই (কুরআন সুন্নাহর) এই জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত করবে।" (বায়হাকি)

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ - (دارمى)

অর্থ : "ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্য জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর।" (দারিমি ঃ হাসান বসরি থেকে)

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ - (دارمى و دار قطنى: عبد الله بن مسعود)

অর্থ : "তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা দীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো। তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো।" (দারিমি)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদিসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো :-

১. মানব কল্যাণ।

২. সুশিক্ষা বিস্তার।

৩. আল্লাহ্কে জানা ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন।

৪. আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায় জানা।

৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা।

৬. ইসলমাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

৭. কর্তব্যপরায়ণ হওয়া।

৮. কুরআনের আলো বিস্তার।

www.icsbook.info

৫. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-মনীষীদের দৃষ্টিতে

এবার দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীরা কে কী বলেছেন; জন ডিউই বলেছেন; "শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।"

প্লেটোর মত হলো : "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছুই প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে : "শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।"

এরিস্টোটল বলেছেন : "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।"

শিক্ষাবিদ জন লকের মত : "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।"

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন : "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের কাঙ্খিত প্রকাশ।"

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ -এর মতে : "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।"

কমেনিয়াসের মতে : "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা।"

শিক্ষাবিদ বলেছেন : "দেহ ও মনের সমান্তরাল পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।"

পার্কার বলেছেন : "পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্ম প্রকাশের জন্য যেসব গুণাবলি নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলির যথাযথ বিকাশ সাধান।"

জিন জ্যাক রুশোর মতে : সুঅভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

Bartrand Russell-এর মতে একটি মন্তব্য হলো : "............The education system must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl an opportunity for the best that exists.Ó

স্যার পার্সিনান বলেছেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো : "চরিত্র গঠন, পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা।"

ড. হাসান জামান বলেছেন : !"স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা........এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

আল্লামা ইকবালের মতে : "পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।"

www.icsbook.info

বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেন : মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখে না, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও মগজ। রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত। জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের অভ্যন্তরীণ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়। অতঃপর সেই চিন্তা ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি। যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনাদর্শ তাদেরকে তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। আর সে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা।" (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী : তালীমাত)

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতভাবে 'শিশু অধিকার সনদ' গৃহীত হয়। এতে চুয়ান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। 'অনুচ্ছেদ ২৮' শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার দলিল। অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ:

শিক্ষার লক্ষ্য

অনুচ্ছেদ : ২৯

১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে-

ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ;

খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি;

ঙ. "প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।" এই অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দৃষ্টিতে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হলো :

১. ব্যক্তিত্বের পরিপূন বিকাশ ;

২. মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ;

www.icsbook.info

৩. মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ;

৪. শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ;

৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

৬. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৭. জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৮. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

৯. নিজস্ব সংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ;

১০. নিজস্ব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

১১. নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

১২. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

১৩. অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

১৪. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ;

১৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

৬. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করে যাচ্ছে। কোনা না কোনো উপায়ে সে অবিরাম জ্ঞানার্জন করেই চলেছে। শ্রেণিকক্ষ আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ প্রতিনিয়ত জগতের সকলের এবং সকল কিছুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, অর্জন করেছে জ্ঞান। এই অবিরাম ও প্রতি-নয়ত শিক্ষাকার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Informal Education

২. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Nonformla Education

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Formal Education

বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও পাঠ্যপুহমশক এ শিক্ষার প্রধান প্রধান উপকরণ। এছাড়া সময়ের সীমারেখা, পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা, পরীক্ষার বিধিবদ্ধতা, কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতির বেষ্টনীতে এ শিক্ষার বসবাস। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এসব আনুষ্ঠানিকতা পুরোপুরি থাকে না বটে, তবে কিছু কিছু থাকে। আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও এটা নয়।

www.icsbook.info

আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যাতে কোনো কৃত্রিম আয়োজন নেই। এখানে গোটা সমাজ আর পুরো বিশ্বজগৎই মানুষের শিক্ষাগার। কোনো প্রকার বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মানুষ এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখেই চলে।

এ ক্ষেত্রে মানুষের মা তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, তার বাপ শিক্ষক। ভাই বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, নানা-নানিসহ সকল আত্মীয় স্বজন তার শিক্ষক। তার প্রতিবেশীরা তার শিক্ষক। তার পরিবেশ তার শিক্ষক। তার সমাজ ও চলমান সামাজিক কার্যক্রম তার শিক্ষক, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তার শিক্ষক। চলমান বিশ্ব ও বিশ্বব্যবস্থা তার শিক্ষক। প্রকৃতি তার শিক্ষক। তার নিজের সৃষ্টিতে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। নক্ষত্ররাজি, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং রাতদিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। এসবের কাছ থেকে এবং এসব কিছু থেকে মানুষ তার চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে আর মনমস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব উপলব্ধি করে দিনরাত অবিরাম শিখছে আর শিখছে। আহরণ করছে জ্ঞান আর জ্ঞান। বিকশিত করছে নিজের দেহ ও মনকে। প্রস্ফুটিত ও পরিশুদ্ধ করছে নিজের আত্মাকে। প্রখরিত করছে নিজের বিবেককে। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অকৃপণ, উদার ও প্রাকৃতিক। কেউই বঞ্চিত হয় না এ শিক্ষা থেকে। তবে আজ আমরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েই আলোচনা করছি। কারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাতেই প্রয়োজন হয় অনেক আয়োজনের।

৭. শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি

শিক্ষা কী? শিক্ষাব্যবস্থা কী? শিক্ষানীতি কী? এ নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন অনেকেই। শিক্ষার পরিচয় তো আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। এবার জানা যাক অপর দু'টি কী? শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাপনার সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে গঠিত হয় শিক্ষাব্যবস্থা। অন্যকথায় শিক্ষার সাথে জড়িত সকল বিষয়ে সমন্বিত রূপই শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য, শিক্ষার স্তর, শিক্ষার বিভাগ, শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম), পাঠ্যসূচি (সিলেবাস), পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাগৃহ, শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষা বা মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার জন্যে অর্থ, শিক্ষার পরিবেশ-প্রভৃতির সমন্বয়েই গঠিত হয় শিক্ষাব্যবস্থা।

আর উপরোক্ত বিষয়গুলো যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকেই বলা হয় শিক্ষানীতি বা এডুকেশন পলিসি।

যেমন অনেক বিভাগ, উপবিভাগ, দফতর, অধিদফতর, পরিষদ, উপপরিষদ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয় যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতির ভিত্তিতে- তা হলো রাষ্ট্রনীতি।

এভাবে সব ক্ষেত্রেই কর্ম এবং কর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে সাথে কর্মনীতিও থাকতে হয়। যেমন, কর্ম কর্মনীতি; শ্রম শ্রমনীতি। মূলত কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন,

www.icsbook.info

সংস্থা, সমাজ, সমষ্টি, রাষ্ট্র সেই নিয়মনীতি ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তার উদ্যোক্তারা তা পরিচালনার জন্য যে নীতিমালা ও বিধিমালা তৈরি করে থাকেন।

৮. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়নি। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থ্যায় নাগরিকদের সুর্নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা চলে আসছে আরো আগে থেকে।

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে চালুছিল ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। সে শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হতো আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম এবং দেশ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব ও জনশক্তি।

কিন্তু ১৯৫৭ সাল থেকে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে নিতে থাকে, তখন থেকে তারা এ দেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করে, যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের মানসিক গোলাম হিসেবে তৈরি হবে। তাদের খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে না। শেষ পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাহীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা তার শৌর্যবীর্য হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষ্যাব্যবস্থা জমে ওঠে। চাকরি বাকরিসহ বস্তুগত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য তখন এই শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে।

সেই থেকে এদেশে চালু হয় দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা। একটি হলো ব্রিটিশদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। আর অপরটি হলো পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলমাদের ধর্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। এ সময় মুসলমানরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার কারণেই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি করবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে। ১৯৪৭ সালে ভাতরবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় ভারত। মুসলমানরা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনার জন্য।

www.icsbook.info

তাদের আদর্শিক ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি চালু করবার জন্য। কিন্তু যারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে, তারা মুসলমানদের এই প্রাণের দাবির সাথে গাদ্দারি করে। তারা পাকিস্তানে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও চালু করেনি। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেনি। তারা ইংরেজদের চালু করে যাওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা সবই হুবহু বহাল রাখে। কিছু সংস্কার সংশোধন করলেও ইসলামের পক্ষে তেমন কিছুই করেনি। কেবল মুসলমান জনগণের প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান' নামের সাইন বোর্ডটি গ্রহণ করে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা করেনি অতঃপর চব্বিশ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যায় পাকিস্তান হিসেবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪ বছর বিগত হলো। আদর্শভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থ্যা এখানে চালু হয়নি। জনগণের প্রাণের দাবি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে ৪০ বছরে বেশ কয়েকটি শিক্ষা সংস্কার ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সে কমিটিগুলো রিপোর্টও প্রদান করেছে। তবে এ যাবৎ পাঁচটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। পাঁচটি কমিশনই তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেছে।

কমিশনগুলো হলো :

প্রথম : কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪

দ্বিতীয় : মজিদ খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৯

তৃতীয় : মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮

চতুর্থ : শাসছুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৯৭

পঞ্চম : মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ২০০৩

মূল ভিত্তির প্রেক্ষিতে উপরোক্ত কোনো একটি রিপোর্টই পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ রিপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়। প্রথম কমিশনটি ছিলো ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসের এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় : 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে"। নবদিগন্ত সূচনাকারী উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি :

১. "কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১: ১)

২. "আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" (অধ্যায় ১ : ২)

www.icsbook.info

৩. "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে নাগরিকদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।" (অধ্যায় ১ : ৫)

৪. "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।" (অধ্যায় ১ : ৯)

৫. "প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।" (অধ্যায় ২ :১৩)

৬. "সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।" (অধ্যায় ৭ : ৯)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা থাকবে না।)।

৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় : সাপ্তাহিক পিরিয়ড : প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবে না। (অধ্যায় ৭ : ১০)

৮. "মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত।" (অধ্যায় ৭ : ১০)

৯. "নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে : (ক) বৃত্তিমুলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।" (অধ্যায় ৮ : ৫)। (ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না)।

১০. "মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১১: ২)।

১১. "বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে।" (অধ্যায় ১১ : ৩) (অর্থাৎ মাদ্রাসা থাকবে না।)

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করার জন্য অনেক প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতির ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি করার একটা পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী আর্দশের বিপরীত বিশেষ ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে কতটা গণমূখী ও বাস্তবভিত্তিক বলা যায়?

এরপর ১৯৮৮ সালে প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্ব গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের চেয়ে অনেকটা উন্নতর। এ রিপোর্ট থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার নীতি বাদ দেয়া হয়। ধর্মের প্রতি কিছুটা অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। এই রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

www.icsbook.info

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বেও প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।

২. দেশের নিরক্ষতার অবসান ঘটান।

৩. সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

৪. নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদারোধ সৃষ্টি করা।

৫. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

৬. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা।

৭. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের সাহায্যে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সমূহের বিকাশ সাধন করা।

৯. বিশ্বের সকল দেশের মানুষের আশা -আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজ-সচেতন মানুষে পরিণত করা।

১০. মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটান। (জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮)

এই রিপোর্টটিও বাস্তবায়িত হয়নি।

অতঃপর ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শামসুল হক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সরকার এ কমিটিকে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করে। দেশের বর্তমান সংবিধান এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও শিক্ষক সংগঠনের চাপের মুখে এ কমিটি কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টের চাইতে অনেকটা উন্নতর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তাচেতনায়

www.icsbook.info

দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগরুখী, উৎপাদনক্ষম সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা।

১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।

১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা। (২২) প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৯:৪০।

এখানে ২ নং পয়েন্টে সুস্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলে দেয়ার পর ৩ নং পয়েন্টে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী, তা উহ্য ও অস্পষ্ট রেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া ৬, ৭, ৯, পয়েন্টসমূহ খুবই বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ প্রতিবেদনের ভেতরেও মাঝে মাঝে বেশ বিভ্রান্তিকর সুপারিশ করা হয়েছে।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পর এ সরকার প্রথমে প্রফেসর এম.এ বারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটি একটি ভালো রিপোর্ট প্রদান

www.icsbook.info

করে। অতঃপর এ সরকার প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ হিসেবে পরিচিত। এ কমিশন ৩১ শে মার্চ ২০০৪ তারিখে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালা নির্ধারণ করা হয় নিম্নরূপ :

মৌলিক নীতিসমূহ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতগুলো মৌলনীতির ভিত্তিতে, যা কমিশনের কাজের প্রথম দিকেই আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল, এ প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে। এগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. মূল লক্ষ্য : শিক্ষার মূল লক্ষ্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্পদে পরিণত করা।

২. শিক্ষার সুযোগ : ধর্ম, গোষ্ঠী সংস্কৃতি, নারী-পুরুষ বা ভৌগোলিক অবস্থানভেদে শিক্ষার সুযোগ, বিশেষভাবে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমবণ্টনের নীতি অনুসরণ ।

৩. শিক্ষার গুণগতমান : শিক্ষার গুণগত মান সর্ব পর্যায়ে সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স : যে দিন শিশুর বয়স ৫ বছর হবে সেদিন তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রক্রিয়া চালু করা।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ : সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি আওতায় আনয়ন করতে হবে।

৬. শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত ১:৩০ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১:৪০-এ নামিয়ে আনা।

৭. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সকল পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৮. শিক্ষাকাঠামো : বর্তমানের শিক্ষাকাঠামো অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

৯. শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধন : বর্তমানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষার ধারা সমাজে আর্থ-সমাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অসমতা সৃষ্টি করছে, যা সামাজিক সংহতি বিরোধী। হঠাৎ করেই আজ যেহেতু এসব ধারা পরিবর্তন করা বাস্তবসম্মত নয় সেহেতু অন্তত বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিস্তৃত অংশ যাতে সমসত্ত্ববিশিষ্ট হয় সে লক্ষ্যে কারিকুরাম প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

১০. একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা : একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা ও ব্যবস্থা চালুকরণ।

১১. গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃতকরণ : এ উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থে পরিচালিত নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল এলাকায় অর্থাৎ যে সব এলাকায় শিক্ষার সুযোগ কম সেসব জায়গায় স্থাপন।

www.icsbook.info

১২. মফস্বলে মডেল হাইস্কুল : স্বল সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে মডেল হাইস্কুল স্থাপন।

১৩. শিক্ষক নির্বাচন : বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ।

১৪. শিক্ষার গুণগত মান : শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নকল্পে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা। বিশেষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান। স্বল্পসময়ের প্রশিক্ষণের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার।

১৫. শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার : কমিশনের বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার ছাড়া স্বল্পসময়ে শিক্ষার মান উন্নত করার অন্য কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে একটি টি-ভি চ্যানেল শিক্ষার জন্য নিবেদিত (Dedicated) করা যেতে পারে।

১৬. জীবনমুখী শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা এমনভাবে গড়ে তুলতে হব যেন ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীরাও সমাজের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

১৭. শিক্ষা ও জনশক্তি : দেশের জনশক্তি ব্যবহার সম্পর্কে একটি জাতীয়নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক যাতে কোন শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি না হয়।

১৮. শিক্ষার দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাক-প্রাথমিক ও অব্যাহত শিক্ষাদানের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতিটি (টি-ভি'র সাহায্যে) ব্যবহার করতে হবে।

১৯. শিক্ষকের মর্যাদা ঃ শিক্ষকদের বেতনকাঠামো, পদোন্নতির নিয়মাবলি, চাকরির শর্তাবলি ইত্যাদি এমন হতে হবে যেন তা সম্মাজনক হয়।

২০. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ (ক) সকল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মুল্যায়ন পদ্ধতি অনুরূপ রাখার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। (খ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে (দশম শ্রেণীর শেষে এসএসসি পরীক্ষা ব্যতিরেকে) পরীক্ষার ফল কোন শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য ঘোষণার জন্য নয়। বরং শিক্ষাজীবনের প্রথম নয় বছর পরীক্ষা নিতে হবে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর অর্জন কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে কি না তা দেখার জন্য এবং তা অর্জিত না হলে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে তার মান উন্নয়নের সহায়তা করা।

২১. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ঢাকাকেন্দ্রিক প্রশাসনকে (বিশেষ করে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ক্ষেতে) বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে যাতে– ক) কোন এক ব্যক্তির হতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না থাকে; খ) বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষমতার মধ্যে সংঘাত না থাকে; গ) অধিকতর দ্রুতগতিতে এবং স্থানীয়ভাবে সমস্যার সমাধান হয় এবং ঘ) বিদ্যালয়/কলেজ/কর্তৃপক্ষ বা প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের সকল কাজে রাজধানীতে আসতে না হয় বা অমর্যাদাকর অবস্থায় পড়তে না হয়।

২২. তথ্যপ্রযুক্তি : তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য প্রণীত জাতীয় নীতি স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.icsbook.info

২৩. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ সরকারি ব্যয়ে একক বিষয়ভিত্তিক (যেমন-কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিরুৎসাহ করতে হবে, কেননা তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অপচয়ী।

২৪. বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ঃ উচ্চশিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল সেহেতু বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে না, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৫. বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রেখে ১৯৭৩-এর আইনদ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা।

২৬. গবেষণায় উৎসাহদান ঃ (ক) প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের গবেষণায় উৎসাহদানের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Centres of Excellence গড়ে তোলাসহ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি সম্প্রসারণ। (খ) পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্র (কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা) গবেষণার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

২৭. ভাষানীতি : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি জাতীয় ভাষানীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।

২৮. বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন ঃ সর্বাধুনিক জ্ঞানের আলোকে জাতীয় বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্বল্পসময়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৯. অব্যাহত শিক্ষাদান ঃ প্রযুক্তি (রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট) ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বাস্তবভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালুকরণ।

৩০. স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন ঃ দেশে একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা দরকার। কমিশনের কাজ হবে মূলত (ক) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ ; (খ) চলমান গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকারের সুপারিশ করা। ; (গ) শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাচেতনার উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ করা। (জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদন।)

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন, ডিন, নির্বাচন ও ভিসি নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া রিপোর্টে প্রত্যেক উপজেলায় ১০ বছরে একটি আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্কুল ম্যাপিং-এর ভিত্তিতে প্রতি বছর দেশে ২৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো গঠন, কোচিং সেন্টার ও নোট বই নিষিদ্ধ করাসহ শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও আধুনিক করার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি ফাজিল ডিগ্রিকে ব্যাচেলার এবং কামিল ডিগ্রিকে মাষ্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের রিপোর্টে ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়নেরও সুপারিশ করা হয়।

www.icsbook.info

সুপারিশ বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে ৫ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সকল শিশুকে আব্যশিক বিদ্যালয়ে আনতে হবে। সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা চক্র যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বর্তমান প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার পাশাপাশি সাময়িক পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। তবে ইংরেজি ও ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়।

সুপারিশমালায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে আধুনিক বিষয়সমূহে গবেষণা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও আইন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান রাজ্যের এক বর্ণালি প্রশিক্ষণ।

সুপারিশমালায় বলা হয়, দেশে মাদ্রাসা পরিচালনা জন্য যে পরিচালনা পরিষদ রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করছে না। মাদ্রাসাগুলো পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে বিধায় সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে নিবিড় পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ একান্ত জরুরি। সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ যেসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও তা করা জরুরি। সুপারিশমালায় প্রচলিত শিক্ষাধারার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করার প্রস্তাবও করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট গ্রহণের পর তা বাস্তবায়নের জন্যে একটি বাস্তবায়ন সেল গঠনের নির্দেশ দেন।

এ রিপোর্ট বেশ Upgraded. মাদ্রাসা শিক্ষাকেও এ রিপোর্ট বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা যাক এ রিপোর্ট কতটা বাস্তবায়িত হয়।

তবে, এযাবৎ যতোগুলো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টই প্রকাশ হয়েছে, তার কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে বিভিন্ন সময় সংস্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলাম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে এখানো ঢেলে সাজানো হয়নি।

৯. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা

আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশনাল মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা। একটি আধুনিক জ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। একই জাতির লোকেরা দুই ধারায় শিক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ধারার দিগদর্শন দুই বলয়ে অবস্থিত। এক ধারার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করে না। আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে কোনো

www.icsbook.info

ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয়।

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভুভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে।

বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষণ করতে। তাই এদেশীয়দের মধ্য থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভূ মনে করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃকিতে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায় দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে। যে ব্যক্তি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যতো বেশি নিষ্ঠার সাথে সেবা করার সে নিজেকে ততো বেশি গৌরবান্বিত মনে করবে।

তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিল রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি করার উদ্দেশ্য প্রণীত। সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, তা থেকে তৈরি হচ্ছিল সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা দেশগুলোতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করেছিল প্রভুভক্ত ও আনুগত্যপরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেণীর লোক তৈরি করেছিল। তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে চালু আছে।

বলাবহুল্য এ ছাত্ররাই আবার শিক্ষক হয়। তাই, আমাদের ছাত্র শিক্ষক সকলের জীবনই লক্ষ্যহীন, দক্ষ পথের অনুসারী। মোট কথা দেউলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজ এমন চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, চিন্তাশীলরা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতংকিত।

এ শিক্ষাই উৎপাদন করে আমাদের দেশের কর্ণধারদের। এ দুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় তথা সর্বক্ষেত্রের নেতৃত্বের কাঠামোকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতির ধারা অসংখ্য গতিপথে প্রবাহিত। জাতীয় নেতৃত্বের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। শুধু মাত্র লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার কবলে পড়ে জাতি আজ সর্বক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ সংকটকাল অতিক্রম করছে। জাতিকে এখন বাঁচানো প্রয়োজন। তাকে এখন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন।

এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ও আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী। এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ :

www.icsbook.info

১. আল্লাহবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহবিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তিতে উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছে।

এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত।

২. ঈমানী দর্শন বর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা : আধুনিক শিক্ষ্যাব্যবস্থ্যা মানুষকে সঠিক জীবনের দর্শনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ, আল্লাহর একত্ব, রিসালাত, আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমানি দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ শিক্ষাব্যবস্থা পরকাল থেকে বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও স্বার্থকতা জানাবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

৩. জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহবিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ অহি ও নবুয়্যাতের মাধ্যমে মানষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচেছ, তারা না ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে, আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪. প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা : ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তি লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে না।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা : এই আধুনিক ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক

www.icsbook.info

থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদণ্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল এ রকম হয়। যে শিক্ষাব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে না, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে না, আদর্শ জীবন পদ্ধতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না, সে শিক্ষাব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদণ্ডহীন। এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওনা সম্ভব নয়। এ শিক্ষাব্যবস্থার কুফলে আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধঃপতনের দিকে তলিয়েই চলেছে।

৬. নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা : আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায় না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হবার আশা করা যায়না। তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭. জাতির ঐক্য ও সংহতি (National Consensus) সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ এ শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থ্যা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহুমত ও পথের অধিকারী বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে গড়ে ওঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং জাতিকে বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে। ফলে জাতির মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। ঐক্য ও সংহতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

৮. সংকীর্ণ মতপার্থক্য (Fanatic dissentions) সৃষ্টি ও লালন করা এ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. সন্ত্রাস : এ শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

১০. এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

১১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির লোক তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যানকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলে/মেয়েদের অবাধ মেলামেশার কুফল জাতিকে ধ্বংসের

www.icsbook.info

দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

১২. দুর্নীতির প্রসার : দুর্নীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরীয়ে আসছে জঘন্য ঘুষখোর, চোরাকারবারি, মানুষের অধিকার হরণকারী, আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, স্বজনপ্রীতিকারী, যুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রতারক, চোর, ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, আদর্শ তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাজে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে।

১৩. ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় : অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গোটা ধর্মহীন ভাবধারার সাথে 'ইসলামিয়াত' ও 'ইসলামের ইতিহাসের' লেজুড় জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখানো ঐচ্ছিক, কখনো বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ইসলামের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

'ইসলামের ইতিহাস' নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা পাস করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলামবিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা মুসলিম যুবকদের ইসলামবিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে ইসলামকে একটি জঘন্য মানবতাবিরোধী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা কাঁটা দিয়ে 'কাঁটা তোলার' নীতি গ্রহণ করে।

'ইসলামিয়াত' বা 'ইসলামী শিক্ষা' নামে যে বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া হয় না। তবে যতটুকু ধারণাই দেয়া হয় তার ফলাফল ইসলামের পক্ষে খুবই একটা যায় না। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ হলো, নিচের শ্রেণীগুলোর ইসলামিয়াত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা দেয়া হয় না। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয় না। ইসলামিয়াত বিষয়টি গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পরগাছার মতো। ছাত্রদের অন্য সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগৎ আল্লাহ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে। আল্লাহর রাসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করে না। ছাত্রদের গোটা চিন্তা ধারাই এ দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা হয়। অতৎপর ইসলামিয়াতের ক্লাসে মৌলভী সাহেব আল্লাহ,

www.icsbook.info

রাসূল, কিতাব ও পরকাল আছে এবং এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে শিক্ষা দেন।

একদিকে সামগ্রিকভাব ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি করা হচ্ছে, অপরদিকে ইসলামিয়াত ক্লাসে আল্লাহমুখী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সাথে ইসলামিয়াতের এই শিক্ষা খাপ খায়না। ফলে ছাত্রদের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে ইসলামিয়াতের শিক্ষাটা পরগাছার মতোই থেকেই যাচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে। নিরানব্বই মণ লবণের সাথে এক মণ চিনি মিশালে সে চিনি লবণের সাথে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

এভাবেই প্রবল আল্লাহবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে তার ওপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং সে দ্বন্দ্বে বেচারা পরগাছা এভাবেই প্রবল আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে তার ওপর আল্লাহমুখী হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং বেচারা পরগাছা ইসলামিয়াত চরমভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে ইসলামের বিরোধিতায় তারা সাহসী হয়ে ওঠে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কথায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়র সব চাইতে ঘৃনীত বিভাগ সম্ভবত একটি। এ বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা 'মোল্লা' 'মৌলবাদী' খেতাবে ভূষিত। এ বিভাগের ছাত্রদের কর্মপোযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে পাস করার পর তাদের না সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় আর না সিভিল প্রশাসনে। কোনো প্রকারের ইসলামিয়াতের শিক্ষকতা করে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাদের সামাজিক মর্যাদাকে হেয় করে দেখা হয়। মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার এই লেজুড় ও পরগাছা থেকে ছাত্ররা

ক. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে জনতে পারে না।

খ. ইসলামকে হানাহানি কাটাকাটির ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে শিক্ষা লাভ করে।

গ. তাদের মন ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

ঘ. ইসলামকে একটি খেল তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে।

ঙ. এটাকে সমাজের জন্যে কল্যাণকর মনে করা হয় না।

১০. মাদ্রাসাশিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব

আমাদের দেশে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি ধারা চালু আছে। একটি হলো 'দরসে নেজামি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা। অপরটি হলো আলিয়া মাদ্রাসা। এ পদ্ধতির সুচনা হয় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ পদ্ধতি শ্রেণীভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড়ে লাগানো হয়েছে। এই দুই ধারা মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব কমই। মূলত উভয় ধারাই মুসলিম

www.icsbook.info

শাসন আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলে, তারই শিক্ষাক্রমের অনুযায়ী। মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যুগ উপযোগী। তখন এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রাষ্ট্র নায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কূটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর দায়িত্বশীল লোক।

এরপর বৃটিশরা এলো। তারা তাদের ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষাব্যবস্থা চালূ করে।

গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব নিয়ে চলতে থাকে। বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীনত্ব নিয়েই সে এখনো ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের পতন হয়। দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণা করে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে পড়ে আছে আপন স্থানে। ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো তাতোই এ শিক্ষাব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো। এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলি ও জীবনধারর সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তাদের জন্য মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকতা, স্কুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকার আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান ছুটানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিম্লোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত ঃ

১. মূল শিক্ষাব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের কার্যকারিতা বর্জিত।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়

৩. এখানে যুগ উপযোগী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাস ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাস করার পর পুনরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না।

৪. এখানে প্রাচীন ফিকাহ শাস্ত্রের ওপরই অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাধীন চিন্তা গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

www.icsbook.info

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তাও পূর্ণাঙ্গ কুরআন পড়ানো হয় না। কুরআনের ওপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই।

৬. হাদীস শাস্ত্রেরও একই অবস্থা। হাদীসের ওপর গবেষণাধর্মী পড়া-লেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করবার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

৭. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায় না।

৮. এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্য লোক তৈরি হয়না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনার 'কি পোস্ট' গুলোতে তাদের স্থান হয় না।

৯. এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছে না। ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা লাভ করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়, প্রসাশনিক ও সামাজিক পদমর্যাদায় তারা অধিষ্ঠিত হতে পারছে না। ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় থাকতে হয়।

১০. এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে জনশক্তি লাভ করা যায়না, সে কারণে মাদ্রাসাগুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত।

১১. মাদ্রাসগুলোতে যারা শিক্ষাদান করেন, তারাও অদক্ষ। তাদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো উপযোগিতা নেই।

১২. মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও কর্মহীনতার কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বির্তকে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সারা দেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তর করে আছে।

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা সমাজ পরিচারলনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন করে না, সেজন্যে অভিভাব-করা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করাননা। কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে :

ক. একান্তধর্মীয় শিক্ষা লাভ করবার কামনায়।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার নিয়্যতে।

গ. গরিব লোকেরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়।

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিত্যন্তই অপ্রতুল্য। ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টিকে থাকার জন্য বাধ্য

www.icsbook.info

হয়ে বহু মাদ্রাসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চেয়ে বাড়িয়ে দেখাতে হচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিকভাবে অনাস্থা কতো প্রবল এবং এ শিক্ষাব্যবস্থা কতোটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে।

১১. চাই ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির শিক্ষানীতি

শিক্ষা মূলত একটি দেশের মেরুদণ্ড। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হলো সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। একদিকে মানুষের জীবনধারা ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষার রাজপথ নির্দেশক। অপরদিকে শিক্ষাই মূলত মানুষের মধ্যে বিশেষ ধরনের জীবনধারা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং শিক্ষা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যাভিসারী। শিক্ষা বর্তমানে কানন, ভবিষ্যতের মুকুল। শিক্ষা বর্তমানের ফল, ভবিষ্যতের বল।

শিক্ষা একদিকে মহাকবি মিল্টনের ভাষায় Harmonious development of body, mind and soul. অপরদিকে শিক্ষা কালে সিঁড়ি, সভ্যতার নির্মাতা এবং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতির ক্রেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রের অন্য দশটির মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা একটি সোনালি ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবদীপ্ত জাতি। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, আজ আমরা সাংস্কৃতিক ভিক্ষুক, রাজনৈতিক কুঁদুলে, অর্থনৈতিক কোমর ভাঙা আর শিক্ষাব্যবস্থায় দেউলিয়া।

আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোতে উর্দু মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ আমলে আলিয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। দারসে নিযামি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি। বিভিন্ন সময় আলিয়া পদ্ধতিতে বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এগুলো খুবই একটা খাপ খায়নি। ফলে এসব মেরামত/সংস্কার মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও বিভিন্ন সময় সংস্কার মেরারমত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা ফল হবে না। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের।

www.icsbook.info

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতীয় কল্যাণ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্ব নিজেদের ওপর। নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা পঁচাশি ভাগ নাগরিক মুসলমান। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয়, আল্লাহভক্ত ও ধর্মভীরু।

অর্থনৈতিক দিকে থেকে বাংলাদেশ পেছনে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুসলিম হিসেবে আমাদের গৌরবান্বিত ইতিহাস। আছে মহান ঐতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা। আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কাছে নির্ভুল জীবন বিধান নেই।

সারা বিশ্বে আমাদের সোয়াশো কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা আমাদের অংশ। তারা আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী।

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা। প্রণয়ন করতে হবে নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা। এই শিক্ষব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে নদীব স্রোতধারার মতো।

এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের একটি আদর্শ ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করবে আমাদের জাতিকে প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। স্বাধীন মর্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে শিখবে। আমাদের পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। দক্ষতার সাথে দেশ হবে এতোটা উন্নত, যুযোপযোগী ও বাস্তবধর্মী, যেনো এ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা জীবন ও জগৎকে জানতে শিখে, জীবন ও জগতের প্রতিটি বিভাগকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করতে শিখে এবং জীবন ও জগৎকে দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী খাতে পরিচালনা করতে শিখে। আমাদের শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, শিক্ষা মানুষকে স্রষ্টামুখী করে এবং সাথে সাথ জীবন ও জগৎকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী খাতে পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষানীতি আমাদের লাগবেই। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, আক্বীদা-বিশ্বাস, কোন ঐতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন্ ভিত্তির ওপর

www.icsbook.info

দাঁড় করাতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা কোন ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই? এ কথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stunly b ull-এর তথাই যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, তিনটি 'R' অর্থাৎ Religion, Writing এবং Arithmetic-এর সাথে যদি ৪র্থ 'R' অর্থাৎ Religion, যুক্ত না হয়, তাহলে আপনি কেবল ৫ম, 'R' অর্থাৎ Ruscal ই পাবেন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা Ruscal হতে বাধ্য। বিশ্বের সব ধর্মের লোকই এক স্রষ্টাকে জানে এবং মানে। তাই শিক্ষা অবশ্যি এক আল্লাহমুখী হতে হবে। তিনি এবং তাঁর বিধানই মানুষের সত্যিকারে কল্যাণ সাধন করতে পারে।

আমাদের প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার, একটি আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার। যে শিক্ষাব্যস্থা সব ইসলামী আদর্শের অনাবিল সংস্কৃতির বাহক। যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অন্তগর্ত আক্বীদা বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের মন মানসিকতাকে এক করে তুলবে। তাদের চিন্তাচেতনার গতিকে প্রবাহিত করবে অভিন্ন স্রোতে। যে শিক্ষাব্যবস্থা তাদের সৎ প্রবণতাকে লালন করবে, বিকশিত করবে এবং করবে দুর্জয়। আর তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন করবে, নিরুৎসাহিত। তাদের মনকে করবে উদার। যে শিক্ষাব্যবস্থা হবে তাদের জীবনবোধ উৎসারিত সংস্কৃতির বাহন এবং তাদেরকে তাদের জীবন লক্ষ্যকে করবে এক। তাদের পরিণত করবে একই চিন্তার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতিতে। মোট কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত দক্ষ জনসম্পদ তৈরির হাতিয়ার।

উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা

১. ভূমিকা

৬২২ ঈসায়ী সালে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা এখান থেকেই। মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন। রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম শিক্ষক। সাহাবায়ে কিরাম প্রথম ছাত্রসমাজ।

এখান থেকেই সম্মুখে অগ্রসর হয় উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষার ইতিহাস। অতঃপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হতে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরিরা পৃথিবীর লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানবতার দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র। সেখানেই প্রজ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো। এক নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রাণচাঞ্চল্য।

ইসলামের এই সুমহান সভ্যতা-সংস্কৃতির জোয়ারেই প্লাবিত হয়েছিলো তেত্রিশ কোটি

www.icsbook.info

দেবতার দেশ হিন্দুস্তান। ব্যাপকভাবে এসেছেন এখানে ইসলামের পতাকাবাহীরা। তাঁরা এসেছেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে। তাঁরা এসেছেন কখনও বীরের বেশে, কখনও দরবেশের বেশে। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে, গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে। ব্যক্তিগত ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজারো শিক্ষাকেন্দ্র। সেসব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য শাসক ও কর্মচারী, সৈনিক ও সেনাপতি, ফকীহ ও আলেমে দ্বীন এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। মোটকথা, একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার লোকই সে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তৈরি হয়েছিলো।

২. উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও শাসন

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে থাকেন। পরবর্তীকালে হাজারো মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এমনকি মুসলমান আবর ব্যবসায়ীরাও এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এদেশের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসনকালে (৭০৫ খ্রিঃ - ৭১৫ খ্রিঃ) সেনাপতি ইমাদ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে কাসেম সাকাফী সর্বপ্রথম (৭১২-১৩ খ্রিঃ ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অতৎপর গযনীর সুলতান সবুক্তগীন (৯৭৭-১০৩০ খ্রিঃ) পূর্ব দিকের সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত গযনীর ইসলামী রাজ্যকে বিস্তৃত করেন। এর পর বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা গোটা ভারতবর্ষ অধিকার করে নেন। এদেশে দিল্লিকেন্দ্রিক প্রথম স্বাধীন ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দীন আইবক (১২০৬-১০ খ্রিঃ)। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ শাসক ছিলেন মুগল বংশের সম্রাটগণ। তাঁদের শাসন যুগের শেষ দিকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজরা বাংলাদেশ দখল করে। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা রাজধানী দিল্লি দখল করে মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে তাদের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত করে। সর্বশেষ ইংরেজ বৃত্তিভোগী মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের (১৮৩৭-৫৮ খ্রিঃ) আমলে সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং বিপ্লবীগণ কর্তৃক-তাঁকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করায় ইংরেজরা তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে এবং তাঁর সন্তানদের দিল্লির রাজপথে গুলি করে হত্যা করে।

এদেশের ইংরেজদের হাতে এভাবে মুসলমানদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। গোটা মুসলিম ভারত করায়ত্ত করতে তাদের একশত বছর সময় লাগে।

www.icsbook.info

৩. উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

কয়েক শতাব্দীকালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সাধন করেন। ১৮৮২ সালে ইংরেজদের এক শিক্ষা-কমিশন রিপোর্টে বলা হয় :

"আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর তাঁরা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করে। ধর্মই তাঁদের শিক্ষার বুনিয়াদ হবার কারণে এসব শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াক্‌ফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বীনদার লোকেরা পারলৌকিক পূণ্য লাভের জন্য ওয়াক্‌ফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে যান। পাক-ভারতীয় মসজিদকেন্দ্রিক মাদরাসার এ অবস্থা ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত বলব থাকে।"

উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠার একটা চিত্র এ রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অবশ্য ইতিহাস গ্রন্থাবলি থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাসেম মাহমুদের শাসনামল থেকে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হয়।

প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম লিখেছেন :

"৫৮৯ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্তানে মুয়েযুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাম (শিহাবুদ্দীন ঘোরী নামে খ্যাত) কর্তৃক ইসলামী গুকুমাত কায়েম হয়। তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এ জ্ঞান প্রিয় বাদশা-ই সর্ব প্রথম দিল্লিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদরাসার নামকরণ হয়, 'মাদরাসায়ে মুয়েযীয়া'। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবক (১২০৬-১২ খ্রি :) আজমীরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসাকে 'আড়াই দিনের ঝুপড়ি' বলা হতো। তৃতীয় মাদরাসটি মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসীরুদ্দীন কুবাচন 'উচে' প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাযী মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানী (মৃত্যু ১২৬০ খ্রি:) সর্ব প্রথম উচ্চ মাদরাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে তিনি মাদরাসায়ে মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন।"

অতঃপর মুসলিম শাসক, আলেম, আমীর ও বিদ্যোৎসাহী দ্বীনদার লোকদের প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে মক্তব মাদরাসা তথা ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী:

"সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১ (খ্রি:) আমলে দিলিল্লতে এক হাজার মাদরাসা ছিলো। এর মধ্যে শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের একটা মাদরাসা ছিলো।

www.icsbook.info

শিক্ষকদের সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা হতো। মাদরাসাগুলোকে দ্বীনী শিক্ষার সাথে সাথে অংক এবং দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাও দেয়া হতো।"

রোহিলা খণ্ডের হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের (মৃত্যু ১৭৭৪ খ্রি:) জীবন-চরিত থেকে জানা যায় :

"দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ার পরও কেবলমাত্র রোহিলা খণ্ড জেলার বিভিন্ন মাদরাসায় পাঁচ হাজার আলেম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা নিয়মিত ভাতা পেতেন।'

এস, বসুর' এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় : 'ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার মকতব ছিল।" (ম্যাকস মুলারের শিক্ষা রিপোর্ট)

৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিলো

মুসলিম শাসনামলে এদেশে বিভিন্ন সময় নানা প্রকার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় মকতব ও মাদরাসা গড়ে ওঠে।

(১) কখনো ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কল্যাণধর্মী কাজ হিসেবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং খরচ বহনের জন্য মাদরাসার নামে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দিতেন। এ সম্পত্তি থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো। ছাত্রদের শিক্ষা ও জীবিকার যাবতীয় ব্যয় মাদরাসা থেকেই বহন করা হতো।

(২) অনেক সময় কোন আলেম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। তিনি নিজেই শিক্ষক নিয়োগ করতেন ছাত্রদের শিক্ষা ও খাবার ব্যয় নির্বাহ করতেন।

(৩) কখনো কোন ধনী ব্যক্তি নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতেন। ঐ শিক্ষককে কেন্দ্র করে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে বাড়তে মাদরাসার আকার ধারণ করতো। শিক্ষক নিয়োগকারী নিজেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।

(৪) কখনো আবার যোগ্য আলেমকে কেন্দ্র করে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তাঁর পাশে জড়ো হতো। লেখাপড়া চলতো মসজিদে। ছাত্ররা লজিং থাকতো এবং শিক্ষকগণ থাকতেন মসজিদের হুজরায়।

(৫) কোন কোন সময় শাসকগণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তারাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

এমনিভাবে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় অসংখ্য মকতব মাদারাসা গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের নজিরবিহীন আগ্রহের ফল।

৫. মাদরাসা গৃহ

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়েক শতাব্দী যাবৎ মসজিদই মুসলমানদের

www.icsbook.info

শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রথম স্বতন্ত্র গৃহ কখন এবং কোথায় নির্মিত হয়েছিলো সে ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা বড় মুশকিল। মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর 'তালিম ও তারবিয়াত' গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী এদেশে মুসলমানদের চার প্রকার শিক্ষা কেন্দ্র ছিল :

(১) মসজিদ

(২) মাদরাসা ও মকতবের স্বতন্ত্র গৃহ

(৩) কোন আমীর বা ধনী ব্যক্তির বসতবাটির অংশ বিশেষ এবং

(৪) কোন গাছে নিচে।

৬. মাদরাসার আসবাবপত্র

প্রফেসর সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সলীম তাঁর 'হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমান কা নিযামে তা'লিম ও তারিবয়াত গ্রন্থে' মুসলিম শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের আসবাবপত্র সম্পর্কে লিখেছেন–

"শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হতো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের। বালকদের সবার জন্য থাকতো চাটাইয়ের বিছানা; কিতাবপত্র রাখার জন্যে ভূমি থেকে অল্প উঁচু কাষ্ঠখণ্ড, শিক্ষকদের বসার জন্যে গদির আসন। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকাদি এবং সামান্য কাষ্ঠসামগ্রীর সমন্বয়ে গঠিত হতো গোটা প্রতিষ্ঠান। টেবিল চেয়ারতো সে সময় নবাবদের বাড়িতেও পাওয়া যেতো না। ইংরেজদের বিজয়ের পরই এ সবের প্রচলন শুরু হয়। অপ্রয়োজনীয় কোন আসবাবপত্র মাদরাসায় থাকতো না। অতিশয় মিতব্যয়িতা ও সাদাসিধেভাবে কর্ম সম্পাদন করা হতো। এ কারণে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা খুবই সহজ ছিল।"

৭. শিক্ষার কাঠামো

মুসলিম শাসনামলে এদেশে শিক্ষা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল না। পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়নেও সরকারের কোন হাত ছিল না। উলামায়ে কিরাম এবং শিক্ষকগণই ঠিক করতেন কী পড়াবেন। তাই সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোন শিক্ষা-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো না। তবে শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ একটি বুনিয়াদি কাঠামো গড়ে ওঠে।

(১) মকতব : এতে কোরআন পাঠ ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো।

(২) ফার্সি মাদরাসা : এতে ফার্সি ভাষা এবং এ ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করা হতো।

(৩) আরবি মাদরাসা : মূলত : আরবি মাদরাসাগুলোই ছিল উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র। এতে আরবি ভাষা ও দ্বীনি ইলমের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো।

www.icsbook.info

৮. ভর্তি

মকতব এবং ফার্সি মাদরাসাসমূহে ভর্তির ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম-নীতি পালন করা হতো না। যখনই কেউ লেখা-পড়া করতে আসতো তাকে পাঠে শরিক করে নেয়া হতো। আরবি মাদরাসাগুলোতে অবশ্য ভর্তির সময় ছিল শাওয়াল মাস। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এক মাস পরও ভর্তি করা হতো।

৯. ভর্তির বয়স

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে বয়সের কোন প্রশ্ন ওঠে না। যখনই কোন ব্যক্তির বোধোদয় হতো তখনই সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারতো। মাদরাসাগুলো তাকে সহযোগিতা করতো। বয়সের ভিত্তিতে কোন তারতম্য করা হতো না। কেউ কেউ অধিক বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতেন। সাধারণভাবে মাদরাসাগুলোতে বালকদের সাথে বয়স্কদের দেখা যেতো।

১০. শ্রেণীবিন্যাস

যে সকল মাদরাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণীবিন্যাস পন্থা ছিল না, শিক্ষার বছর দ্বারা গণনা না করে পাঠ্যপুস্তক দ্বারা করা হতো। বলা হতো এ ছাত্র অমুক অমুক কিতাব পড়েছে, বা অমুক অমুক কিতাব পড়া বাকি আছে। প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক সবক (পাঠ) দেয়া হতো। প্রত্যেকের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি রাখা হতো। কেউ কেউ দ্রুত কিতাব শেষ করতে পারতো। আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন একই কিতাব নিয়ে পড়ে থাকতো। সকল ছাত্র একত্রে বসে তাদের পাঠ মুখস্থ করতো।

১১. শিশু শিক্ষার সূচনাকাল

শিক্ষিত মুসলিম পরিবারসমূহে প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চলে আসছিলো যে, তাঁদের সন্তানরা যখন চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে উপনীত হতো, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শিক্ষাদান শুরু হতো। এ অনুষ্ঠানকে 'বিসমিল্লাহর অনুষ্ঠান' বলা হতো। এটা একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হতো। অভিভাবকগণ তাদের বন্ধু-বান্ধবদের এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতেন। তিনি 'রাব্বি ইয়াস্‌সির ওয়ালা তু'আসসির ওয়া তাম্‌মিমবিল খায়ির, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়িয়ে অতঃপর সূরা আলাকের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত এবং সূরা ফাতিহা পড়িয়ে দিতেন। শিশু এ পাঠ আওড়াতে থাকতো। উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হতো। অভিভাবকের সামর্থ্যানুযায়ী অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইনাম পেতেন।

১২. শিক্ষার সময়সূচি

মকতব ও মাদরাসাগুলোতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হয়ে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত তা অব্যাহতভাবে চলতো। অবশ্য আরবি মাদরাসগুলো আসর পর্যন্ত চলতো। মাঝখানে যোহরের নামায ও খাবার বিরতি হতো। কোন কোন শিক্ষক চূড়ান্ত

www.icsbook.info

পর্যায়ের ছাত্রদের এশা ও তাহাজ্জুদের পরও পড়াতেন। পড়ালেখার যাবতীয় কাজ মাদরাসাতেই সম্পন্ন করা হতো।

১৩. সাপ্তাহিক ছুটি

শুক্রবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বৃহস্পতিবারে অর্ধদিবস পর্যন্ত মাদরাসা খোলা থাকতো। এ সময়টাও মসজিদ বা মাদরাসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যয় হতো। কোন কোন আরবি মাদরাসার মঙ্গলবারে পাঠদান হতো। সেদিন ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের কপি তৈরি করতো। শিক্ষকগণ গ্রন্থ রচনার কাজ করতেন।

১৪. বার্ষিক ছুটি

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় সারা বছরই পড়ালোখা চলতো। ছুটি থাকতো খুবই কম। বার্ষিক ছুটি মোটামুটি নিম্নরূপ ছিল :

১. ঈদুল ফিতর	২ দিন
২. ঈদুল আযহা	৫ দিন
৩. মুহাররাম	৬ দিন (বাংলাদেশে)
৪. সফর মাসের শেষ বুধবার	১ দিন (বাংলাদেশে)
৫. শবে বরাত	১ দিন
মোট	১৫ দিন

১৫. খেলাধুলা

বর্তমান যুগের মত তখন খেলাধুলার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতো না। খেলাধুলায় সময় অপচয় করতে নিষেধ করা হতো। মাদরাসাগুলোতে খেলাধুলার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল না। অবশ্য কোথাও কোথাও ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে ব্যায়াম করতেন। কোথাও কোথাও যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ হতো। ইমাম গাযালী প্রমুখ শিশুদের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য মনে করতেন।

১৬. শাস্তি

শিষ্টাচার বা আদব শিক্ষাদানের জন্য সে যুগে শাস্তি বা দণ্ড প্রদানকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হতো। এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যাপারেও ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হতো। ভর্তির সময় অভিভাবগণ বলে যেতেন; 'হাড় আমাদের' শরীর আর চামড়া আপনাদের। কোনো কোনো শিক্ষক দণ্ডদানে বিশষভাবে খ্যাতিমান হয়ে উঠতেন। বেয়াড়া এবং পলাতক ছাত্রদের খুঁজে বের করে পেটাতে পেটাতে মাদরাসায় আনা হতো। শিক্ষাকে তখন কোন ঐচ্ছিক ব্যাপার মনে করা হতো না। বরং শিক্ষা ছিলো

www.icsbook.info

আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক। তাই লেখাপড়ায় ছাত্রদের সামান্যতম অলসতাও কঠোর দৃষ্টিতে দেখা হতো।

১৭. খাদ্য

মাদরাসায় খানা পাকানোর ব্যবস্থা ছিলে না। এলাকাবাসীরাই ছাত্রদের খাবারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতো অথবা মাদরাসায় এনে ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে একত্রে খাবার খেতোনা।

১৮. থাকা

স্থানীয় ছাত্রদের বলা হতো মুকিম। দূরাগত ছাত্রদের বলা হতো মুসাফির। মুসাফির ছাত্ররা মাদরাসা কক্ষে কিংবা মসজিদের হুজরায় থাকতো। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়তো। লজিং থাকার প্রথাও ছিলো।

১৯. শিক্ষা-সমাপন

মেধাবী ছাত্ররা ১৪-১৫ বছর বয়সেই ফার্সি ও আরবি মাদরাসার শিক্ষা-সমাপন করতো। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী পনের বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করেন। যাদের মেধা-শক্তি কম ছিলো, শিক্ষা সমাপন করতে তাদের আরো কয়েক বছর বেশি সময় লাগতো।

২০. সমাবর্তন (Convocation)

সকল ফার্সি মাদরাসা শিক্ষা সমাপনী ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। এতে বড় বড় আলমদের দাওয়াত দেয়া হতো। সেদিনে 'ফাতেহা' পাঠ করে শিক্ষা-সমাপনকারী ছাত্রদের জন্য দোয়া করা হতো। অতঃপর কোন একজন বুযুর্গ তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করতেন। এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে 'ফাতেহা' ফেরাগ' বলা হতো।

২১. উপাধি

সে আমলে ফার্সি মাদরাসা সমাপনকারীকে 'মুন্সি' এবং আরবি মাদরাসা সমাপনকারীকে 'আলেম' খেতাব দেয়া হতো। মুগল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম হাসিলকারীকে 'দানিশ মন্দ' বলা হতো। মাওলানা গোলাম আলী আযাদের (মৃত্যু ১৭৮৫ খ্রিঃ) যামানায় দানিশ মন্দের পরিবর্তে 'মৌলভী' খেতাব চালু হয়। ফার্সি মাদরাসা থেকে পাস করার পর ছাত্ররা সরকারি চাকরির উপযুক্ত বিবেচিত হতো।

২২. শিক্ষক

ফার্সি মাদরাসা শিক্ষকদের 'মিয়াজী' 'আখন্দজী' কিংবা 'মোল্লাজী' বলা হতো। আরবি মাদরাসা শিক্ষকদের বলা হতো 'মৌলভী' কিংবা মোল্লা সাহেব।

www.icsbook.info

২৩. সর্দার পড়ুয়া (Monitor)

মুসলিম শাসনামলে নামকরা আলেমদের শিক্ষাকেন্দ্রে এ প্রথা ছিলো যে, তাঁরা কোনো উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রকে 'সর্দার পড়ুয়া নিয়োগ' করতেন। উস্তাদ যা পড়িয়ে যেতেন সে তার পুনরালোচনা ও ব্যাখ্যা করতো। এরূপ ছাত্রকে 'মুয়িদ' বা 'মন্সবদার' বলা হতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বোম্বাইতে নিযুক্ত Dr. Andrew Bell নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী 'সর্দার পড়ুয়া' সংক্রান্ত এ প্রথা খুবই পছন্দ হয়। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে 'Monitor' নাম দিয়ে 'সর্দার পড়ুয়া' সংক্রান্ত এ প্রথা সেখানে চালু করেন। সেখান থেকে পুনরায় এদেশের আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে সে প্রথা আমদানি হয়।

২৪. পাঠ্যবিষয়

আগেই বলেছি, শিক্ষা বিভাগ বলে সরকারের তখন কোন বিভাগ ছিলো না। শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষার বিষয় প্রণয়নে সরকারের কোন হাত ছিলো না। বড় বড় আলেম ও শিক্ষকগণই এ দায়িত্ব পালন করতেন। শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারি হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা বরং বহু শাসক ও সুলতানদের প্রশাসনেই আলেমদের বিরাট প্রভাব ছিলো। সেকালে কোন বোর্ডের অধীনে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হতো না। সারাদেশে আলেমরা এক জায়গায় বসে শিক্ষা-নীতি, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্য-তালিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করতেন না। তবে সকলেই একটি দ্বীন ও আদর্শের অনুসারী হবার কারণে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার একটা বুনিয়াদি কাঠামো গড়ে ওঠে। পাঠ্য বিষয় ও পাঠ-তালিকার ক্ষেত্রেও একটা সমন্বিত রূপ পরিলক্ষিত হয়।

২৫. পাঠ্য-তালিকা : মকতব

(১) সর্বপ্রথম 'কায়দায়ে বাগদাদি' পড়ানো হতো।

(২) অতঃপর কোরআন শরীফের ৩০তম পারা (আমপারা) পড়ানো হতো।

(৩) আমপারা শেষ হবার পর গোটা কোরআন মজিদ খতম করানো হতো। কোরআন মজিদ খতন করার আগে অন্য কোন কিতাব পড়ানো হতো না।

(৪) কোরআন মজিদ খতমের পর 'কালিমা' প্রভৃতি চরিত্র গঠন মূলক ফার্সি বই পড়ানো হতো।

(৫) অযু এবং নামায শিখানো হতো। সকর ছাত্রকেই (আসর) নামাযের জামায়াতে শরিক হতে হতো।

২৬. শিক্ষাদান-পদ্ধতি : মকতব

(১) শিক্ষক-ছাত্র সকলেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে পাঠ আরম্ভ করতেন।

(২) ছাত্ররা বিছানায় উস্তাদের সম্মুখে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসতো।

www.icsbook.info

(৩) ছাত্রদের প্রথমে বিগত পাঠ শুনাতে হতো। তা' শুনাতে পারলেই নতুন সবক (পাঠ) দেয়া হতো।

(৪) বৃহস্পতিবারে নতুন করে সবক দেয়া হতো না। সেদিন বিগত সাতদিনের পড়া শিক্ষক শুনতেন।

শিশুরা সাধারণত : সাত-আট বছর বয়সেই কোরআন পড়ে শেষ করতো। পূর্ণ কোরআন খতম করার পূর্বে কোন ছাত্রই অন্য কোন শিক্ষা আরম্ভ করতে পারতো না।

২৭. পাঠ্য বিষয় : ফার্সি মাদরাসা

সুলতান মাহমুদ গযনভীর শাসনকাল থেকে নিয়ে কোম্পানির শাসনকাল পর্যন্ত (১০৩০-১৮৩৫ খ্রিঃ) ফার্সি ছিলো এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। সে জন্য এদেশে ব্যাপক হারে ফার্সি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাদরাসায় হিন্দু ছাত্ররাও পড়তো। ফার্সি ভাষা ছাড়াও জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাও দেয়া হতো। এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বিষয় ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপ :

(১) ফিকাহ

(২) আখলাক : এতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও অন্তর্ভুক্ত হতো। যেমনঃ নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি।

(৩) ইতিহাস : ইতিহাসের সাথে কিস্‌সা-কাহিনীও পড়ানো হতো।

(৪) ভাষা ও সাহিত্য : এতে ফার্সি গদ্য ও পদ্য পড়ানো হতো।

(৫) পত্র : এর দ্বারা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত-দস্তাবেজ ইত্যাদি লেখা শিখানো হতো।

(৬) গণিত : এতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও হিসাব শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞান দান করা হতো।

(৭) খোশ নবিশি (সুলেখা)

ফার্সি মাদরাসায় শিক্ষার মেয়াদ কত বছর ছিলো তা বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না। নবাব মিরযা দাগের (১২৪৭-১৩২৫ হিঃ) একটা পত্র থেকে জানা যায়, তিনি তিন বছরে ফার্সি মাদরাসার পড়া লেখা শেষ করেন।

২৮. শিক্ষাদান পদ্ধতি : ফার্সি মাদরাসা

(১) কোরআন মজীদ খতম হবার পর পরই ফার্সি ভাষা শিক্ষাদান শুরু হতো।

(২) মুখস্থ করার প্রতি জোর দেয়া হতো।

(৩) ছাত্ররা শুনে এবং পড়ে পাঠ মুখস্থ করতো।

(৪) প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথকভাবে পাঠদান করা হতো। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।

www.icsbook.info

(৫) তৃতীয় প্রহর সুলেখা এবং অংকের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো।

(৬) সাধারণত বুধবারে নতুন কিতাবের সবক দেয়া হতো।

২৯. পাঠ্য বিষয় : আরবি মাদরাসা

মুসলিম শাসনামলে এদেশে আরবি মাদরাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরবি ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হতো। যারা এসব মাদরাসার শিক্ষা শেষ করতো তাদের আলেম বলা হতো। আরবি মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যগ্রন্থ নির্বাচনে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানদানের উপযুক্ত গ্রন্থাবলি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হতো। শেষ পর্যায়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হতো। পাঠ্য গ্রন্থাবলি পরিবর্তন করা হতো খুব কমই। মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন সময় মাদরাসাগুলোতে মোটামুটি নিম্নরূপ পাঠ্য বিষয় চালু ছিলো :

(১) ইলমে ছরফ

(২) ইলমে নাফ

(৩) উসুলে ফিকাহ

(৪) ফিকাহ

(৫) তাফসির

(৬) হাদীস

(৭) ইলমে কালাম

(৮) মানতিক, ফালসাফা (দর্শনশাস্ত্র)

(৯) তাসাওফ

(১০) আরবি সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য)

৩০. শিক্ষাদান পদ্ধতি : আরবি মাদরাসা

পাঠ্য গ্রন্থাবলির গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে সেগুলোকে তিনভাবে ভাগ করে পড়ানো হতো।

(১) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি : এ পর্যায়ে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বুঝাতেন। এ পদ্ধতি আধুনিক কালের Lecture Method এর অনুরূপ।

(২) মধ্যম পদ্ধতি : এ পর্যায়ে ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতিও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো। সন্দেহ-সংশয়ের নিরসন করা হতো এবং সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো। এটা ছিলো সূক্ষ্ম (Intensive) অধ্যয়ন পদ্ধতি।

www.icsbook.info

(৩) ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি : এ পর্যায়ে উপরোক্ত দু'প্রকারের আলোচনা ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা করা হতো। এটা ছিল ব্যাপক (Extensive) অধ্যয়ন পদ্ধতি।

৩১. দারসে নিযামী মাদরাসা

মোল্লা কুতুবদ্দীন নামে একজন বিখ্যাত আলেম মাদরাসা সমূহের তৎকালীন সিলেবাস সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটা নতুন সিলেবাস তৈরি করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন (মৃত্যু ১৭৪৭ খ্রি:) পিতার পদ্ধতিতে আরো অধিক চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যেক বিষয়ে দু'দুটি কিতাব নির্বাচন করে নতুন সিলেবাস চালু করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী এ সিলেবাসের মাদরাসাগুলো দারসে নিযামী মাদরাসা নামে অভিহিত ছিলো।

৩২. নারী-শিক্ষা

মুসলিম শাসনামলে নারী শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো। মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যাসন্তানদের পড়ালেখা করাতেন। মেয়েরা ব্যাপকভাবে মকতবে কোরআন শিক্ষা করতো। দিল্লির এক সময়ের একজন শাসক ছিলেন একজন নারী, সুলতানা রাজিয়া। তিনি ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। তিনি কয়েকটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতা (১৩০৩-১৩৭৭ খ্রি:) তাঁর ঐতিহাসিক সফরে এদেশে তিনটি মহিলা মাদরাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীর মহলে দশ হাজার মহিলা ছিলো। মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে হাজার হাজার হাফেজা, ক্বারিয়া, দ্বীনের আলেমা ও শিক্ষিকা ছিলেন।

মুসলিম আমলে শিক্ষার দিক থেকে এদেশের নারীদের খুবই খ্যাতি ছিলো।

৩৩. চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা

মুসলিম আমলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা ছিলো বলে জানা যায় না। তবে এসব বিদ্যায় বহু দক্ষ মুসলমানের নাম জানা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, হয়তোবা কোন কোন মাদরাসায় এসব বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো। এসব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম আমলের ব্যাপক স্থাপত্য-নিদর্শন থেকে বুঝা যায় যে, তখন সুদক্ষ কারিগর তৈরি হতো।

৩৪. উপসংহার

মুসলিম শাসনামলে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো, যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা এতক্ষণ আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, যে শিক্ষাব্যবস্থা শত শত বছর ধরে এদেশে প্রচলিত ছিলো, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো সৃষ্টিকর্তার একত্ব এবং আখিরাত স্রষ্টার সম্মুখে জবাবদিহির সুদৃঢ় বিশ্বাসের ওপর। এ বিশ্বাসই মুসলমানদের

www.icsbook.info

মন-মগজকে যাবতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ মানুষ তৈরির কারখানা। গোটা ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার জন্যে সর্ব প্রকার দক্ষ মানুষ এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই তৈরি হতো। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন :

"আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীই ছিলেন না বরং জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি ও মেধাগত দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। .... তাঁদের হাতে ছিলো এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যাকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখা যায় না। এতে ছিলো উন্নত নৈতিক ও মাসনিক প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা।"

মাওলানা মওদূদী (র.) মুসলিম শাসনামলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এক পর্যালোচনায় বলেন :

"তখন আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো, তা সে সময়ের দাবি ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলো। এ ব্যবস্থায় এমন সকল বিষয়ই পড়ানো হতো, যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন ছিলো। তাতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতো না, বরং সে শিক্ষাব্যবস্থা দর্শন, মানতিক, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার প্রেক্ষিতে আমারা গোলামে পরিণত হলাম, তখন এ গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে।"

গ্রন্থপঞ্জি

(১) হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুঁকা নিযামে তা'লিম ও তারবিয়াত : প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম।

(২) তা'লিমাত : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

(৩) তারীখে মাদরাসা-ই-আলীয়াঃ আবদুস সাত্তার খান।

(৪) তা'লীম ও তারবিয়াতঃ মানাযির আহসান গিলানী।

(৫) History of the rise of the Mohamedan power in India : Mohammed Kasim Ferishta, Translated in english by John Briggs.

(৬) Our Indian Muslams : William Hunter.

(৭) History of Education in India : Noorullah & Niak.

(৮) British policy & Muslim Bengal : A. R Mullick.

(৯) ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানুঁকে উরূজ ও যাওয়াল কা আসারঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদবভী।

www.icsbook.info

(১০) হিন্দুস্থান মে ইসলাম কি পহেলি তাহরিক; মাওলানা মাসউদ আলম নদভী।

(১১) মাধ্যমিক ইতিহাস : মুহাম্মদ ইসহাক: বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড : ঢাকা।

(১২) বাংলাদেশে ইসলাম : আবদুল মান্নান তালিব।

(১৩) বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা : মোহাম্মদ আজিজুল হক।

(১৪) আল কুরআন।

(১৫) সাইয়্যেদ আবল আ'লা মওদূদী : তাফহীমূল কুরআন। আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা।

(১৬) সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী।

(১৭) মিশকাতুল মাসাবীহ।

(১৮) Miltion Cowan : A dictionary of Modern Written Arabic, Macdonald & Evans Ltd. London, Third Printing 1974.

(১৯) শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, ড.শশীভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচর্য: সংসদ বাঙ্গালা অভিধান।

(২০) অশোক মুখোপাধ্যায় : সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৮ কলিকাতা।

(২১) গাজী শামছুর রহমান : শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য। শিশু একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪।

(২২) প্লেটো : রিপাবলিক। সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত।

(২৩) ড. খুরশীদ আহমদ: নেযামে তা'লীমে। আই পি ইসলামাবাদ।

(২৩) মুসলিম সাজ্জাদ: ইসলামী রিসালাত মে নেযামে তা'লীম। আই পি এস ইসলামাবাদ।

(২৫) মুহাম্মদ আবুল কুদ্দুস : শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা।

(২৬) প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম: ইসলাম কা নেযামে তা'লীম। লাহোর ১৯৯৩।

(২৭) Report of the commission on National Education, Government of Pakistan (Sharif Commission Report) 1959.

(২৮) বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট) ১৯৭৪।

(২৯) বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজউদ্দিন আহমদ কমিশন রিপোর্ট) ১৯৮৮।

(৩০) প্রতিবেদন : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ (শামসুল হক কমিটি)।

www.icsbook.info

(৩১) জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৩ প্রতিবেদন।

(৩২) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা : আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত: সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৭।

(৩৩) আফজাল হোসাইন : তা'লীম ও তারবীয়াত, মাকতবা ইসলামী, নতুন দিল্লি।

(৩৪) আবদুস সাত্তার : আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০।

(৩৫) মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম : প্রাথমিক শিক্ষা, বাংলা একাডেমী।

(৩৬) সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম : হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা নিযামে তা'লীম।

(৩৭) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তা'লীমাত।

(৩৮) William Hunter : Our Indian Musalmans.

(৩৯) A. R. Mullik : British Policy & Muslim Bengal.

লেখক : পরিচালক, মাওলানা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি

www.icsbook.info

আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন আদর্শিক ভিত্তি ও জাতীয় মূল্যবোধ

আব্দুল মান্নান তালিব

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। কিন্তু শুধু কি মেরুদণ্ড? মেরুদণ্ড মানুষকে দাঁড় করিয়ে রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষাও জাতিকে দাঁড় করিয়ে রাখে। এই সঙ্গে তাকে জীবনীশক্তি সরবরাহ করে। তার জীবনের সমস্ত কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাকে পথের দিশা দেয়। কাজেই এই অর্থে শিক্ষাকে জাতির প্রাণশক্তি বলা যায়।

জাতি ও মুসলমানদের জাতীয়তা : এ প্রসঙ্গে জাতির চেহারাও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। জাতি বলতে আমরা কী বুঝি? শুধু কি এক ভূখণ্ডে যারা বাস করে তারা এক জাতি? অথবা এক ভাষায় কথা বলে একই বর্ণ ও গোত্রের সাথে সংযুক্ত যারা তারা এক জাতি? এগুলো সবই একটা জাতির উপাদান সরবরাহ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উপাদানগুলো এমন নয় যা একটা জাতিকে চিরকাল জীবনশক্তি সরবরাহ করে যেতে থাকবে। একই ভূখণ্ডে বাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই বর্ণের অধিকারী হয়েও আদর্শিক কারণে জাতির একজন সদস্য নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে পারে। মানসিক দিক দিয়ে ভূখণ্ডগত এবং ভাষা ও বর্ণগত বিষয়কে সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে। একথা অবশ্যই মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে তার বাইর জগৎকে। কাজেই জাতি গঠনের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে আদর্শ ও মতবাদ যার ভিত্তিতে তার সমগ্র জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলমানের জাতীয়তা ও প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। জাতীয়তা বিষয়ে যখন মুসলমানদের প্রশংসা আসে তার আদর্শ, মতবাদ ও ধর্ম তথা ইসলাম যা তার কেবল মনোজগৎ নয়, তার সমগ্র জীবন ও জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড

www.icsbook.info

নিয়ন্ত্রণ করে সবার ওপরে স্থান লাভ করে এবং তার স্থায়ী ভূখণ্ড, ভাষা বর্ণগত জাতীয়তা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত বা পরিপূরক হয়ে যায়। কারণ ইসলামের সাথে মুসলমানদের অস্তিত্ব জড়িত, ভূখণ্ড ভাষা বর্ণ গোত্রের সাথে নয়। মুসলমান যদি ইসলামের অনুসারী না হয়, যদি অন্য কোনো মতবাদের অনুসরণ করে অথবা আংশিকভাবে ইসলামকে মেনে চলে অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত করে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করার সময় সেক্যুলার গণতন্ত্র বা অন্য কোন চরম ধর্মবৈরী মতবাদের রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী অর্থনীতি গড়ে তোলার সময় ইসলামের ভারসাম্য পূর্ণ ন্যায়বাদী নীতিকে পুরোপুরি পুঁজিবাদ বা অন্য কোনো হালকা সমাজতান্ত্রিক ও জন কল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ করে, তাহলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তখন সে হয় নিছক স্থানীয় ও সংকীর্ণ জাতীয়তার সাথে জড়িত একজন মানুষ। কাজেই মুসলমানকে যদি মুসলমান হিসাবে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে তার আদর্শ, ধর্ম ও ইসলামকে পুরোপুরি গুরুত্ব দিতে হবে।

আদর্শ ও নীতিহীনতা : আমাদের এই স্বাধীন দেশটিতে স্বাধীনতার তিরিশ বছরেও কোনো সুস্পষ্ট শিক্ষা নীতি গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ সরকারি পর্যায়ে জাতি গঠনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দুশ' সোয়া দুশ' বছর আগে বৃটিশ শাসনামলে এখানে একটা শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছিল–উদ্দেশ্য ছিল তাঁর শাসক জাতির শাসন কাজে সহায়তা করা, যারা বাহ্যিক চেহারা সুরাতে হবে ভারতীয় কিন্তু মন মর্জি ইংরেজদের। আমরা বলতে পারি এই ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সামনে একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এবং তাতে তারা শতকরা একশ ভাগ সফলকাম হয়েছিলো। এই শিক্ষাব্যবস্থার বাড়তি লাভ হচ্ছে এই যে, তাদের তৈরি করা মানসিক ইংরেজদের হাতেই তারা দেশের শাসনভার স্থানান্তর করতে পেরেছে। এ শাসকদের অবহেলা ও অনিচ্ছাই মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতার তিন দশক পরও বাংলাদেশের বারো কোটি দেশের সামগ্র জনসমাজ পঙ্গত্বের শিকার হয়েছে। বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার হীনতম লক্ষ্য জাতীয় মানসে সে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার ফলে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর ব্যাপারে সাধারণ গণমানুষের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে না।

শিক্ষা কাকে এবং কেন?

শিক্ষার ক্ষেত্রে এখানে সেই আসল প্রশ্নই এসে যায়। অর্থাৎ শিক্ষা কাকে দেয়া হবে? কেন দেয়া হবে? সকল শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে এ দুইটি হচ্ছে মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন দুটির সঠিক জবাবই একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা দেয়া হবে বাংলাদেশের গণমানুষকে। এদেশের শতকরা পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ মুসলমান এবং দশ থেকে পনের ভাগ অমুসলমান। শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এই মুসলমানদের জন্য এবং অমুসলমানদের জন্যও। তবে এই শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা যাবে না যাতে তা অমুসলমানদের উপযোগী হয় কিন্তু মুসলমানদের জন্য হয়ে অনুপযোগী। শিক্ষা

www.icsbook.info

ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমান ও অমুসলমানকে একাকার করা যাবে না। কারণ এটা একটা জাতি গঠনের প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্ন যেখানেই অমুসলমানের প্রাধান্য চলে এসেছে এবং মুসলমানকে কোণঠাসা করে ধীরে ধীরে অমুসলমানের অধীন করা হয়েছে। এ উপমহাদেশে বাদশাহ আকবরের দীন ইলাহী এর একটা বড় প্রমাণ। আকবর দীন ইলাহীর মাধ্যমে যে সর্বজনীন ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে ইসলামকে পুরোপুরি কোণঠাসা, বিকৃত ও বিলীন করা হয় কিন্তু অন্যদিকে অনৈসলামিক ইসলাম বিরোধ ও শের্কীয় ভাবধারার সবকিছুই যথাযথভাবে সংস্থাপিত হয়। দুনিয়ার মতবাদ হচ্ছে দুটি। ইসলাম ও কুফর। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলা এবং কুফর আল্লাহকে মানে না। আল্লাহর ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা যেমন কুফরী তেমন আল্লাহর হুকুম কিছু মানা না মানাও প্রায় সমান ফলাফল উৎপাদন করে। যেমন সূরা বাকারার ৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা কি কিতাবের [আল কুরআন] কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইসলাম কুফরের কোনো প্রকার আবেশ বা আমেজ অস্বীকার করে। বরং কুরআনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে– 'হে মুমিনরা-ইসলামে প্রবেশ করো সম্পূর্ণরূপে। [বাকারা : ২০৮] সূরা আল ইমরানের ১৯ আয়াত এর চাইতেও আরো এগিয়ে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা।' অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্যকোনো জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। আল ইমরানের ৯৫ আয়াতে এ কথাটিই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ হিসাব ইসলাম ছাড়া বাকি সবই কুফর। কাজেই ইসলাম তার নিজস্ব পথে চলবে এবং কুফর চলবে তার নিজের তৈরি করা পথে। কুফরের পথে ইসলামকে চালানো নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক রীতি ও ইসলামী বিধানের পরিপন্থী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, একই দেশে দু'রকম ব্যবস্থা গড়া কি উচিত এবং সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবটি আসলে শিক্ষাব্যবস্থা কেন? এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যে খুঁজলে মনে হয় সঠিক হবে। কারণ মুসলমানকে তো কোনোক্রমেই কুফরির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবে কুফর যারা চায়, যারা আল্লাহর অনুগত থাকতে চায় না তাদের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামোর মধ্যে সম্ভব কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়। এবার আমরা আসতে পারি দ্বিতীয় প্রশ্নে অর্থাৎ কেন শিক্ষা দেয়া হবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য দুটি। এক ব্যক্তি ও ব্যক্তির আত্মিক পরিগঠন ও উন্নয়ন। দুই জাগতিক ও বৈষয়িক যোগ্যতা সৃষ্টি ও তার বিকাশ।

শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য : প্রথম উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে বলা যায়, শিশু তার জন্মের পর থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা লাভ করতে থাকে। সৃষ্টি সূচনা থেকেই আল্লাহ তার মধ্যে এই যোগ্যতা ও চাহিদা তৈরি করে দিয়েছেন। তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সেইভাবে সংবেদনশীল করা হয়েছে। সে চোখ দিয়ে দেখে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে তা অনুভব ও বিচার

www.icsbook.info

করে। কান দিয়ে শোনে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে। তা দিয়ে স্পর্শ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে জানিয়ে দেয়। মুখ দিয়ে সে কথা বলে। তার মস্তিস্ক তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সময় এগিয়ে চলার সাথে সাথে এবং তার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। এভাবে ধীরে ধীরে তার শিক্ষার পরিবেশ ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভের এ পর্যায়ে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

এই সঙ্গে শুরু হয় বাইরে থেকে পরিকল্পিতভাবে তাকে শিক্ষিত করে তোলার পর্ব। এই পর্বে বাপ-মা-ভাই বোন-আত্মীয়-স্বজন সবাই শামিল হন। একই সাথে পরিকল্পিত শিক্ষার সবচেয়ে বড় আয়োজন বিষয়গুলো যদি শিশুর ইতঃপূর্বেকার প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে তার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। কারণ নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কালু মাওলুদিন ইউলাদু আল্লাহ ফিতরাতিল ইসলাম ফা আবওয়াইহ ইউহাইবিদানাহ ওয়া ইউমাজ জিসারনাহু ওয়া উইউনাসইসরহ।’ অর্থাৎ প্রত্যেক নবজাতক আল্লাহর সৃষ্টি ইসলামি প্রকৃতির ওপর জন্মলাভ করে, তারপর তার বাপ-মা তাকে ইহুদি, অগ্নিপূজারী ও খ্রিষ্টান বানায়। অর্থাৎ তার মধ্যে আল্লাহ সৃষ্ট যে ইসলামি প্রকৃতি থাকে তার বাপ মা সে অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিলে সে হয় মুসলিম। আর তার বাইরে শিক্ষা দিলে তারা তাকে আল্লাহ বৈরী অমুসলিমে পরিণত করে। এভাবে বাইরে শিক্ষা তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পরিবেশে। পরিবেশও বিপর্যস্ত হয়। ধীরে ধীরে ভারাক্রান্ত হয় এলাকা, দেশ ও পৃথিবী। এতবড় বিপর্যয় থেকে নিজের এলাকা, দেশ ও সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানের। মুসলমানকে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা তার অভ্যন্তরের প্রাকৃতিক শক্তি ও সামর্থ্যগুলোকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করবে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা তাকে একজন প্রকৃত মানুষ ও আল্লাহর বান্দায় পরিণত করবে। এমন একজন মানুষ যে হবে মানবতার সকল গুণে গুণান্বিত, যার মধ্যে মানবিক সততা, সৎ বৃত্তি ও নৈতিকতা চরম বিকাশ লাভ করবে এবং অসৎবৃত্তি ও নীতিহীনতা যার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। যে হবে মানবতার বন্ধু, তার শত্রু নয়। পৃথিবীকে ও পৃথিবীর মানুষকে যে নিজের স্বার্থ ও উন্নয়নের হাতিয়ার মনে করবে না বরং সবার উন্নয়ন ও স্বার্থ অর্জনের সহায়ক হবে।

এভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তি মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক চাহিদাকে সমগ্র সৃষ্টির ও বিশ্ব প্রাকৃতিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে। যার ফলে একজন মানুষ হয় সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণকর। মানুষের সমাজে বিপর্যয়ের সমগ্র পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে না যার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিনাশ হবে এবং একজন মানুষ তার কিছু বা সমস্ত মানবিক গুণাবলি বিসর্জন দিয়ে আংশিক বা পূর্ণ অমানুষে পরিণত হবে। এভাবে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ যে প্রাকৃতিক গুণাবলি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে।

www.icsbook.info

শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার প্রথম লক্ষ্যার্জনের সাথে সাথে তার মধ্যে জাগতিক ও বৈষয়িক যোগ্যতা সৃষ্টি এবং তাকে বিকশিত ও লালন করাই হচ্ছে শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

এ পৃথিবীতে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় আসেনি। কিন্তু এখানে তাকে নিজের প্রচেষ্টায় বেঁচে থাকতে হবে। তাকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। পৃথিবীতে তাকে নিজের রিযিক সংগ্রহ করতে হবে। এ রিযিক আল্লাহ তার জন্য তৈরি করে রেখেছেন। **আল্লাহ বলেন 'পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলেরই রিযিক বা জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।'** [হুদ ঃ ৬]-এ রিযিক বা জীবিকা কী? জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই রিযিকও জীবিকা। তা কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং সব ধরনের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন। মানুষকে তা সংগ্রহ করে নিতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষ জানতে পারে আসলে তার কী প্রয়োজন, কতটুকু প্রয়োজন এবং কিভাবে তা অর্জন করতে হবে। তারপর কিভাবে তাকে ব্যবহার করতে হবে এটাও এর সাথে জড়িত। কারণ অর্জন করা হয় ব্যবহার করার জন্য। তাছাড়া এটা হচ্ছে দুনিয়ার একটা সম্পদ আর এ দুনিয়ার এই সম্পদকে কুরআন মাতা বলা হয়েছে। মাতা অর্থ হচ্ছে ভাগ্য সম্পদ যার পরিমাণ অতি সামান্য। অর্থাৎ এ সম্পদ তৈরি করা হয়েছে মানুষের ভোগ করার জন্য।

সম্পদ যেমন নানা প্রকার তেমনি, যোগ্যতাও নানা পর্যায়ের। এই বিভিন্ন মুখ্য যোগ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ হবে শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমদের বিভেদ দেখা দেবে না। এই যোগ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের ধারাও এগিয়ে চলবে আত্মীয় উন্নয়নের পথে। অর্থাৎ একজন একজন আদর্শ মানুষ এবং আল্লাহ একজন অনুগত বান্দা তার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ব্যবহার করে পৃথিবীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষ জানবে কোন সম্পদটি তার প্রয়োজন এবং কোনটির প্রয়োজন নেই? কোন পরিমাণ জানলে সম্পদের অপচয় ও বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা কমে যায়। আর কেন প্রয়োজন একথা জানতে পারলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়। অযথা ব্যবহার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন মানুষসহ পৃথিবীর জীবনী শক্তির অধিকার সমস্ত প্রাণীর রিযিক ও জীবিকার। অর্থাৎ সবার রিযিক লাভের ব্যবস্থাপনা তিনি তৈরি করেছেন। সেই অনুযায়ী বুদ্ধি বিবেচনা শক্তির অধিকারী মানুষ ও জিন ছাড়া সমস্ত প্রজাতি রিযিক লাভ করছে। মানুষকে এই পদ্ধতি জেনে নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা এই পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করবে। এর ফলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার সাথে মানুষের ব্যবস্থাপনা সামঞ্জস্যশীল হবে এবং বিশ্বে ও মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না। শিক্ষাব্যবস্থার এটি একটি মহৎ লক্ষ্য।

www.icsbook.info

শিক্ষানীতি প্রণয়নে ইসলামী আদর্শ অপরিহার্য

আমাদের এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে স্বাধীনতার তিন দশক পরও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইংরেজের গোলামির তকমা গলায় পরে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা কতটা লজ্জাজনক তা দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করবেন। একটি অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু স্বার্থে একটি সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার বোঝা মাথায় নিয়ে জাতিগতভাবে নীতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা। আসলে আমরা নিজেদের মুসলিম জাতিসত্তার কোনো যৌক্তিক ভিত্তিই থাকবে না। বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তার সাথে আমাদের মুসলমানিত্ব জড়িত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন হিন্দুস্তানের স্বাধীন সত্তার সাথে প্রত্যেকটি হিন্দুস্তানি হিন্দুতার হিন্দুত্বকে জড়িত করেছে। হিন্দুত্বকে বাদ দিয়ে তারা কেবলমাত্র বাঙ্গালি, বিহারী, মারাঠী, রাজপুতানী ইত্যাদি হিসাবে হিন্দুস্তানি থাকতে রাজি নয়। তেমনি আমরা বাংলাদেশের মুসলমানের মুসলমান হিসেবেই বাংলাদেশী। আর যেখানে আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনাকে আড়াল ও উপেক্ষা করা জাতি হিসেবে আমাদের মৃত্যুর চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজেই আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ইসলামী আদর্শ ভাবধারা, মূল্যবোধকে ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জাতিগতভাবে আমাদের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবপর হবে। কারণ বাংলাদেশের কোনো একজন মুসলমানও তার মুসলমানিত্ব বাদ দিয়ে জীবিত থাকতে রাজি হবে না। এক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে তার ওপর সেক্যুলার বা ধর্মহীনতাবাদ আরোপ করে কোনো লাভ হবে না কেবল তাকে পিছিয়ে দেয়া ছাড়া। আর ইসলমী আদর্শ ও মূল্যবোধ আমাদের শিক্ষাকে পিছিয়ে দেবে না। বরং বিশ্বের অন্যান্য সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় অনেক এগিয়ে দেবে। কারণ এর মধ্যে জাগতিক যাবতীয় উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতিকে ধারণ করার যেমন ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে তেমনি নিজস্বভাবে এর অগ্রগতির নিজস্ব যোগ্যতা আছে যা অন্যদের নেই।

লেখক : সাহিত্যিক, অনুবাদক, পরিচালক-বাংলা সাহিত্য পরিষদ।

www.icsbook.info

ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ড. এম. এ. সালেহ

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব। মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করে মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করার কথা ব্যক্ত করে মহান আল্লাহ বললেন, ('হে রাসূল) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদেরকে (পরামর্শচ্ছলে) বললেন : আমি অবশ্যই জমিনে আমার প্রতিনিধি তৈরি করতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা উত্তরে বললেন : আপনি সেখানে কি এমন কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠাতে চাচ্ছেন, যে সেখানে কেবল ফেতনা ফাসাদ আর খুনাখুনিই করবে। আমরাইতো আপনার প্রশংসার সাথে গুণকীর্তন করছি আর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি (প্রভু) তাদের জবাবে বললেন : নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' (আল কোরআন ২: ৩০-৩১)

মানুষের সৃষ্টি ও তার মর্যাদা সম্বন্ধে যে খবর মহান আল্লাহর এই বাণী হতে প্রকাশিত হয়েছে সেই বিষয়ে একটু চিন্তা করা আবশ্যক। উপরোক্ত আয়াতে লক্ষ্য করা যায় যে, মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষ না বলে তাঁর 'প্রতিনিধি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রতিনিধি শব্দটির মর্মার্থ বহুমাত্রিক এবং এর তাৎপর্য অসীম। মানুষকে প্রতিনিধি বানিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যেমন মর্যাদার চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি তার ওপর অর্পণ করেছেন অপরিসীম দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব নেহাত মানুষের খেয়াল খুশি অনুসারে সম্পাদন করা যাবে না। এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ ও হেদায়েত অনুসারেই জীবনের সকল কর্মকাণ্ডও পৃথিবীর

www.icsbook.info

সকল সমস্যা সমাধানে বাধ্য থাকবে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কত গুরুতর দুরূহ তা পবিত্র কোরআনের নিচের আয়াত থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি।

আমরা সমস্ত আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে এই গুরু দায়িত্ব বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এরা কেউই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয় নাই। বরং তারা এতে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু মানুষ এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে রাজি হয়েছিল।' (আল কোরআন ৩৩:৭২)

উপরোক্ত আয়াত হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর অপরিসীম বিশালত্ব অথবা পাহাড় পর্বতের দৃঢ়তা ও অটলতা সত্ত্বেও এই দায়িত্বভার গ্রহণ করতে তারা অস্বীকৃতি জানাল। এতে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার কত ব্যাপক ও কত গুরুতর।

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে চাই আল্লাহর সৃষ্ট পদার্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং তাকে মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা। আল্লাহ মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে সেই কাজ সাধ্যমত সম্পন্ন করার জন্য মানুষকে আল্লাহ সৃষ্ট পদার্থের উপর খবরদারি করার কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন -

'এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরই অধীনস্থ করেছেন, যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে। খেয়াল কর, এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে গভীর মর্মবাণী।' (আল কোরআন ৪৫:১৩)

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, মহান আল্লাহ কিভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই মানুষের অধীন করে দিলেন? আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম এটম হতে অসীম মহাবিশ্ব আল্লাহর প্রদত্ত বিধান আল্লাহরই নির্দেশে অভাবনীয় নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে মেনে চলে। আর মানুষ যা করতে পারে তা হলো, আল্লাহর সেই বিধানগুলি অক্লান্ত সাধনার মাধ্যমে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় উদঘাটিত করা। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান এবং আল্লাহর বিধান সমূহ উদঘাটন করার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে অবারিতভাবে। আর এই বিধানগুলি যেহেতু অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয়, তাই এইগুলো অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রায়োগিক দিকটাকেই আমরা এখন প্রযুক্তি বা Technology বলে থাকি। এই বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে-সবই আল্লাহর জন্য। এবং এরা আল্লাহর বিধান সমূহ অপরিসীম সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলে।' (আল কোরআন ২:১১৬)

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করার জন্য ছেড়ে দেন নাই। বিশেষ দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে তাঁর (আল্লাহর) প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাও দিয়েছেন মানুষের মধ্যে খোদায়ী গুণাবলি দিয়ে। আল্লাহ বলেছেন-

'আমি মানুষকে সুষম অবয়ব প্রদান করেছি এবং তার অভ্যন্তরে আমার রূহ ফুকে দিয়েছি।' (আল কোরআন ১৫:২৯)

www.icsbook.info

আল্লাহ বিশেষ রহমতে শুধমাত্র মানুষকেই এই রুহ ফুৎকার করেছেন, যার ফলে মানুষকে পরিণত করা হয়েছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এবং মানুষ অর্জন করেছে অসীম সম্ভাবনা। তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনা, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্প্রদত্ত সুপ্ত শক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করে দুনিয়া ও আখেরাতের চরম উন্নতি সাধন করতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতে হবে তার দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব, তার প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের মূলমন্ত্র মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন এইভাবে বলেছেন, 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। যিনি 'আলাক' থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, এবং তোমার প্রভু অতীব দয়াময়। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেন। তিনি মানুষকে সে সবও জানান, যে সব সে জানত না।' (আল কোরআন ৯৬ : ১-৫)

হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় আমাদের প্রিয় নবী (সা) যখন স্রষ্টার ধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ন, ইসলামের সেই উষালগ্নে মহান আল্লাহ উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত জিবরাইল (আ:) মারফত প্রেরণ করে পবিত্র কোরআনের সূচনা করেন। এই আয়াত কয়টি মূলতই তাওহীদভিত্তিক জ্ঞান বিকাশের এক বিপ্লব সাধনের আহবান। কোরআনের এই রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াতগুলি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং রাসূল করিম (সা) এর জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের সর্বোচ্চ তাগিদের ফলে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত আরব জাতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা কিংবদন্তি হয়ে আছে।

এই আয়াতগুলি একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রতিভাত হয় :

(ক) এই পাঁচটি আয়াতের মধ্যে পাঠ করার কথা তিনবার বলা হয়েছে। রাসূল (সা) এর অক্ষর জ্ঞান ছিল না। তিনি পড়তে পারেন না বলা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাঁকে বার বার পাঠ করার আদেশ দিয়ে অধ্যয়ন করার অপরিসীম গুরুত্বের কথাই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(খ) যে যুগে ভ্রূণ-বিজ্ঞান (embriology) সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না তখন মহান আল্লাহ 'আলাক' শব্দটির দ্বারা ভ্রূণ-বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

(গ) মানুষের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাই তাওহিদের ভিত্তিতে গড়তে হবে। তাওহিদশূন্য বা তাওহিদবিরোধী কোন কিছুই মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারবে না।

(ঘ) মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে গেলে আল্লাহ রহমত লাভ করবেই।

www.icsbook.info

(ঙ) কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান তথা লিখনের মাধ্যমে মানুষের লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থায়ীভাবে রক্ষা করাও তার প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(চ) শিক্ষার্থী হয়ে মানুষ নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে গেলে তাদের অজানা বস্তু কিছুই আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেন বিধায়-জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা ছেড়ে উদাসীনভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।

উপরের এই কয়টি আয়াত পবিত্র কোরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত অসংখ্য আয়াতের সামান্য অংশ মাত্র। বস্তুত পবিত্র কোরআনের প্রায় এক-অষ্টমাংশ জুড়ে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য মহান আল্লাহর তাগিদ। রাসূলে করিম (সাঃ) এই তাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জনের প্রতি।

এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সামান্য দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে কোরআন ও হাদিসে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে। এখন যেটা প্রয়োজন তা হলো, এই সব আয়াত ও হাদিস গভীরভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের আলোকে সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনবে।

লেখক : অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

www.icsbook.info

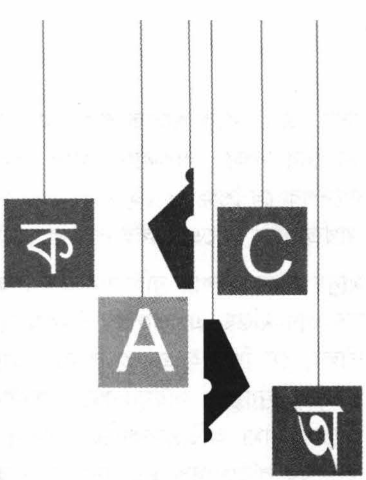

আমাদের শিক্ষা কিছু ভাবনা

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ

॥ ১ ॥

মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মের পরে তার আত্মীয়-স্বজন বাপ-মা পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। মানুষ তার মনুষ্য বৃত্তিগুলোর বিকাশ ও প্রয়োগোপযোগিতা সাধনের জন্য বাইরের এ শিক্ষার আশ্রয় নেয়। জীবজগতের অন্যান্য শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়; কিন্তু মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে তাকে মানুষে ও পশুতে পার্থক্য করতে হয়। আর সে জ্ঞান লাভ হয় তার শিক্ষার মাধ্যমে। তাই হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ তার শিশুকে সমাজের বাসোপযোগী সদস্য হিসেবে তৈরি করার চেষ্টায় নানা পদ্ধতি বের করেছে। যুগে যুগে সমাজদেহের দুষ্ট ক্ষত দূরীকরণের জন্য এবং সমাজে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা আত্মত্যাগ করেও মানুষকে পথ দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন। বলে গেছেন : তোমরা মানুষ, পশু নও। অন্যান্য জীবরে মতো আহার নিদ্রা মৈথুন ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়েই তোমার সব কাজ, সব সাধনা শেষ হয়ে যায় না। তোমাদের চেষ্টা নিয়োজিত হবে দশের কল্যাণে। তোমাদের সাধণা হবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ– আশরাফুল মখলুকাত যাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করে ইহ ও পরকালে তার স্রষ্টার মহিমা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। আর তার কল্যাণ কামনা ও প্রচেষ্টা পরিব্যাপ্ত হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে, ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে জাতিতে, জাতি থেকে বিশ্বে। সে যে কেবল নিজের জন্যই বাঁচে না, পরের জন্যই তার জীবন– এ কথা বুঝাবার ও বুঝাবার পরিশীলনীর নামই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন যাপন।

শিক্ষা : জীবন যাপন প্রণালির পদ্ধতি শিক্ষা। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন আহার্য, বিভিন্ন বাতাবরণ ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে তার জীবন যাপনোপযোগী রসদ সংগ্রহ করে বাঁচার ও বাঁচানোর যে পদ্ধতি, তার সম্যক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে ভাল মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের মধ্যে তারতম্য বোধ এনে

www.icsbook.info

দেয়। এ বোধকে শাণিত শক্ত সমর্থ করে, এ বোধের ধারা-পদ্ধতি অনুসরণই মানব জীবনের লক্ষ্য। অকল্যাণ থেকে কল্যাণে মনুষ্য জীবনের তথা বিশ্বজীবনের পথ নির্দেশক যে শিক্ষা তারই পরিশীলনী মানবজীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। পরহিতে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গই শিক্ষার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য।

মানুষ বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিমান জীব। অতএব তাকে সমাজে বাস করতে হলে তার মন-প্রাণ-মস্তিষ্ক এ তিনেরই উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। এ তিনের উৎকর্ষের জন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আল্লাহ মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন : ওয়ালা তা'তাদু ইন্নাল্লাহা লাইয়ুহিরুল মু'তাদীন– তোমরা সীমা অতিক্রম করো না, কেননা আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না। যে শিক্ষা মানুষের ফিতরার বা স্বভাবের পরিপোষক এবং নিজের ও অপরের কল্যাণকর তাই সবার জন্য ওয়াজিব। হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : আল ইলমু ফরিদাতুন আলা কল্লি মুসলেমিনা ওয়া মুসলেমাতিন– প্রতিটি নর এবং নারীর জন্য ইলম হাসিল বা জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের শিক্ষায় জীবন যাপনের সব রকমের ব্যবস্থা থাকবে। কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের শিক্ষাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। কেননা, মানুষের খাওয়া পরার পরই অন্তরের পিপাসা ও মনের ক্ষুধার কথা আসে। আর তাই তাকে মানুষের অধ্যাত্ম দিকটিকেও সমাজেই উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত না করলে, তার পশুত্বই প্রবল হবে এবং মনুষ্য জীবনের উদ্দিষ্ট ভূমিকা সে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে না। আবার কেবলমাত্র অধ্যাত্ম্য শিক্ষাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। যে শিক্ষা তাকে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ শিখাল অথচ তার জৈবিক দিকটিকে অস্বীকার করল তাও প্রকৃত শিক্ষা নয়। সুতরাং, যে শিক্ষায় এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করে মানুষকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে এবং স্বার্থ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, মানবতার কল্যাণে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, সে শিক্ষাই সবার কাম্য। কল্যাণকর সুশিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সুশিক্ষিত সেকান্দর জুলকারনাইন তাই বলেছেন : To my father I owe my life but to Aristotle I owe how to live worthily.

যে আদর্শ শিক্ষা সত্যিকার মহৎজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে তা-ই প্রকৃত শিক্ষা। আর সে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই নিজ গ্রাম নিজ দেশ ত্যাগ করে বহু দূর দেশে যেতেও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। এ শিক্ষার জন্যই এ জ্ঞান সাধনার জন্যই নির্দেশ রয়েছে ; উতলুবুল ইলমা ওয়ালাও কানা বিসসীন– সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও বিদ্যার্জন কর। সে কালে যানবাহনের প্রাচুর্য ও সুযোগ সুবিধা এ কালের মতো ছিল না। আরব দেশ থেকে চীন দেশ বহুদূর জেনেও ইসলাম ইলম হাসিলের জন্য, বিদ্যার্জনের জন্য সে দেশে যেতে পরামর্শ দিয়েছে।

মূর্খ লোক পশুর সমান। সে কেবল নির্বোধ ও অজ্ঞানই নয়, সে সমাজের বুকে দুষ্ট ব্রনের মতো। নিজেও অধঃপাতে যায়, অপর সকলকেও অতলে নিমজ্জিত করে। তাই

www.icsbook.info

অজ্ঞতা মূর্খতা দূরীকরণের জন্য সবকালে সবদেশে সাধনা চলেছে। আজ আমরা যে বিজ্ঞানের উন্নতি লক্ষ্য করছি তা জ্ঞান সাধনারই এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মানবকল্যাণে জীবন নিয়োজিত করবে, নিজের জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করে তুলবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের কল্যাণও চিন্তা করবে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুন্দর করে তুলবে। আর এ করতে হলে চাই সুশিক্ষিত সুস্থ মস্তিষ্কের যোগ্য নাগরিক। সমাজে যোগ্য নাগরিক এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাস করতে হলে, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারস্থ হতেই হবে। শিক্ষাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, সাদায় কালোয়, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এক বিশ্ব মানবতার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষা তেমনিই অমার্জনীয়। কর্ম শিক্ষা মানুষকে বাঁচাতে শিখায়। কিন্তু ধর্মশিক্ষা মানুষকে যোগ্য নাগরিক রূপে বাঁচতে ও চিন্তা করতে শেখায়। কাজেই উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে যে শিক্ষা সে আদর্শ শিক্ষাই সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে সমর্থ। মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেকসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে মানবিকতার সমস্ত গুণ ও পাশবিকতার সবগুণের সমন্বিত আধাররূপে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে ইচ্ছা করেছেন যেন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করে এবং পশুত্বের দমন করে। মানুষের মধ্যে যে মানবতা দিয়েছেন তার পরিচর্যা করে, পশুত্বের ধ্বংস সাধন করে, প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা ও সাধনারই সংগ্রাম এ জীবন। এ জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলতে হলে চাই সত্য-মিথ্যার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য সৃষ্টির জ্ঞান। আর যথোপযুক্ত শিক্ষার বা সাধনার পরিশীলনীতেই এ জ্ঞান বিধৃত।

মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়। একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল এ সমাজ মানব বুদ্ধির ও মানব সংস্কৃতির এক অমোঘ নিয়মে পরিচালিত। আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হলে, প্রকৃতির কোথাও কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে পরিচালিত হলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন হয় সহজ সরল ও সুন্দর। এ সুন্দরই পরম সত্য। আর সত্যই সুন্দর। অসত্যই অসুন্দর। এবং অসুন্দর ও অসত্যই মানবতাবিরোধী তথা জীবনবিরোধী। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অশান্তি-অন্ধকার দূরীকরণের জন্য সুস্থ সমাজ চেতনা ও মানবতা বোধের জাগৃতি ও উদ্বোধনের জন্য, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক বিশাল দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে হয়। আর সে অংশগ্রহণে বিশৃঙ্খলা থাকলে জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। মানুষকে জীবনে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর এ দায়িত্ব পালনের মহড়ার অনুশীলন শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের কর্তব্য এতিম দুঃখীর প্রতি তার দায়িত্ব, এবং মনিব-ভৃত্য, ছোট-বড়, আপন-পর, সবার সঙ্গে তার জীবন-যাপনে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা না পেলে, জীবন যাপন প্রণালি

www.icsbook.info

শিক্ষার মাধ্যমে অনুশীলিত ও পরিচ্ছন্ন না হলে, সে জীবন পশুবৃত্তি পরিচর্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। চরিত্রই মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ চরিত্র একবার পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হয়ে গেলে জীবনযাপন হয় সহজাত সুষ্ঠু ও সুন্দর। দেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির সেবা থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনিয়ন্তার প্রীতি লাভের স্তর পর্যন্ত নানাভাবে নানা কর্মের ভেতর দিয়ে পরিচ্ছন্ন মনের ও সংস্কৃত মানসের বিকাশ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। মানব প্রবৃত্তি শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল না হলে জ্ঞানহীন অন্ধকার জীবন যাপনই হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। আর সে জীবনই মানবতা বিরোধী জীবন।

কেবল ইহকালের এ জীবন যাপনই নয়, পরকালের চিন্তায় নিয়োজিত সত্যসুন্দর জীবনযাপনের জন্যও এ দুনিয়াই কর্মক্ষেত্র। বলা হয়েছে: **'আদদুনিয়া মাজরাআতুল আখিরা'** এ দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানকার কর্মের মাধ্যমেই পরকালের পথের সম্বল সঞ্চয় সম্ভব। আর এ কর্ম পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে পরিশীলিত না হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে পড়তে বাধ্য।

শিক্ষা মানুষকে এ দুনিয়ায় হালাল রুজি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করবে এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত করবে। আর ঈমান ও আকিদার পরিচ্ছন্নতা সাধন করে বান্দার ও আল্লাহর হক আদায়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে।

সে জন্যই ইলম বা জ্ঞান অনুসন্ধান অবশ্য পালনীয় কর্ম বা ফরয করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবনপদ্ধতি ইসলামে ইলমের বিপরীতধর্ম বা স্বভাবকে বলা হয়েছে, যুলুমাত বা অন্ধকার আর ইলমকে বলা হয়েছে, 'নূর' বা আলো। তাই সবাইকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে ইলম বা জ্ঞান হাসিল করার জন্য। এ বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য, সত্য উদঘাটন করার জন্য, গবেষণা করার জন্য, বারবার বলা হয়েছে। জ্ঞান লাভ না করলে নিজেকেই চেনা যায় না, বিশ্বকে তথা তার প্রতিপালক স্রষ্টাকে কি করে জানা যাবে? মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু– যে নিজেকে চিনেছে, সে-ই তার প্রতিপালককে চিনেছে। জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ না করলে তাকে জানা কখনও সম্ভবপর হয় না।

জ্ঞান অর্জন যেমন ফরয, তেমনি জ্ঞান দান করা, ইলম বিতরণ করাও সওয়াবের কাজ। নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান দান করবে। হযরত আলী (রা) বলেছেন: ফাকুম বিইলমি ওয়ালা তাবগি লাহু, বাদালান, ফান্নাসু মাওতা ওয়া আহলিল ইলমি আহইয়াউ– জ্ঞান ধারণ কর এবং তা বিতরণের বিনিময়ে কোন মূল্য কামনা করো না। কেননা মানুষ মরে যায়, কিন্তু জ্ঞানের অধিকারীরা চিরজীবী। মানুষকে শিক্ষা দেয়া বড় তাবলিগ। বিপদে আপদে সদুপদেশ দান পরম নেক কাজ।

সাধক পুরুষ মহাকবি শেখ শা'দী ধন সম্পদ দান সম্বন্ধে বলেছেন : আজই তোমার ধন

www.icsbook.info

ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা অপরের হাতে দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না, কেননা কালই সে ধন ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা তোমার হাতে নাও থাকতে পারে।

ধন দান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, জ্ঞান বা ইলম বিতরণ সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। কবি সত্যি বলেছেন :

জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম-অলঙ্কার,

করে মাত্র মানুষের মহত্ত্ব বিস্তার।

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,

যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

Plain living and high thinking শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, সে শিক্ষাই উত্তম, যে শিক্ষা মানুষকে এই পার্থিব জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার কৌশল শিখায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনেও সহায়ক হয়। কেবলমাত্র পার্থিব রুজি রোজগারের উপায় আয়ত্ত করায় জীবন একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। কেবল নৈতিক শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষা যেমন জীবনকে করে ফেলতে পারে পঙ্গু তেমনি কেবল জীবিকা অর্জনের শিক্ষাও নিয়ে যায় পঙ্গুত্বের কাছাকাছি। ধর্মীয় ও জাগতিক উভয়বিদ শিক্ষার সমন্বয় জীবনকে করে তুলতে পারে সার্থক। সে জীবনই সংসারের পাপ-পঙ্কিল ধরার ধুলায় বাস করেও চলার পথ করে তোলে সুন্দর মসৃণ। পরকালেও তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

কোন এক ইংরেজ মনীষী বলেছেন যে, শিক্ষার্থীকে কেবল রুজির পন্থা শিখালে, তাতে যদি নৈতিক শিক্ষার সম্মিলন না ঘটে, তবে সে শিক্ষায় মানুষ সুশিক্ষিত হয় না। কুশিক্ষিত হয়। If you give them three 'Rs' i.e. Reading, writting and arithmatic, and do not give them the fourth 'R'i.e Religion, they are sure to become the fifth 'R'i.e. Rascal— শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র পঠন, লিখন ও অংক কষা শিখালে এবং ধর্ম না শিখালে তারা 'দুষ্ট' হতে বাধ্য। কাজেই যে শিক্ষা নীতিবিগর্হিত সে শিক্ষা কারো কাম্য নয়।

এই উপদেশটি আজকের দিনে আমাদের দেশে বেশি প্রযোজ্য। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় Fourth R Religion তার জীবনে কোনই প্রভাব বিস্তায় করতে পারছে না। সুতরাং মানব শিশুকে মানুষ করে তুলতে হলে তার শিক্ষা ব্যবস্থায় Fourth R (Religion) এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ভাল ও মন্দ, আলো ও আঁধার, সুন্দর ও অসুন্দর, হিত ও অহিত ন্যায় ও অন্যায় হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জ্ঞান অর্জনই প্রকৃত ইলম হাসিলের প্রশিক্ষণের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। যাতে মানুষ শাশ্বত জীবনের অমরত্বের বিশ্বাস নিয়ে, কর্মে প্রযুক্ত হয়ে সৃষ্টির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ 'মুসলিম' হতে পারে এবং ইহকালের কর্মপ্রেরণায়, পরজীবনের হিদায়াতের সন্ধান পায়, তার

www.icsbook.info

প্রশিক্ষণই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা অর্জন মাত্র নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞানকে করে পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিকে করে শাণিত, দৃষ্টিকে করে প্রসারিত আর জীবনকে করে তোলে সংস্কৃত ও সুন্দর। মানুষের সংস্কৃতির ধারা প্রবাহ গতিশীল এবং স্থান কাল পাত্র উপযোগী করার যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা।

জনৈক ইংরেজ মনীষী বলেছেন : Education does no necessarily mean mere equisition of Degrees and Diplomas, It emphasises the need for acquisition of knowledge to live a worthy life. A balanced acquisition of techniques to fight against odds in order to pave the paths of peace for mankind and to fight for survival before and after death is recomended for the gradual cultural development and smooth running of human civilization.

মানুষের বাঁচার জন্য ও অপরকে বাঁচতে দেয়ার জন্যই শিক্ষার দরকার। কেবল তাই নয়, শিক্ষার দরকার জীবন যাপনে সেবায় নিয়োজিত হওয়ার এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতিধারা রক্ষার জন্যও। কেবল কিছু ডিগ্রি ডিপ্লোমা বা সনদ জোগাড় করাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য তা জীবন বোধে সর্বত্র সমৃদ্ধ নয়। তাই তা পরিত্যাজ্য।

এ সম্বন্ধে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে T.S. Eliot বলেছেন : The purpose of education has been defined as the making people happier. That the educated person is happier than the unducated is by no means self-evident. Those who are conscious of their lack of education are discontented, if they cherish ambitions to excel in occupation for which they are not qualified, they are sometimes discontented, simply because they have been given to understand that more education would have made them happier. Many of us feel some grievances against our elders, our schools or our universities for not having done better by us. This can be way of extrenuating our own shortcomings and excusing our failure. To be trained, taught or instructed above the level of over abilites and strength may be disastrous; for education is a strain and can impose greater burdens upon a mind than that mind can bear. Too much education, like too little education, can produce unhappiness.2

॥ ২ ॥

মানুষকে দুটো কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে : ইবাদত ও খিলাফত। মানুষ স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। আর সে যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আল্লাহর খলিফা;

www.icsbook.info

তার পরিচর্যা করবে। আর জ্ঞান ব্যতীত এ দু'টোর কোনটিই সম্ভব নয়। কিন্তু সে জ্ঞান মানুষের গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; কম হলেও চলবে না, অতিরিক্ত হলেও বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানবপ্রেম। পাপী পুণ্যবান নির্বিশেষে মানব সমাজের মঙ্গল সাধনই হলো জীবনের আদর্শ। তিনি আরো বরেছেন: জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চাইতেও মূল্যবান। জ্ঞান ক্ষুরধার। জ্ঞান মুজাহিদের তরবারির চাইতেও ধারাল শাণিত। অজ্ঞান-তমসা দূর করে আলোর বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে জ্ঞানের তুলনীয় কিছুই নাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ দুনিয়ার দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ হিংসা বিদ্বেষ কলহ বিদূরিত করা যায়, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করা যায়।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানহীনতা দুর্বলতা ও মৃত্যু। জ্ঞানের মতো ঐশ্বর্য নেই। বলা হয়েছে : সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন। জ্ঞানের সাহায্যেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। জ্ঞানই শত্রুকে মিত্র করতে, দুশমনকে দোসত করতে সাহায্য করে। জ্ঞান জীবন যাপন পদ্ধতি তথা ধর্ম বোঝার সহায়ক। জ্ঞানহীন লোক কোনদিন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। জ্ঞান আলো, অজ্ঞানতা অন্ধকার। আল্লাহতায়ালা আল-কোরআনে বলেছেন : আঁধার আর আলো কি সমান? তোমরা কী চিন্তা করো না? যে নির্বোধ মূক ও বধির অর্থাৎ যে শোনে না, দেখে না, বলে না এবং বোঝে না, আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি নিরেট পশুর মতো। জ্ঞান মানুষের ভেতর ও বাহির স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলে, মন ও মস্তিষ্কের মোক্ষণ সাধন করে। বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এ জ্ঞানেরই অধীনে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। জ্ঞানেই কল্যাণ জ্ঞানেই মুক্তি। তাই জ্ঞান লাভ করার অধিকার সকলেরই। আর সে অধিকারের সদ্ব্যবহারই আমাদের জীবনকে করে তোলে সুন্দর ও সুসমঞ্জস। জ্ঞানানুশীলনকে সারারাত ইবাদতের চাইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। হযরত (সা) বলেছেন, যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে তার আগের সব পাপ মাফ হয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ্যার্জন করতে করতে অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে নিষ্পাপ। কেউ বিদ্যা অর্জনের জন্য বের হলে, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথেই থাকে। যে শিক্ষা সত্যিকার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে হয় সহায়ক, সবার প্রতি কর্তব্যবোধে করে উজ্জীবিত, স্রষ্টার প্রতি করে বিনীত, সেই শিক্ষাই কাম্য। শাস্ত্র বলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ং– বিদ্যা বিনয় জননী। বিদ্যাই মানুষকে মনুষ্যত্ব বোধে উজ্জীবিত করে পশুত্বের পর্যায়ে থেকে আলাদা করে। সেজন্যই বিদ্যা অর্জনে যত্নবান হওয়ার তাগিদ সকল ধর্মেই দেয়া হয়েছে। বিনয়, নম্রতা, মানুষের মহত্ত্ব বাড়ায়, জীবনকে সুন্দর করার জন্য মানুষ সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের জীবজগতের সম্পর্ক, তার পরিপার্শ্বস্থ জড়-অজড় জগতের সবকিছুর সম্পর্ক এবং এদের যথাযথ প্রাপ্য ও দেয় হক সবকিছুরই জ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্নিবিষ্ট থাকবে। মানুষ সত্যাসত্য, ন্যায়–অন্যায়, ভালমন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য জেনে জীবনকে করে তুলবে পরিচ্ছন্ন নির্মল। জীবন থেকে মিথ্যা, অন্যায় ও

www.icsbook.info

অসুন্দর দূর করে সত্য ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুন্দর, সহজ, সরল জীবন, বিনয়, নম্রতা ও মহত্ত্বে উজ্জীবিত আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং মানব কল্যাণে নিয়োজিত জীবনই সত্যিকার জীবন। আর যে শিক্ষায় এসবের সমন্বয় ঘটে সে শিক্ষাই সবার উপযোগী। যে সব গুণের অনুশীলনীর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে, আল্লাহর গুণে বিভূষিত হতে পারে, আল্লাহর প্রকৃত খলিফা বা প্রতিনিধি হতে পারে, সে সব গুণের সমাবেশেই জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। আর এই সুন্দর জীবনের সব গুণ শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকলে সে শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে না আর ইসলাম এই বিশ্বজনীন শিক্ষারই পরিপোষক ও প্রচারক।

ইসলামের স্বর্ণযুগে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। সব রকমের শিক্ষাকেই ধর্মীয় অঙ্গনে স্থান দেয়া হয়। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে জনৈক ইউরোপীয় লেখকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। এতে বলা হয়েছে: ইসলামের এক গৌরবময় কীর্তি হচ্ছে, ইসলাম কুরআন, হাদীস ও মুসলিম বিধান-শাস্ত্র ফিকাহর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অনুরূপ অন্যসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকেও সমান আসন ও মর্যাদা দান করেছে এবং মসজিদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মসজিদে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহর ওপর আলোচনার সঙ্গে একই ভাবে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভেষজবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপরও আলোচনা করা হতো। কেননা, স্বর্ণযুগে মসজিদই ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিক্ষেত্র ও প্রতি প্রান্ত থেকে লব্ধ সাধনা ও সে যুগের সমস্ত জ্ঞানধারাকে সেদিন মসজিদের অঙ্গনে সাদরে বরণ করা হতো। এই আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় সম্মিলন আর সর্বজ্ঞানের চরম উৎকর্ষই প্রাচীন মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারায় এক অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে- যা তাঁদের প্রতিটি পাঠকের মনেই রেখাপাত করে। এ হচ্ছে বিদগ্ধ মনের এক শান্ত স্থির মহিমময় রূপ।

ইসলামে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' এবং 'ধর্মবাদের' মত কোন মতবাদের অস্তিত্ব নেই; কেননা, খাঁটি ধর্ম মানুষের উদ্যম ও কর্মধারা সমগ্র পরিসরকেই তার আওতাভুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে ভাল ও মন্দ তথা সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সুকৃতি মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নের সহায়ক, আর দুষ্কৃতি এর পক্ষে চরম হানিকর। ইসলাম মুক্তবুদ্ধিবাদী ধর্ম। এ ধর্মে সে মানুষের স্থান নেই, যে সেন্ট অগাস্টিনের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলে : Credo quia absurdumest- 'আমি বিশ্বাস করি, যেহেতু এটা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য।" আল-কোরআন বার বার অযৌক্তিক বা মুক্তবুদ্ধি বর্জিত ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করেছে। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন ধর্মমত ধর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য। বার বার কুরআন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তি ও সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের জন্য মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছে। সমস্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা একথা প্রমাণ করে, যে সব জাতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারায়, তাদের অধঃপতন অনিবার্য। আল্লাহর প্রতি জাগ্রত বিশ্বাস এবং প্রশস্ত মুক্তবুদ্ধি-এ দুটো কি

www.icsbook.info

সংগতিবিহীন? পাশ্চাত্যের একশ্রেণীর বেশ কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ মনে করেন, এ দুয়ের মধ্যে কোন সংগতি থাকতে পারে না কিন্তু ইসলাম প্রমাণ করেছে, এ দু'টো বিষয় সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমন্বয়শীল, এ দু'টি সম্পূরক। (৩

সাফল্যের ফলবাহী ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে প্রতিটি বৈষয়িক ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি অবিমিশ্র বিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তবুদ্ধির সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। কারণ, ইসলাম পৃথিবীর ওপর এমন কোন কিছুকেই এত পবিত্র মনে করে না, যা সমালোচনা মুক্ত বা সমালোচনার নাগালের বাইরে। কেবল অসীম অলৌকিক একজন মাত্র আছেন– অকল্পনীয় অদ্বিতীয় সত্তা এমন একজন, যার একত্বে একবার বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোন আলোচনার অবকাশ থাকে না। তিনি সকলের জন্য সার্বজনীনভাবে মঙ্গলময় ও দয়ালু। তিনি মানুষকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও কার্যকারণ নিরূপণের প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম মনীষী লেখকরা মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান হিসেবে এ 'কার্যকারণ' জ্ঞানকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যা শুভ ও কল্যাণকর তার অনুসরণ এবং যা মন্দ ও অকল্যাণকর তার পথ বর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ অবাধে আল্লাহর নামে তার এই বিচারবুদ্ধি ও কার্যকারণ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে, সে জন্যেই আল্লাহ তাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন। আর এ উদ্দেশ্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে পবিত্র সংবিধানে পথনির্দেশ ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইসলামে কোন পৌরহিত্যবাদ নেই। অন্যান্য ধর্মে সবরকম অধিকার ও কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এসব অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের ওপর আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এ উদার দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব লাভ করেন।

॥ ৩ ॥

কোন নরনারীর জীবনে চলার পথে আলোক সঞ্চারের পক্ষে একজন জ্ঞানহীন ব্যক্তি হচ্ছে একটি তৈলবিহীন প্রদীপের মতো, তাই এই যুক্তি জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সর্বজনীন শিক্ষার নির্দেশে বিধৃত হয়েছে। মহানবী (সা:) বলেছেন: "জ্ঞানানুশীলন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বা ফরয।"

এভাবে দেড়হাজার বছর আগের নর ও নারীর উভয়ের জন্যই সর্বজনীন শিক্ষা ইসলামের পবিত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা একে সাদরে বরণ করে নেয়। এ কথাও বলা হয়েছে : "জ্ঞানই শক্তি।" নিম্নোক্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, জ্ঞানানুশীলনের ওপরই কেবলমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি– জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নেবেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি

www.icsbook.info

পৃথিবী থেকে জ্ঞান সাধকদের উঠিয়ে নিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শূন্যতা সৃষ্টি করবেন। এর ফলে এমন অবস্থার উদ্ভব হবে যে, কোথাও কোন খাঁটি ব্যক্তি বা আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ তাদের নেতা বা পথপ্রদর্শক হিসেবে মূর্খদের বরণ করবে এবং তাদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করবে (নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবে) এবং তারা (সেই মূর্খ নেতাগণ) কোন রূপ জ্ঞান ব্যতিরেকেই ফতোয়া দান করবে। (এর ফলে) তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথ ভ্রষ্ট করবে।"

এ উক্তিতে ইসলামের বর্তমান অবস্থা সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। আমাদের মধ্য এখন এমন বহু সংকীর্ণচিত্ত আলেমও দেখা যায়, যাঁদের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। তবে এখানে জ্ঞান শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, তা তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ততর এবং অধিকতর মানবীয়। এছাড়াও মহানবী (সা) বলেছেন : 'জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্রতর।' তিনি আরো বলেন : 'আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টার নীরব চিন্তা ও গবেষণা এক বছরের এবাদতের চাইতেও উত্তম।' তাঁর অন্য এক উক্তিতে আছে: 'যে জ্ঞানাসাধনা করে, সে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।" 'প্রথমে যে জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছিল তা হল– বিচার বুদ্ধি বা কার্যকারণ জ্ঞান। আল্লাহ বিচার বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। এর দ্বারাই আল্লাহ আমাদের কল্যাণ বিধান করেছেন এবং এর সাহায্যেই আমরা সবকিছু বুঝি ও অনুধাবন করি। আর এই জন্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ঘটে থাকে এবং এর মধ্যেই পুরস্কার ও শাস্তির কারণ নিহিত রয়েছে।' তিনি বলেন : জ্ঞান সাধকের কথা শোনা এবং অন্যদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি দীনী এবাদত অনুশীলনের চাইতেও মহত্তর।' 'যে জ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর রাস্তায় পদচারণা করে।' 'জ্ঞান তার অধিকারীকে মন্দ থেকে ভাল কিংবা দুষ্কৃতি থেকে সুকৃতির পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করে; জ্ঞান বেহেশতগামী পথকে আলোকিত করে। উষর মরুতে এ আমাদের বন্ধু, নিভৃতবাসে আমাদের সমাজ আর বন্ধুহীন অবস্থায় আমাদের সহচর। এ সুখের পথের সন্ধান দেয় এবং দুঃখের গুরুভার বহনের শক্তিদান করে। বন্ধুদের মধ্যে এ হচ্ছে একটি ভূষণ এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে এ হচ্ছে এক দুর্ভেদ্য বর্ম।' 'দেখ ফেরেশতাগণ জ্ঞান সাধকের ওপর তাদের আলোর পাখা বিস্তার করেছে। যাদের জ্ঞান আছে যাদের জ্ঞান নেই তারা কি সমপর্যায় ভুক্ত? জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান ধর্মব্রতীর উপরে; যেমন আমার স্থান তোমাদের মধ্যে সবচাইতে অধস্তন ব্যক্তির উপরে।

তিনি বলেন, 'একজন মানুষ সালাত, সিয়াম, যাকাত, দানখয়রাত ও হজ অনুষ্ঠান এবং অন্যসব ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারে; কিন্তু জীবনে যে পরিমাণ সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে পরিচালিত হয়েছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি আরো বলেন, জ্ঞান আছে অথচ যে তা জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করতে জানে না, সে

www.icsbook.info

বইয়ের বোঝাবাহী একটি গাধার মতো।"

ইসলামে কোন অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা, পবিত্র কুরআনে কোন জাহেল মুসলমানের কথা কখনো ধারণা করা হয়নি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, 'অজ্ঞ মুসলমান' কথাটি মুসলমান পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন দরিদ্র মুসলিমের মত একজন অজ্ঞ মুসলিমকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। (৪

॥ ৪ ॥

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থারই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপমাত্র। এ পদ্ধতি যে নিছক অকাজের তা বলছি না। কিন্তু এটি যে একমাত্র মোক্ষম পদ্ধতি- এ ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের ক্রমাগত ধ্বংসে দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের যেভাবে শিক্ষাদেব, সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে এবং সেভাবেই তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। তাই আজকের শিক্ষাপদ্ধতি যদি আমরা ঢেলে সাজাতে না পারি তাহলে জাতির উন্নতি নেই।

আমাদের দেশের দুরবস্থা আজ চরমে পৌঁছেছে। সে দুরবস্থা পরিমাপের চেষ্টার লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেই মানুষও নেই। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। জাতির এ ভয়ানক গ্যাংগ্রিনের অবস্থাটা তুলে ধরতেও সবাই ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ দুর্দশার কারণ কী? আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কি কোন মহাপুরুষের জন্ম হয়নি, কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি? তবে আজ এ অবস্থা কেন? এর আসল কারণ কি এ নয় যে, আমাদের শিক্ষার মূলেই গলদ রয়েছে? যে শিক্ষা আমরা দেই, তাতে প্রকৃত মানুষ তৈরি হতে পারে কিনা, এ কথাটা আমরা ভেবে দেখেছি কি? বাইবেলে যে বলা হয়েছে : Domen gather grapes of thoms, or figs of thistles?- কাঁটার বোঝা থেকে কি আঙ্গুর পাওয়া যায়, না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম থেকে ডুমুর পাওয়া যায়?– এ কথাটি আমাদের জন্য আজ সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

সকল দেশের সকল মনীষী একথা স্বীকার করেছেন যে, ছাত্রদের চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুতঃ চরিত্র গঠনই হচ্ছে শিক্ষার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রযুক্তি, ভেষজ ও চিকিৎসা বিদ্যাসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের সবগুলো শাখায় আমাদের জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে হবে। কৃষি শিল্প কোন কিছুকেই অবহেলা করে নয় বরং এদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে, কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে সৎ ও দক্ষ কর্মী তৈরি করতে হবে।

চরিত্র গঠনের জন্য চাই নৈতিক শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে দুটো ভাগ স্বীকার করা হতো। একটি পরাবিদ্যা অপরটি অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা শাখায় শিক্ষা দেয়া হতো ধর্ম আর মোক্ষ। আর এতে তাদের চরিত্র গঠন সহজতর হতো। এখন শিক্ষার এ দিকটি হয়ে পড়েছে গৌণ।

www.icsbook.info

আমাদের ব্যক্তিত্বের দুটি aspect বা বিধার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এক apperant বা 'প্রাতিভাসিক' বিধা; দুই Real বা 'সত্য' বিধা। যেসব বিজ্ঞানে জ্ঞানের পরিধির প্রসার ঘটে, সেসব পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিষয় প্রাতিভাসিক বা apperant বিধায় বিধৃত। আর ইন্দ্রিয়তীত যে 'প্রজ্ঞা' মানুষকে জীবাত্মা, মানবাত্মা ও পরামাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ করে, তার পরিচর্যা যে বিধায় বিধৃত তাকেই বলা হয়েছে 'সত' বা Real বিধা। একে 'সজ্ঞা' নামেও অভিহিত করা যায়। ইন্দ্রিয়াতীত বলেই এ বিধাটি পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিরীক্ষা বহির্ভূত। প্রত্যেকের মধ্যে যে পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত অন্তর্লীন প্রকৃত সত্তা বা 'সজ্ঞা' রয়েছে তারই স্বরূপ বিধৃত আত্মার পরিচর্যায়। মানুষ তার এই ভাব সত্তার সঙ্গে যত বেশি যুক্তি হয়ে ভাব বিনিময় করে, ততই তার অভিজ্ঞতা পূর্ণতর হয়। (৫

শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনাই শিক্ষা। আন্তর সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধনই আমাদের শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। আত্মার আন্তর সত্তার স্বরূপই পূর্ণতা। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলেই দেখা যাবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও 'সম্পূর্ণ শিক্ষা' অর্জন করেছিলেন। আর বলতে পারি, সাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আমরা 'অশিক্ষিত'। আমাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা এবং তার অপপ্রয়োগই আমাদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ ও দুঃখ ভোগের কারণ। আমাদের এই অসম্পূর্ণতার ত্রুটি রয়েছে বলেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ' তৈরি হয় না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এসব প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য বহিরঙ্গ শিক্ষাক্রমের সংস্কার ও পূনর্গঠনের সামান্য চেষ্টা মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এ পর্যন্ত কোন কমিটি বা কমিশন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে 'গলদ আদর্শহীনতা' বা 'লক্ষ্য ভ্রষ্টতা' সম্বন্ধে আলোচনা করেননি। প্রায় সকলেই কেবলমাত্র বৈষয়িক জ্ঞান, ধর্মনিরপেক্ষ বোধ বা অপরাবিদ্যার ওপরই জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের কেউই পরাবিদ্যা সম্বন্ধে সচেতন নন, অথবা বলতে পারি, সে সম্বন্ধে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাই তার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জীবিকা অর্জনের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়ার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। অথচ একথা সকল কালের সকল মনীষী একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পরাবিদ্যাহীন শিক্ষা মানব জীবনের প্রকৃত শিক্ষা বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যত বিদ্বানই হোন না কেন, 'প্রকৃত শিক্ষার' অধিকারী বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার 'শিক্ষণ'-এর 'ধারণ' 'মনন' বা মানসিকতার উৎকর্ষের প্রতি কোন প্রকার নযর দেয়া হয় না। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধ্যান, একাগ্রতা, নৈতিক পবিত্রতা পালনের মাধ্যমে মানসিক সংস্কার সাধন করে বিদ্যা অর্জনের যোগ্য পাত্ররূপে তৈরি

www.icsbook.info

করার কোন চেষ্টাই নেই। আগের দিনে বিদ্যালয় ছিল অনুকূল পরিবেশে। নগরের কোলাহলের ডামাডোলের মধ্যে মনমানসিকতার স্থৈর্য ও ধ্যানশীলতা বিনষ্ট হয়। কাজেই দৃঢ়ভিত্তিক বোধশক্তি সম্পন্ন জীবন তৈরি করার যথাযোগ্য পরিবেশের কথাও চিন্তা করার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

আগের দিনে শিক্ষা সমাপনী উৎসবে ওস্তাদ উপদেশ দিতেন: বাবা, সবেমাত্র শিক্ষার দোর গোড়ায় পৌঁছেছো। এখনও রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান পাওনি। এখনই প্রকৃত শিক্ষার শুরু হলো। জীবনে একে ছাড়বে না, জীবন সংগ্রামে এ শিক্ষাই তোমার অবলম্বন। এ তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে, এ তোমাকে দুনিয়ার শান্তি দান কররে এবং আখিরাতে নিয়ামত পাওয়ার সহায়ক হবে। অতএব বিদ্যার্জন ছাড়বে না। বিদ্যালয় ছেড়ে যাচ্ছ, ব্রহ্মচর্য ছেড়ে যাচ্ছ, তাই বলে অধ্যয়ন ও শিক্ষার শেষ নেই। গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবেশ করেছ, শিক্ষা ও অধ্যয়নই তোমার পাথেয়। উপদেশ হলো : তুমি মানুষ হও। উপনিষদ বলেছেন : সত্যংবদ ধর্মচর-সত্যকথা বলবে ও ধর্মচারণ করবে। সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না, নিন্দনীয় কাজ করবে না। মঙ্গলজনক কাজ করবে। ইহসান করবে। এসব ধর্ম পালন করবে।

অবশ্যই শ্রদ্ধাদি গুণের অনুশীলন করবে। শাস্ত্রবাণীতে ও গুরুর কথায় যদি শ্রদ্ধাবোধ না করে থাক তবে জীবনে কোন ধর্মই করা হয় না। শাস্ত্র বলে : শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম– যার শ্রদ্ধাবোধ আছে সেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর যার শ্রদ্ধাবোধ নেই, তার ইহ-বা পরকাল কোন কালই নেই। গীতা বলে : অশ্রদ্ধাবানচ বিনশ্যতি– শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি বিনাশ হয়।

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সংযমের অনুশীলনী করা। আত্মশক্তির বোধন ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা করা এবং যাবতীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রেণে রাখার শিক্ষণই সারা জীবনের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়। কলসের তলায় যদি একটি মাত্র ফুটো থাকে, তাহলে পানি যতই ভর্তি করি না কেন, তা বেরিয়ে যাবে। একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের অনিয়ন্ত্রণের কারণে যাবতীয় তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনা বরবাদ হয়ে যায়। জীবন নৌকা যদি আসক্তি রজ্জুতে বাঁধা থাকে তবে সারা জীব দাঁড় বেয়েও এগুনো যাবে না; দেখা যাবে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। যাবতীয় শ্রম বিফল হয়েছে।

চিত্ত বিশুদ্ধ করার শিক্ষণই অনুশীলন করতে হবে। হৃদয় হ্রদের পানিতে যদি বাহ্য সংসারের তুফানে ঢেউ জাগে তবে তাতে আপন চেহারার সুষ্ঠু প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। উর্মি ভেঙ্গে খণ্ডিত প্রতিচ্ছায়া সামগ্রিকতায় প্রতিভাত হয় না। আবার কেবল পানি স্থির থাকলেই চলবে না, স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে। পাপ পঙ্কিলতা থেকে ধুয়ে মুছে নিজেকে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে করতে হবে, তবেই তো তার ছবি পুরোপুরি দেখতে পাব। বাইরের বিশ্বের আলোড়ন ও আবিলতা-ধূলিময়লা-এ দুই উপাদান দূর করে নিজেকে শান্ত সমাহিত ও পাকসাফ করে সাধনায় নিয়োজিত হতে হবে। অনেকে বলেনঃ সালাত-

www.icsbook.info

সিয়াম-তপজপ-তসবিহ তাহলিল কি করে করব; ভোগের চঞ্চলতা সব সময় অন্তর অস্থির করে রাখে, মোহ হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে, আল্লাহতে মনোযোগী হওয়া যায় না। মন কেবলি ছুটাছুটি করে। স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্থিব চঞ্চলতা ও মোহমায়া দূর করার জন্যই তো আরাধনা সাধনা, সালাত-দোয়া সবকিছু। বলা হয়েছে : আসসালাতু মি'রাজুল-মুমিনীন-সালাত মুমিনের মি'রাজ। আল্লাহ জান্নাত-জাহান্নাম-এসব স্পষ্টতর হবে, সামনে প্রত্যক্ষ হবে। অবিরাম অনুশীলনীর মাধ্যমে বাসনার লয়, ভোগের অবসান ও ত্যাগের মহিমার বোধন হয়। তাতেই অন্তর পরিচ্ছন্ন ও তত্ত্বচিন্তায় লীন হয়। এ-ই প্রকৃত শিক্ষার অনুশীলনীর অঙ্গ হওয়া উচিত।

একদিকে স্রষ্টা ও পালনকর্তার স্মরণ, অপরদিকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এ-ই তো মুমিনের জীবন। গীতায় বলা হয়েছে : তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ–অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। এ-ইতো প্রকৃত জিহাদ। একবার একদল মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোত্থেকে এসেছো। তারা জবাবে বললো : জিহাদ থেকে। তিনি বললেন ছোট জিহাদ থেকে তোমরা বৃহত্তর জিহাদে এলে। অর্থাৎ জীবন সংগ্রামই বৃহত্তর জিহাদ। সেখানে যে জিহাদ করতে পারে, সে–ই প্রকৃত মুজাহিদ, সত্যিকার মুমিন।

জীবনের এই অনুশীলনী যে শিক্ষায় অনুপস্থিত সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অতএব সে শিক্ষা মানব জীবনের সাফল্যের সহায়ক নয়। তাই এ শিক্ষা কাম্য হতে পারে না। আমাদের সব শিক্ষার মূলে থাকবে এমন অনুশীলনীর পরিচর্যা যাতে ঈমান ও আকিদার পরিপোষণে জীবনের সব চিন্তা ও কর্ম হবে নিয়ন্ত্রিত। আর এ শিক্ষাই জাতির জীবনে এনে দিতে সক্ষম হবে সাফল্যের সোনার কাঠি।

জ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত হয়ে প্রতিটি মুসলিম, তথা মানুষ তার নিজের ও আর সবার অপশক্তির বিরুদ্ধে, অজ্ঞতা মূর্খতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং তাতেই জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, কলা, শিল্প তথা জ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিম মানব কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়। আর একাজ সম্পন্ন হবে যে শিক্ষায়, সে শিক্ষাই হওয়া উচিত আমাদের সবার জন্য। শিক্ষিত, শিক্ষক, শিক্ষার্থী তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে যে শিক্ষা, সে শিক্ষাই প্রবর্তিত হওয়া উচিত। শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, কামার, কুমার, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চাকরিজীবী সবার জন্য যে শিক্ষা সুপারিশ করা যায়, তা-ই হলো মৌল শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা। তাতে যেমন ধর্ম থাকে, তেমনি থাকবে পার্থিব জীবনের চলা প্রশিক্ষণ। আর এ শিক্ষা যখন সমাজের সর্বস্তরের প্রতিটি মানুষের দেহ ও মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে, কেবল তখনই আমরা আশা করতে পারি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান আদর্শ নাগরিকের।

www.icsbook.info

নির্দেশিকা :

১. কাজী দীন মুহম্মদ, মানব জীবন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ১৩।

২. T.S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture, London, ১৯৪৮, P ৯৯ ff.

৩. M. M. Pickthol, Islamic Culture, উদ্ধৃত- শাহেদ আলী, সম্পাদিত, ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা ১৯৬৭, পৃঃ ২৫।

৪. কাজী দীন মুহম্মদ, জীবন সৌন্দর্য, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৭৩।

৫. স্বামী বীরেশ্বরনন্দ, শিক্ষা ও ধর্ম প্রসঙ্গ, উদ্দীপনা, রামকৃষ্ণ স্মরণিকা, ঢাকা, ১৯৮৪ পৃঃ ২৫।

লেখক : বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ

'কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব,
ধর্মহীন শিক্ষা তেমনিই অমার্জনীয়।
কর্ম শিক্ষা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়।
কিন্তু ধর্মশিক্ষা মানুষকে যোগ্য নাগরিক
রূপে বাঁচতে ও চিন্তা করতে শিখায়'

.... ড. কাজী দীন মুহাম্মদ

www.icsbook.info

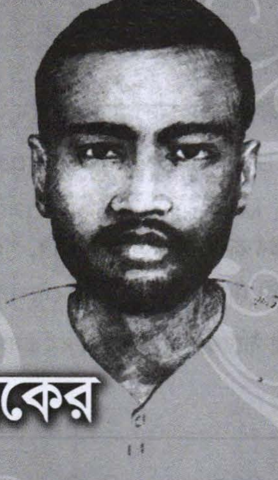

শহীদ আবদুল মালেকের কলম থেকে

(আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে নিজের জন্য পছন্দ করে নেন তাঁর যোগ্যতার সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আবদুল মালেক শহীদের একাডেমিক কৃতিত্ব এবং অপূর্ব চরিত্র মাধুর্যের সাথে সাহিত্য ক্ষেত্রেও ছিল এ সত্যটি অকপট। যে সামান্য সময় তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যয় করেছিলেন তাতেই একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে আদর্শ যদি জীবনের পথিকৃৎ হয় তাহলে যোগ্যতা সেখানে অসাধারণ ব্যাপ্তি খুঁজে পায়। শহীদ আবদুল মালেকের প্রবন্ধসমূহ, রম্য রচনাগুলো এবং সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিটি জানালায় উঁকি দিয়ে সাহিত্য সমালোচক মাত্রেই এটি স্বীকার করেছেন যে প্রগতিশীলতার নামে অশীলতা এবং প্রাক-সভ্যতার দিকে তারুণ্যের এক অধঃপতনের দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর কলম ছিল আদর্শ এবং সত্য-নিষ্ঠার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তার লেখা পড়ে ব্যক্তি মালেককে অনুধাবন করা যাবে খানিকটা।)

ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা

'ধর্ম' নামটা নিয়ে একদল চিন্তিত আর একদল ব্যস্ত। চিন্তিতের দল ধর্ম ভাবকে জিইয়ে রাখার জন্য ব্যাকুল আর ব্যস্তের দল ধর্ম নিয়ে হেসেই আকুল। ধর্মের নাম শুনে আমরা অনেকে আবার ভ্রূ কুচকিয়ে, নাক সিটকিয়ে সটান ভদ্রলোকের মত চলে যাই। ধর্ম-ধ্বজীরা (?) যে কী বলতে চায় সেটা আমাদের বিবেকের বিচারে কতটুকু টিকে তা চিন্তা করেই কটাক্ষ করেই রাস্তা দেখি। ধার্মিক স্বভাবের লোকের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লম্বা আধ ময়লা আব্বা-জোব্বা পরনে, হাতে তাসবিহওয়ালা চেহারা। এমন লোককে আদি কালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব বলে আমরা ঠাট্টা করি। ধর্ম পুস্তকের নাম শুনলে তো আর রক্ষা নেই, মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে ওঠে, মনে মনে বলি শত বছরের পুরনো ঐ জীর্ণ পুঁথিগুলোকে (?) গাধার পিঠে চাপিয়ে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দেই। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের

www.icsbook.info

ধারণা এই। ভাববার বিষয়, এই বিবৃত ধারণা তথা বিদ্বেষের মূল কোথায়। এটা কি কোন আকস্মিক ব্যাপার, না এর পেছনে কোন ইতিহাস আছে? এই দুটো প্রশ্নেই উত্তর দিতে চেষ্টা করবো এই ছোট্ট প্রবন্ধে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যত মতবাদ যত বিশ্বাসই থাক না কেন স্বয়ং ডারউইনও এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে, এই পৃথিবীতে সুষ্ঠু জীবন-যাপনের জন্য কতকগুলো আইন-কানুন ও নিয়মনীতির অবশ্য প্রয়োজন। কেননা সৃষ্টির অন্যান্য জিনিসের চেয়ে মানুষ অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ। তাই সে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে জীবন-যাপন করতে চায়।

মানব সৃষ্টির পর অন্যান্য জীবের মত খোদা মানুষকেও ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা হলে মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই খোদা মানব সৃষ্টির শুরুতেই এই পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য দিলেন কতকগুলো আইন কানুন যাতে করে মানবসমাজ কল্যাণের পথে চলতে ও অকল্যাণের পথ থেকে ফিরে থাকতে পারে। যুগের পরিবর্তনের সাথে জীবনের জটিলতা বেড়ে গেলো। সমস্যার পর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। খোদা তখন অনুগ্রহ করে পাঠাতে লাগলেন নতুন নতুন নবী ও মহামানবদের, যারা মানুষের সকল জটিলতা ও সমস্যার কথা চিন্তা করে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও তার প্রদত্ত বিধানের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী বিধানগুলো যুগোপযোগী করে তুলেন। এই বিধান ও আইন-কানুনের সমষ্টিই হলো ধর্ম। ধর্ম কোন গাঁজাখুরি ব্যাপার নয়, বরং মানব সমস্যার এক সুপরিকল্পিত সমাধান।

মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারে ধর্ম। তবুও আমরা একে সুনজরে দেখতে পারি না কেন? এরও একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। যুগে যুগে ধর্মের মূল সত্যকে বিকৃত করে নিজেদের মত ও পথকে আল্লাহর দেয়া বিধান বলে চালিয়েছে। ফলে মানুষের মন গড়া নিয়ম-নীতি মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে করেছে অমঙ্গল। কিন্তু দোষটা হয়েছে ধর্মের। ফল হয়েছে এই যে, মানব সমাজের এক বিরাট অংশ ধর্মকে অস্বীকার করে গড়ে তুলেছে নিজেদের গড়া-আরো অপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সংগে ধর্মের যে সংঘর্ষ তার মূল হচ্ছে মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় ইউরোপ। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, খ্রিষ্ট ধর্ম তখন তার আদি পবিত্রতা ও মৌলিকতা নিয়ে বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহর দেয়া বিধান ও হযরত ঈসার (আ) বাণীর সাথে তদানীন্তন ধর্ম যাজকদের স্বার্থভিত্তিক মতের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা হযরত ঈসার (আ) জীবন ব্যবস্থা নয় বরং তাতে হস্তক্ষেপের ও বিকৃতকরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের অনেক মৌলিক বিশ্বাসই ছিল তদানীন্তন গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মানুষের মনগড়া মতবাদ ও বিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্য নয় বরং এগুলো মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে যুগে যুগে। ফল হলো এই যে, গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান খ্রিষ্টধর্মের অনেক বিশ্বাসের মূলেই হানলো আঘাত। ধর্মের ওপরও এলো অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়।

www.icsbook.info

মধ্য যুগে সমস্ত ইউরোপই শাসিত হতো রোম ও কনস্টান্টিনোপলের চার্চ দ্বারা। এই চার্চ শাসিত হতো গুটি কয়েক খ্রিষ্ট ধর্মযাজকদের দ্বারা। সমগ্র খ্রিষ্টান জগতে পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা। তার নির্ধারিত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করাও কঠিন পাপ বলে গণ্য করা হতো। খ্রিষ্ট ধর্মের বিকৃতনীতি ও পোপের ক্ষমতা মিলে সমস্ত খ্রিষ্ট জগতে আসলে ধর্মের নামে চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। পোপ ছিলেন স্বর্গ মর্তের একচ্ছত্র অধিপতি। কারো স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া পোপের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করতো বলে ধরা হতো। পোপের নীতির সমালোচনাকে খোদার সমালোচনা মনে করা হতো এবং তার জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত বিকৃত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ-শব্দ করলেও তাকে নিষ্ঠুরভাবে নিস্পেষণ করা হতো।

খ্রিষ্টীয় আদালতের এই আইনের নাম ছিলো ইনকুইজিশন। এটা প্রায় দুশো বছর ধরে চলেছিল।

মানুষের চিন্তাধারা স্থবির নয়। ভাল হোক, মন্দ হোক মানুষ সব সময়ই নতুন করে চিন্তা করতে চায়। চার্চ শাসিত ইউরোপে মানুষের চিন্তাধারা যখনই স্থবির হয়ে পড়েছিলো তখনই কতকগুলো নতুন প্রাণ-নব্যপন্থীর আবির্ভাব হলো। তাঁরা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে বললেন। এতে খৃষ্টান ইউরোপের ক্ষমতাসীন যাজক সম্প্রদায় প্রমাদ গুনলেন। চার্চের সকল প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে এই নব্যপন্থীদের হত্যা করা হলো। খৃষ্ট ধর্মের গোড়ায় গলদ থাকায় যুক্তির সাহায্যে এ ধর্মবিরোধী মনোভাবকে বাধা দেয়া গেলো না। উপরন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে অবস্থা আরো সংকটের দিকে গেলো।

এদিকে খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক সত্যই ভুল প্রমাণিত হতে লাগলো। কোপারনিকাস যখন টলেমির ভূকেন্দ্রিক মতবাদ (Geocentrie Theory) ভুল প্রমাণ করলেন, তখন তা খ্রিষ্ট ধর্মের বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোপরনিকাস তার এ মতবাদ প্রকাশ করতে পারেননি। এভাবে যুবক বিজ্ঞানী ব্রুনোকে হত্যা করা হলো। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা গ্যালিলিওকেও চার্চের সামনে নতজানু হয়ে তার প্রচারিত মতবাদ অস্বীকার করতে হলো। এই ছিল তখন খৃষ্টীয় ইউরোপের অবস্থা।

বেগবান নদীকে যদি বাধা দেয়া হয়, তাহলে তা ফুলে ওঠে। তেমনি চার্চ তার সকল শক্তি দিয়েও এই নবজাগরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব মূলতঃ ধর্মের প্রতি প্রগতিবাদীদের আক্রমণের উৎপত্তি। খ্রিষ্ট ধর্মের ওপর আঘাত হেনেই প্রগতিবাদীরা ক্ষান্ত হলো না। তারা গোটা ধর্মের ওপরই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো-খ্রিষ্ট ধর্মই হোক বা অন্য যে কোন ধর্মই হোক না কেন। রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধারগণ ভাবলেন, গোটা ধর্মই মানুষের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম যুক্তির আঘাত মোটেই সহ্য করতে পারে না। কাজেই আল্লাহ, রাসূল, পরকাল অহি প্রভৃতি সবকিছুকেই হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করা হলো। এগুলোকে

www.icsbook.info

মানুষের যুগ যুগের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের ফলমাত্র বলে ধরে নেয় হলো। এ কারণেই আজ ধর্মকে মনে করা হয় সংশয়পূর্ণ আর বিজ্ঞানীও দার্শনিকের মতকে মনে করা হয় চূড়ান্ত সত্য-অন্ততঃ ধর্ম বিশ্বাসের মুকাবিলায়।

বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের, অত্যাচারের জন্য নব্য সমাজ হলো রুষ্ট। পরিণামে খ্রিষ্টধর্ম গুটিকয়েক লোকের আচারে পরিণত হলো আর ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মও নব্য সমাজের আক্রমণের শিকারে পরিণত হলো। প্রশ্ন উঠতে পারে, খ্রিষ্ট ধর্ম ও রেনেসাঁবাদীদের মধ্যে যখন আদর্শিক দ্বন্দ্ব জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। কারণ, গোটা ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র স্পেনেই মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল। কিন্তু রেনেসাঁ আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্সে তখনও ইসলামের আলো পৌছেনি। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের বিরুদ্ধে গোড়া মনোভাব থাকায় ইসলামও হয়ত ততটা আমল পায়নি।

ধীরে ধীরে জন্ম হলো হেগেল, স্পেন্সার, হিউম ও ডেকার্টের মত দার্শনিকের, কারলাইল ও ভলটেয়ারের মত লেখকের, মার্কস ও এঙ্গেলসের মত অর্থনীতিবীদের, ডারউইনের মত জীববিজ্ঞানী ও নিউটনের মত গণিত বিজ্ঞানীর। এই আলোক যুগে (en lighten-ment) চিন্তাবিদগণ রচনা করলেন জড়বাদী দর্শন ও বিজ্ঞান। যদিও দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর কোন ধারণাই অভ্রান্ত নয় বরং তা শত শত বার পরিবর্তিত হচ্ছে, তবুও আমরা গোঁড়ামি করে তাকেই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি আর আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের উৎস আল্লাহর দেয়া সত্যিকার জীবনব্যবস্থাকে করছি অস্বীকার।

প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন

'ঈশ্বর যদি নাও থেকে থাকে তবে নিজের প্রয়োজনের খাতিরেই একজন ঈশ্বর তৈরি করে নাও'- কথাগুলো বলেছিলেন পাশ্চাত্যের এক আধা নাস্তিক দার্শনিক। আল্লাহকে আমরা অনেকেই অস্বীকার করি। কিন্তু নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতার বড়াই আমরা কেউই করতে পারি না- কেন না কোন সত্তার কাছে জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে, আমরা নিজেদের মাথাটা নত করে দেই, দিতে বাধ্য হই। সে সত্তা এ পৃথিবীরও হতে পারে অথবা কোন অতি-প্রাকৃতিক জগতেরও হতে পারে। তাই তো দেখি কট্টর কম্যুনিস্ট-নাস্তিকও তাদের সংগ্রামী দেবতা লেনিনের সমাধির সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনিভাবে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি কেউ হয়তো ব্যক্তির পূজা করছে আবার কেউবা হয়তো সমষ্টির পূজা করছে অর্থাৎ পূজা, অর্চনা, ইবাদত-বন্দেগি, আমরা সবাই করছি, পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, আমি হয়তো আমার আপনার চাইতে অনেক বড় কোন মহাজাগতিক সত্তার আনুগত্য করছি আর আপনি আপনারই মত কোন মানুষের অথবা তার চাইতে নিকৃষ্ট কোন সত্তার দাসত্ব করছেন। তাহলে একটি সত্যই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, সৃষ্টি প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন নয়-কোন না কোন সত্তার আনুগত্য করা তা জন্মগত বৈশিষ্ট্য। মনীষীরাও এ

www.icsbook.info

সত্তাকে অস্বীকার করেননি। নিউটন ও আইনস্টাইন এ বিস্ময়কর সুশৃংখল সৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় এক ঐশী সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন, ভলটেয়ারের মত মুক্তবুদ্ধি ও মানব প্রগতির অন্যতম প্রবক্তাও অতি মানুষের (Superman) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তারই হাতে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কম-বেশি সবাই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সমস্যাটা হলো এই খোদা আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন কিনা-আমরা কি তাঁর আইন ও ক্ষমতার আওতায় না একে বারেই স্বাধীন-আমরা কি তাঁর আইন মেনে চলবো না নিজেরাই নিজেদের পরিকল্পনাভার গ্রহণ করবো এমনি কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে। যদি বলা হয় যে আল্লাহ তো আমাদের স্রষ্টা, আইন-কানুন কেবল তাঁরই মেনে চলা দরকার। তখন বলা হবে এটাতো একটা (Abstract idea) আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমরা তো কেবল তাই বিশ্বাস করি যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, হাত দিয়ে স্পর্শ করি। অর্থাৎ সোজা কথায় ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তার আনুগত্য আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। বস্তুতঃ আধুনিক জীবন দর্শনই হচ্ছে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি তা-ই সত্য এবং তারই মূল্যমান আছে। বস্তুবাদী জীবন দর্শন (truth and reality) কেও আমরা বস্তুর সীমিত পরিসরের বাইরে যেতে দেই না। আমাদের সকল লক্ষ্য ও সাধনা কেবল বস্তু ও বস্তুজগতের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দৈহিক সুখ ও দুঃখকেই আমরা জীবনের সফলতা ও বিফলতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি। মানুষের উন্নতির মূল্যায়ন অস্বীকার করে গোটা মানব সত্তাকে আর দু'দশটি বস্তুর ন্যায় কতকগুলো অজৈব পদার্থের সমন্বয় হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ মানব প্রকৃতির উত্তম দিকগুলোর স্থান দখল করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আবার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতা, আর এ থেকেই আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, ভোগবাদ, উপযোগবাদ, সংশয়বাদ, পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয়বাদ ইত্যাদির এবং এভাবেই সমাজ সভ্যতা তথা গোটা মানবজীবন প্রহসন মাত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রবন্ধের এই অংশে আমরা পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে বিচার করে দেখবো জীবনে আমরা পেয়েছি কী, হারিয়েছি বা কতটুকু। প্রকৃতি বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে করেছে সম্পদশালী, স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান করেছে দূরীভূত। প্রকৃতির কোনায় কোনায় মানুষ বিজয়ীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন বেড়েছে অনেক আর মানুষের ভোগের সামগ্রীও হয়েছে প্রচুর। মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার হয়েছে চরম বিকাশ-সমাজ ও সভ্যতার পরিসরও গেছে তাই বেড়ে। আমরা তাই হতবাক হয়ে যাই আমাদেরই সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে।

এতো গেলো জীবনের উজ্জ্বল দিক। অন্যদিকে বস্তুতান্ত্রিক এই সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে আমাদের জীবনের চরম অধ:পতন সূচিত হয়েছে। পশ্চিমের এই সভ্যতায় আমরা

www.icsbook.info

পেয়েছি অনেক, কিন্তু হারিয়েছি তারও বেশি। মানব জীবনের গোটা কাঠামোকে ধ্বংস করেই এই সভ্যতা গড়ে তুলছে এর সৌধ। বস্তুর উন্নতি তাই জীবনের স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারেনি। প্রকৃতি জয়ের সংকল্প নিয়ে যে যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলাম, তা এখন আমাদেরই জীবনকে সংশয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে, বিঘ্নিত করছে আমাদের গোটা অস্তিত্বকে। আমরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আমাদের জন্যেই ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন করছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে সত্য কিন্তু তার বিবেককে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর এজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের ধ্বংস কাজেই ব্যাপৃত। (Russel) তাই বলেছেন : Knowledge is power but it is power for evil justs much as good. It follows that unless man incresaes in wisdom as much as in knowledge, increase of knowledge will be increased of sorrow.

বস্তুতান্ত্রিক দর্শন জীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মানবসত্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মূল্যমানকে অস্বীকার করেছে। বস্তু বিজ্ঞান মানুষকে জড় বস্তুর একটি রূপান্তর ছাড়া আর অধিক কিছু অল্পনা করতে পারেনি, মহাকাশের অসীম বুকে ভাসমান একটি গ্রহের বুকে নৃত্যশীল ক্রীড়নক সত্তার অধিক দাম দেয়নি। জড়-বিজ্ঞান তাই মানুষকে বলেছে, "The level of a mere reflex mechanism a mere organ motivated by sex, a mere semimechanical, semi psychological organism devoid of may divine spark, of may absolute value, of anything noble and sacred, আর তাই বোধ হয় Alixis Carrel দুঃখ করে বলেছিলেন : Today the most neglected field of study is poor man.

আধুনিক জীবন দর্শনে চূড়ান্ত সত্য (absolute truth) বলতে কিছু নেই। পুরাতন সত্যের সাথে নবাগত সত্যের সংঘর্ষের ফলে দুটোই বিলুপ্ত হচ্ছে, সেখানে Synthesis হচ্ছে নতুন আর একটি সত্যের। তাও আবার আপেক্ষিক ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক যুগ সভ্যতা জীবনের নৈতিক ও আর্থিক দিক অস্বীকার করে কেবল দৈহিক সত্তারই সৃষ্টি সাধন করে যাচ্ছে, অখণ্ড জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন water compartment গড়ে তুলেছে। দেহ ও আত্মার হয়ে পড়েছে দুর্বল, আর এভাবে গোটা জীবন পরিণত হয়েছে একটি মৃতদেহে।

আধুনিক যুগ-সভ্যতার প্রবণতা হচ্ছে-জীবনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (dialectical materialism) দ্বারা ব্যাখ্যা করা। ফলে অতীতের সকল সত্যই আজ সন্দেহের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতকে অস্বীকার করে করে বর্তমান সর্বস্ব হওয়ার এক উৎকট মানসিকতা আধুনিক মানুষের মজ্জাগত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। জীবনের পরম সত্যগুলোর ক্ষেত্রেও আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগের ফলে সৃজনশীল মানুষের কর্ম-প্রেরণা

www.icsbook.info

অনেকখানি কমে এসেছে। কারণ আমি আজ যে সত্যের সৃষ্টি করবো তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের আগেই বিলীন হয়ে যাবে-ক্ষণিকের স্থায়িত্বের জন্যে নিশ্চয়ই আমার মনে কোনো বৃহৎ সৃষ্টির প্রেরণা জাগতে পারে না। সরোকীন আধুনিক সভ্যতার এই বীভৎস চিত্রই অংকন করেছেন : `Yesterday's values are absolute tomorrow and who can create anything perenial in this inconstent Niagra of change. By virtue of this fevrish, change, our culture devours its own creations as soon as they emerge. Today it builds enormous buildings from steel and concrete, tomorrow it tears then down. Today is erects a temple to some new fangled god in science and Philosophy, in to religion and fine atrt, and in any of its compartments tomorrow it will demolish in smoke, in this sense our culture is new cronous incessantly devowing his own children. Hardly anything perrenial Can be created and nothing can survive this perrenial destruction.

বস্তুর মূল্যমান এখানে কখনও তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না-নির্ধারিত হয় তার পরিব্যাপ্তিতে। আমাদের দৃষ্টিতেই তাই যা কিছু বৃহৎ, তাই মহৎ। অন্যদিকে আণবিক শক্তির অপব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে-সংশয়ের আবর্তে আমরা প্রতিনিয়তই ঘুরপাক খাচ্ছি। জড়বাদী দর্শন শিখিয়েছে-জোর যার মুলুক তার, বেঁচে থাকার অধিকার তারই আছে যে জড়জগতের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বিজয়ী হতে পারে। দুর্বলকে গ্রাস সবল তার নিজস্ব অধিকার বলে মনে করে।

পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো তাই প্রাচ্যদেশীয় ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে শোষণ করা কোনো নৈতিক অন্যায় বলে মনে করে না। কারণ নিরন্তর সংগ্রাম মুখর এই পৃথিবীতে দুর্বলের বাঁচারই কোন অধিকার নেই।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তাই সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের কোনো সমৃদ্ধি আনতে পারেনি। সংঘাতের মুখে পড়ে কেবল মানুষ মার খাচ্ছে, জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর শূন্যতা। আধুনিক শিল্প সভ্যতা ও বিশৃংখল জীবন দর্শনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই এক মনীষী বলেছেন: People are fleeing from their ghosts pursuing them fleeing from their inner natures the material prosperity, sexsual enjoyment and Sexsual satisfaction lead to a sinking into the morass of nervous and psychological disease, sexual perxervion, constant anxiety, illness and misery. Frequent crime and lack of human dingnity in life.

সংশয়ের আবর্তে আমাদের জীবন। আর সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত হওয়ার প্রধান কারণই হলো আমরা বস্তুর দাসত্ব করছি নিজেদের মাথাকে বস্তু দেবতার সামনে নত

www.icsbook.info

করে দিয়েছি। বস্তু বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, ও ক্রমবিকাশে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমরা নিজেরাই মানবজাতিকে পরিচালনার জন্যে আইন প্রণয়ন করছি, বিধান দিচ্ছি। এভাবে এক গোষ্ঠী সেজে বসেছে বিধানদাতা প্রভু আর অবশিষ্ট মানুষ তাদেরই দাসত্ব করছে। অথচ মানবজাতির জন্য সুষ্ঠু বিধান দিতে হলে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই বিধানদাতা সত্তার।

প্রথমত তাকে হতে হবে গোটা মানবজাতির ওপর ন্যায়পরায়ণ, যাতে করে কোনো মানুষ বা মানব সমষ্টির ওপর পক্ষপাতিত্ব না হয়। দ্বিতীয়ত তাকে মানুষের দৃশ্য-অদৃশ্য অনভূত-অনুভূত সকল প্রকৃতির সাথেই হতে হবে পরিচিত। তৃতীয়ত তাকে একাই সকল মানুষের জন্যেই হতে হবে কল্যাণকামী ও মঙ্গলময়। চতুর্থত: মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে। উল্লিখিত চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয় গুণ মানুষের মধ্যে বর্তমান নেই। আর নেই বলেই মানুষের দেয়া আইন-কানুন সমাজের সঠিক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। একটি সমস্যার সমাধান দিতে যেয়ে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করছে। মোট কথা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে রোগীর যেমন কোনো নিরাপত্তা নেই, তেমনি মানুষের মনগড়া আইন ও বিধানের কাছেও সমাজও জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।

উপরোক্ত চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করলে সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর হাতেই অর্পণ করতে হয়। কারণ তিনি গোটা মানবজাতির জন্যই নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারক। তিনিই কেবলমাত্র মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রকৃতিনিচয়ের জ্ঞান রাখেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্যক দ্রষ্টাও তিনিই। তাই সত্যিকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেবলমাত্র তারই সার্বভৌমত্ব এবং বিধান মেনে নিয়েই গড়ে উঠতে পারে, সংশয়ের আবর্তে, নিক্ষিপ্ত জীবন এভাবেই পেতে পারে মুক্তির সন্ধান। আর তাই কোরআন বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে : আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আর অস্বীকার করেছে তাদেরকে যারা আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিবর্তে মেনে নিয়েছে অপর কোন বিধানকে। কোরআন বলে : তারা কি আল্লাহর মনোনীত পথ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধান করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়, কেবল তারই আনুগত্য করছে। আর তারাও অবশেষে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'

আল্লাহর মনোনীত এই পথই হচ্ছে ইসলাম। অনেকে ইসলাম বলতে বুঝেন মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার ব্যাপার। তাদের মতে ইসলাম একটা আধ্যাত্মবাদ বা পরোলোকতত্ত্ব। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। কোরআনের অধিকাংশ অধ্যায়ই মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছে এবং এই পৃথিবীর জীবন পথের একটা

www.icsbook.info

সুষ্ঠু ইঙ্গিত দিয়েছে। অতএব ইসলাম একটি ধর্মমাত্র নয়, নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম কখনোই মানুষের প্রকৃতি ও তার বস্তু সত্তাকে অস্বীকার করেনি। বস্তুসত্তার বিকাশের ওপর সে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে, তবে মানুষকে বস্তুর দাস করে তুলতে চায়নি কখনও। আর সেই জন্যেই ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদা দিয়েছে-তাকে সকল সৃষ্টির ওপরে প্রতিপত্তিশীল এক সৃষ্ট রূপে ঘোষণা করেছে। ইসলামই মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দিয়েছে- মানবতার সীমার মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানুষের দেয়া ভ্রান্ত আইন ও বিধানের মূলোৎপাটন করে মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে খতম করেছে। এভাবে সে মানব মন ও মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বাস্তব জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে।

কারো কারো ধারণা ইসলাম একটি খোদায়ী বিধান, কাজেই কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। অতীতে আমরা দেখেছি, একদল মানুষের চেষ্টা সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলেই এই জীবন বিধান দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আজো যদি সেই প্রচেষ্টা ও সাধনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে ইতিহাস আর একবার তার অধ্যায় পরিবর্তন করতে বাধ্য।

অনেকে বলে থাকেন ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিলে নিরস ও শুষ্ক হয়ে যায়, বিধি নিষেধের শৃংখলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ভোগের সকল স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে চায়। কিন্তু আসলে এগুলো মোটেও ঠিক নয়। এই বিভ্রান্ত চিন্তাধারা কতটা উদ্দেশ্য প্রসূত এবং অনেকটা অজুহাতবশত: পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই ইসলামকে কেবলমাত্র একটি আদর্শবাদী হিসেবে দেখতে প্রয়াস পান। তাদের লেখনীতে প্রায়ই ইসলামের অবাস্তব ও অনুপযোগী কাল্পনিক রূপে ফুটে ওঠে। উদ্দেশ্যটা হলো ইসলাম সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারার একটা হতাশার সৃষ্টি করা। আসলে সত্য ব্যাপার হলো এই যে, ইসলাম যেহেতু মানুষের জন্যেই একটি জীবনব্যবস্থা এবং মানব প্রকৃতির সাথে পুরো সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই এটি কোনো মতেই মানুষের ওপর তার প্রকৃতি বিরোধী কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। ইসলাম কেবল মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে চায়। ইসলামের নৈতিকতা কেবলমাত্র কতগুলো বিধি-নিষেধের সমষ্টি নয় বরং এ হচ্ছে এক গঠনমূলক শক্তি যা গোটা জীবন ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ইসলামের নৈতিক বিধান অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ন্যায়ের বিকাশ ঘটায় এবং এভাবেই ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন

www.icsbook.info

করে। ভোগের বিরোধিতা ইসলাম কোনো দিন করেনি, তবে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বহুবার। কারণ ভোগের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গোটা সমাজজীবনকে বিষাক্ত করে তুলে সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাই সত্যিকার সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্য মানুষের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে এবং মানব মনকে করে দেয় বিকারগ্রস্ত। এজন্যে ইসলাম প্রথমেই অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন চায়। অবশ্য একথা সত্য যে, অনৈসলামী পরিবেশে একজন মুসলমানের জীবনযাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং দুরূহ ব্যাপার। আর সেজন্যেই বর্তমান মুসলিম জীবনধারার দিকে তাকিয়ে ইসলামকে শুষ্ক ও নিরস এক জীবনব্যবস্থা বলে মনে হয়। ইসলামের সামাজিক পরিবেশকে একজন মুসলমানের জীবন অত্যন্ত সরস ও জীবন্ত। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি আবার বলে থাকেন, ইসলামী জীবনব্যবস্থা তো আলীর শাহাদাতের সাথে সাথেই শেষ। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ক্ষমতা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নেই। কাজেই ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে তারা একটা Uotpia বলে মনে করেন। আসলে তাদের এধারণাও ভুল এবং ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা। ইসলামী জীবনব্যবস্থা মাত্র অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে একক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বিগত হাজার বছরেরও অধিককাল দুনিয়ার সকল অজ্ঞতা ও মূর্খতার সম্মিলিত বাধার সামনে নির্বিকার শাশ্বতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপী মূর্খতার সম্মিলিত আক্রমণে প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা ক্ষয়িত হয়েছে এবং মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুতও হয়েছে: কিন্তু এর আদর্শিক ভিত্তিমূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হতে পারেনি।

একথা সত্য যে, পূর্ণরূপে বিকশিত প্রতিপত্তিশীল একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিলো স্বল্পকালের। ইতিহাসের এই চরম উৎকর্ষের যুগটি আমাদের জন্যে একটা ইঙ্গিত মাত্র ছিলো। অল্প সংখ্যক লোকের প্রচেষ্টা ও সাধনায় যে সত্যের প্রকাশ হয়েছিলো, দুনিয়ার মানুষকে সভ্যতার আলো দান করেছিলো- তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল কল্পনাবিলাস নয়, আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই সত্য।

আদর্শ জীবন

আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলে আসছে বরাবর। এই বিরাট জীবন সমুদ্রে একটি জীবন বুদ্বুদের ন্যায় মিলে যায় আর একটি জীবন তখন পূর্ণ করে তার স্থান। জীবন মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসছি। কিন্তু জীবনের এই অখণ্ড স্রোতের মধ্যে দুই একটি জীবনের সন্ধান মেলে, যা সর্ব বিষয়ে সাধারণ হতে স্বতন্ত্র। মহত্ত্ব, জ্ঞানে কর্মে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের আদর্শ। তাকেই লক্ষ্য করে আমরা ছুটে চলি, এ সীমাহীন মহাসাগরের বুক চিরে চিরে। মানুষের

www.icsbook.info

জীবন তখনই আদর্শতার পর্যায়ে পৌছে, যখন সে হয় বলিষ্ঠ নৈতিকতার অধিকারী, কঠিন সত্যের উপাসক। একটা জীবনকে আদর্শরূপে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চাই তার সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কেননা যে জীবন হবে বিশ্ব মানবের আদর্শ, যাকে লক্ষ্য করে চলবে অগণিত মানুষ, সে জীবন যদি হয় চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযমী, স্বেচ্ছাচারী, তবে বিশ্ব-সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে তখন তখনই; আর এরূপ জীবন কখনোই বিশ্ব মানবের আদর্শ হতে পারে না।

জীবন এক অখণ্ড সাধনার মত। এই সাধনা যে কি তাতে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু সকল মতের গোড়ার কথা এই যে, মানুষ্য জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয়া, অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক বিকাশ সাধন করা ও মানুষের মহান আদর্শকে সার্থক করে তোলাই জীবনের অন্যতম সহায়ক। এই সাধনায় মানব জীবন সুন্দর, ভাস্বর হয়ে মহিমার মহালোকে উত্তরণ করে।

জীবন আদর্শ হয় শিক্ষা-দীক্ষায়, করুণা-প্রেম ও কঠোর আত্ম-শাসনে। কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান অসাধারণ, কিন্তু অন্যান্য উপাদানগুলোর তাঁরা সমানুপাতে উন্নত নন। তাঁদেরকে আমরা কতবিদ্যা বা প্রতিভাবান পুরুষ বলতে পারি, কিন্তু আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ জীবনের অধিকারী বলতে পারি না।

জীবনের সকল কর্ম সুন্দর হয় করুণা ও প্রেমে। বস্তুত প্রতিটি জীবনের প্রতি করুণা ও প্রেম প্রদর্শনই আদর্শ মানবের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কঠোর আত্ম-শাসনে যে মানুষ সত্যিকার জীবন পথের দুরন্ত বাঁধা রিপুগুলোকে বশ করতে পারে, জগতে তার দ্বারা কোনো অত্যাচার বা অনাচার সাধিত হতে পারে না। আত্ম-শাসনে বিজয়ী বীর মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদে কখনও পিছপা হন না। সত্যের অনির্বাণ দ্বীপশিখা নিয়ে তিনি পাড়ি জমান দিক হতে দিগন্তরে, কাল হতে কালান্তরে, জীবন হতে জীবন্তরে। দুনিয়ার কোনো বাতিল শক্তি তার বিরুদ্ধে টিকতে পারে না। সকল মিথ্যার আবরণ ভেদ করে ছুটে চলে সত্যের চিরন্তন শিখা।

প্রাসাদে বাস করলে বা সমাজের নেতা হলে বা অতুল বৈভবের অধিকারী হলেই কাউকে আদর্শ জীবনের অধিকারী বলা যায় না, যে পর্যন্ত না তার দ্বারা জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়

সর্বশেষ কথা হলো এই যে, আদর্শ জীবন বলতে আমরা এমন এক স্তরে জীবন যাত্রা প্রণালিকে বুঝি যা দ্বারা মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক সকল কর্ম সুন্দর হয়। যে জীবন মানুষের সকল কুসংস্কার জ্বালিয়ে দিয়ে, মানুষের চিরদিনের বদ্ধ জ্ঞানের দ্বার ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন শাশ্বত সত্য ও সুন্দর পথের সন্ধান দেয়-তা-ই আদর্শ জীবন। সদগুণ সদবৃত্তির বিকাশে মানুষের জীবন মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বে পূর্ণ করে জীবন ও জগতের কল্যাণ

www.icsbook.info

সাধনই আদর্শ জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম উদ্দেশ্য।

শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি

(এই নিবন্ধটি 'নিপা'র উদ্যোগে আয়োজিত নুরখান কর্তৃক প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর আলোচনা সভায় প্রদত্ত শহীদ আবদুল মালেকের টেপরেকর্ডকৃত বক্তৃতার অনুলিপি। শাহাদাতের মাত্র তেরদিন আগে ১৯৬৯ সালের ২রা আগস্ট তিনি এই ভাষণটি দেন)।

নতুন ঘোষিত শিক্ষানীতির Ideological Basis সম্পর্কে এখানে আলোচনা হতে যাচ্ছে। এখানে এই Basis সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "Pakistan must aim at ideological unity, not ideological vaccum-it must impart a unique and integreted system of education which can impart a common set of cultural values based on the precepts of Islam."

আমার মনে হয় আজকে যারা এখানে আলোচনা করছেন তাদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণাও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে common set of cultural values বলতে হয়তো কেউ বুঝেছেন one set values value কিন্তু তাদের এটা মনে রাখা দরকার যে, Common set of culture value মানে One set of culture value নয়। One set of culture values সোভিয়েত রাশিয়াতে রয়েছে, যেখানে রয়েছে একটা Authoritarian society আর সেখানে বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রগুলো তাদের Culture-কে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে একটা One set of culture values তৈরি করেছে। আমরা এটার বিরোধী। আমরা এখানে চাই common set of culture values, not one set of culture values.

এরপরে পরবর্তী পর্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? আমি এখানে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা না করে শুধুমাত্র মহাকবি Milton এর একটা কথা আলোচনা করতে চাই। Milton বলেছিলেন Education is the harmonious development of body, mind and soul. GB body, mind and soul-এর harmonious development কোন ideology বা কোন আদর্শ ছাড়া কি হতে পারে-যারা ideology শিক্ষা ব্যবস্থা চান না তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা।

এরপরে আমি আপনাদের কাছে যে জিনিসটা আলোচনা করতে চাই তা হলো Milton-এর এই সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা যদি দেখি তবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিচেতনা এবং সঠিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও জাতীয়মতের সৃষ্টি করা। আর যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের mental, physical Ges moral training দিয়ে তাদেরকে এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাতে করে তারা ভবিষ্যতে জনসমষ্টির সাথে একটি common culture এবং ideological

www.icsbook.info

basis-এর bridge তৈরি করতে পারে এবং এরপর এখনকার যে আদর্শ রয়েছে সেটা যাতে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে increase হতে পারে-এরকমই একটা পরিকল্পনা রয়েছে Milton এর এই সংজ্ঞার ভেতর।

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার যারা প্রবক্তা তারা আজ পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে পাশ্চাত্য সমাজে liberal education এর নাম দিয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যে ব্যবস্থায় শিক্ষিত আমেরিকার একজন Social Philosopher এবং educationist নিজেই বলেছেন যে, Three kinds of progress are significant progress in knowledge and technolgy, progress in socialization of man progress in Spirituality. The lust on is the most important" আর এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে Albert Schezer. তিনি যে বই লিখেছেন, তার নাম হচ্ছে The Teaching Of Reverence For Life' তিনি বর্তমান আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা secular Ges liberal শিক্ষাব্যবস্থা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেখানে একটা turning point- এ শিক্ষাকে Ideologically orient করার চেষ্টা করতে বলেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন Our age must achieve spiritual renewal. A new renaissance must come-the renaissance in which man kind discomered that ethical action is the supreme truth and be supreme utilitarianism by which mankind will be liberated: এই spiritual liberation ছাড়া mankind এর কোন liberation হতে পারে না। তিনি এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলেছেন। আমার মনে হয় আর কোন কথা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। এজন্য যে পাশ্চাত্য ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা তথা liberal education এ শিক্ষিত একজন ব্যক্তিই বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছেন। আমার কথা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের বুকে ২২ বছর পর্যন্ত এই secular এবং ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সমাজে এমন কতগুলো ম্যাকলের brain child এবং brown English man তৈরি করছে-যাদের মুখ থেকে আমরা ধর্মহীন শিক্ষার কথা শুনেছি। কিন্তু জেনে রাখা দরকার এ শিক্ষাব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হয় আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এবং যখন এই শিক্ষাব্যবস্থা fail করলো মুসলমানদের মধ্যে তখন Sir William Hunter কে এর assesment করতে দেয়া হয়েছিল। উনি কি কথাগুলো বলেছিলেন দেখুন। তিনি বলেছেন, "The truth is that our system of public instruction is opposed to the tradition, unsuited to the requirement and hateful to the religion of Musalman."

যারা বলেন যে, ইসলামে ideology কী তাদেরকে আমি বলবো যে, আপনি ইসলামের ইতিহাসের ওপর পর্যালোচনা করুন। ইসলামের ইতিহাস দেখে তারপর বলুন ইসলামে ideology কী। ইসলমে ideology বা ইসলামে culture- এর ভিত্তিতে যে সমাজ

www.icsbook.info

এবং society গড়ে উঠেছিল সেখানে স্থানীয় culture- বা স্থানীয় সংস্কৃতিরও দাম ছিল এবং সে সব বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। Soviet Russia-র মত সেখানে one set of culture করা হয়নি, common set of culture করা হয়েছিল।...

(এরপর তার বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বক্তৃতা শেষ করতে হয়।)

একটি স্বর্ণোজ্জ্বল উপলব্ধি

ইসলামী ছাত্রসংঘের ষোড়শ নিখিল পাক সম্মেলন নভেম্বর (১৯৬৭) ষোল তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে-খবরটা আগেই পেয়েছিলাম। নিজামী ভাই বলেছিলেন সম্মেলনে যোগদান করতে হবে। ব্যাপারটাকে খুব বেশি একটা আমল দেইনি। ভাবছিলাম উর্দু তো জানিও না বুঝিও না। সম্মেলনে গিয়ে করবটা কী? পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের সাথে দু'দণ্ড কথা বলতে পারব না কিসের জন্যে তারা সত্যের এ ডাকে সাড়া দিয়েছে। শুনতে পাবনা কোন আহ্বানে জান-মাল কোরবান করে দেয়ার শপথ নিয়েছে পাঠান, বালুচ, সিন্ধি, আর পাঞ্জাবি যুবক। আমার হৃদয়ের ভাবটাও তাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না। বলতে পারব না তাদের কাছে পদ্মা, যমুনা আর মেঘনার কুলে কুলে ইসলামী ইনকিলাবের ঢেউ কিভাবে দুরন্ত তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে। বুঝাতে পারব না কিভাবে চট্টলার সমুদ্র শিশু খাইবারের পর্বত শিশুর সাথে একান্ত হয়ে গিয়েছে। দুরন্ত পাঠান শিশু বন্দুক কাঁধে পাথরের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ানো যার অভ্যাস, কি করে সে আটকা পড়ল এ কাফেলায়। সিন্ধি যুবকের যে রঙ্গীন খোয়াব সিন্ধুর নীল জলে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করত কি করে তা সত্যের জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল তার উত্তর পাব কোথায়। এমনি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তা নিয়েই বিমানে উঠেছিলাম।

আশা ছিল লাহোর বিমান বন্দরে একটা বিরাট রকমের সংবর্ধনা পাব। কিন্তু প্লেন পৌছাতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় সে আশাটুকু আগে ছেড়ে দিয়েছিলাম। বিমান বন্দরে পৌছালে এক কোণ থেকে পাঞ্জাবি যুবক দৌড়ে এসে আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরল। এ যেন কতদিনের পরিচিত।

মনে হল একই আদর্শের ছায়াতলে মানুষ যারা তারা তো এক ও অভিন্ন হৃদয়, হোক না দু'জনে ব্যবধান কয়েকহাজার মাইল। ভাইটির বুকে কান পেতে শুনলাম সহস্র মুজাহিদের কণ্ঠে ধ্বনি উঠছে যেন আল্লাহু আকবার।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে মোলাকাত হল অপেক্ষমাণ কর্মী ভাইদের সাথে। সবাই আমাদের কুশল জিজ্ঞাসায় ব্যক্তিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অনেক আলাপ হল। কর্মী ভাইদের সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু ও ইংরেজিতে বেশ আলাপ জমে উঠল। প্রাণের আবেগ ভাষার বাঁধ ডিঙ্গিয়ে যেতে লাগল। একটি সত্যই তখন আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল প্রাণ যেখানে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেখানে একই মূর্ছনায় অনুরণিত

www.icsbook.info

সেখানে কোন বাধাই বাধা নয়। চারদিনের সম্মেলন। প্রথম থেকেই সম্মেলনকে বানচাল করার বিরাট ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। তাই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার মাত্র একদিন আগে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জারি করা হল ১৪৪ ধারা। নতুন ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মী ভাইদেরকে কি দুর্ভোগটাই না ভুগতে হল ক'দিন। কিন্তু এত ভোগান্তির মধ্যেও তাদের উৎসাহ এতটুকু ভাটা পড়তে অথবা চেহারায় এতটুকু পরিশ্রান্তির ভাব দেখিনি, এটা আমার কাছে বেশ একটু অদ্ভুতই লেগেছিল।

ষোলই নভেম্বর শুরু হল সম্মেলন। গোটা সম্মেলনের চারটি দিক ছিল :

(ক) সিম্পোজিয়াম, (খ) কর্মীদের জন্য শিক্ষণীয় বক্তৃতা, (গ) রিপোর্ট অধিবেশন ও (ঘ) আরকান ইজতেমা।

সব অধিবেশন সম্মেলন স্থানেই করার কথা ছিল। কিন্তু সরকারি হস্তক্ষেপের দরুন এগুলো বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক সিম্পোজিয়ামগুলো অনুষ্ঠিত হত দু'মাইল দূরের এক কলেজ প্রাঙ্গণে আর অন্যান্য অধিবেশনগুলো স্থানীয় মসজিদ অথবা পাশ্ববর্তী একটা স্কুলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হত। উর্দুটা তখনও বুঝে উঠতে পারিনি পুরোপুরি। কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় ভাষার চাইতে ভাবের আশ্রয় নিই বেশি।

রিপোর্ট অধিবেশন বেশ ভালই হল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমের খতিয়ান আমায় নতুন আশার আলো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার যুবক ইসলামের দীক্ষা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের সে শূন্যস্থান পূরণ করছে আর একদল জিন্দাদিল নওজোয়ান। এভাবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বিরাট অংশ ইসলামী জীবনদর্শনের বাস্তব ট্রেনিং নিচ্ছে। এদের এ গতিকে রোধ করা অসম্ভব।

আরকান ইজতেমার একটি উপলব্ধি এখনও আমার আশার দিগন্তে সম্ভাবনার এ অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। বার্ষিক আরকান ইজতেমার শুরুতেই রোকনিয়াতের শপথ পড়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের এক যুবক আর পশ্চিম পাকিস্তানের একজন। দু'জনের কণ্ঠেই আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেখার অসীম আকুতি। দূরবর্তী দুটো পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চলের দুটি যুবকের এ আকুতি আমার মনে গভীর রেখাপাত করল, আমায় স্মরণ করিয়ে দিল-পশ্চিম জেগেছে, পূর্ব জেগেছে দুর্জয় মুসলিম বীর তরুণেরা, সাফল্য এদের সুনিশ্চিত। আমার সম্মেলন অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠতম দিক কর্মীদের ব্যবহার এবং তাদের Performances বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতিতে অভ্যস্ত কর্মীদের একই পরিবারের লোক বলেই মনে হচ্ছিল। পাঠান, পাঞ্জাবি, বালুচি যুবককে একই পালে রুটি নিয়ে খেতে দেখেছি। এদের এক সাথে খাওয়া, এক সাথে নামাজ সাক্ষ্য দিচ্ছিল জিহাদের ময়দানেও এরা এক সাথে জান দেবে। হয়তো দ্বীনের

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠা হবে আর নইলে দ্বীনের সংগ্রামে পাঠানোর রক্তরেখা বাঙালি মুজাহিদের রক্তস্রোতে মিশে যাবে-সত্যেরও সাক্ষ্য উপলব্ধি করছিলাম এরই মাঝে। নাজেমে আলা উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন- একটি বছর পর আমরা নিতান্ত আল্লাহর মেহেরবানিতেই সমবেত হয়েছি এখানে। আমরা যদি আরামে খানা পিনার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসে থাকি, যদি সুখনিদ্রা অথবা লাহোরের সৌন্দর্য দর্শন আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা হবে আমাদের জন্য চরম ভুল। বরং আমাদের মাকসাদ তো এই যে, আমরা এখানে একটি বছরের কাজের খতিয়ান নেব, মিলতে চাইব অন্য স্থান থেকে আগত কর্মী ভাইদের সাথে, জানতে চাইব আন্দোলনের পথে তার সমস্যা কী? দাওয়াত, তানজিম ও তরবিয়াতের সঠিক রূপরেখা কী? একটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখলেই আমাদের এ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। সম্মেলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কর্মীর কাজে ও কথায় এ হেদায়েতেরই বহিঃপ্রকাশ।

সম্মেলনের ক'টি স্মরণীয় দিক এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। কর্মীদের উদ্দেশে চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদের ভাষণ...। অনেক কষ্টে মাইকের অনুমতি পাওয়া গেছে। নাজেমে আলা সবেমাত্র শুরু করেছেন আর অমনি মাইকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। ভাবলাম হয়তো বিক্ষোভের ঝড় উঠবে, আলোচনা সভা প্রতিবাদ সভায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু প্রথম দিকে একটু গুঞ্জন, মাত্র ছিল। নাজেমে আলা গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, শত বাধা সত্ত্বেও আমরা সম্মেলন সফল করে তুলতে চাই। আর অমনি সব চুপ-চাপ। শীতের কুয়াশায় ঢাকা খোলা আসমানের নিচে বসে রাত নটা পর্যন্ত সবাই মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনল। সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের এ এক অনন্য প্রতিফলন বলেই আমার মনে হল। শুধু তাই নয়- দৈনিক ছ'সাত ঘন্টা করে সামানাবাদ মসজিদের মেঝেতে বসে বসে বক্তৃতা শুনতে হত। বসে থাকতে থাকতে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যেত, কোমর ও বুক টন্ টন্ করে উঠত। কখনও অধৈর্য হয়ে চলে আসতে চাইতাম। কিন্তু অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে এতটুকু অধৈর্য অথবা শ্রান্তির ভাব আমার চোখে পড়েনি। তাদের চেহারার দীপ্তি মনের প্রফুলতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল-শত বাধা সত্ত্বেও আমরা সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে চাই। আরাম আয়েশের জন্যে আমরা এখানে আসিনি। ধৈর্য ও শৃংখলার এ উদাহরণ আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপনাটা ছিল খুবই মামুলি ধরনের। বিশেষত অনিবার্য কারণে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। একদিন তো অনেক কর্মীকে প্রায় না খেয়েই থাকতে হল। অন্য আর একদিন সকালে নাশতা মিলল না। তবুও কোন অভিযোগ শুনিনি কারো মুখে। ক্ষুধার্ত কর্মীকেও দেখেছি হাসিমুখে অন্য কর্মীর সাথে আলাপ করতে, অন্যের খোঁজ নিতে। আমরা এখানে খাওয়ার জন্য আসিনি, এসেছি বিরাট এ মাকসাদ নিয়ে-এ যেন এ কথারই বহিঃপ্রকাশ।

www.icsbook.info

করাচির এক কিশোর কর্মীকে জিজ্ঞাস করলাম 'ভাই সংঘের সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' ভাইটি উত্তর দিল যে সে সংঘের সাথী। বললাম, রোকন (সদস্য) হবেন না? হেসে উত্তর দিল, তার জন্যেই তো চেষ্টা করছি। আল্লাহর পথে জান মালের বিনিময়ে মহান এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেয়ার জন্য কিশোর এ বালকের এ আগ্রহকে সেদিন অভিনন্দন না জানিয়ে পারিনি। রোকন প্রার্থীদের দু'একজনের সাথেও আলাপ হয়েছিল। তারা খোলাখুলিভাবেই বলল, অধিকারের দিক দিয়ে তারা রোকন নয় সত্য কিন্তু দায়িত্ব ও জিম্মাদারির দিক দিয়ে রোকনের চাইতে কম হলে চলবে কী করে?

আমরা ক'জন পূর্ব পাকিস্তানি ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইদের আগ্রহের শেষ নেই। বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের ক্রমধারা জানতে তারা বড় বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। সাবেক সিন্ধুর গ্রাম্য এলাকা থেকে আগত এক কিশোর কর্মী আমাদের একজনের সাথে তো বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল দেখলাম। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, আমার ঐ ছোট্টভাইটি উর্দুও ভাল করে বোঝে না।

ফল-মূলের দেশ পশ্চিম পাকিস্তান। এখানে এসে ফল-মূল না খেয়ে যাব না। এই ভেবে জামাল ভাই আর আমি দাঁড়িয়েছি একটি ফলের দোকানের সামনে। পাশে দাঁড়িয়েছিল স্কুলের কয়েকটি ভাই। আমাদেরকে তারা কিছু কিনতেই দিল না। বললাম, তোমরা তো আমাদের ছোট ভাই, তোমাদেরকে খাওয়ানো আমাদের কর্তব্য। চট করে একটি ছোট্ট ভাই জবাব দিল, নেহি, আপতো হামারা মেহমান হায়। ছোট্ট এই ভাইটির মেহমানদারিতে সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারিনি। পশ্চিম পাকিস্তনি কর্মী ভাইয়েরা হালকা অথচ নির্দোষ আমোদ প্রমোদও বেশ অভ্যস্ত। গান-গজল, হাস্যরসে তরুণদের এই আন্দোলনকে তারা সরস করে রেখেছে। পেশওয়ারের চিশতি ভাইদের গানের ছন্দে সেদিন সরস প্রাণেরই প্রতিধ্বনি খুঁজে পেয়েছিলাম।

বান্ধব সংগঠনের সদস্য ভাইদের আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্বকে ভুলতে পারব না। নসরুল্লাহ শেখের বিরাট বুকে বুক মিলিয়ে ভেবেছিলাম আমি এদের কারো পর নই। জাফরুল্লাহ খান সাহেবের মুখে দেখেছিলাম বিশ বছর আগের এক যুবক কর্মীর অনবদ্য প্রতিচ্ছবি। নসরুল্লাহ খান আজিজ সাহেবের মত বৃদ্ধ লোকও গৌরবে সেদিন দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ বিশ বছর আগে এ মহান কাফেলার নামটি দিয়েছিলেন তিনিই। বিকেলের পড়ন্ত রোদে লাহোরের সেই ছোট্ট বাগান বাড়িটির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আদর্শের অচ্ছেদ্য এ বন্ধন বিস্তার লাভ করেছে স্থান হতে স্থানান্তরে, যুগ হতে যুগান্তরে।

সম্মেলন অভিজ্ঞায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা না বললে নয়। সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র ও জনজীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করার সুযোগ

www.icsbook.info

পেয়েছিলাম। এখানে শিক্ষার পরিবেশ শান্ত ও কোলাহলমুক্ত গণ ও ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক ব্যাপারে বড় একটা সচেতন বলে মনে হল না। তাই লাহোরের এক কর্মী ভাইকে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলাম We have been economically Suppressed but you are Politically Sabotized."

লাহোরের সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও কিছু বলতে হয়। ভেবেছিলাম, হয়তো সবাই ধনী, গরিব মানুষের সেখানে অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আমার এ ধারণা যে কত বড় ভুল ছিল নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না। সাধারণ মানুষ সেখানেও আমাদের এখানকার মতই শোষিত বঞ্চিত। তাই তো সেদিন ম্যাকলিয়ান রোডের উন্মুক্ত আকাশের নিচে বস্তির দরিদ্র পরিবারগুলোর সাথে ঢাকার বস্তির লোকগুলোর কোন পার্থব্য দেখিনি। পার্থক্য দেখিনি, সামনাবাদের ঐ অন্ধ শীর্ণ ভিখারিনীর সাথে ঢাকার যেকোন ভিক্ষাজীবীর।

ঢাকায় ফিরছিলাম। বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মীভাইয়েরা এসেছিল বিদায় জানাতে। শেষ অভিবাদন জানিয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিমানে আরোহণ করেছিলাম। বিমান উড়ে চলল অসীম আকাশের বুক চিরে। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝ থেকে মনে হল ইসলামের ইনকিলাবি ঝাণ্ডন নিয়ে নওজোয়ান মুজাহিদদের যে দুরন্ত কাফেলা এগিয়ে চলেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, পশ্চিম হতে পূর্বে কার সাধ্য তার সে পূর্ণ গতিতে বাধা দেয়? খায়বারের গিরি চূড়ায় ইনকিলাবি জীবনের যে পতাকা উড়ে সীতাকুণ্ডের ঝর্ণাধারায় তারই প্রতিচ্ছবি ভাসে; সিন্ধুর মউজের মাথায় যে ইনকিলাবি জোয়ার উঠে পদ্মা, যমুনা আর মেঘনার জলে তারই কাঁপন লাগে। দুঃসাহসী পাঠান, চঞ্চল সিন্ধি, গর্বিত পাঞ্জাবি আর নিরীহ বালুচি যুবকের মনের আকাশে সত্যের যে শুকতারা জ্বলে তার আলোতেই তো ভাস্বর হয়ে উঠেছে বাঙালি যুবক হৃদয়। খাইবারের পাঠান-শিশুর চোখে সত্যের যে দ্যুতি দেখে এসেছি চট্টলার এক নওজোয়ানের মুখে তো তারই ছাপ দেখেছি। আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহরই জমিনে কায়েম করার দুর্বার শপথ নিয়ে এগিয়ে চলেছে পূর্ব ও পশ্চিমের হাজারো তরুণের এ কাফেলা। জীবন সিন্ধুর এ উত্তাল তরঙ্গ রোধ করার শক্তি কোন শক্তির নেই। এদেশে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই সত্য-এটাই ছিল আমার উপলব্ধির স্বর্ণোজ্জ্বল দিক।

www.icsbook.info

সুখ, শান্তি ও শিক্ষা

ড. আহসান হাবীব ইমরোজ

সুখ ও শান্তি। ছোট্ট দুটি শব্দ। কিন্তু এই পরমাণুসম শব্দ দুটিতেই লুক্কায়িত আছে মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতকেন্দ্রিক সকল কার্যক্রমের মূলীভূত লক্ষ্য । এমনকি সমগ্র মহাবিশ্বের কোটি কোটি মাখলুকও এর বাইরে নয় । বাড়ি, গাড়ি, ধন, খ্যাতি মানুষকে সুখ-শান্তি দেয় এটি মানুষের আপাত: বিশ্লেষণ । আর তাই বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এগুলি যেন তেন প্রকারে অর্জনের জন্য মারাত্মক এক ম্যারাথনে লিপ্ত। শুধু কি তাই? দুনিয়ার সকল বিভ্রাট, হট্টগোল, মারামারি এমনকি যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ সবই কিন্তু তাদের জনকদের ভাষায় এই সুখ আর শান্তির জন্যই। আজকে ইরাক, আফগানিস্তানে ধ্বংসযজ্ঞ, চেচেন, বসনীয়, কাশ্মীরী আর ফিলিস্তিনিদের হত্যাযজ্ঞ সবই এসবের স্রষ্টাদের ভাষায় বিশ্বশান্তির জন্য । এমনকি দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের মহানায়করা এই শান্তির বাহানাতেই কোটি কোটি নিরীহ মানুষদের রক্ত ও লাশের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিলেন । কিন্তু যুদ্ধের স্রষ্টারা কি সুখ-শান্তিনামক সোনার হরিণটি ছুতে পেরেছেন ? সম্ভবত নয় , বেশি দুরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এইতো আমাদের নিজের দেশেই ১৭৫৭ সালের পলাশীর আম্রকাননে যারা বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অস্তমিত করেছিল । তারা সাময়িকভাবে আকাশছোঁয়া লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ আর অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেও ইতিহাস সাক্ষী তাদের প্রত্যেকের পরিণতি হয়েছিল ভয়ঙ্কর ধ্বংস।

পয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায় না

(এএফপি)-আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (ইউএসসি) এর গবেষকরা “ক্যাম্পেইনিং হ্যাপিনেস” শীর্ষক গবেষণায় দেখেন ‘অধিকাংশ মানুষই যত

www.icsbook.info

ধনী হয়ে ওঠে তত সুখী হয় না '। ২০০৩ এর আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স এর ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কে জানা যাবে । গবেষণায় দেখা যায়, সুখী হওয়ার কোন নির্ধারিত মাত্রা নেই । ১৯৭৫ সাল হতে প্রতি বছর ১৫০০ লোকের ওপর এ জরিপ চালানো হয় । জরিপের ডাটা বিশ্লেষণকারী ইউএসসি'র অর্থনীতিবিদ রিচার্ড ইস্টারলিন বলেন, অনেকের মধ্যেই এই মোহ কাজ করে যে, আমরা যত অর্থ উপার্জন করবো ততই সুখী হব । তিনি বলেন, আমরা আমাদের পরিবার ও স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনে সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করি । সমস্যা হচ্ছে উপার্জন বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চাহিদাও যে বেড়ে যায় তা আমরা বুঝতে পারি না । গবেষণায় দেখা যায় সুখী হওয়ার প্রধান কারণ গুলি হচ্ছে, ১.'প্রিয়জনের সাথে সুখময় সময় কাটানো ২. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া ৩. বন্ধুবাসলতা ৪.আশাবাদী মন ৫. আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা তথা ধৈর্য ৬. নীতিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং ৭. নিজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরাই সুখী হন।

অপর দিকে ধন, যশ, খ্যাতির ভেতর যারা সুখ খুঁজেছেন তারা ব্যর্থ হয়েছেন বিশ্বখ্যাত অনেক চিত্রতারাকা, আর্নেস্ট হোমিংওয়ে, কাওয়াবাতার মতো নোবল পুরস্কার বিজয়ী সাহিত্যিক এবং হুন্দাই কোম্পানির মালিকের মত শ্রেষ্ঠ ধনীদের আত্মহত্যাই-এর প্রমাণ।

তাই কিসে সুখ-শান্তি এটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে দামি প্রশ্ন। পৃথিবীর লাখো দার্শনিক ও ঋষিদের মাথার চুল পেকে গেছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে। যেমন বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক এরিস্টটল বলেন "সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মার অনুভবের প্রকাশই হচ্ছে সুখ" প্রায় এক হাজার বিলোনিয়ার তৈরি করেছিলেন যে মার্কিন আয়রন কিং সেই এন্ড্রু কার্নেগি বলেন "সুখের সবচেয়ে গূঢ় রহস্য হল ত্যাগ।" ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব এর ভাষায় "নিজের চাহিদা কমিয়ে আনার মত সুখ আর নেই। সেই হচ্ছে আসল সুখ। বিশ্ববিখ্যাত নোবল বিজয়ী সাহিত্যিক লিও টলস্টয় যিনি ছিলেন জমিদার পুত্র কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন ঋষির বেশ তিনি বলেন "অল্পেতে তুষ্ট থাকতে পারলেই জীবনকে মধুময় মনে হয়।"

কবি কামিনী রায় বলেন

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভূলিয়া যাও"।

সবশেষে হাদিসে বলা হয়েছে আত্মার অভাব মুক্তিই হচ্ছে সত্যিকার সুখ

তাই মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে সত্যিকার সুখের জন্য দরকার

www.icsbook.info

আলোকিত জীবন । আর এই আলোকিত জীবনের জন্যই সবার আগে দরকার যে অনুষঙ্গ তার নাম শিক্ষা। সত্যিকার শিক্ষা ও শান্তি পারস্পরিক সম্পর্কিত দু'টি বিষয়।

প্রচণ্ড জিনিয়াস বা স্মরণশক্তিসম্পন্নদের নিয়ে গবেষণা করেছেন আমেরিকার এক্সেটোর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মাইকেল হাও। তিনি কিছু কথা বলে সারা বিশ্বে ঝড় তুলেছেন "সাধারণ মানুষ ও জিনিয়াসদেও ভেতর কোন পার্থক্য নেই"। তার মতে জিনিয়াসরা প্রত্যেকেই তৈরি হয়। তবে একটি বিষয়ের ওপর তিনি খুবই গুরুত্ব দেন, সেটি হলো পারিবারিক শান্তি। যে পরিবারে যত বেশি শান্তি আছে এবং যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা যতবেশি হাসিখুশি পরিবেশের মধ্যে বড় হতে পারে সে পরিবার থেকে ততবেশি জিনিয়াস জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গীর অনুপ্রেরণাও অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রফেসর হাও ব্রিলিয়ান্ট সাইন্টিফিক মাইণ্ড নিয়েও কাজ করেছেন । আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তার পরিবারের পরিবেশ ভাল ছিল এবং সেখান থেকে তিনি প্রচুর উৎসাহ পান যা তাকে জগৎবিখ্যাত হতে সহায়তা করে। প্রফেসর হাও এর মতে একজন মানুষের সাফল্যের মূল বিষয় হচ্ছে "ব্যক্তিগত পরিশ্রম, কাজ করার সুযোগ, পারিবারিক উৎসাহ এবং শান্তি"। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন পরিবারে টাকার চেয়ে শান্তির বেশি প্রয়োজন। প্রফেসর হাও তার নিজের লেখা বই 'হাউ টু বি এ ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস ইন টেন ইজি স্টেজেস,' 'গিভ ইউর চাইল্ড এ বেটার স্টার্ট,' জিনিয়াস এক্সপেইন্ড এগুলিতে তিনি আরো বিস্তারিতভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা ও সভ্যতা একই সূত্রে গাথা। বর্তমান মানব সভ্যতা শিক্ষারই ফলশ্রুতি। চলমান সময়ে অগ্রসরমান এই পৃথিবীতে শিক্ষা সবচাইতে আকর্ষণীয়, সবচাইতে আলোচিত এবং সবচাইতে ব্যবহৃত এক অনুষঙ্গ ।

শিক্ষা কী ও কেন ?

বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শাস ধাতু হতে। শাস ধাতুর অর্থ হচ্ছে শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশ দান করা, উপদেশ দান করা ইত্যাদি । উল্লেখিত শব্দটি মূলত বিশেষ কৌশল অর্জনের ওপর জোর দেয় । ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'শিক্ষা' বলতে বিশেষ জ্ঞান কিংবা বিশেষ কোন কৌশলকে আয়ত্ত করা বুঝায় ।

শিক্ষা শব্দটি ইংরেজি Education শব্দের বাংলা রূপায়ন । Education শব্দটি ল্যাটিন Educatum. Educare এবং Educere শব্দ হতে এসেছে। এ শব্দগুলির অর্থ হলো বাহির করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, লালন করা, পরিপুষ্টি সাধন করা, পরিচালিত করা ইত্যাদি। Joseph T. Shipley তার Dictionary of Word Origins, এ লিখেছেন Education

www.icsbook.info

শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Edex, এবং Ducer-duc, শব্দগুলি থেকে । এগুলির শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথপ্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্তপ্রতিভা বিকশিত করে দেয়া । OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY তে Education শব্দের অর্থ করা হয়েছে "Knowledge, Abilities and the development of character and mental powers that result from such training: Intellectual, moral, physical etc Education.

সক্রেটিসের মতে : মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার ।

প্লেটো বলেছেন : শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছুই প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ।

এরিস্টটলের মতে : শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা।

জন লকের মতে : শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক ফ্রোবেলের মতে : শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য পবিত্র জীবনের উপলব্ধি ।

জন ডিউই বলেছেন : শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।

সাহিত্যিক হাক্সলি শিক্ষাকে ভেবেছেন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে ভেবেছেন পরশ পাথর হিসেবে যা মানুষের মনে জ্বালে আশার আগুন।

অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ শিক্ষাকে দেখেছেন এমন একটা শক্তিরূপে যা মানুষের অন্তরে নিহিত র‍্যাসানালিটিকে জাগিয়ে তোলে এবং এ্যানিম্যালিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ইকবালের মত ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে শিক্ষা হলো সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মানুষের অন্তরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

মূলত : শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে প্যারাডাইস লস্টের বিখ্যাত কবি মিল্টনের বক্তব্যে; তিনি বলেন " Education.

Is The Harmonious development of body,mind and soul. অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের নাম।

www.icsbook.info

মানুষ প্রভুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

নিউরোলজিস্টরা গবেষণা করে বলেছেন, আইনস্টাইনের সংরক্ষিত মগজ সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা বড়। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতিভাই আল্লাহ প্রদত্তভাবে সমান। ।

মানুষের দেহের ওজনের চলিশ ভাগের একভাগ হলো তার মস্তিষ্কের ওজন। আর মৌমাছির দেহের ওজনের একশত সাতচল্লিশ ভাগের একভাগ হলো মস্তিষ্কের ওজন। ক্ষুদ্র এই পতঙ্গগুলি মস্তিষ্ককে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে। তাদের বানানো কারুকাজময় মৌচাক আর তাদের শাসনব্যবস্থা দেখলেই তা বুঝা যায়। হাজার মানুষের ভেতর একজনও তার মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না । আমাদের দেহের ভেতর মাত্র তিন পাউণ্ড ওজনের মস্তিষ্কের গঠন সবচেয়ে জটিল। এমনি কম্পিউটারের চেয়ে হাজার হাজার কোটি গুণ জটিল। ডাক্তার ওয়াল্টারের মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে মানুষের মত সমক্ষমতার একটি বৈদ্যুতিক বা এটমিক মস্তিষ্ক তৈরি করতে চাইলে পনের শত কোটি টাকারও বেশি প্রয়োজন হবে। সংখ্যাটিকে অংকে লিখলে দাঁড়ায় ১৫০০, ০০০০০০০, ০০০০০০০ টাকা। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা দিয়ে বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রায় দশ হাজার কোটি কম্পিউটার কেনা সম্ভব। এই মস্তিষ্ককে চালাতে এক হাজার কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-এর প্রয়োজন হবে। দৈনিক চালু রাখার জন্যে প্রয়োজন হবে কর্ণফুলীর কাপ্তাইয়ের মতো তিন হাজার আড়াইশত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামগ্রিক উৎপাদন। এই যান্ত্রিক মস্তিষ্কের আয়তন হবে আঠারোটি এক'শ তলা বিল্ডিংয়ের সমান। আমাদের মস্তিষ্কের সবচেয়ে ওপরের সাদা ঢেউ খেলানো অংশকে কর্টেক্স বলে। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই কর্টেক্সকে সমান্তরালভাবে সাজালে এর আয়তন হবে দু'হাজার বর্গমাইলেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ব্রুনাই দেশের সমান। চৌদ্দশত কোটি নিরপেক্ষ জীবকোষ দিয়ে কর্টেক্স গঠিত। এ সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ একক জীবকোষকে নিউরন বলা হয়। এগুলি এতই ক্ষুদ্র যে কয়েকশত একত্রে একটি আলপিনের মাথায় স্থান নিতে পারে। প্রতি সেকেণ্ডেই শত শত হাজার হাজার নিউরন এসে ব্রেইনের প্রাথমিক স্তরে জমা হতে থাকে। এরা একেকটি ইলেক্ট্রোনিক সিগনাল যা শরীরের বিভিন্ন অংশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং মূল নিয়ন্ত্রণের আদেশ অতি দ্রুত হাজার কোটি সেলে ছড়িয়ে দেয়। ব্রেইনের এ সকল প্রতিক্রিয়া অনেক সময় সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের মাত্র একভাগ সময়ে ঘটতে পারে। আমাদের দেহের মেরুদণ্ডের মাধ্যমে নিউরনগুলি সারা শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে সজীব ও তৎপর রাখে। এগুলির আবার অনেক স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। যেমন কোন অংশ শোনার জন্য, কোন অংশ বলার জন্য, কোন অংশ দেখার জন্য আবার কোন অংশ অনুভূতিগুলিকে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল টাওয়ারে ট্রান্সমিট করার জন্য ব্যস্ত থাকে। এতে আবার বসানো হয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় শক্তিশালি 'মেমোরি সেল'। যার কাজ হলো নিত্য নতুন সংগ্রহগুলিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনের সময় তাকে 'রি ওয়াইন্ড' করে

www.icsbook.info

মেমোরিগুলিকে সামনে নিয়ে আসা। এই স্মৃতি সংরক্ষণশালা প্রতি সেকেন্ড ১০টি নতুন বস্তুকে স্থান করে দিতে পারে। পরম আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বপ্রকারের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বকে এক জায়গায় একত্র করে যদি এই মেমোরি সেলে রাখা যায় তাতে এর লক্ষ ভাগের একভাগ জায়গাও পূরণ হবে না। সুবহানআল্লাহ! কত শক্তিশালী আমাদের এই মস্তিষ্ক! তবে দুঃখের বিষয়, আমরা এর হাজার ভাগের একভাগও কাজে লাগাই না বা লাগাতে পারি না। শিক্ষার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হবে নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে চেনা এবং তাকে কাজে লাগানো । তাইতো সক্রেটিস বলেছেন 'নো দাই সেলফ' অর্থাৎ নিজেকে জানো'। আরবি প্রবাদেও বলা হয়েছে 'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজকে চিনতে পারলো সে তার প্রভুকে চিনতে পারলো।

জ্ঞানীরাই সভ্যতার স্থপতি

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ত্রিশের বিশ্ব মন্দার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন একটা জাতিকে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে টেনে এনে উন্নয়নের পথে ধাবিত করতে লাগে একশত জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি যারা দায়িত্ব পালন করবেন জজ, ব্যারিস্টার, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, হিসাববিদ, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, প্রশাসক, নির্বাহী ও দক্ষ কর্মী হিসেবে।

চীনারা পরিকল্পনা করে সময়ের প্রেক্ষিতে। এক বছরের পরিকল্পনায় আশু ফল পাওয়ার জন্য তারা চাষ করে ধান। দশ বছরের জন্য পরিকল্পনায় মূল্যবান কিছু পাওয়ার জন্য তারা লাগায় গাছ। একশত বছরের পরিকল্পনায় তারা জোর দেয় মানুষ চাষে। উন্নত দেশগুলো শিক্ষার মাধ্যমে নানাবিধ সম্পদে নিজেদের অলংকৃত করেছে। তারা এখন মঙ্গলে যাচ্ছে, হার্ট ট্রান্সপ্লানটেশন করছে । একেবারে উন্নত বিশ্ব নয় আমরা যদি উন্নয়নশীল পূর্ব এশিয়ার দিকেও তাকাই তবুও শিক্ষার গুরুত্বটা হাড়ে হাড়ে বুঝবো ।

তিনদশক আগে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া একই আয়স্তর থেকে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণের তুলনায় পূর্বের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ২৭ গুণ এবং মানবউন্নয়ন সূচক ২ গুণ অগ্রসর । মাহবুব উল হকের 'দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন-১৯৯৭' রিপোর্টে উপরিউক্ত বিষয়টির পেছনে ৫টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভেতর শিক্ষায় বিনিয়োগ কে সবচাইতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । তারা শিক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগ করেছিল অপরদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় বেশি বিনিয়োগ হয়েছে সামরিক খাতে। পূর্বরা মোট বরাদ্দের ৭০% ব্যয় করতো প্রাথমিক শিক্ষায় কিন্তু আমরা সিংহভাগ ব্যয় করেছি উচ্চতর শিক্ষায় গুটিকয়েক মানুষের পেছনে। পূর্বরা যেমন দঃ কোরিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষার ১৮.৬ % কারিগরি শিক্ষা অপরদিকে বাংলাদেশে ০.৭ % অর্থাৎ বাংলাদেশ হতে ২৭ গুণ বেশি।

www.icsbook.info

বড় হতে হলে এ বিশ্বটাকে জয় করতে চাইলে অনেক বেশি পড়ালেখা করতে হবে। বিশ্বে যারাই বড় হয়েছেন তারাই প্রচণ্ড পড়ালেখা করেই বড় হয়েছেন। যিনি দারিদ্রতার কারণে ঘড়ি বিক্রি করে দিয়ে দিনে আধপেট খেয়ে, সারাদিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতেন আর পৃথিবীকে পরিমাপ করতেন। তিনিই পরবর্তীতে রূপকথাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান হয়েছিলেন। আর নেপোলিয়ান যুদ্ধে গেলেও তার সাথে থাকতো একটি চলমান লাইব্রেরি এবং যুদ্ধেক্ষেত্রেও তিনি বই পড়তেন। হেলেন কিলার ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ; কিন্তু চক্ষুষ্মান অনেক-অনেক লোকের চাইতেও তিনি অধিক সংখ্যক বই পড়েছেন। সাধারণের চাইতে কমপক্ষে একশ গুণ এবং নিজেই লিখেছেন প্রায় এগারোটি গ্রন্থ। আর নোবেল বিজয়ী বার্নার্ডশ, দরিদ্রতার কারণে মাত্র পাঁচ বছর স্কুলে লেখাপড়া করতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিই ছিলেন বিশ্বে তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি মাত্র সাত বছর বয়সে শেকসপিয়ার, বুনিয়ান, আলিফ লায়লা, বাইবেল প্রভৃতি অমর গ্রন্থ শেষ করেন আর বারো বছর বয়সেই ডিকেন্স, শেলীর বইগুলি হজম করে ফেলেন তিনি।

সে মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়ে বই ধার করে এনে পড়তো। তার পড়ার সময় ছিল দিনের কাজের শেষে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, কামরার মধ্যে চুলিতে একটা নতুন কাঠ জ্বালিয়ে সেই আলোয় সে পড়তো, ঘুমে ঢুলে না পড়া পর্যন্ত। কালক্রমে তিনি হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।

আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অন্য লোকদের সাথে কথোপকথনের সময়ও ফাঁক দিয়ে বই পড়তেন এবং গ্রাম ভ্রমণের সময় প্রতিদিন প্রায় তিনটি করে বই পড়তেন । ইউরোপ কাঁপানো নেপোলিয়ান বলেছেন, "অন্তত ষাট হাজার বই সঙ্গে না থাকলে জীবন অচল।" ভারতে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক জন মেকলে বলেছেন আরও মজার কথা, "বরং প্রচুর বই নিয়ে গরিব হয়ে চিলেকোঠায় থাকবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না যে বই পড়তে ভালোবাসে না"। আর সবচাইতে চরম কথাটি বলেছেন নর্মান মেলর, "আমি চাই বই পাঠরত অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়"।

একজন মহান জ্ঞানী যখন অসহায়ভাবে রাশিয়ার এক রেলস্টেশনে মারা যান তখন তার ওভারকোটের পকেটে পাওয়া যায় মূল্যবান এক বই 'দ্যা সেইং অফ প্রোফেট মোহাম্মদ'। সেই নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল জাতীয় উন্নয়নের জন্যে আপনি যুবসমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন আমার তিনটি পরামর্শ আছে :

১. পড়

২. পড়

৩. আর পড়ো

www.icsbook.info

এটি যেন মহান আল্লাহর সেই প্রথম বাণী 'পড় তোমার সে প্রভুর নামে' এরই প্রতিফলন।

আমাদের উপমহাদেশেও যে সকল ব্যক্তিত্বকে মানুষ সর্বদা স্মরণ করে তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন মহাজ্ঞানী আর সুউচ্চ ক্যারিয়ারসমৃদ্ধ। আল্লামা ড. ইকবাল মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ব্যারিস্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাত্র চব্বিশ বছর বছর বয়সে ব্যারিস্টার হন। ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী, প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ব্যারিস্টার ছিলেন। আমাদের নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী তরাও তাদের সময়ের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্যারিস্টার ছিলেন।

শিক্ষা : সভ্যতার উত্থান পতনের নিয়ামক

মহানবীর আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বৎসর আগে এথেন্সে হেমলক পানে আত্মহত্যা করেন মহামতি সক্রেটিস। অতঃপর এই সহস্র বৎসরে রোমান এবং পারস্য সভ্যতা থিতিয়ে আসে। এই সময়টাকে ইউরোপে অন্ধকারের যুগ বলা হয় ।

ভারতবর্ষে কিছুটা জ্ঞানচর্চা থাকলেও আরবে ছিল তখন আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর ভাষ্য মতে সে সময়ে আরবে মাত্র হাতেগোনা আঠারো জন মানুষ লেখাপড়া জানতেন ।

ইকরা (পড়) শব্দ ধারণ করে নবী হলেন মুহাম্মদ সা. এবং নবুওত পাওয়ার পরই শিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন উম্মি (অক্ষরের ধারণাহীন) কিন্তু তিনিই হলেন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারক। রাসূল (সা)-এর ওপর প্রচণ্ড রণাঙ্গনেও নাজিল হতো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন; আর তিনি তা যথাযথভাবে আত্মস্থ করতেন। মূলত: কুরআন কেন্দ্রিক জ্ঞানের তিনি এতটাই চর্চা করতেন যে তার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে বলেছেন "তুমি এত সাধনা করে শেষাবধি নিজকে ধ্বংস করে ফেলো না"। তার প্রেরণায় আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আঃ রহমান, তালহা, যোবায়ের তাঁরা হলেন এক একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস। হযরত আলী (রা)-এর ব্যক্তিগত হাদিস সংকলন 'সহীফা' সংরক্ষিত থাকতো সর্বদা তার তলোয়ারের খাপের ভেতর। তিনি তো সেই সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন। মহানবী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন "জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর এবং নারীর জন্য ফরজ"। এর সময়সীমা সম্পর্কে বলেছেন "তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর"। এর বিস্তৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন "এর জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও"। রাসূল (সা) এর সাধনার চিত্রকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল ডিউস বলেন "কুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডারের জগতের চাইতেও বৃহত্তর জগৎ, রোম সাম্রাজের চাইতেও বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কুরআনের সাহায্যে একমাত্র তারাই রাজাধিপতি হয়ে এসে ছিলেন ইউরোপে, যেথায়

www.icsbook.info

ভিনিসীয়রা এসেছিল ব্যবসায়ী রূপে, ইহুদিরা এসেছিল পলাতক বা বন্দী রূপে"।

ব্রিফল্ট তার সুপরিচিত 'দ্য মেকিং অব হিউম্যানিটি' গ্রন্থে বলেন-'আমাদের বিজ্ঞানের জন্যে আরবদের কাছে কেবল চমৎকার আবিষ্কার বা যুগান্তকারী সূত্রের জন্যেই ঋণী নই। বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে আরবদের সংস্কৃতির কাছে ঋণী। এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণী।" বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইলের ভাষায় "মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাব জগতের অবস্থা ও চিন্তাস্রোতে এক অভিনব পরিবর্তন সংঘটিত করে। যেন একটি স্ফুলিঙ্গ তমসাচ্ছন্ন বালুকা স্তূপে নিপতিত হল। কিন্তু এই বালুকারাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লী হতে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করল।"

পবিত্র কোরআনে নামাজের কথা বলা হয়েছে ৮২ বার অথচ জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়েছে ৯২ বার। আল কোরআনের ৬৬৬৬ টি আয়াতের মধ্যে অন্তত ৭৫০ টি আয়াত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক।

১২৫০ সালে স্পেনের টলেডোতে আজকের সভ্য ইউরোপের শিক্ষক মুসলমানেরা প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র School of Oriental Studies স্থাপন করেন। কর্ডোভাতে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানরা স্থাপন করেন। যেখানে সব সময়ে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো। যার ব্যাপারে যোশেফ হেলের মন্তব্য হলো :

Cordova shone like lighthouse on the darkness of Europe. আমরা সেই সময়ের কথা বলছি যখন ইউরোপে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটি ছিল রানী ইসাবেলার অধীনে যাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০১টি। অপরদিকে তৎকালীন ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়াতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিল ১০ লক্ষ বই।

ঠিক যে সময় অসভ্য ইউরোপে মুসলমানদেরই আবিষ্কার পৃথিবী গোল বলার অপরাধে মিঃ ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, গ্যালিলিওকে বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য কারাগারে আটক করা হয় অবশেষে অন্ধ, বধির হয়ে তিনি সেখানেই মারা যান। কাগজ, ঘড়ি, বারুদ, মানচিত্র, ইউরোপ থেকে ভারতের রাস্তা এমনকি আমেরিকার আবিষ্কর্তা মুসলমানেরা। এই জ্ঞানের শক্তিতেই একদিন মুসলমানরা সারা পৃথিবীকে শাসন করেছে প্রায় হাজার বছর।

দুর্ভাগ্য- আজকে তারাই বিশ্বে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জাতি। কারণ এক সময় পৃথিবীর শিক্ষক হলেও এখন তারাই সবচেয়ে কম পড়ালেখা করে। ইকরা অর্থাৎ 'পড়' দিয়ে ইসলামের যাত্রা আরম্ভ হলো। রাসূল (সা) জ্ঞানকে আখ্যায়িত করলেন শত্রু মহলে ঢাল এবং মিত্র মহলে অলংকার হিসাবে। অথচ আন্তর্জাতিক এক ম্যাগাজিনের ভাষ্যমতে এখন জাতি হিসেবে বিশ্বে মুসলমানদের শিক্ষার হার ১৯%, হিন্দুদের ২৪%, বুদ্ধিস্টদের ৪৯%, খ্রিস্টানদের ৯৮% এবং ইহুদিদের ৯৯%। বুঝা গেল কম শিক্ষিত

www.icsbook.info

হওয়ার কারণে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। অথচ রাসূল (সা) বলেছেন–সবচাইতে মূল্যবান কথাটি, "জ্ঞান হচ্ছে মুসলিমদের হারানো সম্পদ সুতরাং যেখানে তা পাও কুড়িয়ে নাও"। আল্লাহপাক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা সর্বোত্তম জাতি মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে-অথচ আজ পৃথিবীর যে দিকেই তাকাই দেখতে পাই সারা পৃথিবীতে মুসলমানেরা আজকে চরম পশ্চাৎপদতা, বঞ্চনা আর সর্বগ্রাসী নির্যাতনের শিকার। তাহলে কি আল্লাহর ঘোষণা কখনও মিথ্যা হতে পারে? না বরং আসল সত্য হলো, যাদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা দিয়েছেন তারা সেই সত্যিকার মুসলমান হতে পারেনি। এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রথম নির্দেশ জ্ঞানার্জন না করা প্রথম ও প্রধান কারণ।

শিক্ষা : সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার, মজলুমের বর্ম

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের জন্মদিন ১৪৯২ সালের ১০ অক্টোবর অর্থাৎ কলম্বাস যেদিন বাহামা দ্বীপে অবতরণ করেন। না কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেননি । তিনি করেছিলেন আক্রমণ । কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন : আদিবাসীদের সম্পদ আছে, কিন্তু মানবপ্রযুক্তিতে ওরা দুর্বল । লুণ্ঠনের চাইতে লাভজনক আর কিছু নেই । লুণ্ঠন বজায় রাখতে চাইলে মানব প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োজন । আর তাই দরকার উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কলম্বাসের উত্তরকালে যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি তথা শিক্ষাকে এ কাজেই ব্যবহার করেছে।

বসনীয়ার সাবেক দার্শনিক প্রেসিডেন্ট মরুম আলীয়া আলী ইজেতবিগোভিচ, বলেন "আধুনিক শিক্ষা মানুষকে অধিকতর ভাল, অধিকতর স্বাধীন বা অধিকতর মানবিক করে না। পরিবর্তে শিক্ষা মানুষকে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর সমর্থ ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পশ্চাৎপদ মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মানুষেরা অকল্যাণকর কাজে বেশি পটু। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক অল্প শিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অযৌক্তিক ও বশ্যতামূলক আগ্রাসনের ইতিহাস। শিক্ষার উচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী তৎপরতাকে মসৃণ করা জন্যেই সব রকমের সহায়তা করেছে।"

ইউনেস্কো প্রকাশিত 'General History of Africa তে আমরা কথিত আদিম আফ্রিকীয় মানুষের সাংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহোদ্দীপক চিত্র পাই । সে সময় এ সকল রাজ্যে বিদেশী সাদা কিংবা কালো মানুষ গেলে তারা আগন্তকদের আন্তরিক আতিথেয়েতা করতো এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতো সকল রকম সুযোগ সুবিধাও তাদের দেওয়া হতো । অথচ এই একই সময়ে সভ্যতাগর্বী প্রাচীন গ্রিস কিংবা রোমে বিদেশী আগন্তকদের দাস হিসাবে গণ্য করা হতো ।

www.icsbook.info

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সুসভ্য স্প্যানিশরা কি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে মায়া ও এ্যাজটেক জাতি এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে। সভ্য ও সাদা চামরার লোকেরাই কি আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি ? তিনশো বছর ধরে ইউরোপ-মার্কিন সভ্যতার ধারকেরা যে তের থেকে পনের মিলিয়ন (আসল সংখ্যা কোনদিন জানা যাবে কি?) কালো নিরীহ মানুষকে নিয়ে দাস ব্যবসা চালিয়েছে তাকি ইতিহাসে কখনও মোছা যাবে ? ইন্ডিয়ানদের ওপর এই নির্যাতনের কাহিনী সম্বলিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'রুটস' এর লেখিকা আলেক্স হ্যালি কে কিছু বাহবা দিয়েই কি এ পাপমোচন হবে ?

সাম্রাজ্যবাদীদের এই হিংস্রতা তাদের হঠাৎ কর্ম নয় বরং এটি তাদের দার্শনিকদেরই শিক্ষা যেমন নিটশে বলেছেন; বিবেক, সহানুভূতি ক্ষমা এই সব মানবিক দৈত্যদের হাত হতে মুক্ত হও। দুর্বলকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের লাশের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাও সামনের দিকে। তার নিকট খ্রিষ্টবাদ, বিশেষত তার নীতি ভাক্ষনা উদ্দীপনাময় মানবজাতির দেহে প্রবিষ্ট নিকৃষ্ট বিষ।"

নিটশের চিন্তার ধারকেরা সাম্রাজ্যবাদী রূপে বিশ্বের দিকে দিকে তাদের হিংস্র থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্বলের লাশের সিঁড়ি বেয়ে তাদের সভ্যতার প্রাসাদ গড়তে । আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল তাদের অন্যতম সফল হাতিয়ার ।

এ ক্ষেত্রে আমাদের উপমহাদেশ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'ঐতিহাসিক ইবনে বতুতাসহ বিভিন্ন পরিব্রাজকরা আমাদের দেশ সম্পর্কে বলেছেন "যেন সপ্তস্বর্গ এই রাজ্যে পৃথিবীর স্বর্ণরাজি ছড়িয়ে রেখেছে।" ষোড়শ শতকে বার্নিয়ার আরো লিখেছেন, 'বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ' কিন্তু হায়! দীর্ঘ প্রায় তিনশত বছর যাবৎ মগ, ফরাসি, ব্রিটিশবেনিয়া, পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ্যবাদী জমিদার শ্রেণী সর্বোপরি আমাদের দেশেরই কিছু মানুষের জঘন্য লুটপাট সেই সোনার বাংলাকে শ্মশান বাংলায় রূপান্তরিত করেছে। আর এ ক্ষেত্রে তার শিক্ষাকেই প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে ।

বস্তুবাদী শিক্ষা : সভ্যতার স্থূলদেহে ক্যান্সার

বস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে আরো দক্ষ আরো কৌশলী করে । কিন্তু ব্যক্তি মানুষ, তার পরিবার এমনকি রাষ্ট্রে শিক্ষা কতটুকু উন্নয়ন করে, কোন দিকে করে ? কোনদিকে নয়? প্রশ্নটি আজকে শিক্ষার মতোই মৌলিক হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে । বর্তমান পৃথিবীর শাসকরা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা উন্নয়নের প্রতি নজর দিলেও মন ও আত্মার উন্নয়ন এবং এ শিক্ষার দিকে কোনই নজর দেয়নি। যার ফলে সভ্যতার স্থূলদেহে সৃষ্টি হয়েছে মারত্মক ক্যান্সার।

www.icsbook.info

আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমার স্রষ্টা বৈজ্ঞানিক অপেনহেইমারের আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতা দেখে সকল প্রকার আণবিক গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে প্রাচ্য দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন । তার মতে প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানবজাতি গত চার'শ বছরে যা করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে গত চল্লিশ বছরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মানুষে মানুষে মনোদূরত্ব বেড়ছে ১০২৬-১০৪৪, তাপমাত্রা বেড়েছে ১০৫-১০১১ চাপ বেড়েছে ১০১০-১০১৬।

১৯৬৫ সালে আমেরিকানরা শুধু ছুটি কাটানো বাবদ খরচ করে ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিলাসদ্রব্য। ধনী দেশগুলো বছরে শুধু কসমেটিকস- এ খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ সমস্ত দেশে জীবনযাত্রার মান ১৮০০ সালে যা ছিল তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি উন্নত এখন। আগামী ৬০ বছরে আজ যা আছে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত হবে। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, আগামী ৬০ বছরে মানব জীবন পাঁচগুণ বেশি সুখী ও মানবিকতাপূর্ণ হবে? স্বতঃসিদ্ধরূপেই উত্তর আসবে না। বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত অপরাধ বিজ্ঞানীদের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৯৭৩, সেপ্টেম্বর) সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান সময় অপরাধের বিশ্বজনীন আগ্রাসন দ্বারা আক্রান্ত। মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীরা হতাশভাবে বলেন, আমাদের গ্রহ এক জ্বলনের সমুদ্র' অর্থাৎ কম বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক রিপোর্টে বলা হয় বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানব জীবন কখনোই এতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি। বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ যেমন চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি, ডাকাতি, আধুনিক জীবন ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিগত পনের বছরে যত আমেরিকান নাগরিক আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত আমেরিকান সৈন্যদের মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে পাঁচ মিলিয়ন অপরাধকর্ম সংঘটিত হয়। ১৯৯৩ সালে অপরাধের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ কোটি ৪০ লাখে দাঁড়ায়। সেখানে ভীতিকর অপরাধকর্ম বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে তিন গুণ বেশি। আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামীতে আমেরিকায় ১০ বছরের কমবয়স্ক ঘাতক শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষে দাঁড়াতে পারে । বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শতকরা ৩১ ভাগ ছাত্রছাত্রী অস্ত্রসহ ক্লাসে আসে। এ প্রেক্ষিতে অনেক স্কুলে মেটালডিটেক্টর যন্ত্র বসানো হয়েছে। শুধু ১৯৮৬ সালেই আমেরিকার স্কুল সমূহে তিন লাখ ৬০ হাজার সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ বছর স্কুল ছাত্র- ছাত্রীদের নিকট থেকে ৭০ হাজার অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সে দেশে প্রতি সেকেন্ডে ১২টি অপরাধ প্রতি ২০ মিনিটে একটি খুন, প্রতি ৬ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি ৩ মিনিটে একটি ডাকাতি ও প্রতি মিনিটে একটি করে গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে।

www.icsbook.info

সমগ্র ইউরোপের মতোই বরং তার চাইতে বেশি যৌন অনাচার গোটা আমেরিকান জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে। আমেরিকার কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের শতকরা ৮২ ভাগই ২০ বছর বয়স হবার পূর্বে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করে । যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১৬ লাখ গর্ভপাত ঘটানো হয় । এর বেশিরভাগই কম বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে। এর পরও শুধু ১৯৯২ সালেই অবিবাহিতা মায়েরা ৩ লাখ ১১ হাজার শিশুর জন্ম দেয় । যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর মোট যত শিশু জন্ম নেয় তার মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগই জারজ সন্তান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবাহিতা নারীদের শতকরা ৪০ জন এবং বিবাহিত পুরুষদের শতকরা ৬৫ জন স্বামী বা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। প্রতি একশ বিবাহের মধ্যে ৫৫ টি ভেঙ্গে যায় । রয়টারের মতে মার্কিন সিনেটের বিচারবিভাগ সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় প্রতি ঘন্টায় ষোল জন নারী ধর্ষণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। অন্যদিকে প্রতি ছয় মিনিটে একজন মার্কিন নারী ধর্ষিতা হয় ।

নিউইয়র্কের সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে সমকামীদের পারস্পরিক বিবাহকে আইনসম্মত হিসেবে ঘোষণা করা হয় ।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক রিপোর্টে বলা হয়, রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যকার সন্ন্যাসীদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগই সমকামী । শুধু তাই নয়, সমকামী সন্ন্যাসীরা তাদের সমকামিতাকে বৈধ ঘোষণার জন্যে গির্জার নিকট দাবি জানিয়েছে।

উপরিউক্ত অনাচারের ফলে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯২ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৯০ জন প্রাণ হারায়। বর্তমানে আমেরিকায় এইডস রোগের ভাইরাস বহন করছে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ। কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্ট-এর ভাষ্যমতে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো এদের চিকিৎসা দেবে যারা সেই আমেরিকায় সাত হাজার চিকিৎসকও এইডসের ভাইরাস বহন করছে। রুশ মনস্তাত্ত্বিক হোজকভের গবেষণায় দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাদকাসক্তি তুমুলভাবে অনেক বেড়েছে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে। মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মৃত্যুর হার বার্লিনে ১০০০০০ জনে ৪৪.৩ জন, ফ্রান্সে ৩৫ জন, অস্ট্রিয়ায় ৩০ জন। মাদকদ্রব্যে সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করেও অবস্থা তথৈবচ। রয়টারের ভাষ্যমতে, জর্জবুশের দুই কিশোরী কন্যাসহ সেখানে ১৮ বছরের কমবয়সী তরুণ-তরুণীদের শতকরা ৩৫ ভাগ মাদকাসক্ত । এর বিচার কে করবে আমেরিকার আইজীবীদের প্রতি পাঁচ জনের একজনই মাদকদ্রব্যে আসক্ত । আগে মাদকাসক্তিকে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার সাথে সম্পর্কিত ভাবা হত, সেক্ষেত্রে সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু উন্নত দেশে মাদকাসক্তি কেন? প্রাচুর্যের সন্তানেরা কিসের থেকে পলায়ন করতে চায়?

পর্নোগ্রাফির আগ্রাসনও সুস্পষ্ট। সকল ফরাসি প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জুড়েই চলে পর্নো ছায়াছবি। প্যারিসেই ২৫০টি সিনেমা হল শুধু পর্নো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। সেই সাথে

www.icsbook.info

যোগ হয়েছে জুয়া। বৃহত্তম জুয়া নগরীগুলো সভ্যতম অঞ্চলে অবস্থিত, দোভিলে, মন্টে কারলো, ম্যাকাও, লাস ভেগাস। আটলান্টিক সিটির বিশাল নৃত্যশালার একটি ঘরে ৬০০০ জুয়াড়ির ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষের মধ্যেই অতৃপ্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি-বলছেন একজন মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজারে চারজন জন মানসিক হাসপাতালের বাসিন্দা, নিউইয়র্ক শহরে এই সংখ্যা হাজারে ৫.৫ জন। হলিউডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসিক চিকিৎসকের সমাগম। আমেরিকার গণস্বাস্থ্য সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক পাঁচজন মার্কিনির একজন মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন।

ভোগবাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত পরিণতি সুখকর নয়; এর পরিণতি জীবন সম্পর্কে হতাশা । তাই আত্মহত্যার হার স্বাভাবিক মৃত্যুর হারকে ছাড়িয়ে গেছে । ১৯৯৫ সালে আমেরিকায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণকারীদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৫৫২ জন সেখানে প্রতিদিন ৮৫ হারে বছরে ৩১ হাজার লোক আত্মহত্যা করে। এছাড়া প্রতিদিন আরো ২ হাজার অর্থাৎ বছরে ৭ লাখ ৩০ হাজার ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে । এখন যুক্তরাষ্ট্রে শত শত নিরাপদে আত্মহত্যার ক্লিনিক চলছে আর এটি একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে সমস্ত দেশে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক তাদের তালিকায় প্রথম আটটি দেশ হল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এ সমস্ত দেশে হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরেই আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর স্থান (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে) একই সংস্থার ৭০ সালের রিপোর্টে এ ব্যাপারগুলোকে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পারিবারিক ভাঙ্গনের সাথে যুগপৎ হিসেব ধরা হয়েছে। এক্ষত্রে উন্নয়ন ও শিক্ষাকেও যুক্ত করা যায়। যুগোস্লভিয়ার অতি উন্নত অঞ্চল সোভেনিয়াতে যেখানে সাক্ষরতার হার ৯৮% প্রতি ১০০০০ জনে আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫.৮ জন কিন্তু অনুন্নত কসোভোতে (যেখানে সাক্ষরতার হার ৫৬%) মাত্র ৩.৪% (অনুপাত ৭:১)। ড. এ্যান্থনি বেইলের গবেষণা মতে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের মধ্য আত্মহত্যার সংখ্যা তাদের সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় ছয়গুণ বেশি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের বয়সী অন্যদের তুলনায় দশ গুণ বেশি। অথচ এখানে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীরা ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত নয়ত সরকারি বৃত্তিধারী।

১৯৬৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কাওয়াবাতা ১৯৭১ সালে আত্মহত্যা করেন। এর দু'বছর আগে ১৯৬৯ সালে আরেকজন জাপানি ঔপন্যাসিক তুকিয়ো মিশিমা একইভাবে জীবনাবসান ঘটান। ১৮৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অন্তত তের জন জাপানি ঔপন্যাসিক ও লেখক আত্মহত্যা করেছেন। জাপানি সংস্কৃতির এই

www.icsbook.info

অবিরাম ট্রাজেডি হল জাপানের প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতিতে পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশের পরোক্ষ ফল । মৃত্যুর এক বছর আগে কাওয়াবাতা লেখেন মানুষ এক কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, সে দেয়াল ভালবাসার সকল সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে । প্রগতির নামে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে প্রকৃতির । তুষার রাজ্য নামক উপন্যাসে কাওয়াবাতা মানুষের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন । আন্দ্রে মার্লো ঊনবিংশ শতকের আশাবাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন ; ইউরোপ ধ্বংসাক্রান্ত এবং রক্ত দ্বারা কলঙ্কিত মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিল, ইউরোপ তা করেছেও ।

এই প্রেক্ষাপটে, আমেরিকার এককালের খ্যাতিমান টিভি বিশ্লেষক জিমি সোয়াগার্ট তার বিখ্যাত বই 'হোমোসেক্সুয়ালিটি'তে আর্তনাদ করে বলেছেন " আমেরিকা বিধাতা অবশ্যই তোমার বিচার করবেন (অর্থাৎ ধ্বংস করবেন); আর তিনি যদি তোমার বিচার না করেন, তাহলে সমকামিতা (ও অন্যান্য নৈতিক অপরাধে) এর কলুষতায় অস্বাভাবিকভাবে লালসা চরিতার্থ করার অপরাধে সডোম ও ঘোমরার জনপদের (আদ, সামুদ আর লুত সম্প্রদায়) অধিবাসীদের কেন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল; সেজন্য স্বয়ং বিধাতাকেই একদিন ক্ষমা চাইতে হবে।"

সত্যিকার প্রগতি : শিক্ষার সাথে নৈতিকশিক্ষার সমন্বয়

বস্তুবাদী শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আলীয়া আলী ইজেতবিগোভিচা, তিনি বলেছেন-সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতি (ধর্ম) মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন অপরটির প্রয়োজন ধ্যান বা প্রার্থনা।

ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেয়ার অন্তর্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা যা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধ্যানে নিজের ওপর আধিপত্য করা যায়, বিজ্ঞান সাহায্য করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয় সংস্কৃতি (বা নৈতিকতা) কে নয়। আজকের দিনে মানুষ শেখে অতীতে মানুষ ধ্যানমগ্ন হত। কিংবদন্তি বলে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মহামতি বুদ্ধ তিন দিন তিন রাত্রি নদীর ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, সময়চেতনা বিস্মৃত হয়ে। জেনোফেন সক্রেটিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন "একদিন সকালে সক্রেটিস একটি জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন যার সহজ সুরাহা হচ্ছিল না, দুপুর গড়িয়ে গেল, তিনি ঠাঁই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন কেউ কেউ ঘটনাস্থলের অদূরে তাদের মাদুর এনে অবস্থান নেয় যাতে তার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। সক্রেটিস দিনাবসানের পর

www.icsbook.info

সারা রাত্রিও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর তার ধ্যান ভঙ্গ হয় "। সত্যিকারের জ্ঞানার্জনের জন্য আমরা লক্ষ্য করি মূসা (আ) চলিশ দিবারাত তুর পাহাড়ে, ইসা (আ) গ্যালিলিতে আর যুবক মুহাম্মদ (সা) হেরা গুহায় পনের বছর ধ্যানমগ্ন ছিলেন । আর এটাই সত্য যে তাদের শিক্ষাই পৃথিবীকে সবচাইতে বেশি আলোড়িত করেছে এবং তাদের পেশকৃত নৈতিকজ্ঞানে সমৃদ্ধ কিতাবই পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত এবং সর্বাধিক বিক্রীত । নৈতিকশিক্ষা ও বস্তুবাদী শিক্ষার তুলনা চলে পৃথিবী বিখ্যাত দুই ব্যক্তির মাধ্যমে ।

টলস্টয় তার সারা জীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করে, অপরদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবাদপুরুষ গ্যালিলিও সারা জীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি বস্তুর পতনজনিত সমস্যার সাথে।

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক দাশনিক প্লেটো, এরিস্টটল তাঁদের দর্শন চিন্তায় সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন বলেছেন। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগে আদর্শলিপি দেখে হাতের লেখা অভ্যেস করতে হতো আর তাতে লেখা ছিল 'সর্বদা সত্য কথা বলিবে'' চুরি করা মহা পাপ, গুরুজনে সম্মান করিবে' অহঙ্কারই পতনের মূল' ইত্যাদি। টলস্টয়ের 'একজন মানুষের কতটুকু জমির প্রয়োজন' এই গল্পটি, যার নীতিকথা হলো "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এইভাবে শিক্ষাদানে সক্ষম হলে শিশু-কিশোরদের মনে নীতিবোধ জাগ্রত হবে। আমাদের একটা বড় সঙ্কট হচ্ছে আমরা হঠাৎ খুব জোরে জাম্প দিতে চাই। এই জাম্প দিতে যেয়ে আমাদের কালচারাল, আইডেন্টিটি, মোরালিটি এবং স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস হয়ে যায়। এর কারণ কী? এর কারণ আমাদের নীতিহীনতা। তৎকালীন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল আত্মার উন্নয়ন। যার জন্য সাধনা, চিন্তা ও আত্মসংযমের প্রয়োজন হতো।

বস্তুতপক্ষে এডুকেশন শব্দটির প্রতি অক্ষরে কাঙ্খিত শিক্ষার স্বরূপ তথা নৈতিকতারই বর্ণচ্ছটা ফুটে ওঠে। সকল কাজে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা বা ইকুইটি(ই) দেশ জনগণ ও পরিারের জন্য সদা কর্তব্যপরায়ণ বা ডিইটিফুলনেস(ডি) সত্য ও সুন্দরের জন্য ঐক্যবদ্ধ বা ইউনিটি (ইউ), সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন পথ উদ্ভাবন বা সার্চ (সি), জাতীয় সম্পদের সম্যক ব্যবহারের দায়বদ্ধতা বা একাউন্টিবেলিটি (এ), আচার-ব্যবহার ও সততা অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্সি(টি), নবদিগন্তের উন্মোচন বা ইনভেস্টিগেশন (আই) জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও আনুগত্যপরায়ণ বা ওবেডিয়েন্ট (ও) এবং মহৎ কাজের প্রতি আসক্তি বা এনথেসিয়াস (এন) ।

www.icsbook.info

নেপোলিয়ান যখন বললেন আমাকে ভাল মা দাও, আমি তোমাদিগকে ভাল জাতি দেব। তখন কিন্তু তিনি খুবই শিক্ষিত মায়ের কথা বলেননি বরং বলেছেন চরিত্রবতী, ধৈর্যশীলা ও ন্যায়বান এক মায়ের কথা । আধুনিক অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ ছিলেন একজন দার্শনিক। তার থিওরি অব মোরাল সেন্টিমেন্টস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে দর্শনশাস্ত্রে স্বীকৃত। ২০০১ সালের নোবেল পুরস্কারও কিন্ত অর্থনীতির নৈতিকতা বিষয়েই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই নৈতিকতার গুরুত্ব ।

বস্তুবাদী শিক্ষা সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু নৈতিক শিক্ষা শাশ্বত, কিভাবে সৎ জীবন যাপন করা যায় সে প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন গ্রীসের সাত সাধুর এক সাধু থেলেস (জন্ম-৬২৪ খৃঃ পূর্ব) বলেছিলেন যে কাজের জন্যে আমরা অন্যকে তিরস্কার করি, নিজেরা সেটা না করা। প্রাচীন রোমের সিসেরো বলেন, অন্যের যা কিছুকে তুমি সমালোচনা কর সেটা হতে দূরে থাকো । সমগ্র তাওরাত এই নীতির সাথে সম্পৃক্ত । মহামতি বুদ্ধ ভারতে এবং পিথাগোরাসের সমসাময়িক কনফুসিয়াসও একই শিক্ষা প্রচার করেন চীনে । আমি নিজে যা করতে চাইনে তা অন্যের জন্যেও করি না; একই নীতি যিশুখৃষ্ট প্রকাশ করেছেন তার বিখ্যাত উক্তিতে ; Do unto others as you would have them unto you, ৬শত বছর পর আরবের মরুভূমিতে মুহাম্মদ (সা) একই কথা বলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় সার্বজনীন নীতির আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে কিন্তু কোন মৌলিক পরিবর্তন নেই ।

প্রথাগত শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে তেমন অগ্রসর না হয়েও রাসূল (সা) বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিপ্লব করেছেন। কারণ তাঁর শত ব্যস্ততার ভেতরও প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘন্টা তিনি আলাহর প্রার্থনায় কাটাতেন। এমনকি বদর যুদ্ধের সেই কঠিন মুহূর্তে কাফেরদের তিন ভাগের এক ভাগ নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় বসে গেলেন। আর আল্লাহও দিলেন তাকে চূড়ান্ত বিজয়। নামাজরত অবস্থায় পায়ে বিদ্ধ তীর টেনে বের করার পরও টের পাননি যিনি, তিনিই হয়েছিলেন কাফিরদের ত্রাস শেরে খোদা হযরত আলী হায়দার। আর তাইতো খেলাফতের যুগে চীনের এক গোয়েন্দা চীনসম্রাটের কাছে মুসলমানদের ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করেছিল– "এদের রাত কাটে জায়নামাজে কেঁদে-কেটে, আর দিনের বেলার আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় এদের ঘোড়ার খুরের দাপটে, উড়ন্ত ধুলায়; সুতরাং এদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।" ঠিক এমনি যুদ্ধের বিজয়ের মতোই আত্মগঠনের সাফল্যের জন্যেও দরকার আল্লাহর কাছে অবিরত প্রার্থনা। যেমন আল্লাহই শিখিয়েছেন দোয়া "হে প্রভু আপনি আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।" আধুনিক বিজ্ঞানীরাও ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। বিজ্ঞানীদের ভেতর সবচেয়ে বড় নোবেল পাওয়া বিজ্ঞানী অ্যালেক্সি কমরেখ পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লেখেন, "প্রার্থনা একজন মানুষকে সবচেয়ে বড় শক্তি দান করতে পারে। এই শক্তি কাল্পনিক শক্তি নয় মাধ্যাকর্ষণের মতোই তা অত্যন্ত বাস্তব।

www.icsbook.info

একজন ডাক্তার হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা হল- সমস্ত ওষুধ ও চিকিৎসা যেখানে ব্যর্থ সেখানে প্রার্থনার জোরে মানুষ নবজীবন লাভ করেছেন। রেডিয়ামের মতই আলো এবং শক্তি ছড়ায় প্রার্থনা। মানুষের শক্তি সীমিত, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা সে অসীম শক্তিকে ডাকতে পারে নিজের শক্তি বাড়াবার জন্যে। প্রার্থনা এমন একটি শক্তি যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়ই।"

অনেক সময় প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও প্রার্থনার শক্তিতে মানুষ অনেক বড় হতে পারে। এমন একজন জন. ডি. রকফেলার প্রথম জীবনে ঘন্টায় মাত্র চার সেন্টের (মার্কিন চার পয়সা) বিনিময়ে আলুক্ষেতে কাঠফাটা রোদের ভেতর লোহার কোদাল দিয়ে কাজ করেছেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি পরিণত হয়েছিলেন সেই সময়কার আমেরিকার সবচেয়ে সেরা ধনীতে। প্রায় ষাট বৎসর আগে মৃত্যুর পূর্বে তিনি দু'বিলিয়ন ডলার (প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা) এর মালিক হয়েছিলেন। যার সম্পদ এখনও বেড়ে চলেছে প্রতি মিনিটে প্রায় একশ ডলার অর্থাৎ দিনে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা করে। যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন না তবুও তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করতেন, নাচতেন না, থিয়েটারে যেতেন না, কখনও মদপান এমন কি ধূমপান পর্যন্ত করতেন না।

সার্বিক অবস্থা বিচারে তাইতো বস্তুবাদী শিক্ষার অন্যতম দার্শনিক স্ট্যানলি হল বলেন, "If you teach your children the three R's (Reading,Writing and Arithmatics) And leave the fourth `R'(Religion) you will get fifth `R'(Rascality)"

শেষ আহবান

এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষাই পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শিক্ষার মোকাবেলায় একমাত্র উত্তম বিকল্প। সুতরাং আমাদের জন্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হলোঃ নৈতিক শিক্ষাকে আরো বিস্তৃত করার পাশাপাশি, বিশ্বমানের যোগ্যতা, দক্ষতা আর প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন। যাতে করে আর ধ্বংসোন্মুখ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নয় বরং আমরাই দিতে পারি বিশ্বের নেতৃত্ব। শুধু নেতৃত্ব লাভের জন্যই কি এটা দরকার? না, বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণ, অনাবিল শান্তিও এবং মানবতাকে হেফাজতের জন্যই এটা দরকার। পাশ্চাত্যের মুখে যতই বাগাড়ম্বর বুলি থাক, বুকে তাদের হতাশার ভিসুভিয়াস। আর তাইতো রাষ্ট্রীয় সকল বিরোধিতার পরও নৈতিকতা ও ধর্মীয় জীবন পাশ্চাত্যের দেশ মানুষগুলিকে জোয়ারের টানের মতোই প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। লন্ডন টাইমস পত্রিকা লিখেছে "পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মাদকাসক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।"

আজকের হতাশাগ্রস্ত, ভয়াল, নিকশ বিশ্বসভ্যতার পেছনেই লুকিয়ে আছে

www.icsbook.info

আগামীকালের প্রদীপ্ত সত্যের সূর্য। আল্লাহর ঘোষণা বাস্তবায়িত হবেই "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পরাজয় অবশম্ভাবী" (আল কোরআন)

লাইট হাউস

বাংলাদেশ, সবুজ স্বদেশ, সময়ের সাম্পানে চড়ে তার অভ্যুদয়ের পর প্রায় তিনটি যুগ অতিক্রম করে যৌবনের চূড়ান্ত ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। সমসাময়িক কালে অথবা পরবর্তীতে জন্ম নিয়েও অনেক দেশ, বিশ্বের উন্নয়ন, ঐক্য ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে আমাদের পিছু ফেলে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব, আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঘাটতি এবং আধুনিকায়নের অভাব এর অন্যতম কারণ বলে চিন্তাশীলদের অভিমত। সমস্যা ও হতাশার বিক্ষুব্ধ অন্ধকার সাগরে জাতি আজ নিমজ্জিত। ঠিক এমনি সময়ে লাইট হাউস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অভ্যুদয়। যেন বাতিঘর হিসেবে লাইট হাউস সে দায়িত্ব নিয়েছে দিগভ্রান্ত জাতিকে নাবিকের মতোই পথপ্রদর্শন করার।

জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ, উন্নয়ন প্রশ্নে কঠোর পরিশ্রম, দেশের আদর্শ ও কৃষ্টির সাথে গভীর সম্পৃক্ততা এবং আধুনিকায়নের জন্য প্রচন্ড গতিবেগকে মূলধন করে একদল তরুণের প্রচেষ্টায় ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার লাইট হাউসের সূচনা। লাইট হাউসের নামের ভেতরেই পরিস্ফুটিত হয় এর কর্মের পরিধি ও তাৎপর্য।

প্রথমত, নিষ্পাপ সত্তা হওয়ার কারণে শিশুরা আলোর তুল্য- আর তাই তাদেরকে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় আলোকিত মানুষ হিসেবে। তাদেরই নিকেতন হিসেবে এটি আলোর ঘর বা লাইট হাউস।

দ্বিতীয়ত, আজকের শিশু আগামী দিনের জাতির কর্ণধার। এরা তাদের স্বকীয় প্রতিভা, যোগ্যতা ও চরিত্রপ্রভায় প্রথমত প্রতিষ্ঠানকে করবে আলোকিত, অতঃপর সমাজের সদস্য হিসেবে আলোকিত করবে সমাজ- এ অর্থে এই প্রতিষ্ঠান আলোঘর বা লাইট হাউস।

তৃতীয়ত, দিগভ্রান্ত জাতিকে শান্তি, উন্নয়ন ও আদর্শের পথে বাতিঘরের মতোই পথ দেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে বলে এ প্রতিষ্ঠান বাতিঘর বা লাইট হাউস।

অর্থাৎ লাইট হাউসের পরিকল্পনা হচ্ছে ব্যক্তি থেকে সমাজ আর সমাজ থেকে রাষ্ট্র এবং ক্রমান্বয়ে বিশ্বকে আলোকিত করা। তাই তার শ্লোগান হচ্ছে 'বিশ্বে হবো সেরা জাতি, নিজকে প্রথম গড়বো খাঁটি।'

লেখক : বিশিষ্ট গবেষক ও সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

ইসলামে নারী শিক্ষা

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

ইসলাম বিশ্বমানবতার চিরন্তন স্বভাবধর্ম; যা মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারায় পূর্ণতা লাভ করে মহানবী (সা) এর মাধ্যমে। সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিরূপে ইহকালিন জীবনে দৈহিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এবং পরকালিন জীবনে সার্বিক মুক্তির বিধি বিধান ও পথনির্দেশনা রয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং তদানুযায়ী আদর্শ জীবনযাপন ও আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা:) স্বয়ং ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

ইসলামের বিশ্বজনীন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃতি ও পরিধি ও অতি ব্যাপক এবং কালের আবর্তন ও বির্তন এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সংগতি রক্ষা করে চলার গুণসম্পন্ন। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতা ও ব্যাপকতার প্রমাণ রয়েছে মহা নবীর শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচি ও কর্মতৎপরতায়। রাসূল (সা) বলেছেন, "আমি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। কাজেই বলা যায়, রাসূল (সা) এর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি সর্বকালের এবং সর্বজাতির পুরুষ ও মহিলা এর জন্য অনুকরণীয় আদর্শস্বরূপ।

শিক্ষার প্রতি রাসূল (সা) এর গুরুত্ব

মানব জাতিকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য রাসূল (সা) এর আবির্ভাব হয়েছিল। তাই তাঁর ওপর অবতীর্ণ প্রথম বাণী ছিল, **'পড় তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে, তিনি মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার রব অতীব মহান। তিনি মানুষকে দিয়েছেন এক অজানা জ্ঞানের সন্ধান'** (সূরা আলাক : ১-৫) আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, **'জ্ঞানও মূখরা কি কখনও সমকক্ষ হতে পারে?'** (সূরা যুমার : ৯) তিনি আরও বলেন, **'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে অধিক ভয় করে'**। (সূরা

www.icsbook.info

ফাতের : ২৮)

জ্ঞান অর্জনের প্রতি রাসূল (সা) পুরুষ ও নারী সকলের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরয। (১) (ইবনে মাযা) এ ফরয অন্যান্য ফরয ইবাদতের মতই।

'আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তির কল্যাণ করতে চান তখন তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার জন্য পথে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথের যাত্রী থাকে।' (তিরমিযি) (৩)

জ্ঞান অর্জন করা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। জ্ঞান না থাকলে ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না, তাই মহান নবী (সা) নফল ইবাদতের চেয়ে জ্ঞানচর্চাকে অধিক সোয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন। 'রাতে কিছুক্ষণ জ্ঞানচর্চা, এক হাজার রাকাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম'। (তিরিমিযি) (৪)

'যে জ্ঞান অর্জনের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করবে'। (৫)

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. ইসলামী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো : খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করা। মানুষ আল্লাহর খলিফা। খেলাফতের এ দায়িত্ব পালনের জন্যে যে ধরনের যোগ্যতা দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সে জ্ঞান অর্জনই হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

২. আল্লাহর খাঁটি বান্দা তৈরি করা : আল্লাহর মানুষদের তার বন্দেগি করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তৈরি করা।

৩. আল্লাহর পরিচিতি লাভ : আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করাই হবে এর উদ্দেশ্য।

৪. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য লোক সৃষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরি করতে হবে যারা একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনায় খোদাভীরুতা, আমানতদারি ও সততা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে।

৫. আখেরাতের জবাবদিহিতা : সর্বোপরি ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এমন একদল যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা যারা মানবজাতিকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহপাকের খাঁটি বান্দায় পরিণত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাসূল (সা)-এর মসজিদে নববীর শিক্ষালয় থেকে আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা) এর মত শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক বের হয়েছেন। খালিদ বিন ওয়লিদ, সায়াদ ইবনে আবি আককাস (রা), হামযা (রা), জাফর ইবনে আবি তালিবের (রা) এর মত শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ বের হয়েছেন।

ইবনে আব্বাসের মত প্রখ্যাত মুফাসসির, আবু হুরাইরাহ, আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা)

www.icsbook.info

এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ, মুয়ায ইবনে যাবাল আবু মুসা আশয়ারী (রা) এর মত স্টুডিয়াস, আসেম ইবনে সাবেত, মুহাম্মদ ইবনে সালমা, কয়েম ইবনে সায়াদের (রা) মত পুলিশ অফিসার, উবাদা ইবনে সামেত, আবদুল্লাহ ইবনে হায়াফা, সালিত ইবনে উমরের (রা) মত কূটনীতিবিদ বের হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ লোকগুলো মূর্খ ছিল না। তখনও তারা কমবেশি পড়ালেখা জানতেন। কিন্তু সে শিক্ষা দ্বারা তারা আদর্শ চরিত্রবান ও সভ্য মানুষ হতে পারেননি। বরং রাসূল (সা) প্রণীত তাওহিদ ও ঈমানভি-ত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে এ লোকগুলো শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়ে ইতিহাসে সেরা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সুতরাং যেসব প্রত্যয় ও আদর্শের জন্য একটি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় শিক্ষা ব্যবস্থাই তা জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট করে। কাজেই একটি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ হওয়া উচিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অধ্যাপক Herman H Hors বলেন, শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে খোদার সঙ্গে উন্নতভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। আল্লামা ইকবাল বলেন : 'জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝি। কারণ জ্ঞান শারীরিক শক্তি প্রদান করে এবং এ শক্তি দ্বীনের অধীনে হওয়া উচিত। এটা যদি দ্বীনের অধীনে না হয় তবে তা নির্ভেজালভাবে পৈশাচিক"। ইকবাল শিক্ষাকে আদর্শিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষাকে তিনি শয়তানি জ্ঞান ও শিক্ষা বলেই গণ্য করেছেন।

কাজেই শিক্ষার প্রথম কাজই হওয়া উচিত ছাত্রদেরকে তাদের ধর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। তাদেরকে শেখানো উচিত জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য। তাদেরকে আরো শেখাতে হবে এ বিশ্বে মানুষের পজিশন, তাওহিদ রিসালাত ও আখেরাতের ধারণা। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সাথে তার সম্বন্ধ। ইসলামী নৈতিকতা, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে এমন লোক তৈরি করা উচিত যাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী আদর্শের কার্যকারিতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকবে।

রাসূল (সা) এর যুগে নারী শিক্ষা

মহানবী (সা) ভাল করেই জানতেন একটি আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে নারী-পুরুষ সকলকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে, তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন বলে নর-নারী সবাইকে বুঝিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, তাকে উত্তমভাবে লালন পালন করে ঐ কন্যা সে ব্যক্তির জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে (বুখারী ও মুসলিম)। (১০)

যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী থাকে, সে যদি তাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার

www.icsbook.info

শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয়, এবং বিবাহ করে সে ব্যক্তি দু'টি প্রতিদান পাবে (বুখারী) (১১)

এ হাদীসে শুধু নিজ কন্যাসন্তান নয় বরং দাসীদেরকেও সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

ইবনে হুরায়েজ (রা) বর্ণনা করেন, কোন এক ঈদুল ফিতেরের দিনে রাসূল (সা) সালাত আদায় শেষে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে তিনি মহিলাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। (১২)

সমাবেশ খুব বড় ছিল বলে মহিলারা প্রথম ভাষণ শুনতে পায়নি যে কারণে তিনি তাদের কাছে পুনরায় গিয়ে উপদেশ দিলেন। আর এটা ছিল শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের বৈধ অধিকার।

শিক্ষায় অধিকতর সুযোগ লাভের জন্য রাসূল (সা) এর নিকট মেয়েদের দাবি

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে বলল হে আল্লাহ রাসূল: আপনার হাদীস পুরুষরা নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহর প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যে দিন আমরা সবাই আপনার খিদমতে হাজির হবো, জবাবে রাসূলল্লাহ (সা) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তারা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহপ্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন হে আল্লাহ রাসূল (সা) যদি দুটি হয়? তখন রাসূল (সা) বললেন দুই (বুখারী। (১৩)

হাফেজ ইবনে হাজার (রা) বলেন, এ হাদীসে মহিলা সাহাবীদের দ্বীনি ইলম অর্জনের অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিঃসন্দেহে সত্য যে এটা ছিল নারী সমাজের অধীর আগ্রহ। মসজিদে নববীতে রাসূল (সা) মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করাই যথেষ্ট মনে করলেন না বরং এ জন্য বিশেষভাবে আবেদন পেশ করলেন এবং রাসূল (সা) তাদের এ দাবি পূরণ করলেন।

রাসূল (সা) ও সাহাবীদের যুগে নারীদের জ্ঞানচর্চা

অনেকে শিক্ষালাভ করা এবং ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে নারীদেরকে তাদের ঘরের বাইরে আসার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। বলা হয় পিতা বা স্বামীই তাদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট। একথা বলে তাদেরকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে

www.icsbook.info

মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাদেরকে না তাদের পিতা শিক্ষা দান করেন, না স্বামী। যারা নিজেরাই অজ্ঞ তারা আবার কী করে অন্যকে শিক্ষা দেবে।

যেহেতু বিদ্যা শিক্ষা করা নারী-পুরুষের সবার জন্য ফরয, তাই আমরা দেখি ইসলামের প্রাথমিক যুগে উম্মাহাতুল মুমিনীন, মহিলা সাহাবী তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ মহিলাগণ হাদীস ও ফিকহের মাসয়ালা মাসায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি আরবি সাহিত্য কবিতা চর্চা ও ভাষা জ্ঞানের তারা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী ইমামদের অনেকেই নির্বিঘ্নে মহিলা সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ নারীদের সূক্ষ্ম অনুভূতি দান করেছেন যা তাদেরকে শিক্ষা ও ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে যদি তাদেরকে সঠিকভাবে জ্ঞানার্জনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। কাতারের প্রধান বিচারপতি শেখ যায়েদ বলেন -নারীরা দ্বীনি চরিত্র ও উত্তম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে অগ্রগামী। যদি তারা এমন শিক্ষক শিক্ষিকা পায় যারা সৎপথের নির্দেশনা দিতে পারেন, তাহলে তারা শ্রবণ ও অনুসরণে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। (১৫)

জ্ঞান অর্জনে নারীদের ভূমিকা

১. **কিরাত ও তাফসির বিষয়ে জ্ঞান :** হযরত আয়েশা, হাফসা উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা (রা) পুরা কুরআন শরীফ হিফজ করেছিলেন, হিন্দা বিনতে উসায়েদ, হারিসা, উম্মে সাদ (রা) কুরআনের অধিকাংশ অংশের হাফেজা ছিলেন। উম্মে সালমা পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন। কুরআন পাকের তাফসির বর্ননায় হযরত আয়েশা (রা) এর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সহীহ মুসলিম শরীফের শেষাংশে তাঁর তাফসীরের কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। (১৬)

২. **হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা :** রাসূল (সা) এর সকল স্ত্রীগণ কমবেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে বিবি আয়েশা (রা) ছিলেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী নারী ও পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। আয়েশা (রা) মোট ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। বড় বড় সাহাবীগণ তার নিকট অনেক বিষয় জেনে নিতেন। কেহ কেহ বলেন, ইসলামী শরিয়তের বিধানের এক-চতুর্থাংশ তাঁর কাছে থেকে পাওয়া গিয়েছে। (১৭)

এছাড়াও উম্মে আতীয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানি ও ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন।

৩. **ফিকহ :** ফিকহ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) এর এত অধিক ফতোয়া রয়েছে যে, তাতে কয়েক খানা গ্রন্থ হতে পারে। উম্মে সালমা (রা) এর ফতুয়াসমূহ একত্র করলে একটা রেসালা হতে পারে। হযরত সাফিয়া, হাফসা, হাবীবা, মায়মুনা, ফাতেমা, কয়েস খাওলা, উম্মে দারদা, উম্মে আয়মন (রা) আরো অনেকে ফতোয়া দিতেন। (১৮)

www.icsbook.info

৪. **ফারায়েয :** এ বিষয়ে আয়েশার (রা) বিশেষ সুনাম ছিল। বিশিষ্ট সাহাবাগণ তার কাছ থেকে ফারায়েয জেনে নিতেন। উম্মে সালমা, উম্মে সুলাইম (রা) ফিকহ ও ফারায়েয জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। (১৯)

৫. **কবিতা রচনা ও আবৃত্তি :** খানসা, সফিয়া, আতিকা, যয়নব, উম্মে আয়মন, মায়মুনা, রুকাইয়া (রা) কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। খানসা (রা) ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মদীনা এলে রাসূল (সা) দীর্ঘক্ষণ তার কবিতা শুনেন। শোকগাথা বা মর্সিয়া রচনায় হযরত খানসার (রা) সমকক্ষ কেউ ছিল না। ভাষাবিদ ও কাব্য সমালোচকদের মতে খানসা (রা) এর মত কোন মহিলা কবি আর জন্মায়নি।

১৮৮৮ সালে বৈরুত থেকে তার কবিতার একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়। (২০)

৬. **যুক্তিবিদ্যায় :** হযরত আয়েশা (রা) এতে পারদর্শী ছিলেন, তিনি আল্লাহর দর্শন গায়েবি ইলম, মিরাডা, খিলাফতের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে যে ধারণা দিয়েছেন তাতে তার গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

৭. **ইতিহাস :** ইসলামের ইতিহাসের কতিপয় বিশেষ ঘটনা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যেমন অহির ধরন, ইফকের ঘটনা, বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধের ঘটনাসমূহ ও মক্কা বিজয়, মহিলাদের বায়াত ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ইতিহাস তাঁর নিকট পাওয়া যায়।

৮. **বক্তৃতা ও ভাষণ :** আসমা বিনতে সাকান (রা) এতে পারদর্শী ছিলেন।

৯. **চিকিৎসা বিজ্ঞান :** চিকিৎসা অস্ত্রোপচারে রফিদা আসলামিয়া, উম্মে মুতা, উম্মে কারাশা, হামনা বিনতে হাজাশ, মায়ায, লায়লা, উম্মে জিয়াদ, রু বী উম্মে আতীয়া উম্মে সুলাম (রা) গণ অধিক দক্ষ ছিলেন। রাফিদা (রা) এর তাঁবু মসজিদে নববীর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং সেখানে অস্ত্রোপচারের কেন্দ্র ছিল। (২২)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলের (সা) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমি এলে রাসূল (সা) এর কাছ থেকে সেবার সুবিধার্থে মসজিদের মধ্যে তার জন্য তাঁবু খাঁটিয়ে দিলেন। (বুখারী)

উম্মে আতীয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলের (সা) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, আমি সৈনিকদের জন্য খাদ্য তৈরি করতাম আর আহতদের ও রোগীদের সেবায় থাকতাম (মুসলিম) (২৩)

১০. **ইসলামী সংগীত ও গান :** বিবাহ-শাদি ও ঈদের দিনে আনসার কিশোরী মেয়েরা গীত ও গান করতেন। এমনকি বিবাহ-শাদি ও খুশির অনুষ্ঠানে নবী করিম (সা) এর উপস্থিতিতেই কবিতা আবৃত্তি করা হতো। মদীনাতে আরনব নাম্নী এক কিশোরী ছিলেন। নবী করিম (সা) এর অনুমতিক্রমে আয়েশা (রা) তাকে আনসারদের বিবাহে গীত করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। (২৪)

কোন এক ঈদের দিনে আবু বকর (রা) আয়েশা (রা) এর ঘরে গেলেন এবং দুটি

www.icsbook.info

মেয়েকে গান করতে দেখলেন, ঘরে নবী করিম (স) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর (রা) উভয়কে গান বন্ধ করতে ধমক দিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, আবু বকর, ছেড়ে দাও আজ ঈদের দিন (বুখারী ও মুসলিম) (২৫)

সমাজকল্যাণ ও শিক্ষায় অংশগ্রহণ

শিক্ষার সাথে সাথে তারা সমাজ জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। পুরুষদের পাশাপাশি সমাজ ও জাতির কল্যাণে তারা নিয়মিত এগিয়ে আসতেন। বিশেষ ও সাধারণ কাজের সকল ক্ষেত্রে তাঁরা অংশ নিতেন জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে। তবে এ অংশগ্রহণ শরিয়তের নিয়মনীতি বহির্ভূত ছিল না। মেয়েরা সব সময় নির্ধারিত নিয়মনীতি মেনে চলতো এবং কখনো তা ভঙ্গ করতো না, শিক্ষার সাথে সাথে নারীরা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতো। যেমন-সমাজকল্যাণ, সমাজসেবা, শিক্ষকতা, কায়িক পরিশ্রম, কারিগরি, পশু পালন, কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা, নার্সিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিসাব-নিকাশ, ব্যবসা ও সেলাই। তবে দুটো জিনিস তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল নিজেকে ও পরিবার পরিজনকে দারিদ্র্যমুক্ত রেখে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করার দায়িত্ববোধ। দ্বিতীয়ত, উপার্জিত অর্থ সদকা করে অধিক পুরস্কার লাভ করা।

রাসূল (সা) এর যুগে প্রায় সকল সাহাবীই (রা) কাপড় বুনতেন। (২৬)

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

হযরত সফিয়া (রা) ইলম চর্চার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কুফা থেকে অনেক মহিলা লেখাপড়া শিক্ষা ও মাসয়ালা জানার জন্য সেখানে আসতেন। (মুসনাদ)

হযরত আসমা বিনতে উমাইল (রা) নিরক্ষরদের পড়াতেন (বুখারী)

শিক্ষকতা : শিক্ষা-দীক্ষায় হযরত হাফছা (রা) এর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আব্দুল্লাহ। আবদুর রহমান (রা) মহিলাদের মধ্যে ছফীয়া বিনতে আবু ওবায়দা (রা) এবং উম্মে মোবাশশের আনসারী ছিলেন তার ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত। (২৭) অন্য দিকে হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ ছিলেন হাফসা (রা) এর শিক্ষিকা।

চাকরি

হযরত উমর (রা) বিনতে আবদুল্লাহকে রাজধানী মদীনার বাজার পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন এবং কোন সিদ্ধান্ত দানের ব্যাপারে তার মতামতকে সর্বোপরি স্থান দিতেন। (ইসাবা) আনসারীদের অধিকাংশ মহিলা কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আর মোহাজির মহিলাদের মধ্যে যারা মদীনার কর্ষণযোগ্য ভূমি এলাকায় বাস করতেন

www.icsbook.info

তারাও কৃষিকাজে জড়িত ছিলেন, হযরত আসমা (রা) তাদের মধ্যে অন্যতম। ২৭

হযরত জাবেরের (রা) খালা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের মধ্যে খেজুর কাটতে চাইলে, এক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করে, তিনি বিষয়টি রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ তুমি খেজুর কাটতে পার, কারণ তুমি তো এগুলো অবশ্য দান করবে। (মুসলিম)

কাব ইবনে মালিকের দাসী মদীনার সালা পাহাড়ে ছাগল চরাত, একবার একটি বকরী অসুস্থ হলে সে ধারালো পাথর দিয়ে জবেহ করল, এ ব্যাপারে রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি খাওয়ার অনুমতি দিলেন। (বুখারী)

হযরত খাদীজা (রা) বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। খাওলা, মারিকা, সাকাফিয়া এবং বিনতে মাখাবাবা আতর ও খুশবুর ব্যবসা করতেন। ২৮

এক কৃষ্ণাংগ মহিলা মসজিদে নববী ঝাড়ু দিতো, সে মারা গেলে রাসূল (সা:) তার কবরের কাছে এসে সালাতে জানাযা আদায় করলেন। (বুখারী)

দ্বিতীয় হাকামের সময় মহিলা পন্ডিতদের অবদান

স্পেনের মুসলিম মহিলাগণ ছিলেন উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তাদের অনেকেই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লাবানা, ফাতিমা, আয়েশা, রাজিয়া ও খাদিজা ছিলেন স্পেনের মুসলিম পন্ডিতদের মধ্যে উলেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞানের মহাত্মে লাবানা ও ফাতেমা দ্বিতীয় হাকামের দরবারে ও গ্রন্থাগারে উচ্চপদ অলংকৃত করেছিলেন। বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও ফাতিমা সুন্দর হস্তাক্ষরে খলিফার জন্য অনুলিপি তৈরি করতেন। যৌবন কালে তিনি দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপির খোঁজে কায়রো, দামেস্ক ও বাগদাদের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে যেতেন। আয়েশা (রা) তার সময়কালের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন, তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে দুর্লভ ও মূল্যবান বইয়ের প্রচুর সংগ্রহ ছিল। খাদিজার একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। হাকামের জনৈক ক্রীতদাসী ব্যাকরণ, গণিত এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিতা ছিলেন, তিনি সুন্দর পত্র লিখতে পারতেন। হাকাম অনেক সময় তাকে দিয়ে পত্র লিখাতেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আল ফেয়াজ বলেন যে, একমাত্র কার্ডোভার পূর্ব শহরতলিতেই কুফী হরফে কুরআন শরীফ নকলের কাজে একশত মহিলা নিয়োজিত ছিল। আহমদের কন্যা আয়েশা সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন নকল করতেন।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্র ও সীমা

মূল শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্র ও প্রকারে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য

www.icsbook.info

হলো উহার দ্বারা তাকে উৎকৃষ্ট স্ত্রী, উৎকৃষ্ট মাতা, গৃহিণীরূপে গড়ে তোলা। যেহেতু তার প্রকৃত কর্ম ক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে। উপরন্তু তার জন্য ঐ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা প্রয়োজন যা তাকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম। তার চরিত্র গঠন ও সামাজিক জীবন যাপনের যাবতীয় বিধি বিধান জানার সুযোগ পায় এ ধরনের শিক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য।

অতঃপর যদি কোন নারী অসাধারণ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার অধিকারিনী হয় এবং এ সকল শিক্ষা দীক্ষার পর ও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তা হলে ইসলাম তার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, কিন্তু শর্ত হলো সে যেন শরিয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।

আসলে নারীর সৃষ্টি উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে আদর্শ মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রাকৃতিক সত্যের ওপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির একটা মহৎ উদ্দেশ্য থাকে; মানবজাতির কল্যাণই সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এ জন্যে আমরা যদি নারীকে তার প্রকৃত দাবি মোতাবেক আসল শিক্ষা না দেই, তা হলে অন্য শিক্ষার মাধ্যমে সে একজন আদর্শ নারী, আদর্শ মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ আদর্শ মা হওয়ার মধ্যেই নারীর মূল সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

সহশিক্ষা

ইসলাম নারীর জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু কোন জ্ঞান নারীর স্বভাবসম্মত এবং নারীর জন্য প্রয়োজনীয় তাকে স্থির করে নিতে হবে। তবে এসব জ্ঞান অর্জন করার সময় তাকে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকেই অর্জন করতে হবে।

ইসলাম সহশিক্ষাকে কখনও অনুমোদন করে না, এ কারণে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা শরিয়তের সীমার মধ্য থেকেই যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জন করতে পারে।

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার শর্তাবলি

শিক্ষা-দীক্ষা ও যে কোন প্রয়োজনে নারীর ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে ইসলাম সেখানে কিছু শর্ত আরোপ করেছে।

১. বের হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী আদব রক্ষা করে বের হতে হবে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না"। (সূরা আহযাব : ৩৩)

www.icsbook.info

রাসূল (সা) বলেন, 'তোমাদেরকে প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো'। (বুখারী)

২. স্বামী, অভিভাবক, পিতা ও মাতার অনুমতি নিয়ে বের হতে পারবে।

৩. হিজার পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে। "হে নবী আপন বিবি, কন্যা এবং মুমিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

৪. সুগন্ধি লাগিয়ে বের হতে পারবে না।

রাসূল (সা) বলেন, 'যে নারী সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে লোকের মধ্যে গমন করে সে একজন ভ্রষ্টা নারী।' (তিরমিযি)

৫. রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা যাবে না।

৬. ভদ্র ও নম্রভাবে হাঁটতে হবে, যাতে করে জুতার শব্দ মানুষ শ্রবণ করতে না পারে। আল্লাহ বলেন, "তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।' (সূরা নুর -৩১)

৭. অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তা যেন স্বাভাবিক ভাবে বলে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।' (সূরা আহযাব : ৩২)

৮. একান্তে কোন অপরিচিত লোকের ঘরে বা দোকানে যেন প্রবেশ না করে। 'রাসূল (সা) বলেন, একজন নারী ও পুরুষ যেন একান্তে কোন ঘরে না বসে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হয় শয়তান। (তিরমিযি)

সহশিক্ষার কুফল

পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা ও সহশিক্ষার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার চরম সীমানায় পৌছে দিয়েছে। প্রবন্ধে তার সামান্য উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

১. সাইয়েদ কুতুব বলেন, 'এক রিপোর্টে দেখা যায়, বর্তমান আমেরিকার একটি শহরের মাধ্যমিক স্কুলে শতকরা ৪৮ জন ছাত্রী অবৈধ গর্ভবতী'।

২. আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অশ্লীলতার বিবরণ লেবাননের একটি পত্রিকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১ লক্ষ ২০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে। যাদের বয়স বিশ বৎসরের নিচে। উক্ত পত্রিকার হিসাবে দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে ৬০% শতাংশ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়

www.icsbook.info

বেশ্যাবৃত্তির কারণে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ভ্রমণে যায় বিভিন্ন অপরাধের কারণে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। (৩১)

৩. কাজী ইবনে লানদস বলেন : 'আমেরিকার বালিকারা প্রাথমিক স্কুলেই যৌন চর্চা শুরু করে, এগার ও বার বৎসরের ৩২১ জন ছাত্রীর ওপর এক জরিপ করা হয়। তন্মধ্যে ২৫৫ জন যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্ত।' (৩২)

৪. আমেরিকার Oklahoma বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের এক বিদায় অনুষ্ঠানে অতি আনন্দের এক পর্যায়ে সকলে উলঙ্গ হয় রাত ভর নাচের অনুষ্ঠান করে। (৩৩)

৫. সহশিক্ষার কারণে আমেরিকাতে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ৪৫% মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে থাকে, যে কারণে সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ১০৭টি কলেজ এবং রাশিয়াতে ১২০টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (৩৪)

৬. আমেরিকাতে ১৭ বছর ও তার কম বয়সের তরুণ তরুণীরা রাত্রিকালীন বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যে সব পিতামাতা রাত ১২ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত তাদের সন্তানদের বাড়িতে আটকে রাখবে না, তাদের জরিমানা ও কারাভোগ করতে হবে। (৩৫)

আজকের আধুনিক নারী কৃষি বিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান এবং কলা ও প্রকৌশল বিজ্ঞানে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। এ ছাড়া সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো এ সব জ্ঞান অর্জন করে নারী কি পেয়েছে? আসলে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়েছে। পরিণতিতে নারী তার আসল মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

নারী কলকারখানায় লোহা লক্কর টানাটানি করে, দোকানে সেলস গার্ল হিসেবে সওদাপাতির মোড়ক বেচে, নোংরা ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে, উত্তেজক পোশাক পরে পথে ঘাটে অঙ্গ প্রদর্শনী করে বেড়ালে, সিনেমা, থিয়েটারে, ক্লাবে অসৎ পুরুষদের ভোগের পাত্রী হয়ে থাকার মাধ্যমে কি নারী তার মর্যাদা অর্জন করতে পারে? উপরে পাশ্চাত্য সভ্যতার নারী শিক্ষার যে চিত্র পেশ করেছি তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আজ নারীদের শিক্ষার হার বেড়েছে সত্য কিন্তু তারপরও আজ তারা নির্যাতিত হচ্ছে। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন উপলক্ষে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল আইস এড জাস্টিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইউএসআই জিকে আর আই) প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়:

'যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতিত ও প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষিতা হয়, ভারতে যৌতুক সম্পর্কিত বিরোধের কারণে প্রতিদিন ৫ জন মহিলাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

পাপুয়া নিউগিনিতে ৬৭ শতাংশ মহিলা সাংসারিক নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশে শুধু

www.icsbook.info

দিনাজপুরে ১৯৯৫ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১৮৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। (৩৬)

মার্কিন সমাজে এক সরকারি হিসাবে দেখা যায় শহরাঞ্চলের ২২ শতাংশ ছাত্রের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। ৪টি রাজ্যের ১০টি বিদ্যালয়ে ৭৫৮ জন ছাত্রের ওপর মার্কিন বিচার বিভাগ এ জরিপ পরিচালনা করে। (৩৭)

যুক্তরাষ্ট্র আজ অপরাধের স্বর্গরাজ্য। এ প্রসঙ্গে F.B.I এর রিপোর্ট নিম্নরূপ :

Official figures completed by the Federal Bureau of Investigation indicates that the crime rate is higher in the United State if than in most other countries and that the rate is continuing to rise. (৩৮) ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর এক সরকারি তথ্যচিত্র হতে জানা যায় যে, অপরাধের হার অধিকাংশ দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বেশি এবং এ হার ক্রমবর্ধমান।

১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১০ মিলিয়নের অধিক অপরাধ সংঘটিত হয়, এ সকল অপরাধ দমনের পেছনে ব্যয়িত হয় ৮৫ বিলিয়ন ডলার।

ডলারের মূল্যমান ৪০ টাকা ধরলে ৮৫ বিলিয়ন ডলার ৩৪০০০০ কোটি টাকা হয় (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা)

১৯৯২ সালে, যুক্তরাষ্টে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ মিলিয়নে দাঁড়ায়। এর পেছনে ব্যয় হয় ৪২৫ বিলিয়ন ডলার। (৩৯)

ডলারের মূল্য ৪০ টাকা ধরলে ৪২৫ বিলিয়ন ডলার সমান ১৭,০০,০০০ (সতের লক্ষ কোটি টাকা) এ অপরাধের সিংহভাগই কিশোর অপরাধ বলা যাচ্ছে।

Almost half of all serious crimes are committed by persons under 18 years of age and about 75 percent by pesons under 25. (৪০)

১৯৯৫ ইং বেইজিং সম্মেলনের এক রিপোর্টে দেখা যায় পৃথিবীর প্রায় ৬০ বিলিয়ন নারী দারিদ্র্যসীমায় জীবন যাপন করে। শুধু আমেরিকায় ৩৩% জন দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবন যাপন করে এবং ৯.৫ অশিক্ষিত, ৪০% জন এইডস রোগে আক্রান্ত এবং প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একজন নারী মৃত্যুবরণ করে। তেমনিভাবে পৃথিবীর শতকরা ৮০% ভাগ নারী ঘরবাড়ি হারা। (৪১)

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সহশিক্ষার ফলে শিক্ষাঙ্গনে যে বিশ্রী পরিবেশ বিরাজ করছে তাতে জাতির নৈতিক চরিত্র মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

সহশিক্ষার কারণে অবাধে মেলামেশার ফলে বহু ধরনের সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে। যে কারণে সমাজের অসংখ্য তরুণ তরুণীর মূল্যবান জীবন ধ্বংস হচ্ছে। সহশিক্ষার এ কুফল চিন্তা করে ইসলাম নারীদের জন্য ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

www.icsbook.info

আদর্শবিবর্জিত শিক্ষা

আদর্শ বিবর্জিত শিক্ষা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করেছে। এখানে বিদ্যাপীঠ তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে আদর্শবান লোক তৈরি হয়নি। আজ আমাদের সমাজে সকল স্তরে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তার একমাত্র কারণ আদর্শবিবর্জিত শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজ কবি John Milton বলেন : Education is the hermonious development of body, mind and soul অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শরীর মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন- বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এ তিনটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে তৈরি হচ্ছে দলে দলে চরিত্রহীন ডিগ্রিধারী বিদ্যান পণ্ডিত, আর এরাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, যার ফলে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশি হচ্ছে, এর কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ভিন্ন উৎস থেকে যাদের উদ্দেশ্য ছিল একটি জাতিকে গোলাম বানানো। দুইশত বৎসর এ গোলামি শিক্ষাব্যবস্থায় এ দেশে গড়ে উঠেছিল একটি জেনারেশন। এরা ওদের শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল, আমাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী এবং আমাদের ইতিহাসের প্রতি বিদ্বেষী ছিল। এর সমালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেন-

'তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করছো

অন্যের কাজ থেকে ধার করা রুজি দিয়ে নিজের চেহারা রঙিন করছো।

আমি জানি না তুমি কি, তুমি না অন্য কেউ,

তোমার বুদ্ধিমত্তা অপরের চিন্তার শিকলে বন্দী।

তোমার কণ্ঠের নিশ্বাসটুকুও তো আসছে অন্যের তন্ত্র থেকে

ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে

তুমি একটি সূর্য, একবার আপন সত্তার দিকে তাকাও

অপরের তারকার আলো তুমি চেয়ো না

সভার মোমবাতির চারিদিকে তুমি আর কতকাল নাচবে?

তোমার হৃদয় অনুভূতি যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে আপন আলো জ্বালো'। (৪২)

কবি এখানে ধার করা শিক্ষার পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও আদর্শিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

www.icsbook.info

শেষ কথা

একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে রাতারাতি বদলে দেয়া যায় না, আমরা চাই বাংলাদেশে শতকরা অর্ধেক সংখ্যক মুসলিম নারী তাদের চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে উঠুক এবং পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম নারীরা দেশ ও জাতি গঠনে এগিয়ে আসুক। বর্তমান সরকারের নিকট আমাদের এ প্রত্যাশা।

সুপারিশ

১. ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তরে সহশিক্ষা বিলুপ্ত করে বর্তমান দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলাদা শিফট চালু করা যেতে পারে।

২. ইসলামের মৌলিক আকিদাহ, ইসলামী তাহজিব ও তামাদ্দুন অনুযায়ী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বিশেষত : বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামের প্রয়োজনীয় আহকাম ও ইবাদতের বিধিবিধান সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন।

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে নারীদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. নারীদের জন্য অধিক হারে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৫. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা মেডিক্যাল কলেজ, মহিলা মাদ্রাসা ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা, আপাতত তা সম্ভব না হলে সরকারিভাবে সকল স্তরে ইসলামী পরিবেশ ও পর্দা প্রথা চালু করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষিত মেয়েদের দিয়ে এলাকাভিত্তিক অথবা বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।

৭. যেহেতু নারীরা সংখ্যা অর্ধেক, সেহেতু তাদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং জাতীয় বাজেটে তাদের জন্য সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা।

৮. গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত মহিলাদের জন্য প্রতিদিন অন্তত : দুই ঘণ্টা শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকদের বাধ্যকরণ।

৯. গৃহ পরিচারিকাদেরকে অক্ষর জ্ঞান দান এবং ধর্মীয় শিক্ষা দানের জন্য গৃহমালিকদেরকে জন্য সংশ্লিষ্ট বাধ্যকরণ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ইবনে মাযা হাদীস নম্বর ২২৪, হাফেজ মযনী বলেন এ হাদীসটি হাসান।

২। বুখারী ১ম খণ্ড পৃ: ১৫০।

www.icsbook.info

৩। তিরমিযি হাদীস ২৬৪৯, রিয়াদুস সালেহীন, অনুচ্ছেদ কিতাবুল ইলম, পৃঃ ৫২৬।

৪। ইউসুফ কানদেহলী, হায়াতুস সাহাবা ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৪৭।

৫। পূর্বোক্ত ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫১।

৬। ড. আবদুর রহমান উমাইরী, রেযাল আনযালাল্লাহ কুরআনা, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খন্ড, ৫ম সংস্করণ দারুল লাওয়া রিয়াদ' ১৯৮৪।

৭। অধ্যাপক খুরশীদ আলম, ইসলাম শিক্ষার মূলনীতি, অনুবাদ অধ্যাপক নজির আহমদ, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃঃ ৫' সন ১৯৯০।

৮। পূর্বোক্ত পৃঃ ৮।

৯। পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫।

১০। সহীহ বুখারী শিষ্টাচার অধ্যায় : সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ ১৩ খণ্ড ৩৩ পৃঃ সহী মুসলিম : আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক, অনুচ্ছেদ : ৮ খণ্ড ৩৮ পৃঃ।

১১। সহীহ বোখারী : বিবাহ অধ্যায় : বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করা, অনুচ্ছেদ ১১ খণ্ড ২৮ পৃঃ।

১২। সহীহ বুখারী : ইলম অধ্যায়, মহিলাদের প্রতি উপদেশ শিক্ষাদান সম্পর্কিত ইমামের ভাষণ, অনুচ্ছেদ ১ম খণ্ড ২০ পৃঃ।

১৩। সহীহ বুখারী : কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সংক্রান্ত অধ্যায়, নবী (সা) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তার সমগ্র উম্মতকে ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ তাকে যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সে ভাবেই কোন কাটছাঁট না করে বা অতিরঞ্জিত করা ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন, ১৭ খণ্ড ৫৫ পৃঃ মুসলিম ৮ খণ্ড।

১৪। ইবনে হাজার ফতুলবারী, ১ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ।

১৫। আব্দুল হালীম আবু শুফাজ, রাসুলের (সা) যুগের নারী স্বাধীনতা, Wams. ঢাকা ১ খণ্ড পৃঃ ৪৩।

১৬। উসুদুল গাবা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২।

১৭। তাবাকাতে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২১।

১৮। যারকানী, আল এলাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭২১।

১৯। উসুদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, ৪৫১ পৃঃ।

২০। মাওলানা সাঈদ আনসারী : সিয়ারুস সাহাবিয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃঃ ১৩।

২১। ইসাবা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১২।

www.icsbook.info

২২। ইবনে সাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২১৩।

২৩। আসাদুল গাবা, ৫ম খন্ড, পৃ: ৩৯৮।

২৪। ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৫৬

২৫। মুসনাদ আহম্মদ, ৫ম খণ্ড, ১৬৬ পৃ:

২৬। যারকানী, ৩য় খণ্ড, ৭২১ পৃ:

২৭। উসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, ৪৩২ পৃ:

২৮। উসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, ৪৩২ পৃ:

২৯। Inamudin, S.M. Hispnoliblrares Pakishtan Hist Society 1961, P. 4

৩০। সাইয়েদ কুতুব, আল ইসলাম অ-সালামুল আলেমী পৃ: ২১; মুহাম্মদ আলী সামুনীর তারবীয়াতুল আওলাদ, ১ম খণ্ড, ২৫১ পৃ: থেকে গৃহীত।

৩১। আহাদ পত্রিকা সংখ্যা ৬৫০।

৩২। মোহাম্মদ আলী সাবুনী। তারবিয়াতুল আওরাদ ১ম খণ্ড, ২৮০ পৃ:

৩৩। আদ দাওয়া পত্রিকা এপ্রিল সংখ্যা ১৯৭৯।

৩৪। পূর্বোক্ত

৩৫। দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ১০-৭-৯৫ ইং

৩৬। New Later, Vol. 17, August 1995

৩৭। Abnormal physchology and Modern life coleman, P 396 5th edition Scott Foresman and Company, U.S.A

৩৮। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৭ ই মার্চ ১৯৯৫

৩৯। Abnormal Phychology and Modern life Jans c. Coleman p-396

৪০। আল মুজতামে পত্রিকা, ২৯ আগস্ট ১৯৯৫, কুয়েত।

৪১। অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি ৬ পৃ: ১৯৯০।

লেখক : চেয়ারম্যান, আল-ফিকহ্ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.icsbook.info

বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ

প্রফেসর তাজুল ইসলাম

ভূমিকা

কৃষিই পল্লীপ্রাণ ও কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তবে এ কৃষি শুধু আমাদেরই গুরুত্বপূর্ণ পেশা নয়, বরং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদিতে কৃষিই ছিল সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অকৃত্রিম পেশা। বর্তমান বিশ্বেও সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। কৃষি আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জোগান দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করা থেকে আরম্ভ করে রাত্রে বিছানায় শোয়া পর্যন্ত আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও তাকে কার্যক্ষম রাখার জন্য আমাদেরকে কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। জামা-কাপড়ের উপাদান বা রোগে ঔষধ পথ্য, রান্নার জন্য কাঠ, কয়লা, বাসের জন্য ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, বাগ-বাগিচা, খাবার জন্য ভাত বা রুটি, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, ডিম, লেখা-পড়ার উপাদান বই, খাতা, গৃহপালিত পশুর খাদ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্যসম্ভার, শিল্পের কাঁচামাল, উৎসবে-ব্যসনে, কবরে এককথায় Cradle to grave কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের নিত্য সাথী। কৃষির উন্নতির ফলেই মিসরের সভ্যতা, ব্যাবিলনের মর্যাদা, সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকার গুরুত্ব, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী তথা ইরাক ও ইরানের খ্যাতি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বের মহান সভ্যতার উত্থান-পতন, কৃষির উত্থান পতনের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল ছিল। কাজেই কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে বর্তমান পরিস্থিতি সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য কৃষি শিক্ষা ও ইসলাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

www.icsbook.info

কৃষি

সাধারণভাবে লোকে মাঠে চাষাবাদ ও ফসল ফলানোকেই কৃষি বলে ভ্রম করে থাকে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন, আহরণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে কৃষির প্রধান কাজ। তাই ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি পালন ও চিকিৎসা, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, বন সংরক্ষণ, রেশম কীট পালন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় ও বিপণন, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, যান্ত্রিক চাষাবাদ ও গ্রামোন্নয়ন এ সবই কৃষির অন্তর্ভুক্ত। আর এ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। আমাদের শ্রমশক্তির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ পরুষ ও ৫৫ ভাগ মহিলা কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদসত্ত্বেও আমাদের আজো অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আসেনি। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। গ্রামের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ ভূমিহীন, এক-তৃতীয়াংশ শ্রমশক্তি বেকার, চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এসব পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ মহানগরী বা বৃহৎ শহর এলাকায় কৃত্রিম চাকচিক্যময় জীবনের বাইরে বাস করে।

এমনকি প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে বার্ষিক প্রায় ২ হাজার কোটির টাকার বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে হয় বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের অর্থ দিয়ে। কাজেই আমাদের আশু লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। আর যেহেতু কৃষিজাত পণ্যই আমাদের প্রধানতম সম্পদ, তাই স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত কৃষি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ।

শিক্ষা

শিক্ষা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। শিক্ষা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি জ্ঞান অর্জন করা এবং চিত্তের প্রসারতার মাধ্যমে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষা মানব-জীবনে অপরিহার্য অংশ। আহার্য, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এ পাঁচটি বিষয় মানুষের অপরিহার্য বা মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে সকল সভ্যদেশ ও জাতি স্বীকার করে। তবে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিশ্বজোড়া ঐক্য উপলব্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞান। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Knowledge is virtue and ignorance is sin" অর্থাৎ, জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পুণ্য আর অজ্ঞানতাই হলো পাপ। পবিত্র কোরআনের প্রথম এবং প্রধান নির্দেশ জ্ঞান অর্জন করা, সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া। তাই মহানবী (সাঃ) জ্ঞান অর্জন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। অবশ্য মানব সভ্যতার শুরু

www.icsbook.info

থেকেই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাকে মানুষের অগ্রযাত্রার জন্যে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে। এর অপরিহার্যতা সম্পর্কে মানব সমাজে আজ পর্যন্ত কোন দ্বিমত দেখা দেয়নি বা এ সত্য অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস আজো কারো ঘটেনি। কিন্তু এ জ্ঞানের প্রদীপ আজও আমাদের দেশে বহু দূরে, সাধারণের আওতার বাইরে মিট মিট করে জ্বলছে, এ কথার প্রমাণ শিক্ষার হার থেকে পাওয়া যায়। কৃষকেরা নিরক্ষর। তাই তারা শিক্ষার আলোকবর্তিকার অপরূপ রূপশিখার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না।

শিক্ষার পরিস্থিতি

বর্তমান আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলোতে, বিশেষ করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে পাঠ্যসূচি আছে, তাতে বাস্তবের রুঢ় সত্যের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষা অনুপস্থিত। দেশ যখন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় জর্জরিত, খরা-অজন্মা রোগ-বালাই, বন্যা-মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত, আমাদের পাঠ্যসূচি সমূহ তখন দুঃখজনকভাবে এসব প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকার বা সমস্যার জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলার পরিবর্তে রাজকীয় মহিমা নিয়ে বাস্তব সত্যবিমুখ ও চেতনাহীন নিছক তত্ত্বকথার শিকলে বন্দী। এদেশে ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর গনিত শেখে, নানারকম তর্কশাস্ত্র ও দার্শনিক পদ্ধতির কূট ব্যাখ্যা দান করতে পারে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার আধুনিক তত্ত্বের খবরও রাখে, আধুনিক কাব্য ও শিল্পকলা তাদের নিকট সহজবোধ্য অথচ দৈনন্দিন জীবনে রুটি রোজগারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাদের হয় না। অধ্যয়ন শেষে মান নির্ধারণকারী পরীক্ষাগুলোতে আশ্চর্যজনকভাবে ভাল করতে না পারলে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও ছাত্রদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত পেশা খুঁজতে হয়, অনেকটা জুয়াখেলার মতো। ফলে দেখা যায় অধিকাংশকেই ইতিহাসে এম, এ ডিগ্রি নিয়ে ব্যাংকে, ভূগোলে ডিগ্রি নিয়ে টিসিবিতে, অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে কেরানির চাকরি করে জীবন কাটাতে হচ্ছে। শিক্ষা তাদের প্রয়োজনভিত্তিক জীবিকা ও পেশার কোনই নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। আমাদের শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের এই যে বিরাট ফাঁক তার ফলেই আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ। অথচ বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, জাতি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে তথা বিশ্বের কল্যাণ সাধন করতে ব্যস্ত।

আমাদের শিক্ষানীতি

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি বলতে কিছু নেই। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে শিক্ষাব্যবস্থা পেয়েছি তা ব্রিটিশদের সৃষ্টি। ঔপনিবেশিক আমলের শাসন ও শোষণকে চালু রাখার জন্য কেরানি সৃষ্টি উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা।

www.icsbook.info

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে মোগল আমলে, আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষাই ছিল এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাষা। শুধু শিক্ষিত মুসলমানরাই নন, রবং বহু উচ্চ বর্ণের হিন্দু আরবি ও ফারসিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা আলিয়া মাদরাসা, ১৭৯১ সালে জোনাথন ভানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, ইংরেজদের শিক্ষাপ্রীতির পরিচয় বহন করলেও আসলে হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগবশত তারা এ কাজ করেনি। এর পেছনে মূলত দু'টি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। প্রথমত ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের বৃহত্তর জনোগষ্ঠীকে খুশি রাখা, দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা এবং ইসলামের জিহাদ অধ্যায় পাঠ্য থেকে বাদ দিয়ে শার্দুলকে মেষে পরিণত করা। ফলে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা এ দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুসলমানরা এ শিক্ষার ফলশ্রুতিতে মুজাহিদ না হয়ে ধর্মভীরুতে পরিণত হয়। আর অবাধে ইংরেজদের শোষণ চলতে থাকে। এ অবস্থায় হিন্দু নেতারা অবশ্য চুপ করে বসে ছিলেন না। বেসরকারি উদ্যোগে তারা ইংরেজি ভাষা সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ১৮১৫ সালে শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম নেতারা তখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ তো দূরের কথা, ইংরেজি শিক্ষার সংগে অসহযোগ আন্দোলন করেই যাচ্ছিলেন। তাই ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্‌রাসায় ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানোর যে প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে কলকাতা মাদ্‌রাসায় যে এংলো-পারশিয়ান বিভাগ খোলা হয়, এতে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য দেখা যায় না। তার কারণ ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এদেশ জয় করলেও এদেশীয় তথা ইসলামী তাহজিব তমুদ্দুনের ওপর সরাসরি হামলা করতে সাহস পায়নি। প্রায় একশ বছর পর ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সিকে পরিবর্তন করে ইংরেজি করা হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজীকরণ এবং দেশীয় ইংরেজ সৃষ্টির প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যায় তাদের প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত-ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। আর এই এ্যাংলো মোহামেডান কলেজ' বা 'আলিয়া-মাদরাসা' ছিল এমনিতর প্রচেষ্টার অংশবিশেষ।

এদিকে ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখা ঠিক করার জন্য ১৮২৩ সালে 'পাবলিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি' গঠন করে এবং কমিটির সুপারিশক্রমে ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের সুপারিশকৃত শিক্ষাব্যবস্থাই এ উপমহাদেশে প্রচলন করা হয়। তিনি এ ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন :

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a

www.icsbook.info

class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals an intellect."

অথচ কোন সুস্থ ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন না যে কোন দেশের লোক অন্য দেশের বা শাসকদের গোলামি করার জন্য এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে বিদ্যা অর্জন করবে। কিন্তু মেকলের সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। ব্রিটিশ এদেশ ছেড়ে চলে গেছে সেই ১৯৭৪ সনে। আর তাদের সৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থ আজো অক্ষুণ্ন অবস্থায় প্রবর্তিত আছে। এ দীর্ঘ সময়ে পাঠ্যসূচিতে হয়ত কিছু পরিবর্তন এসেছে, সুপরিকল্পিতভাবে নয়, অনেকটা খাপ ছাড়া ভাবে। তবে শিক্ষানীতির মূলকাঠামো রয়েছে অপরিবর্তিত।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালে এস, এম, শরিফের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে উক্ত কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৬২ সালে এ কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হলে ১৯৬৪ সালে জাস্টিস হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আর একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্ট ১৯৬৬ সালে "Report of the Commission on the students-problem and welfare" নামে প্রকাশিত হয়। হামুদুর রহমান রিপোর্টের, অনেক টেকনিক্যাল উপাদানে ইতিবাচক ছিল। কিন্তু কিছু নীতি ও পদ্ধতি বিরাজমান ছাত্র আন্দোলনের পরিপন্থী হওয়ায় তা ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষের কারণ হয় ও পরবর্তীতে আর বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে আর একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন প্রায় দু'বছর কাজ করে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। কিন্তু রিপোর্ট জনসাধারণ্যে প্রকাশ বা বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আবার ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন সমাপ্ত হয়। সরকার কর্তৃক উক্ত রিপোর্ট গৃহীত ও মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তার ফলাফল আজো দেশবাসী সঠিকভাবে জানে না।

অশুভ ফলাফল

জাতীয় শিক্ষানীতি না থাকায় বা কার্যকরী না হওয়ায়, ছাত্র-শিক্ষকের নিয়মিত অনুশীলন স্থান শিক্ষাঙ্গন থেকে আরম্ভ করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন আজ নানা দুর্নীতিতে ভরে গেছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির দৌরাত্ম্যই হোক, আজ সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করেছে। ফলে শিক্ষিত সমাজ থেকে আদর্শ নেতা, কর্মচারী বা কর্মকর্তা সৃষ্টি হচ্ছে না।

www.icsbook.info

রাজনীতিতে সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে এবং তীব্র অর্থ লিপ্সা সংযুক্ত হওয়ায় আমাদের সমাজ চেতনা ও মূল্যবোধ পরিত্যক্ত হচ্ছে। বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারাই সম্মানিত যারা ছলে বলে কলাকৌশলে যেভাবেই হোক অর্থ উপার্জনে সক্ষম। ফলে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র বিদ্যা অর্জনের চেয়ে অর্থ উপার্জনের দিকেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সর্বাধিক। এর ফলে আজ এক শিক্ষার্থী তারই বন্ধু, সহপাঠী অন্য শিক্ষার্থীর অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে, শিক্ষক পরীক্ষা হলে ও শ্রেণিকক্ষে লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিশন ১৯৭৪ এ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিপন্ন শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন– "Our Universities appear to be navigating on uncharted perilous water... In the overall interest of the nation we can not possibly carry on with the weakness and malpractices of the Universities."

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ দর্শন, চিন্তাভাবনা রয়েছে। স্যার পার্সী নান বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাধীন লালন ও বিকাশ। অপর এক দল চিন্তাবিদের মত হলো "শিক্ষা কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে হতে হবে। "অবশ্য বার্ট্রারন্ত রাসেল তাঁর 'সমাজব্যবস্থা শিক্ষা' গ্রন্থে শিক্ষার নেতিবাচক দর্শন পর্যায়ে বলেছেন যে, বর্তমান যুগে শিক্ষার তিনটি বিভিন্ন দর্শন রয়েছে। প্রথম দর্শনটি অনুসারে উন্নতির সুযোগ সুবিধা লাভও সে পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় মতাদর্শীরা বলেন : সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতিবান করে তাদের সব যোগ্যতা ও প্রতিভাকে চূড়ান্ত মানে উন্নীত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর তৃতীয় মতাদর্শীদের মত হলো : শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাকে পরিহার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করা কর্তব্য"। তবে এ সমস্ত মতবাদের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে একটি বিষয়ে অন্তত সবাই একমত। আর তা হলো শিক্ষার মাধ্যমে চাকরি নির্ভরতার পরিবর্তে আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি। দেশে যে সম্পদ রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো ও জাতীয় সম্পদকে অধিকতর উৎপাদনমুখী করা। আর এ উদ্দেশ্যক ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষার-ব্যবস্থায় দুটো দিক থাকা অপরিহার্য। (১) নৈতিক চরিত্র গঠন ও (২) বাঁচার অধিকার।

যুগ যুগ ধরে আমাদের আলেম সমাজ কুরআন শরিফের যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, তার সংগে যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমন্বয় হতো, তবে স্বর্ণযুগে মুসলমানদের ন্যায় আজো-মুসলমানরা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে এবং পরকালের সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হত। সুতরাং আধুনিক যুগে কুরআনকে

www.icsbook.info

জানতে হলে, বুঝতে হলে এবং কুরআন থেকে লব্ধ জ্ঞানকে ইহ ও পরকালের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে হলে আমাদের বিদ্যার্জন করতে হবে, বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। সে জন্যই আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে কুরআন-হাদীস শিক্ষার সংগে আধুনিক বিজ্ঞানকে জানা অথবা আধুনিক শিক্ষাকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সংগে সমন্বয় করা।

ইসলামীকরণ

কোন কিছু ইসলামীকরণ অর্থে আমরা সাধারণত বুঝি ইসলামী মূল্যবোধ বা ইসলামী শিক্ষার ও আদর্শের আলোকে সে বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ও বাস্তবায়ন। সে অর্থে কৃষিশিক্ষা ইসলামীকরণ অর্থে আমরা বুঝি বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের আলোকে কৃষিশিক্ষার দিকদর্শন তথা উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং সে অনুসারে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। আমাদের সমগ্র পরিবেশ জনগণের বিশ্বাস, আকিদা, স্বভাব-চরিত্র রীতি-নীতি, সবই জাহেলিয়াতের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমনকি আমরা যে বিষয়কে ইসলামী সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী চিন্তাধারা ও উৎসব মনে করি তার অধিকাংশই জাহেলিয়াত। সেখানে কৃষিশিক্ষা ইসলামীকরণ বাতুলতা মাত্র। তবুও শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান চর্চার সংগে, বা বস্তুবাদী কল্পনা ও চিন্তাপ্রসূত কৃষি বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সংগে সংগে ইসলাম কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে কী নির্দেশ দেয় এবং বর্তমান কৃষি শিক্ষাকে কী করে ইসলামীকরণ করা যায় যে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কৃষিশিক্ষা যেহেতু শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয় বরং এ শিক্ষা তত্ত্বভিত্তিক ফলিত বিজ্ঞান সেহেতু সর্বপ্রথম কৃষি সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভংগি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইসলামের ভূমিব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হয়েছে সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছিল কৃষিকে ভিত্তি করে। নীল, সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকায় কালে কালে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল এতদঞ্চলে কৃষিভূমির সহজ লভ্যতার জন্যই। সভ্যতার সেই উষাকালে জনসংখ্যা স্বল্পতার জন্য ভূমিব্যবস্থা ছিল সহজ সরল। 'লাঙল যার জমি তার'-এ ছিল ভূমিনীতি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে সভ্যতার জটিলতার ফলে ভূস্বামী ও ভূমিহীন কৃষকের উদ্ভব হয়। আসলে যখন পুঁজি মানব সমাজের প্রতিপত্তির মাপকাঠি হিসেবে গৃহীত হয় তখনই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ ইসলাম যেমন পুঁজিবাদকে সমর্থন করে না, তেমনি পুঁজির প্রভাবে সৃষ্ট সমাজ জীবনের ব্যাধিগুলোকেও উৎখাত করতে চেষ্টা করে। যদিও ইসলামের ভূমিনীতির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবুও ভূমির মালিকানা ও ভূমি সংগঠন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ক) ভূমি মালিকানা : ভূমির সঠিক ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে মালিক, দেশ ও জাতির

www.icsbook.info

উন্নতি। একটি গৃহ বা যন্ত্র কিছু সময় অব্যবহৃত থাকলে তা দ্বারা প্রধানত তার মালিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন, আর চাষাবাদযোগ্য জমি যে দেশে অল্প, সে ক্ষেত্রে জমিতে যদি চাষাবাদ ঠিকমত করা না হয় বা জমি অব্যবহৃত ও পতিত থাকে তবে সমগ্র জাতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম সম্পদ ব্যবহারের ওপর শুধু গুরুত্ব প্রদান করেনি বরং সম্পদ সঠিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূল (সা) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত বেলালকে (রা) যে খেজুর বাগান প্রদান করেন, উক্ত বাগান ঠিকমত চাষাবদ না করার জন্য এবং কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হযরত উমর (রা) তা বাজেয়াপ্ত করেন। [কিতাবুল খারাজ] ইয়াহইয়া ইবনে আযম; একই কারণে হযরত উমর (রা) বাজিলা গোত্রের লোকদের জমি বাজেয়াপ্ত করেন। (কিতাবুল খারাজ) এ ব্যাপারে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ "তোমাদের সম্পদ যাহা আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা হিসাবে প্রদান করেছেন তা নির্বোধদের দিও না। তাদেরকে খাদ্য ও বস্ত্র দাও এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর"। (নিসা : ৫)

ইসলাম ভূমির মালিক হিসেবে কৃষককেই স্বীকার করে। বুখারী এ বর্ণনা পাওয়া যায়। "যে ব্যক্তি পতিত জমিকে আবাদ করে, সে-ই সে জমির মালিক। অবশ্য যদি জমির কোন পূর্ব মালিক না থাকে।" আবার জমি পর পর ৩ বছর চাষ না করে ফেলে রাখলে তাতে মালিকের কোন অধিকার থাকবে না।" (কিতাবুল খারাজ : আবু ইউসূফ)। যে সব জমি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় যেমন খাল, বিল, নদী, ঝরণা, পাহাড়, গোচারণ ভূমি, ঈদগাহ, কবরস্থান, রাস্তা, পেট্রোল, তৈলখনি ইত্যাদি এসবের মালিক সরকার। হাদীসে আছে, নবী করিম (সা) ইয়েমেন প্রদেশের মাআরিব নামক স্থানের জমি আইয়াজবিন হামাল নামক এক ব্যক্তিকে দান করার পর যখন জানতে পারলেন যে উক্ত জমিতে লবণের খনি আছে, তখন তিনি তা ফেরত নিয়েছিলেন।" (কিতাবুল আমওয়াল; ইসলামের ভূমিব্যবস্থা : মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী) অনাবাদি জমিকে আবাদ করার বা ভূমিহীন কৃষক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কাউকে ভূমি দান করা ইসলাম বৈধ মনে করে। হযরত মোহাম্মদ (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও বহু ব্যক্তিকে এ ভাবে ভূমি দান করেছেন। (কিতাবুল খারাজ : আবু ইউসূফ কিতাবুল খারাজ : ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম কিতাবুল আমওয়াল) তবে এসব ভূমিদানে ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য হাসিল বা স্বজন-প্রীতিমূলক হলে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। তাই খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয উমাইয়া শাসকগণ কর্তৃক স্বজন-প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর পরিবারের সমস্ত জায়গির বাজেয়াপ্ত করেন। (সীরাতে উমর ইবন আবদুল আযীয : ইবনে আব্দুল হাকাম)। ইসলাম জমিদারি প্রথাকে পছন্দ করে না (কিতাবুল খারাজ)। তবে বসতবাড়ি ছাড়া ইসলাম জমির ওপর কর ধার্য করে (কিতাবুল আমওয়াল)। কিন্তু খাজনা অনাদায়ের জন্য অসমর্থ ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করতে ইসলাম সরকারকে অনুমতি দেয় না (কিতাবুল আমওয়াল খারাঃ ইয়াহয়া)। ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত জমিনের খাজনা মাফ করে

www.icsbook.info

দেয়ার নির্দেশ দেয় (হেদায়া : উশর ও খারাজ অধ্যায়) ও অসমর্থ ব্যক্তিকে বিনা সুদে ঋণ দিতে (ফতুল কাদির : ওরশ ও খারাজ অধ্যায়) ও কৃষকদের সাথে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে বলে (কিতাবুল আমওয়াল; খারাজ; আবু ইউসুফ)। ইসলাম বর্গা দেয়াকে জায়েজ মনে করে এবং সকল ব্যাপারে জুলুমকে ঘৃণা করে।

খ) **ভূমি সংগঠন :** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কৃষি কাজ চালানোর কলাকৌশল এবং ব্যবস্থাপনা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। ভূমি ব্যবস্থার নিয়ম-নীতি, স্থানকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কৃষিপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল পরিবর্তনের অধীন, (সামাদ, ১৯৮২)। তাই ইসলাম জমির মালিকানার সংগে সংগে ভূমি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। হযরত উমর (রা) এর যুগে ইসলামের ভূমি-নীতি একটি পরিণত রূপ লাভ করে। ভূমি সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল ইরাকের সমগ্র জমির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি মালিকানার সমস্ত জমিকে ১০টি ভাগে ভাগ করা (কিতাবুল খারাজ : ইয়াহইয়া বিন আদম)। হযরত উমরের (রা) ভূমি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, জমির মালিক হওয়া ব্যক্তির অলংঘনীয় অধিকার নয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্র ভূমি-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হযরত উমর (রা) রাষ্ট্রের কর্ষণযোগ্য ভূমিকে জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে বা ফলনের বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থ ব্যয়ে খাল খনন, জল সেচ ও সুদমুক্ত ঋণের প্রচলন করেন। ইসলামী আইনে খলিফা কর্তৃক যে সমস্ত জমির দখল নেয়া হয় তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা নেই। ইসলাম যেমন অমিতব্যয়ীকে ঘৃণা করে (আরাফ : ৩১, বনি ইসরাইল : ২৬-২৭) তেমনি মজুদদারিকে নিশ্চিতভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। আর কোরআনে মজুদদারদের জন্য বড় বেদনাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে (সূরা নিসা : ৩৭, আল ইমরান : ১৫০)। বাজারজাত করার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমান পাঠ্যসূচি

বর্তমানে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৬টি অনুষদ রয়েছে। এ সমস্ত অনুষদগুলোর নাম দেখেই বুঝা যায় যে, কোন অনুষদ, কৃষির কোন কাজের সংগে জড়িত। যেমন কৃষিঅনুষদ বিশেষ করে ফসল উৎপাদন, ফসলের খামার পরিচালনা, ফসল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত। উক্ত অনুষদে ক্ষেত খামারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের ও জাতের ফসল জন্মানোর জন্য দক্ষ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কৃষিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, প্রাণরসায়ন, কৃষিরসায়ন অর্থনীতি, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষিশক্তি ও যন্ত্র, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে এবং রসায়ন, গণিত, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করতে হয়।

www.icsbook.info

পশুচিকিৎসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি অনুষদ। এখানে বিশেষ করে পশু-পাখির চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া হয়। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীদেরকে ফিজিও-লজি, ফার্মাকোলজি, ভেটেরিনারি মেডিসিন ভেটেরিনারি সার্জারি, প্যাথলজি প্যারাসাইটোলজি, মাইক্রোবায়লজি; প্রাণ রসায়ন, রসায়ন, গণিত, পশুপুষ্টি বিজ্ঞান এবং পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

পরবর্তী অনুষদ হিসেবে পশুপালন অনুষদের নাম করা যেতে পারে। এ অনুষদে বিশেষ করে পশু-পাখি পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ অনুষদে অধ্যয়নরত শিক্ষানবিশদেরকে সাধারণ পশু বিজ্ঞান, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, পশু-পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ, পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, ডেয়ারি বিজ্ঞান বিভাগ, প্যারাসাইটোলজি, প্রাণ রসায়ন, মাইক্রোবায়োলজি, গণিত বা প্রাণিবিদ্যা, কৃষি অর্থনীতি, রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, ফিজিওলজি, পরিসংখ্যান, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার্থীদের অন্য একটি অনুষদ হল কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব অনুষদ। উক্ত অনুষদে কৃষি অর্থনীতি, গ্রামীণ সমাজ, সমবায় বিপণন, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি অর্থসংস্থান, কৃষি তত্ত্ব, উদ্যান্যতত্ত্ব, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে অধ্যয়ন ছাড়াও কৃষি প্রকৌশল, পশুপালন ও মৎস্য অনুষদের হাফ পেপার করে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার আর একটি অনুষদ কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ। উক্ত অনুষদের ছাত্রছাত্রীদেরকে কৃষি ও মৌলিক প্রকৌশল, কৃষিযন্ত্র ও শক্তি, ফুড টেকনোলজি ও রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, রসায়ন, কৃষিতত্ত্ব, পশুবিজ্ঞান, কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞান এবং প্রাণ রসায়ন বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

কৃষি শিক্ষার অপর অনুষদ মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ। উক্ত অনুষদের শিক্ষার্থীকে ফিরারিজ বায়োলজি ও লিমানোলজি, একুইকালচার ও ম্যানেজমেন্ট, ফিসারিক টেকনোলজি, গণিত, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি পরিসংখ্যান, মাক্রোবায়োলজি, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কৃষি অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়ন করতে হয়।

এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের বা গ্রহণের সময় যে সমস্ত বিষয়ে সরাসরি ইসলামের সংগে সংঘর্ষে আসে তা হল বিবর্তনবাদ, ম্যালথেসিয়ান থিউরি, অর্থনৈতিক মতবাদ বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ও প্রাণের উৎস বা জেনেসিস। এ কয়েকটি বিষয়ে প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীকেই অধ্যয়ন করতে হয়। অথচ সেখানে এসব ব্যাপারে ইসলামী মতবাদ বা কুরআন হাদীসের নির্দেশ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় না। বরং কেউ বললে তাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়।

www.icsbook.info

ইসলামীকরণ পদ্ধতি

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে যেখানে ইসলাম পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ ইসলাম যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও কায়েম থাকত। ফলে ইসলামের বিরোধী মতবাদ বা আদর্শকে হয়ত বিচার বিশ্লেষণের জন্য অধ্যয়ন করা হতো গ্রহণ করার জন্য নয়। আর পাঠ্যসূচিও তেমনভাবে তৈরি করা হতো যার ফলে কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন বিশেষজ্ঞ ইসলাম সম্বন্ধেও আলেম হয়ে বের হতো। কিন্তু যেখানে ইসলামের সংগে সংঘর্ষশীল মতবাদ বা ইসলামের পরিপন্থী বিষয় সারাদিন অধ্যয়ন করানো হবে, সেখানে সে শিক্ষাকে ইসলামীকরণ কী প্রকারে সম্ভব? তবুও এ কথা বলা যায় যে যখন অর্থনৈতিক মতবাদ পড়ানো হবে তখন ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দিক নির্দেশ করা হলে অন্তত ইসলাম সম্বন্ধে বৈরিভাব বা ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূরীভূত হওয়ার আশা থাকে।

সুপারিশ

১. কৃষি কৃষ্টির মূল। ইসলাম কৃষককে সম্মানিত ব্যক্তি এবং কৃষিকে মহাপুণ্যের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ভাবধারা সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই হবে কৃষিশিক্ষা ইসলামীকরণের প্রধান দায়িত্ব।

২. কৃষিশিক্ষা একটি ফলিত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন, আহরণ ও সংরক্ষণ কৃষির প্রধান কাজ। তাই ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, বনসংরক্ষণ, রেশম কীট পালন, কৃষিবাজার, সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন – এসবই কৃষির অন্তর্ভুক্ত। সার্বিক ভাবে এসব কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানব কল্যাণে তাকে কাজে লাগানো ইসলামেরই নির্দেশ। পবিত্র কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে যথাযথ আদেশ নির্দেশ রয়েছে। তাই, কৃষি শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করতে গেলে প্রথমেই এ বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. কৃষিশিক্ষা যেহেতু বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা এবং জীবনের প্রতি পদে প্রভাব বিস্তার করে, তাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাজের কতটুকু প্রয়োজন, কিভাবে এ শিক্ষা মিটাতে সক্ষম তার একটি রূপরেখা তৈরি করতে হবে। ইসলাম কোন বৃথা উদ্দেশ্যে সময় ও মেধা ব্যয় করাকে সমর্থন করে না।

৪. ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টির বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেয়। তাই, যে কোন শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যা ব্যক্তির ও সমাজের নির্বিঘ্ন বিকাশ নিশ্চিত হয়। কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণ করতে গেলে ও এই দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই শিক্ষা হবে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পরিপূরক।

www.icsbook.info

৫. যে কোন শিক্ষার সার্থকতা তার প্রায়োগিক সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়াবলির মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় থাকে, এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকরী বলে বিবেচিত হয়। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে বলেছে। এদিক থেকেও এটা অনুকরণ যোগ্য।

৬. কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কৃষিধর্মী মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। এ জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমে কৃষি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। জ্ঞানার্জন করা মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, তার বাস্তব প্রয়োগ, প্রাকৃতিক বস্তুনিশ্চয় নিয়ে গবেষণা, কৃষিতে উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এসবই হবে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার মূলনীতি।

৭. কৃষি শিক্ষা ইসলামীকরণের জন্য কৃষি শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধও সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিষয়ক একটি শিক্ষার কার্যক্রম সাধারণ কৃষি কার্যক্রমের সাথে একটি অতিরিক্ত পাঠ্যসূচি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাঝে মাঝে আলোচনা, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করতে হবে এবং তাতে দেশ ও বিদেশের প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদরা যাতে অংশগ্রহণ করেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রমে শুধু ছাত্ররাই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরাও যাতে অংশগ্রহণ করেন তার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি, ছাত্রদের হল, খামার, স্টেডিয়াম ইত্যাদির নামকরণ যাতে ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারা প্রকাশের সহায়ক হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

৮. পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রাহমানে উল্লেখ আছে যে গাছপালাও আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তাঁকে সিজদা করে। গাছপালা যে জীবিত তো বহু পূর্বেই কোরআনে উল্লেখ আছে। অবশ্য বিজ্ঞান বহু পরে আবিষ্কার করেছে যে গাছেরও প্রাণ আছে। বিজ্ঞান যে কুরআনের বাণীর সাথে সংগতিশীল তা বুঝাতে হবে। বিজ্ঞান যেখানে কুরআনের সংগে অনৈক্য প্রকাশ করেছে সেখানে কুরআনের বক্তব্যকে সঠিক মনে করতে হবে এবং আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী ভাবধারার বৈজ্ঞানিক তথ্যকে নিয়ে আরো গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে পরিণামে উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.icsbook.info

৯. আল্লাহর বাণী, রাসূলের হাদীস এবং ইসলামের বহু গ্রন্থে কৃষি সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ আছে সেগুলো কৃষি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাসে সংযোগ করা প্রয়োজন। তাতে কৃষি শিক্ষার মান উন্নত হবে, কৃষির উন্নতি তথা দেশ ও জাতির উন্নতি সাধিত হবে এবং ইসলামী মূল্যবোধও জাগ্রত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আবু ইউসুফ-কিতাবুল খারাজ।

২। ড. আব্দুল মিঞা-শিক্ষাঙ্গনে কিছু অশুভ দিক ও তার প্রতিকার। শিক্ষা ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ৩৫৫-৫৭, ১৯৮১।

৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম-ইসলামের শিক্ষা দর্শন : জাহানে নও, মার্চ, ১৯৬৯।

৪। আব্দুল হক-পূর্ব বাংলা আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী, পদ্মা প্রকাশনী : ১৯৭০। আঃ মঃ বশিরুল আলম বাংলাদেশ আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী, কর্ণফুলী প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৭৯।

৫। ডঃ আব্দুল হালিম ও মোঃ আমির হোসেন-ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ১৯৮৪।

৬। ইয়াহিয়া বিন আদম-কিতাবুল খারাজ; ইসলামের ভূমিব্যবস্থা (পরে উল্লেখিত)।

৭। ইবনে আব্দুল হাকাম-সীরাত উমর ইবনে আব্দুল আযীয। ইসলামের ভূমিব্যবস্থা (পরে উল্লেখিত)।

৮। প্রফেসর খন্দকার মনোয়ার হোসেন-আমাদের শিক্ষা সমস্যা। শিক্ষা ও পরিকল্পনা (পূর্বে উল্লেখিত) : ১-৫ : ১৯৮১।

৯। রণজিৎ শর্মা-আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি-সমস্যা ও প্রতিকার। শিক্ষা ও পরিকল্পনা (পূর্বে উল্লেখিত) : ১০৩-১০৬-১৯৮১।

লেখক : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

www.icsbook.info

চিকিৎসাবিদ্যার ইসলামীকরণ

ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়ায্‌যাম

বস্তুজগতের বিশেষ জ্ঞানকে আমরা 'বিজ্ঞান' বলি। তাই অংক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদির মত চিকিৎসাবিদ্যাও বিজ্ঞানের অংশ। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে কোরআন ও হাদীসের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ প্রাথমিক যুগের মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান। সুতরাং ইসলামী বিধানের আওতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে গড়ে তোলা কোন নতুন সমস্যা নয়। যদিও মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা অধিক প্রভাবিত ছিলেন। তবুও মুসলমান হিসেবে তারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন; যার প্রমাণ বর্তমান হাকিমী শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের কোন ধর্ম (দ্বীন) নেই। সুতরাং চিকিৎসাবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের ইসলামীকরণ কথাটির কোন অর্থ হয় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে পদার্থবিদ্যার মত বস্তু বিজ্ঞানেরও ইসলামীকরণ সম্ভব। পদার্থবিদ্যার বদৌলতে আমরা বহু যন্ত্রপাতি লাভ করেছি যার মধ্যে সব রকমের যুদ্ধাস্ত্রও রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে নেহাত বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক মহাশূন্যযান ও পদার্থবিদ্যা তথা বিজ্ঞানের ইসলামীকরণের অভাবে মানব কল্যাণের পরিবর্তে মানবতার ধ্বংস সাধনেই অধিক ব্যবহৃত হবার আশঙ্কা; যেমনটি হয়েছে যুদ্ধবিমান বিস্ফোরক, রকেট ইত্যাদির মাধ্যমে। এগুলোর ইসলামীকরণ বলতে এই যন্ত্রগুলোর সদ্ব্যবহার তথা কেবল মানব কল্যাণে ব্যবহার করা বুঝায়। আর তা সম্ভব যদি এই যন্ত্র আবিষ্কারক, প্রস্তুতকারক ও পরিচালক সবাই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। তখন দ্রুত গমনের জন্য আবিষ্কৃত বিমানকে বেসামরিক ও নিরপরাধ জনগণকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা বর্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে না।

এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা করা যাক। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলতে মানবদেহের গঠন, কর্ম পদ্ধতি, রোগ সৃষ্টির কারণ, রোগে শরীরের গঠন ও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন, রোগ নির্ণয় চিকিৎসাপদ্ধতি এবং রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় বুঝায়। যেহেতু

www.icsbook.info

এই বিজ্ঞান মানবদেহ নিয়ে (মন নিয়েও বটে) আর দ্বীন ইসলামও মানুষের জন্য তাই এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং যোগাযোগ অপরিহার্য।

৮ম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্যান্য বিজ্ঞানসহ চিকিৎসাবিজ্ঞানেও মুসলমানগণ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। আল-রাযী, ইবনে সীনা, আবুল কাসেম, প্রমুখ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের লেখা পুস্তক তখন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলন মুসলমানদের নিকট থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভেরই ফলশ্রুতি।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি শুরু হয় তার ফলে গত প্রায় দেড় শত বৎসরে ইউরোপ প্রাচ্য থেকে বহুগণ উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই সময়ে গড়ে ওঠে। এ সময় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে প্রচলিত বাইবেল সমর্থিত খ্রিষ্ট ধর্মের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ডারউইনের মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে ধর্মকে চার্চের দেয়ালে সীমাবদ্ধ করে বিজ্ঞান সাধনা চালানো হয়। ফলে এটুকু বলতে পারি যে ১৯৪৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলে এনাটমি শব-ব্যবচ্ছেদ ক্লাস শুরু হয়। বেলা ১২ টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। এতে জোহরের সালাত আদায়ে অসুবিধা হল। তাই একদিন গেলাম অধ্যক্ষ মন্টগোমারি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সঙ্গে ছিলেন আমার সহপাঠী বন্ধু ডা. মুহাম্মদ ইউনুস দেওয়ান। (Brigyuns Dewan) আমরা যোহরের সালাতের জন্য দেড়টার সময় হলের বাইরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি জবাব দিলেন–Science and Religion cannot go together. (বিজ্ঞান ও ধর্ম এক সঙ্গে চলতে পারে না।) আমরা জবাবে বললাম আমরা বিজ্ঞানকে ধর্ম বিরোধী মনে করি না। আর নামাযের জন্য মাত্র পনের মিনিট সময়ই যথেষ্ট। তখন তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। এ ধরনের মনোভাব সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বর্তমান যার প্রতিফলন ঘটে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। যা হোক বর্তমান যুগের উন্নত ইসলামী চিন্তা ও গবেষণামূলক পুস্তকাদিও বিশ্বব্যাপী ইসলামী গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ভুল অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ইসলাম যেহেতু স্বয়ং আল্লাহর কিতাব আল কোরআন ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত তাই ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি কুরআন বিজ্ঞান শিক্ষার যেভাবে তাগিদ দিয়েছে তাতে মুসলমানদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর প্রেরিত তাওরাত ও ইনজিল কিতাবের অবর্তমানে মানবরচিত ও বিকৃত প্রাচীন ও নতুন মতবাদ (Old and New Testaments) ধর্মের যে সীমিত পরিসর অনুমোদন করে এবং এই সমস্ত কিতাবে বিজ্ঞানে প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত এত বিষয়াদি রয়েছে যে তাতে কোন বিজ্ঞানী প্রচলিত ইয়াহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মকে মানতে পারে না। তাই ধর্মকে তারা ধর্ম মন্দিরে তালাবদ্ধ করে ধর্মহীন মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করে আজ

www.icsbook.info

পৃথিবীকে আণবিক যুদ্ধের দ্বার দেশে এনে উপস্থিত করেছে। ইসলাম এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিধায় বর্তমান মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ক্রমেই দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে যেহেতু ইউরোপ থেকে ধর্মবিরোধী পরিবেশ নিয়ে এসেছে তাই এর ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

একজন মানুষ সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক শরীরের গঠন থেকে শুরু করে সকল প্রকার শারীরিক দিক থেকে সবাই এক। তাই দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী না হলে যে ব্যক্তি কাফের হল তার সঙ্গেই একজন মুসলমানের বস্তুগত কোন অমিল নেই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন ধারা ও চাল-চলনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তা প্রকাশ পেতে বাধ্য। এমনিভাবে একই মানব দেহের ওপর ভিত্তি করে রচিত চিকিৎসাবিজ্ঞানও তার ব্যবস্থার পদ্ধতি ও শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই এর ইসলামী ও অনৈসলামী রূপ ফুটে উঠবে।

এখন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা থেকে শুরু করে গোটা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কিভাবে ইসলামী-করণ সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১. অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বা এনাটমি

একজন মেডিক্যাল ছাত্র প্রথমেই যে দুটো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে তার একটি হল অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এবং অপরটি হল শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব দেহের কোনরূপ বিকৃতি নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা ছিল নিহত শত্রুর শবদেহের অপমান করার বিরুদ্ধে। ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হযরত হামযার (রা) লাশকে তখনকার অবস্থায় কাফের আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যে অবমাননা করেছিল তা যেমন ছিল নৃশংস তেমনি ছিল অমানবিক। এ ধরনের শত্রুতা যা মৃত্যুর পরও চলে তা ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ এই বিধানের দোহাই দিয়ে যুগ যুগ ধরে শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় মুসলমান বিজ্ঞানীগণ এনাটমিতে আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেনি। চিকিৎসক হওয়ার প্রয়োজনে, শরীরের গঠন প্রণালি শিক্ষা ও অস্ত্রোপচার শিক্ষার জন্য এনাটমি শিখতে হবে। আর সে জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামের জ্ঞান শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়।

অমুসলিমগণ যেভাবে এই শব-ব্যবচ্ছেদ করবে তার সঙ্গে একজন মুসলমানের মূল প্রভেদ থাকবে মানসিক দিক থেকে। ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতিতে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য নিম্নোক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন।

(ক) শবদেহকে সম্মানের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হবে, একটি জড় পদার্থের মত নয়। আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের মৃতদেহ হিসাবে যথেষ্ট তা'যীমের সঙ্গে শবদেহ নাড়াচাড়া

www.icsbook.info

করতে হবে। আর এ কাজের জন্য অমুসলিম নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ডোমের পরিবর্তে পরহেজগার কোন মুসলমান নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নারী শবদেহের জন্য নারী কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) যদিও ব্যবচ্ছেদের সময় উলঙ্গ করতেই হবে তবুও ব্যবচ্ছেদাগারে আনবার পূর্বে মৃতদেহ কাফন আবৃত থাকতে হবে।

(গ) মুসলিম মৃতদেহ হলে তার জানাজা আদায় করে ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠাতে হবে।

(ঘ) মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং শুধু শিক্ষার প্রয়োজনে শব-ব্যবচ্ছেদ করছেন এ ধরনের মনোভাব নিয়ে ব্যবচ্ছেদ শুরু করবেন। এসময়ও যথেষ্ট তা'যীমের সঙ্গে কাজ করলে এনাটমি শিক্ষাও উত্তম হবে। কারণ তাতে সকল শারীরিক গঠন পদ্ধতি ও বিষয় বস্তুগুলো ভাল ভাবে দেখে জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। কারণ এতে ব্যবচ্ছেদের সময় বাজে গল্পগুজবে সময়ের অপচয় কম হবে।

(ঙ) শব-ব্যবচ্ছেদ হবার পর যে সমস্ত হাড় ও মাংস ইত্যাদি পরিত্যক্ত হবে সে সব সসম্মানে মাটিতে দাফন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(চ) শিক্ষার প্রয়োজনে শরীরের যে সব অংশ এবং হাড় সংরক্ষণের প্রয়োজন তা অবশ্যই রাখতে হবে। যদি কোন কারণে এ সব নষ্ট বা পচে যায় তখন সে গুলোও মাটিতে দাফন করতে হবে।

(ছ) এনাটমি শিক্ষায় মানবদেহের সৃষ্টি কৌশল এবং গঠনপদ্ধতি ইত্যাদি পড়াবার সময় এতে যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কৌশল ও প্রজ্ঞা রয়েছে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মানব সৃষ্টি যে প্রকৃতির খেয়াল খুশি নয় বরং আল্লাহ তায়ালার প্রোগ্রাম অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে দিকটাও তুলে ধরতে হবে।

(জ) এমব্রিয়লজি বা ভ্রূণ-বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সময় এ বিষয়ে আল-কোরআনে যে সব চমৎকার আয়াতসমূহ রয়েছে সে সবের উদ্ধৃতি দিলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উত্তম দ্বীনি শিক্ষা হবে। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিয়ে যথারীতি এনাটমি হিস্টলজি এমব্রিয়লজি ও অস্টিওলজি শিক্ষা দিতে হবে। এমনি ভাবে এনাটমি বা শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাকে ইসলামীকরণ সম্ভব।

(ঝ) এনাটমি শিক্ষা দেয়ার সময় মুসলিম বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে যে সমস্ত অবদান রয়েছে তার উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান প্রচলিত পুস্তকেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ অথবা প্রাক-মুসলিম যুগের অবদানের উল্লেখ থাকে অথচ মুসলিমদের অবদান প্রায়ই উল্লেখিত হয় না। এতে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বিশেষ করে আবদুল লতিফের (১১৬২-১২৩১) নাম উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যিনি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে চোয়ালের হাড় একটি, এটা সংযুক্ত হাড় নয়।

www.icsbook.info

শব-ব্যবচ্ছেদ না করা ধর্মীয় বিধান মনে করায় পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মত মুসলিমগণও এ ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিলেন। তবে মুসলমানগণ বানর ও শিম্পাঞ্জীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে গ্রিকদের কিছু ভুল সংশোধন করেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুজগত থেকে বর্জন করার পরই ব্যবচ্ছেদে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করে।

মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ এ ব্যাপারে কেন যে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেননি যে, শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ ইসলাম বিরোধী হতে পারে না তা বুঝা মুশকিল। বোখারী শরিফের প্রথম হাদীসেই বলেছে প্রত্যেক কাজের পরিণাম তার নিয়ত (উদ্দেশ্য) অনুযায়ী হবে। মুসলমান শিক্ষিত সমাজের এ ভ্রান্তি এখনও কাটেনি। এ ব্যাপারে আরও একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯৪৫-৪৭ এই দুই বৎসর আমি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসাবে শব-ব্যবচ্ছেদ ক্লাস করি। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের প্রবল মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার পর কলকতায় আমরা এক নতুন সমস্যায় পতিত হই। ইংরেজ আমলে কলকাতার একটি আইন ছিল যে কোন মুসলমান এবং খ্রিস্টান মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য মেডিক্যাল কলেজে নেয়া যাবে না। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর ভারতের চরম সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্ররোচনায় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেডিক্যাল কলেজে শব-ব্যবচ্ছে করতে দেয়া হল না। কারণ, কোন হিন্দু শব মুসলমানদেরকে ব্যবচ্ছেদ করতে দেয়া হবে না। সরকারি কলেজ হলেও কলেজের প্রায় সব মুফিদুল ইসলাম নামক একটি প্রতিষ্ঠান লা-ওয়ারিশ মুসলিম শবদেহ দাফন করত। একদিন আমরা কযেকজন মুসলিম ছাত্র এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর কয়েকটি শর্তে আমাদের জন্য মুসলিম মৃতদেহ জোগান দিতে রাজি হলেন। শর্তগুলো ছিল :

(১) কোন অমুসলিম যেন মুসলিম মৃতদেহ স্পর্শ না করে।

(২) শব-ব্যবচ্ছেদের পর খণ্ডিত অংশগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে হবে যেন তারা সেগুলো দাফন করতে পারেন।

এভাবে আমরা তখন এক মহাসংকট থেকে রেহাই পাই।

সুতরাং আজ এ কথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে, যেহেতু মুসলিম ডাক্তার হতে হবে, আর ডাক্তার হতে হলে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। সুতরাং মুসলমান শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করতে দিতেই হবে, আর মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনেই এর অনুমতি দিতে হবে। ইসলামের মত একটি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক জীবন বিধানে শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করার জন্য মৃত্যুর পর মৃতের

www.icsbook.info

উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্রমে শব-ব্যবচ্ছেদ বা Post mortem Autopsy করার পক্ষে অনুমোদন থাকতে হবে। মুসলিম দেশগুলোতে মৃতদেহের এই শিক্ষামূলক ব্যবচ্ছেদ হয় না বলে চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না।

২ শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি (Physiology)

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই এই শারীরবিদ্যার উদ্দেশ্য। শব-ব্যবচ্ছেদের অভাবে এ বিষয়ে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারেননি।

এই বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সময় আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের বিস্ময়কর দিকগুলো আলোচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে শারীরবিদ্যায় মুসলমানদের প্রধান ও বিখ্যাত অবদান ইবনে আন নাফিসের (১২০৮–১২৮৮) পালমোনারি সারকুলেশন (Pulmonary circulation) আবিষ্কার। তিনিই প্রথম গ্রিক চিকিৎসক গ্যালনের ভুল ধারণা দূর করেন। অবশ্য ইউরোপীয়গণ পরবর্তীকালে এই আবিষ্কার নিজেরা করেছে বলে মিথ্যা দাবি করে যা ১৯৩৬ সালে আন-নাফিসের লিখিত পুস্তক আবিষ্কারের পর পরিত্যক্ত হয়। এই ভুল সংশোধন না হওয়ায় রক্ত চলাচল বুঝতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে। দুঃখের বিষয় আজও শারীরবিদ্যার পুস্তকগুলোতে ইবনে আন নাফিসের এই অবদানের কথা স্পষ্ট করে লেখা হয় না। মুসলিম শিক্ষাবিদদের উচিত এই ধরনের বিষয়গুলো তাদের লিখিত বই ও বক্তৃতায় সন্নিবেশিত করা। এতে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গবেষণার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের হীনম্মন্যতা দূর হয়ে যাবে।

৩. ঔষধ বিজ্ঞান বা ফার্মাকোলজি (Pharmacology)

ঔষধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সময় শিক্ষার্থীদেরকে বলা উচিত যে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'অর্থাৎ সব রোগেরই ঔষধ আছে' এই হাদীস যে মুসলমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরকে নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঔষধ বিদ্যায় মুসলমানদের বিরাট অবদানের কথা অবশ্যই পাঠ্য তালিকায় থাকতে হবে। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আল বায়তারের (মৃ: ১২৪৮) অবদান বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। তার এ বিষয়ে লেখা দু'টো বিখ্যাত পুস্তক কিতাব আল জামেয়া ফিল আদারিয়া লিল মুফরাদাত এবং কিতাবু আল মুগনি ফিল আদারিয়া আর মুফরাদাতই বর্তমানে ফার্মাকোপিয়ার ভিত্তি। এ বিষয়ে আলকিন্দির (৮১৩-৮৭৩) বিশেষ অবদানের কথাও বলতে হবে।

বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উন্নতির মূলে রয়েছে রসায়ন ও জীব রসায়ন

www.icsbook.info

শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি। কিন্তু পাশ্চাত্যে যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ ও মনোবৃত্তি বিরাজমান সে জন্য ঔষধ প্রস্তুতিতে হালাল-হারাম বলে কোন বিধি নিষেধ নেই। এই প্রচার মুসলিম ঐতিহ্যবাহী বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় ঔষধ প্রস্তুতিতে ইসলামী বিধি নিষেধের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন হারাম বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। ঔষধে হারাম বস্তু ব্যবহারের দুটো মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

মদ বা এলকোহল (Ethyl alcohol) মদ যে ঔষধ হতে পারে না এ বিষয়ে বর্তমান জীব রসায়নবিদরা একমত। আর মহানবী (সা) স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে মদ নিজেই রোগ এতে কোন রোগ আরোগ্য হতে পারে না। অথচ বহু প্রচলিত টনিক জাতীয় ঔষধে বিনা প্রয়োজনে ১০% থেকে ২৫% মদ মিশান হয়। পাকিস্তান আমলে একবার পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসাবে এক সম্মেলনে যোগ দিতে করাচিতে যাই। সেখানে একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে দেখি সেখানকার তৈরি লিভার এক্‌স্ট্রাকট নামক ঔষধে প্রায় ১৫% মদ মিশান হচ্ছে। আমি কোম্পানির ক্যানাডিয়ান কেমিস্টকে এই মদ মিশানোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিল যে মদ Preservative বা সংরক্ষণকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয় আর লোকেরা এটা পছন্দ করে। আমি বললাম পাকিস্তানের মুসলমানরা মদ পান হারাম মনে করে আর মদ একমাত্র সংরক্ষণকারী বস্তু নয়। উক্ত কেমিস্ট কথার জবাবে বললেন কেউ তো আপত্তি করে না আর পাশ্চাত্য এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। অবশ্য মদ ছাড়াও বহু সংরক্ষণকারী রাসায়নিক বস্তু আছে। আমি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করে আসলাম তাদের ভিজিটিং বইয়ে। কিছুদিন পর চিঠি পেলাম যে উক্ত কোম্পানি তাদের ঔষধে মদের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখন অমুসলিম দেশের Liver extract জাতীয় জৈবিক ঔষধপত্র হারাম প্রাণী বা হারাম ভাবে নিহত প্রাণী থেকে সংগ্রহীত হতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। মুসলিম দেশ সৌদি আরব সরকারকে রাজি করিয়ে হজ্জের সময় জবাই করা লক্ষ লক্ষ প্রাণী থেকে প্রয়োজনীয় যকৃত, অগ্নাশয় ইত্যাদি জিনিস সহজেই আহরণ করা যায় মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজনে। এ জন্য খোদ মক্কা শরিফের আশেপাশেই গড়ে উঠতে পারে ঔষধ প্রস্তুত কারখানা।

মদ জাতীয় ব্রান্ডি নামক পানীয়কে ডাক্তারি শাস্ত্রে ঔষধ হিসাবে গণ্য করা হয় যদিও এটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। মদ পানে অভ্যস্ত ইউরোপীয়রা এই ভুল ঔষধ চালু করেছে।

আমাদের দেশে আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নামে কিছু সুধা মূলত কিছু ঔষধ নামীয় ভেষজ মিশ্রিত মদ ছাড়া কিছুই নয়। অথচ প্রকাশ্যে এই মদ মুসলিম বাংলাদেশে বিক্রি হচ্ছে।

www.icsbook.info

এগুলো যে আসলে মদের দোকান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঔষধ প্রস্তুতের দোহাই দিয়ে এরা কম ট্যাক্সে মদ কিনতে পারে বলে অনেক লাভ তাই গ্রামে-গঞ্জে এই সব ভুঁইফোড় মৃতসঞ্জীবনী সুধার দোকান খোলা হচ্ছে। এই ঔষধগুলো বিজ্ঞান বিরোধী ও স্পষ্ট হারাম ব্যবসা। এটা অচিরে বন্ধ হওয়া উচিত।

এছাড়া ঔষধ বিজ্ঞানে অন্য আরও কোন হারাম বস্তুর ব্যবহারও পরিত্যক্ত হতে হবে। যে কোন বিদেশী ঔষধ এবং দেশে প্রস্তুত ঔষধও ইসলামী দৃষ্টিতে হারাম কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যাতে একজন ইসলাম অভিজ্ঞ সদস্য অবশ্যই থাকতে হবে। ঔষধ বিদ্যার আর এক প্রধান দিক হলো ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি-বা Therapeutics এ ব্যাপারে ইসলামী নীতিবোধের প্রয়োজন যথেষ্ট।

যেহেতু একজন চিকিৎসককে বিশ্বাস করে একজন রোগী তার চিকিৎসার জন্য আসবে। তাই সেই চিকিৎসককে অবশ্যই একজন ভাল চিকিৎসক হতে হবে। চিকিৎসাবিদ্যা ভালভাবে শিক্ষা না করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া গুনাহ্‌র কাজ এ কথা শিক্ষার্থীদেরকে বুঝাতে হবে। নতুবা লোককে ধোঁকা দেয়ার গুনাহ্ হবে।

এমনিভাবে বিনা প্রয়োজনে, শুধু বিক্রির জন্য ঔষধ দেয়া অন্যায়। এ ছাড়া এন্টিবায়োটিক, হরমোন ইত্যাদি বিশেষ ঔষধ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে নিশ্চিত না হয়ে প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে। জ্ঞাতসারে এই ক্ষতির জন্য দায়ী হলে গুনাহ্ হবে।

ঔষধ যে আসলে আরোগ্য করে না বরং শরীরকে রোগ আরোগ্যে সাহায্যে করে মাত্র এই মূল কথাটি প্রথম বলেছেন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আলী বিন রাববান আত্‌তাবারি (৮১০-৮৯০)। তিনিই প্রথম ভুল ঔষধে উদ্ভূত রোগ (Iartogenic) সম্বন্ধে সাবধান করেন। সুতরাং একজন মুসলমান চিকিৎসক সব সময় মনে রাখবেন যে আরোগ্যের মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, ডাক্তার নিমিত্ত মাত্র সুতরাং পত্রিকায় গ্যারান্টি দিয়ে চিকিৎসার বিজ্ঞাপন যে কত বড় অজ্ঞতা সে কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিজেদেরকে সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ তবুও যদি কোন ডাক্তার এ বিষয়ে অহমিকা প্রকাশ করেন তবে সেটা তার ভুল। দেশে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার সকল পথও বন্ধ হওয়া দরকার।

(৪) রোগ বিদ্যা বা প্যাথলজি (Pathology)- এর প্রধান কাজ হলো রোগ কেন হয় তা বুঝা এবং রোগ নির্ণয়ে (Diagnosis) সাহায্য করা। এই বিদ্যা বলতে গেলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একক অবদান। এই জন্যই এলোপ্যাথি (Allopathy) চিকিৎসা পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক এবং অধিক জনপ্রিয়।

প্যাথলজি মূলত চার ভাগে বিভক্ত যার প্রত্যেকটির আরও বিভাগ সম্ভব। মূল চারটি বিভাগ হল :

www.icsbook.info

(ক) হিসটোপ্যাথলজি বা শরীরের তন্তুর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা।

(খ) বায়ো কেমিস্ট্রিবা জীব রসায়ন তত্ত।

(গ) মাইক্রো বায়োলজি বা জীবাণু তব।

(ঘ) হিমাটোলজি বা রক্ত-বিজ্ঞান-এই চারটি বিষয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

হিসটোপ্যাথলজি

এনাটমি শিক্ষার সময় চাক্ষুষ পরীক্ষা ছাড়াও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন তন্তু ও অন্ত্রের বিন্যাস দেখা যায়। ইহাকে Histology বলে। রোগ হলে যে পরিবর্তন হয় তা পরীক্ষা করার নাম Histopathology. এতে বিভিন্ন টিউমার অস্ত্রোপচারে ফেলে দেয়া শরীরের রোগাক্রান্ত অংশ বিশেষ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপারে প্রচলিত প্রথার কোন অন-ইসলামিক নীতি নেই। বরং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবকোষগুলির আকৃতি-প্রকৃতি দেখা যে কেউ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশল ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

পরীক্ষার জন্য যে সামান্য অংশ ব্যবহৃত হয় তা ছাড়া বাকি অংশগুলো ব্যবচ্ছেদ করা অংশের মত সযত্নে মাটিতে দাফন করা উত্তম।

বায়ো-কেমিস্ট্রি

এতে শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন রোগে এই উপাদানাগুলোর মান কম-বেশি হতে পারে। যেমন বহুমূত্র রোগে রক্তের শর্করা বৃদ্ধি পায় আর নেফ্রোসিস রোগে রক্তের প্রোটিনহ্রাস পায়। এই বিষয়ে প্রচলিত প্রায় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক এসিড পরিমাপ। এর প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি Gastric Analysis নামক পরীক্ষায় রোগীকে ৭% এলকোহল পান করান হয়। পাশ্চাত্য এলকোহল বা মদ সবার প্রিয় বলে এতে কেউ আপত্তি করে না। কিন্তু মুসলিম দেশসমূহে অন্ধের মত এই নিয়ম চালু করা মূর্খতা। তাই এর বিকল্প বের করার জন্য আমিও আমার এক সহযোগী রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা চালাই। আমরা প্রমাণ করি যে ৭% alcohal এর পরিবর্তে দুধ ও চিনি ছাড়া পাতলা গরম চা দিয়ে একই রূপ ফল পাওয়া যায় (.....) তা ছাড়া যে কোন দিন alcohal পান করেনি তাকে alcohal দিয়ে পরীক্ষা করলে পাকস্থলীর প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক হতে বাধ্য। আজকাল ধীরে ধীরে এই পরীক্ষার বিকল্প বের হচ্ছে। আমরাও তার একটা বিকল্প বের করি রাজশাহীতে যা খুবই নির্ভরযোগ্য (১৯৬৭) যা হোক নতুন যে কোন পরীক্ষা চালু করার আগে ইসলামের দৃষ্টিতে তা জায়েয কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে।

www.icsbook.info

মাইক্রোবায়োলজি বা জীবাণু তত্ত্ব

জীবাণু বলতে Bacteria (Bacteriology), Virus (Virology), Parasites (Parasitology) এবং Fungus (Myeology) ইত্যাদি বুঝায়। এসব পরীক্ষা নিরিক্ষায় অনেক সময় ছোট ছোট জীব- যেমন খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ, মুরগি, গরু, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় যার ফলে এই সমস্ত প্রাণী হত্যা করতে হয়। মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় বলে এতে কোন গুনাহ হওয়ার কথা নয়। তবে যথাসম্ভব মানবতার সংগে এই প্রাণীদের ব্যবহার করা উচিত।

ইউরোপে এইরূপ প্রাণী ব্যবহারের বিরুদ্ধে চার্চ সমর্থিত কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করে। যারা হিরোসিমা নাগাসাকিসহ অসংখ্যা এলাকায় নিরপরাধ লোক বোমা মেরে ধ্বংস করে তাদের এরূপ-মানবতা বোধের আন্দোলন নেহাত হাস্যাস্পদই বলতে হয়।

হিমোটোলজি বা রক্ত সম্পর্কিত বিদ্যা

এর দুটো অংশ (ক) রক্ত পরীক্ষা ও (খ) রক্ত সঞ্চালন বা Blood Bank পরিচালনা। বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্তের বিভিন্ন উপাদানের মান নির্ণয় ও গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এতে ইসলামবিরোধী কিছুই নেই। শুধু রমযান মাসে দিনের বেলায় রক্ত পরীক্ষা নিয়ে কেউ কেউ সমস্যায় পতিত হন। এ কথা জানা প্রয়োজন যে রক্ত শরীর থেকে বের করলে রোযা নষ্ট হয় না। আল কুরআনের সূরা ২ : ১৭৩ আয়াতে রক্ত খাদ্য হিসেবে হারাম। তাই Blood Transfusion রক্ত খাওয়ার মত বরং তার চেয়ে আরও বেশি সরাসরি গ্রহণ করা। কেউ এই জন্য রক্ত সঞ্চালন জায়েজ নয় বলে থাকেন। তবে একই আয়াতের শেষাংশে রয়েছে অর্থাৎ যদি কেউ বাধ্য হয়ে হারাম খাদ্য গ্রহণ করে তবে পসন্দ করেও নয় বা আল্লাহর আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে নয় তা হলে তাতে কোন গুনাহ হবে না। সুতরাং বলা যায় যে যদি জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় তবে রক্ত সঞ্চালন বা Blood Tarnsfusion নির্দোষ হবে। মাওলানা শাফি সাহেবের ফতওয়াও অনুরূপ।

৫. চিকিৎসা আইন বা মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স

বর্তমানে মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স বা ফরেনসিক মেডিসিন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধর্মহীন সমাজ কর্তৃক লিখিত বলে এতে ইসলামী নৈতিক আইন কানুনের উল্লেখ নেই। সুতরাং এই বিষয়ের যাবতীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ইসলামী বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ করতে হবে।

www.icsbook.info

হঠাৎ মৃত্যুতে-মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করাই চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এসব বিষয়ে ইসলামী আইন ভিত্তিক প্রয়োজনীয় রদবদল প্রয়োজন। ভ্রূণ হত্যা, পাশবিক অত্যাচার জাতীয় যৌন অপরাধ এবং অন্যান্য খুন-খারাবিতে ইসলামী বিধি নিষেধের ভিত্তিতে অপরাধ চিহ্নিত করতে হবে। বলাৎকার জাতীয় ঘটনায় সম্ভব হলে মেয়ে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এখানেও যথা সম্ভব সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ বা অটপসি করতে হবে। আর মেয়েদের জন্য মেয়ে সাহায্যকারী অবশ্যই থাকতে হবে।

৬. সামাজিক বা কম্যুনিটি মেডিসিন

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো রোগ প্রতিরোধ শিক্ষা দেয়া। যদিও আজকাল এই ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তবুও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই শিক্ষা খুবই নগণ্য। মহামারী দেখা দিলে এবং বন্যা বা খরায় রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন এই বিদ্যার প্রধান অংশ। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবীর (সা) প্রদর্শিত স্বাস্থ্য রক্ষার নীতিগুলো এই বিষয়ে যুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এগুলো আধুনিক কম্যুনিটি মেডিসিনে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খাবার পূর্বে-পরে ভাল করে হাত ধোয়া, সপ্তাহে অন্তত একবার হাত পায়ের নক কাটা, গোঁফ ছোট করা, বগল ও গুপ্ত স্থানের লোম কামানো, অযুর মাধ্যমে দৈনিক কয়েকবার নাক কানের ছিদ্রগুলো পরিষ্কার করা, হাত-পা-মুখ ভাল করে ধোয়া, পেশাব-পায়খানার পর গুপ্তাঙ্গ ও হাত ধোয়া, খাদ্য ও পানীয় সব সময় ঢেকে রাখা, ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া, খাওয়ার সময় পানি পান না করা, পেট বোঝাই করে না খাওয়া ইত্যাদি অসংখ্য সুন্নাত ফরয ও ওয়াজিবের মাধ্যমে শারীরিক রোগমুক্ত রাখার শিক্ষা রয়েছে। এ উপলক্ষে দৈনিক কয়েকবার দাঁত পরিষ্কার করা ও খেলাল করার উপদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাইজিনের পুস্তকে এগুলো স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে লিখিত হবে এবং এতে যে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) হুকুম পালন করার সওয়াব পাওয়া যাবে এ শিক্ষাও দিতে হবে।

আজকাল এই বিষয়ের সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার নামে বার্থ কন্ট্রোল বা জন্ম নিরোধের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। অথচ এতে সমাজের ওপর যে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। মেডিক্যাল শিক্ষা ইসলামীকরণের সময় এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। মেডিক্যাল শিক্ষা ইসলামীকরণের সময় এর ক্ষতিকর দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার নামে ব্যাপক যৌন-অনাচার প্রসার হোক এটা কেউ চায় না। ইসলাম কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার বিরোধী নয়। যাদের কোন সন্তান হয় না তাদের সমস্যাও একইভাবে পরিবার পরিকল্পনার অংশ হতে হবে। জনসংখ্যা রোধের উদ্দেশ্যে বেপরোয়া গজ বা গর্ভপাত করা কখনই ইসলাম সমর্থন করে না।

www.icsbook.info

৭. মেডিসিন বা সাধারণ চিকিৎসা

বর্তমানে এর অধিক বিভাগ রয়েছে যেমন, শিশু-চিকিৎসা, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, মানসিক চিকিৎসা, নেফরোলজি এভিয়েশন মেডিসিন, ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ইত্যাদি। এসব পদ্ধতি সাধারণত কোন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ রোগী প্রথমত এ সব বিষয়ের যে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট-প্রথম গিয়ে থাকে।

চিকিৎসা ইসলামীকরণের বেলায় পুরুষ রোগীর জন্য পুরুষ ডাক্তার ও নারী রোগীর জন্য নারী ডাক্তার যথেষ্ট সংখ্যায় থাকা উচিত। এর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে যেন আগামী ২০-২৫ বৎসরে এই লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। এতে নারী শিক্ষা ও নারী জাতির স্বাবলম্বী হওয়া সহজ হবে।

এই প্রসঙ্গে নার্সের কথা এসে যায়। ইসলামে যেহেতু পর্দা ফরয তাই পুরুষ নার্স এবং স্ত্রী রোগী ও শিশুদের জন্য মেয়ে নার্স নিযুক্ত হওয়া উচিত। নার্স শব্দকে জোর করে স্ত্রীলিঙ্গ করার বদলে বাংলা সেবক ও সেবিকা শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত।

যতদিন যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা চিকিৎসক না হবে ততদিন পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চালাতে হবে। তবে স্ত্রী রোগ চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র যথেষ্ট সংখ্যায় মহিলা চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ তৈরির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

বর্তমান বিভিন্ন হাসপাতালে মহিলাদের পৃথক বিছানা থাকলেও মহিলা ওয়ার্ডে সত্যিকার কোন পর্দা নেই। যে কোন পুরুষ ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়ও সাক্ষাৎকারী বিনা দ্বিধায় মহিলা ওয়ার্ডে ঢুকতে পারে। এ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। মহিলা ওয়ার্ডে পুরুষ ডাক্তারদের ভিজিটের সময় এবং বিকেলে সাক্ষাৎকারীদের সাক্ষাতের সময় প্রত্যেকটি বিছানাকে অস্থায়ী পর্দা দিয়ে ঘিরে নিতে হবে। মুমূর্ষু রোগীর জন্য এ ধরনের পর্দার ব্যবস্থা সব হাসপাতালেই রয়েছে।

রোগীদের ওয়ার্ড ডাক্তার, নার্স ছাড়াও ওয়ার্ড মাস্টার, ওয়ার্ড বয় ও মহিলা সাহায্যকারী থাকে। পুরুষ ওয়ার্ড মাস্টার ও ডাক্তার এবং সাক্ষাৎকারী দেখা করার জন্য মহিলা ওয়ার্ডে যেতে পারবে। আর পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডে পুরুষ ও মহিলা সাহায্যকারি এখনও আছে, তবে এরা বিনা বাধায় যে কোন ওযার্ডে ঘুরে বেড়ায়। কারণ পর্দার কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

মহিলা ডাক্তার, নার্স ও সাহায্যকারী সবাই মাথায় রুমাল ও স্কার্ফ বেঁধে এপ্রোন পরে হাসপাতালে কাজ করবেন।

যেহেতু ইসলামী পর্দার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই তাই পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড রাখা হয় এবং দরজায় পর্দা পর্যন্ত থাকে না। কোন পাহারাদার তো নয়ই। হাসপাতালের দুই অংশে মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পৃথক ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। শিশুদের ওয়ার্ড মহিলা ওয়ার্ডের সঙ্গেই থাকবে। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে

www.icsbook.info

প্রয়োজনে যেখানে চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন সেখানে পুরুষ ডাক্তার অবশ্যই মহিলা রোগীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা করবেন যদি মহিলা ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ না পাওয়া যায়।

৮. সার্জারি বা অস্ত্রোপচার বিভাগ

এখানেও পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে। মহিলাদের শরীর অপারেশনের পূর্বে প্রয়োজনের বেশি শরীর অনাবৃত না করা উচিত। অবশ্য অপারেশনের সময় কেবল কাটার অংশ ছাড়া বাকি অংশ ভালভাবেই আবৃত থাকে। ইনফেকশন থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে ডাক্তার ও নার্সগণ যে সাবধানতা অবলম্বন করেন তা ইসলামী বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। অপারেশন একটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার আর রোগীর বিশ্বাস বা নির্ভরশীলতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মহিলা বিশেষজ্ঞ না পেলে বিনা দ্বিধায় পুরুষ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। সব সময়ে নিয়ত-ই আল্লাহর নিকট বিচার্য বিষয় হবে। অনেক বড় ও দীর্ঘস্থায়ী অপারেশন মহিলাদের জন্য কঠিন হয়ে থাকে তাই খুব কম মহিলা (General surgeon) পাওয়া যায়। সার্জারিতেও মেডিসিনের মূল বিষয়গুলো প্রযোজ্য।

৯. ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিদ্যা (Obstetrics & Gynaecology)

এখানে যদিও মেডিসিন ও সার্জারির মূলনীতিগুলো প্রযোজ্য তবুও এখানে একটু বেশি আলোচনা প্রয়োজন।

যেহেতু এই রোগগুলো কেবল স্ত্রী যৌন অঙ্গের সঙ্গে জড়িত তাই এই বিভাগে সব চিকিৎসক নার্স ও সাহায্যকারি যে মহিলা হওয়া উচিত তা অনস্বীকার্য। মুসলমান মহিলাগণ পর্দার জন্য পুরুষ ডাক্তার দেখাতে চায় না বলে খ্রিষ্টান মিশনারিরা এই উপমহাদেশের প্রথম স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তাদের ধর্ম প্রচারের জাল ফেলে। তাদের হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্স এর কুফলও আমরা দেখতে পাই। তাই বাংলাদেশ তথা সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এই বিভাগগুলো অবশ্যই মহিলাদের দিয়ে পরিচালনা করতে হবে।

১০. চক্ষু চিকিৎসা বা অপথালমোলজি (Ophtalmology)

এখানেও যেহেতু চেহারা খোলা অবস্থায় ডাক্তারের সম্মুখীন হতে হবে তাই এখানেও মহিলা ডাক্তার ও নার্স মহিলা রোগীদের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। চক্ষু অপারেশন স্বল্প স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য বিধায় এতে মহিলাদের পারদর্শী হওয়াই সহজ।

www.icsbook.info

১১. নাক-কান-গলা বা Ear-Nose-Throat বিভাগ

এখানেও চক্ষু বিভাগের নীতি প্রযোজ্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমান চিকিৎসকগণ এককালে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সে সব কথা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়ার সময় মনে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল রাযী (৮৫০-৯২৫) ইবনে সীনা (৯৯০-১০৩৭), আল-জুরজানী (মৃত্যু ১১৩৬) প্রমুখ চিকিৎসকদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং মেডিসিন ও সার্জারিতে তাদের অমর অবদানের কথাও বলতে হবে। এমনিভাবে আবুল কাসেম জাহরাবীর (৯৩৬-১০১৩) সার্জারিতে বিশেষ অবদান ও বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্বজোড়া স্বীকৃতির কথাও স্মরণ করতে হবে।

ইবনে হাইসাম ও ইবনে রুশদ ১২শ শতাব্দীর চক্ষুরোগ চিকিৎসায় বিশেষ অবদান, মাসুবিয়াহ জুনিয়র (১১শ শতাব্দী) এবং বাহাউদ্দিন (১৬ শ শতাব্দীর) অজ্ঞান করা ঔষধ (Anasthetics) আবিষ্কারের ইতিহাস ও শিক্ষার্থীদের জানতে হবে।

এবার হাসপতালের পরিবেশ ইসলামীকরণ ও শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা যাক।

হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে এবং ওয়ার্ডের ভেতর শিক্ষামূলক কোরআন ও হাদীসের আয়াত সমূহ টাঙিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয় উপদেশাবলি চারদিকে টাঙিয়ে রাখা প্রয়োজন।

হাসপাতালের রোগী কর্মচারীদের জন্য একটি ভাল লাইব্রেরি থাকবে হবে যেখানে ধর্মীয় কিতাবসহ গল্প ইতিহাস-উপন্যাস ইত্যাদি সব রকম পুস্তক ও পত্রিকা থাকবে। সকল বইয়ের একটি তালিকা থাকবে। ওয়ার্ডবয় বা লাইব্রেরির সহযোগী রোগী একবার এই তালিকাসহ বিভিন্ন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং তিনি কী বই পড়তে চান তা জেনে নিয়ে পরে সরবরাহ করতে হবে। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে বই-পুস্তক যথারীতি বিলি ও সংগ্রহ করা হয়। হাসপাতালে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য আলাদা নামাযের কামরা থাকবে যাতে চলতে সক্ষম রোগীগণ জামায়াতে নামায আদয় করতে পারেন। হাসপাতালের কর্মরত যে কেউ প্রয়োজনের ইমামের কাজ করবেন।

হাসপাতাল ও কলেজ এলাকায় একটি বড় জামে মসজিদ থাকবে যেখানে বাইরের লোকও জামায়াতে যোগ দিতে পারেন। এই মসজিদে একজন উপযুক্ত ইমাম যোগ্য বেতনসহ রাখতে হবে যিনি রোজ একবার সকল ওয়ার্ড ঘুরে বেড়াবেন যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তওবা করতে পারে বা কেউ কোন মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে পারে। বিশেষ করে বহু রোগীকে তায়াম্মুম শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে এ জন্য প্রস্তুত মাটির ঢেলা সরবরাহ করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

www.icsbook.info

এ দেশে প্রথম আইয়ুবী মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর একবার জনৈক এক বাঙালি কর্নেল (বর্তমানে মরহুম) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসক নিযুক্ত হন। তখন মেডিক্যাল কলেজে জামায়েতে নামাযের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে হাসপাতালে গাড়িবারান্দার উপরের কামরায় নামায হতো। ১৯৫৯ এর দিকে নতুন আউট ডোর বিল্ডিংয়ের সঙ্গে হাসপাতালে সংযোগের জন্য পশ্চিম দিকের গাড়িবারান্দা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং সেই সঙ্গে নামাযের জায়গাও গায়েব। এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করায় নামাযী কর্মচারীবৃন্দ পশ্চিম দিকের লম্বা বারান্দায় জুমুয়াসহ সব নামায আদায় করতে লাগলেন।

একদিন বিকেলে কলেজ বিল্ডিংয়ের সামনে প্রশাসক সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে পেয়ে বললাম 'স্যার হাসপাতালের নামাজের জায়গাটা ভেঙ্গে দিলেন অথচ তার বিকল্প স্থান দিলেন না। অন্য যে কোন গাড়িবান্দার ঘর দিলেও চলতো।' তিনি বললেন, 'আরে বলো না, জায়গাই তো নেই। তুমিই বলো কোথায় দিতে পারি?' আমি বললাম- 'আপনার কলেজ ও হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের দুটি আলাদা বড় বড় অফিস কামরা রয়েছে। এর একটি যদি নামাযের জন্য ছেড়ে দেন তবে আপনার অফিসের জন্য আর একটি জায়গা পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি হলে তাই করতাম।' আমার এরূপ স্পষ্ট কথায় একটু অপ্রস্তুত হলেও তিনি হেসে বললেন, 'আরে তুমি যে একেবারে মোলা হয়ে গেছ হে। আচ্ছা দেখা যাক কী করা যায়।' হোক অনেকদিন পর আউটডোর দালানের দোতলায় একটি মসজিদ তৈরি হয়।

হাসপাতালের মসজিদের ইমামদের কোন পদ আজও মঞ্জুর হয়নি। পাকিস্তানের তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের আমলেও নয় আর স্বাধীন বাংলাদেশেও নয়। আর অনেক জায়গায় ইমামকে একজন চতুর্থ শ্রেণীর (পিয়ন জাতীয়) কর্মচারী হিসাবে বেতন দেয়া হয় আর নামাযীরা চাঁদা করে কিছু অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থা করেন। আইয়ুব আমলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সুন্দর মসজিদটিতে বহু চেষ্টা করেও একটি ইমামের পদ মঞ্জুর করা গেল না। তখনকার জনৈক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াদা করেও তা পালন করেননি।

হাসপাতালের কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটি মকতব বা প্রাইমারি স্কুল সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই স্কুলের দ্বীনিয়াত শিক্ষক হিসাবে একজন আলেম নিযুক্ত হলেও এর সহজ সমাধান সম্ভব। মুসলিমদের প্রথম যুগের হাসপাতাল যা বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আধুনিক হাসপাতালের পূর্বসূরিরা কোন কোন দিক দিয়ে আরও উন্নতমানের ছিল। দূরদূরান্ত থেকে যেসব রোগী আসতো তাদের সঙ্গীদের মুসাফিরখানা থাকতো যেখানে, তিনদিন পর্যন্ত রোগীর সঙ্গীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কারণ ইসলামে মেহমান শুধু তিন দিনের জন্য। বর্তমানে সরকারের এত প্রাচুর্য নেই বলে মুসাফিরখানায় দু'রকম ব্যবস্থা থাকবে। যারা ধনী তারা মটেল জাতীয় এক বা দু কামরায় Flat ভাড়া নেবে আর যারা গরিব তারা বড় বড় হল কামরায় বিনা ভাড়ায় থাকবে আর রেস্তোরাঁ থেকে খাদ্য কিনে খাবে। তিন দিনের মধ্যে রোগীর ভর্তি হওয়া উচিত এবং

www.icsbook.info

এরপর কাউকে মুসাফিরখানায় থাকতে দেয়া হবে না। অবশ্য এখানেও মেয়েদের থাকার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

রোগীর খাদ্য : সততার অভাবে বর্তমানে কোন হাসপাতালেই খাদ্য সরবরাহ সন্তোষজনক নয়। একে তো রোগীর মাথা পিছু বরাদ্দ কম। তা থেকে কর্মচারীদের চুরি আর বড় সাহেবদের ঘুষ দিয়ে যা থাকে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই আজকাল যারা সমর্থ তারা নিজেরাই খাবার সরবরাহ করে। এজন্য ঈমাদানর কর্মচারী নিয়োগ ও উপযুক্ত তদারক প্রয়োজন।

হাসপাতালের ক্যান্টিন

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিন আমাদের দেশে কল্পনা মাত্র।

সুতরাং সকল কর্মচারী ইসলামী সততায় চরিত্রবান না হলে রোগীর খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহে কোন ন্যায়নীতি সম্ভব নয়। মেডিক্যাল শিক্ষা ইসলামীকরণের বেলায় এসব দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে।

এমনিভাবে হাসপাতালের ধোপা, কন্ট্রাক্টরবৃন্দ ও স্টোর কিপারদের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য। পেশাব পায়খানার জায়গাগুলো সব সময় পরিষ্কার করার সুব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালের লেট্রিনগুলো লজ্জাজনকভাবে অপরিষ্কার।

ছাত্র ভর্তি

প্রথমেই বলতে হয় যে ইসলাম সহশিক্ষা (Co-education) সমর্থন করে না। সুতরাং পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার তৈরির জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। পাকিস্তানে, এমনকি হিন্দু প্রধান ভারতে পর্যন্ত পৃথক মহিলা মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে।

যেহেতু কেবল প্রতিভাবান হলেই চলবে না একজন ডাক্তারকে হতে হবে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান সমাজসেবক। তাই নৈতিকতাবোধ যার কম তাকে ভর্তি করা ঠিক হবে না। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মেধাবী এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু ভর্তি হতে পারবে। এজন্য এ সব বিষয়ে বিচার করতে সক্ষম এমন একটি নির্বাচন কমিটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির অনুমোদন দেবে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের বেলায় তাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কুরআন-হাদীসের জ্ঞান এবং ন্যায়, অন্যায় সম্পর্কে ইসলামী নীতিবোধ আছে কিনা তা অবশ্যই দেখতে হবে।

ভর্তির পর যদি কোন শিক্ষার্থীকে ইসলামী শরিয়তের ন্যূনতম বিধি-বিধানও মেনে চলতে অপারগ দেখা যায় তবে সংশোধনের সুযোগ দিয়েও যদি কোন ফল লাভ না হয় তবে তাকে কলেজ থেকে বিদায় করতে হবে। অমুসলমানদের বেলায় তাদের নৈতিক চরিত্র সন্তোষজনক হলেই চলবে।

www.icsbook.info

শিক্ষক নিয়োগ

ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় যেমন নৈতিকতার মূল্যায়ন জরুরি শিক্ষক নিযুক্তির বেলায় তা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইসলামবিরোধী কোন শিক্ষক কিছুতেই প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে গোঁড়ামি নয় মানুষের অন্তরের কথা আল্লাহই ভাল জানেন।

এ প্রসঙ্গে মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরাসরি আওতায় থাকা ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে নতুবা পৃথক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালিত হবে। এ জন্য পৃথক সিনেট ও ফ্যাকাল্টি থাকবে যাতে সরকারি প্রতিনিধিও থাকবেন। শিক্ষকদের নিয়োগ শুধু সেই প্রতিষ্ঠানের জন্যই হবে আর বদলির কোন ঝুঁকি থাকবে না।

চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন :

এ ব্যাপারে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। একজন ডাক্তার বর্তমানে যেহেতু গ্রাজুয়েট বলে স্বীকৃত তাই তার বেতন-স্কেল অন্যান্য গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়। এটা ঠিক নয়। কারণ যেখানে যে কোন ব্যক্তি H.S.C পাসের পর ২ থেকে ৩ বৎসরে সাধারণ বা অনার্স গ্রাজুয়েট হন সেখানে একজন ডাক্তারকে পাঁচ বৎসর কঠিন অধ্যয়ন করতে হয়। আর উচ্চ মেধা না হলে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়াও যায় না। সুতরাং যেখানে চার বৎসরে একজন মাস্টার ডিগ্রি হাসিল করে এবং ইঞ্জিনিয়ার হয় সেখানে একজন ডাক্তার পাচঁ বৎসরে পাস করে এবং আরও এক বৎসর ট্রেনিং নিয়ে পুরোপুরি ডিগ্রি লাভ করে। সুতরাং আমাদের এ সব অনিয়ম দূর করার জন্য U.S.A এর মত ডাক্তারদের প্রাথমিক ডিগ্রিকেই গ্রাজুয়েট ডিগ্রি M.D বলা উচিত। তাহলে তাদের উপযুক্ত উচ্চতর প্রাথমিক বেতন দিতে অসুবিধা হবে না।

এরপর ডাক্তারদের মধ্যে Teaching এবং Non teaching Cadre সৃষ্টি করতে হবে যেন একমাত্র তারাই শিক্ষক হয় যারা শিক্ষকতা পছন্দ করেন এবং গবেষণা করা ভাল বাসেন। যে সব বিষয়ের ডাক্তারদের Practice করার সুযোগ নেই যেমন এনাটমি, ফিজিওলজি ইত্যাদি তাদের বেতন যারা Practice করবে তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য মূল বেতনের সমান অংশ অতিরিক্ত পাবেন। (Non practrising allowance)।

Clinical বিষয়ের ডাক্তারগণ যেহেতু শিক্ষক হলেও Practice করতে পারবেন তারা কোন অতিরিক্ত বেতন পাবেন না। গবেষণালব্ধ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকাশনা ব্যতীত কোন শিক্ষক উচ্চতর পদে প্রমোশন পাবেন না। মোটকথা এ সবই ইসলামী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে করতে হবে।

লেখক : সাবেক অধ্যক্ষ, রাজশাহী ও মোমেনশাহী মেডিক্যাল কলেজ।

www.icsbook.info

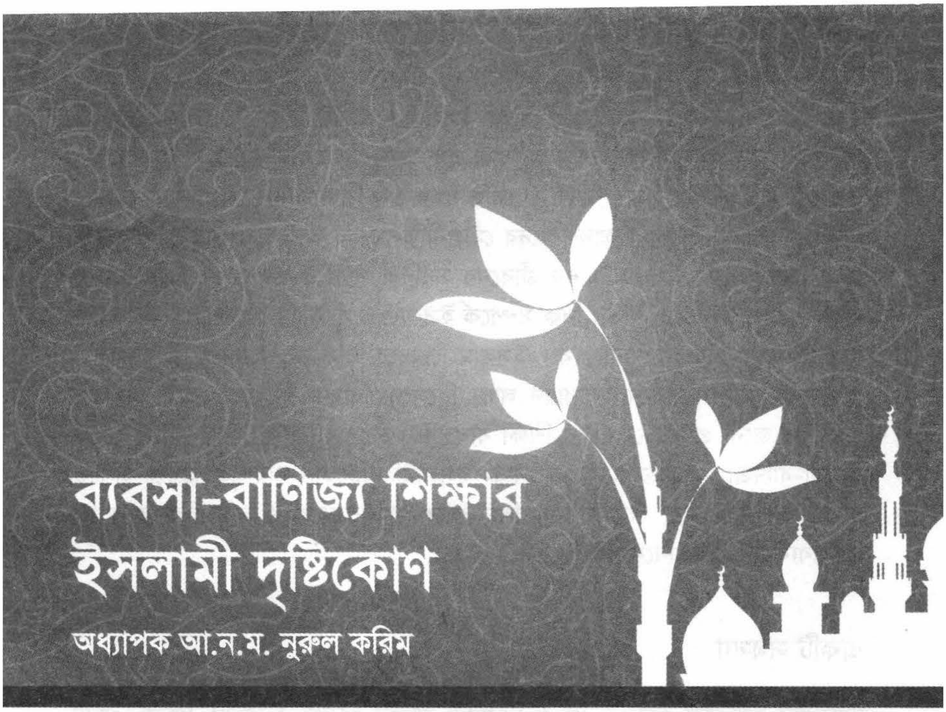

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ

অধ্যাপক আ.ন.ম. নুরুল করিম

প্রারম্ভিক কথা

বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাজগতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির শিক্ষা এক বিশাল এলাকায় ব্যাপৃত হয়ে আছে। উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে কিভাবে খরিদ্দাররা ন্যায্যমূল্যে যথাসময়ে যথা পরিমাণে পণ্যদ্রব্যাদি ও সেবা লাভ করবে তা মানবেতিহাসে সর্বযুগেই সেরা আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করে এসেছে। কিভাবে একজন উৎপাদনকারী অন্য একজন খরিদ্দারের কাছে তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য পৌঁছিয়ে দেবে, উৎপাদনকালীন সময়ে সমগ্র উৎপাদন একসাথে বিক্রি না করে উৎপাদনবিহীন সময় পর্যন্ত ধরে রাখবে, এক স্থানের উৎপাদিত পণ্য অন্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে- এসব কিছুই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। তাছাড়া পণ্যদ্রব্যের প্রচারণা, খরিদ্দারদেরকে সচেতনকরণ, বাজার-তথ্য সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ইত্যাদি কার্যাবলিও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কাজ হিসেবে আজ স্বীকৃত। তাই, বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষাসূচিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষাকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে বাণিজ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীদের মাধ্যমে জীবন-পথে চলার যে আদর্শ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তাই হচ্ছে ইসলাম। হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে যে জীবন-পথের দিশার আগমন শুরু, মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে তার

www.icsbook.info

শেষ পূর্ণ পরিসমাপ্তি- আর তাই হচ্ছে ইসলাম। একটি জনসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী যদি ইসলামী আদর্শের অনুসারী হয়, তবে তা হয় একটি মুসলিম সমাজ। এরূপ একটি মুসলিম সমাজ, দেশ বা জাতি যখন তার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তখন তাকে স্বভাবতই ইসলামী আদর্শবাদের মৌলনীতিসমূহের আলোকে তার শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করতে হয়। ইসলাম মানব জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দেশ করে। যদিও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের খুঁটিনাটি নির্দেশাবলি ইজমা ও কিয়াস করে নির্ধারণ করা হয়। ইসলাম খোদার দাসত্বের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই মানব জীবনের সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই, মুসলিম সমাজের জন্যে প্রণীত যে-কোন শিক্ষা ব্যবস্থায়- তা সাধারণ বা টেকনিক্যাল অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হোক না কেন- ইসলামী দৃষ্টিকোণ অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, যে-কোন মুসলিম দেশে সার্বিকভাবে এ দৃষ্টিভঙ্গিই হবে তা শিক্ষাব্যবস্থার মৌল নির্দেশিকা।

একটি সমস্যা

আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাকে নিছক একটি জৈবিক শিক্ষা বলে ধরে নেয়া হয়। নীতি, নৈতিকতা, ধর্ম, ধর্মবাদিতা, চরিত্র নীতি, ন্যায়নীতি ইত্যাদির সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় না। যেহেতু এ শিক্ষা শুধুমাত্র মানব সমাজে জিনিস-পত্র, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, উপহার বন্টন ও বিতরণের সাথে জড়িত, সেহেতু নৈতিকতাবোধ অথবা আদর্শবাদিতার সাথে এর কোন সংস্রব থাকার কথা নয়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে এ ভুল ধারণা থাকা সমীচীন নহে। যেহেতু ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা এবং যেহেতু ইহা জীবনের সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করে, মুসলিম সমাজে গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইসলামী ভাবাদর্শ থেকে উৎসারিত হতে হবে। ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফপ্রিয়তা, আদর্শবাদিতা,. নৈতিকতা-প্রিয়তা আমাদের ইহলৌকিক পারলৌকিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ইসলামে "ইবাদত" বা খোদার দাসত্বের যে ধারণা আছে, তা শুধু কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয় তা জীবনের যে কোন পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত হবার দাবি রাখে। যদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে এবং এর মাধ্যমে "হালাল জীবিকা" অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালায়, তবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে যত কাজ করতে হবে, ইসলামের দৃষ্টিতে সবকটিই "ইবাদত" বলে পরিগণিত হবে। তাই, বলা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত জৈবিক শিক্ষাসূচিকেও ইসলামীকরণ করা হয় এবং এর ফলে ইসলামের নৈতিকতার-আদর্শ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শান্তির ফল্গুধারা বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

www.icsbook.info

শিক্ষাসূচির উদ্দেশ্য

যে-কোন ধরনের শিক্ষাসূচিই কতগুলো মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রণয়ন করা হয়ে তাকে এবং এ ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত লোকেরা এ সমস্ত উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্য শিক্ষার পেছনে কতকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলোকেও বাস্তবায়িত করার জন্যেই এই বাণিজ্য সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এমন একটি জনশক্তি গড়ে তোলা যারা বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি, ইহার বণ্টন ও বিতরণ এব ইহার ভোগের বিষয়ে সহায়তা করবে। এ দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে। "Commerce is the sum-total of all those activities which are connected with the removal of hindrance of time. place and persons." এদিক থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়, বণ্টন-বিতরণ, ব্যয়-ব্যবহারে শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলা। কোন বিশেষ দ্রব্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তর, এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি থেকে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কাছে বিক্রি করার এবং এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত উৎপাদিত পণ্যকে দাম পড়ে যাওয়ার ভয়ে ধরে রাখা-ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চললে, তাই ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে যাবে (Islamic Trade and Commerce)। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে :

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য বণ্টন সহজ করে তোলা এবং মানুষ যাতে করে সহজভাবে জীবন-ধারনের সামগ্রী লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(খ) পণ্য দ্রব্য বণ্টন-বিনিময়ে একচেটিয়া লাভ যাতে কারো না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

(গ) বণ্টন ব্যবস্থা থেকে সুদ, ঘুষ, রিশওয়াত সহ যাবতীয় অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা এবং বাঁচিয়ে রাখা।

(ঘ) বণ্টন-ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ পরিমাপ ব্যবস্থা চালু করা এবং মজুদদারি, মুনাফাখোরি ও কালোবাজারি কার্যকলাপ থেকে বিরত করা।

(ঙ) ক্রেতা সাধারণকে বিক্রেতাদের হক আদায় করতে, বিক্রেতাদেরকে ক্রেতাদের প্রতি হক আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং

(চ) পণ্যদ্রব্যের বৈধতা, জায়েজ, না-জায়েজ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

www.icsbook.info

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কীয় শিক্ষাসূচি প্রণয়নকালে আমাদের শিক্ষা প্রণেতাদের সম্মুখে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে গুরুত্ব, তা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। ধনোপার্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনোপার্জন অন্যতম। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোরআন মজিদে বলা হয়েছে :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং খোদার অনুগ্রহ-ধন-সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও উপার্জন করো।" (আল জুময়া)

কোরআন মজিদে অন্যত্র বলা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ. (النساء)

"মুসলমানগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অসদুপায়ে পরস্পর পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তোমাদের পাস্পরিক সম্মতিক্রমে কৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই অর্থের আদান প্রদান কর।" (সূরা আন নিসা)

নবী করিম (সা) মুসলমানদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ইসলামী সমাজে সত্যবাদী, বিশস্ত ও ন্যায়পন্থী ব্যবসায়ীদের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করছেন। তিরমিজী শরিফে বলা হয়েছে :

اَلتَّاجِرُ الصَّدِيْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দীক ও শহীদ প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।"

নবী করিম (সা) আরো বলেছেন : تِسْعَةُ اَعْشَارِ الرِّزْقِ فِى التِّجَارَةِ

"রুজির দশভাগের নয়ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যে মধ্যে।"

'কানযুল উম্মাল' নামক ইসলামী অর্থনীতির বইতে বলা হয়েছে :

لَوْ لَا هٰذِهِ الْبُيُوْعُ لَصِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ

"ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ব্যবস্থা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ ও অপরের ওপরে দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠতো।" কালামে পাকে বলা হয়েছে :

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا. (البقرة)

"আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন; কিন্তু সুদ ও সুদ-ভিত্তিক যাবতীয় কাজ কারবার হারাম করেছেন।"

www.icsbook.info

ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষার মূলনীতি

একটি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-সব মূলনীতি থাকার প্রয়োজন, ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষাকে তার অতিরিক্ত কতিপয় মৌলিক নীতি মেনে চলতে হবে। এগুলো হচ্ছে, এ শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর, যার ওপরে এ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাসাদ গড়ে তোলা যাবে। এ মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ হতে পারে :

(১) ইহা মানব সমাজের বৈধ জীবিকা অর্জনের সহায়ক হবে। ইসলাম জীবন ধারণের নিমিত্ত যেসব হালাল উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে, ইহা সেগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে। এবং হারাম উপায়গুলোকে পরিহার করে চলবে।

(২) ইহা সুদ অথবা সুদি কাজকারবার ও লেনদেনে উৎসাহ জোগাবে না; বরং পারস্পরিক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে কৃত-বাণিজ্যের প্রতি জনসাধারণের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

(৩) যে-কোন ধরনের লেন-দেনে পরিমাপ ও পরিমাণের ক্ষেত্রে কারচুপি যাতে না হয় ইহা সে দিকে খেয়াল রাখবে।

(৪) ইহা মজুদদারি, মুনাফাখোরি, গুদামজাতকরণের ব্যবস্থাকে সমর্থন দেবে না। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি গুদামজাতকরণকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

(৫) ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় হারাম কাজ, অনিয়ম, নীতি-বহির্ভূত কাজের বিরোধী হবে। ইহা অনিয়ম ইত্যাদিকে অবৈধ বা হারাম বলে ঘোষণা করবে।

(৬) ইহা নৈতিকতা-উদ্দীপক হবে এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিজনেস মোরালিটি (Business Morality) জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

(৭) ইহা ইসলামের "মুজারাবাত" ও "মুদারায়াত" নীতি অথবা তার কোন আধুনিক বিকল্পকে ভিত্তি করে বাণিজ্য শিক্ষা গড়ে তুলবে।

(৮) ইহা শিক্ষার্থীদিগকে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্যে প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলবে। আর তা হচ্ছে, খোদার দাসত্ব মেনে নেয়া ও পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন। এ জন্যে শিক্ষাসূচির সর্বত্র এ ধারণা বদ্ধমূল থাকবে যে, আমাদের এ বিশ্বে আগমন ও অবস্থান এক ধরনের পরীক্ষা মাত্র। সে পরীক্ষায় আমাদেরকে পাস করতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমান বাণিজ্য শিক্ষার অবস্থা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ন্যায় আমাদের দেশেও বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ অব্যাহত রয়েছে। ১৯৪৭ সালে হিমালয়ান উপমহাদেশের দুটি স্বাধীন দেশ বিভক্তির পর থেকে এদেশের শিক্ষাজগতে বাণিজ্য শিক্ষার প্রবেশ ঘটে। অকালে

www.icsbook.info

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এম, এ, (কম) ডিগ্রি দেয়া হতো। তখনকার দিনের সিলেবাস ছিলো অর্ধেক বাণিজ্য-শিক্ষানির্ভর আর বাকি অর্ধেক অর্থনীতি শিক্ষা-নির্ভর। এরপর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদলয়সমূহ হিসাব-বিজ্ঞানে এবং ব্যবস্থাপনায় এম, কম ডিগ্রি দেয়া শুরু করে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মোট চারটি বিষয়ে বাণিজ্যে মাস্টারস ডিগ্রি প্রদান করছে। বিষয়গুলো হচ্ছে হিসাব-বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফাইনান্স ও মার্কেটিং। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব-বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ফাইনান্স এবং মার্কেটিং কোর্স চালু করার মাঝ পথে রয়েছে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে বি,কম, (পাস) ডিগ্রি দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বি,কম, (অনার্স) ও এম, কম, (প্রিলিমিনারি) ডিগ্রি ও দিচ্ছে। ওইঅ/উট ব্যবস্থাপনায় গইঅ ডিগ্রি দিচ্ছেন। তাছাড়া মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়াকারে বাণিজ্য শিক্ষা চালু আছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট স্তর বাণিজ্য শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র গ্রুপের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এতে একটি প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় যে, পণ্য-দ্রবাদি উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানুষের বিভিন্নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য শিক্ষার পরিসর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আমাদের ইপ্সিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য বাণিজ্য শিক্ষার যে লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে তার সাথে সংগত কারণেই ঐক্যমত পোষণ করা সুকঠিন বলে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য নির্ধারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস, নৈতিকতাবোধ ও জীবন-লক্ষ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। তাই, উদ্দেশ্য নির্ধারণের বিষয়টিও পুনর্বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

এতক্ষণ ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষার যেসব বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর আলোকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষাকে "আইডিয়াল" বলা চলে না। আমাদের বাণিজ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা "বৈধ জীবিকা" অর্জনের ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে বেখবর।

এ শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতি হিসেবে এক ধরনের "রিজিক" বা জীবিকা অর্জন করা গেলেও উহার "হালাল" বা "হারাম" হবার বিষয়ে এর কোন মাথা ব্যথা নেই।

এ শিক্ষাসূচি সুদ অথবা সুদ-ভিত্তিক কায়কারবার চলাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে না। বরং এ ধরনের ব্যবসায়িক কাজ কারবার কতভাবে কতরূপে ফুলে ফলে সুশোভিত করে চালানো যায় সে নিয়ে চিন্তা করে। অথচ আদর্শবাদের দৃষ্টিতে সুদ প্রদান ও গ্রহণ সর্বতোভাবে পরিহার্য।

আমাদের বাণিজ্যে শিক্ষাসূচি আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কায়কারবারে পরিমাপ ও পরিমাণগত অসাধুতা সম্পর্কে সাধারণভাবে নিন্দামুখর বলেও এসব বিষয়ে যে পরিমাণ ইস্পাত কঠিন মনোভাব রাখা দরকার তা পোষণ করছেন না।

www.icsbook.info

মজুদদারি, মোনাফাখোরি, গুদামজাতকরণের ভয়াবহতা তথা অকার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে যে ধরনের ঘৃণা বা অনীহা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন আমাদের বাণিজ্য শিক্ষাসূচি তা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় হারাম কাজ, অনিয়ম, নৈতিকতা-হীনতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নৈতিকতা সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাসূচি সম্পূর্ণ নীরব। অথচ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা মেনে চলার গুরুত্ব অসামান্য। বাণিজ্য শিক্ষাসূচি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

আমাদের বাণিজ্য শিক্ষা নিছক একটি বৈষয়িক শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। জীবনের মৌল লক্ষ্য বিন্দুর সাথে বাণিজ্য শিক্ষার লক্ষ্যকে একাত্ম করে দেখার চেষ্টা করা হয় না। তাই বাণিজ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের জীবনোদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোন সহায়তা করতে পারছে না। তাই যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে জীবন পথে চলছেন, তারা জীবনোদ্দেশ্যের বিষয়ে অনেকখানি গাফিল হয়ে পড়েছেন। তারা জীবনকে অনেকখানি জৈববাদের দৃষ্টিতে দেখা শুরু করেছেন। যার ফলে ধর্ম চিন্তা ও ধর্মবাদিতার সাথে বাণিজ্য শিক্ষার একাত্মতা প্রমাণ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে সমকালীন বাণিজ্য শিক্ষা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-বোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। তাই, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন-উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হবার পরিবর্তে আমাদের বাণিজ্য শিক্ষার লক্ষ্য অনেকখানি- বলতে গেলে সম্পূর্ণতই বিপরীতধর্মী হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই, এর পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

উপসংহার

ওপরের আলোচনায় আমি অন্যান্য দিকে না গিয়ে শুধুমাত্র আদর্শবাদের দৃষ্টিতে আমাদের প্রচলিত বাণিজ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা শিক্ষাসূচির একটি পর্যালোচনা পেশ করেছি। আলোচনা যতটুকু সম্ভব মূলনীতি ও মৌল কাঠামোর দৃষ্টিতে করা হয়েছে। সময় ও সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ আলোচনার আরো বিষয়-ওয়ারি এবং পাঠ্যক্রম অনুযায়ী করা সম্ভব। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে এ আশংকায় আমি আলোচনা আরো বিস্তারিত করা থেকে নিরুড় হয়েছি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আরো অধিক কার্যকর চিন্তার প্রয়োজন আছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনবোধ তথা তাহ্জীব ও তমদ্দুন থেকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বাণিজ্য শিক্ষা সম্পর্কে একটি মৌল কাঠামো পাওয়া যায়। এরই ভিত্তিতে যুগচাহিদা ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী একটি বিস্তারিত-বাণিজ্যক শিক্ষাসূচি রচনা করা যায়। এটি একদিকে আমাদের জীবন-লক্ষ্য উত্তরণে সহায়তা করবে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের

www.icsbook.info

ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে "বৈধ জীবিকা" অর্জনের পথ সুগম করে দেবে। বাণিজ্য শিক্ষার এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে যারা এগুতে চান, তাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে!

(ক) ইসলামের আদর্শবাদ-বিশেষ করে এর ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন,

(খ) আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য পদ্ধতির (ব্যবস্থার) পটভূমিকা, ক্রমোন্নতি এবং এর বর্তমান অবস্থ পর্যালোচনা,

(গ) সমকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে গৃহীত কর্মপন্থা অধ্যয়ন এবং

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগকৃত রূপ সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

তার সাথে সাথে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পূর্ণাঙ্গ সমাজ-কাঠামো ইসলামী না হলে ইসলামের ব্যবস-বাণিজ্যের নীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষা কোনটিই পূর্ণভাবে চলতে পারে না। তাই, ইসলামী সমাজ গঠন প্রচেষ্টা এবং ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্তন দুটো যুগপৎ চালু করতে হবে। আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে পূর্বাহ্নে শিক্ষাসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরি করে তারপর এর বাস্তবায়ন হয়ে যাবে- এ ধরনের ধারণা পালটানো প্রয়োজন। বরং নীতিগতভাবে যদি ইহা স্বীকৃতি পায়, এর সিলেবাস তৈরি তেমন কোন সমস্যা হবে না। এজন্য পূর্বাহ্নে? অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রয়োজন। তাই বলা যায়, ইসলামী আদর্শবাদ ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন চিন্তাবিদগণ কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে একটি বাণিজ্য শিক্ষাসূচি তৈরি করার সাথে সাথে তার বাস্তবায়নও অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এ অপরিহার্যতাই আমাদের যুবসমাজকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বাণিজ্য শিক্ষানীতির প্রতি আরো অধিক আগ্রহান্বিত করে তুলবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. কাবারের সংগঠন : ডা. এম, হাবিবুলাহ, ডীন, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. Education and Ideology : Dr. Hasan Zaman.

৩. ইসলামের অর্থনীতি : মাওলানা আব্দুর রহীম।

৪. Principles of Islamic Education : Khurshid Ahmad, Director, Islamic Foundation, Leicestesr, U.K.

৫. Islamic Education System : Maulana Syed Abul A'la Maududi.

লেখক : সাবেক চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

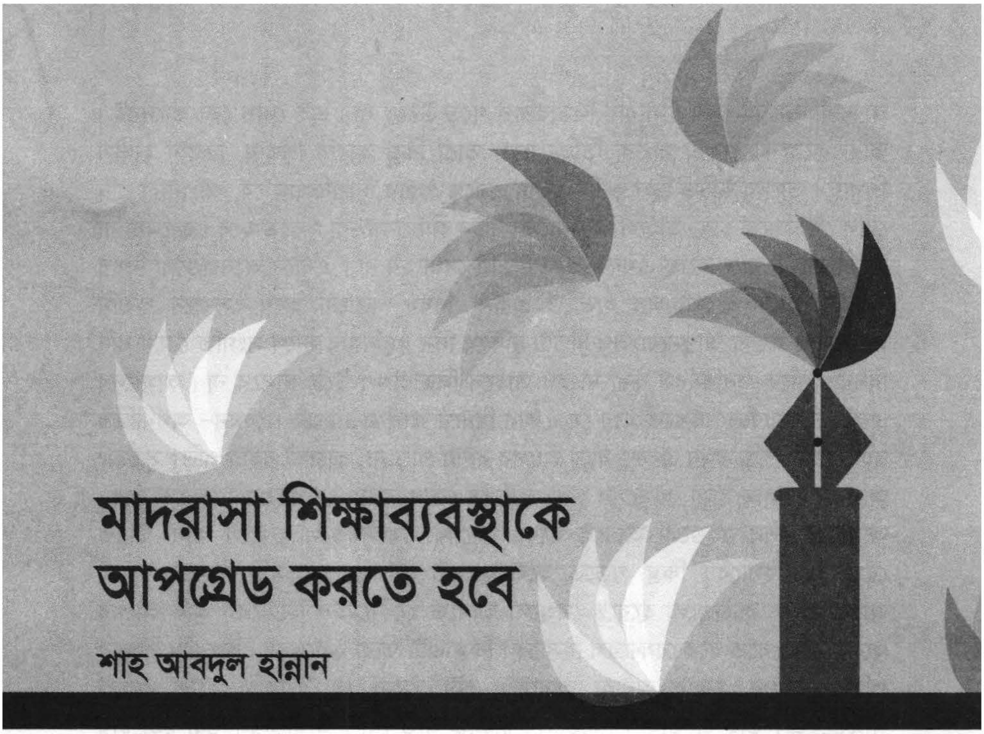

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আপগ্রেড করতে হবে

শাহ আবদুল হান্নান

আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের সাথে যারা মাদরাসা শিক্ষায় তাদের সাথে চিন্তা চেতনায় মন-মননে কিছুটা অমিল রয়েছে। এর কারণ কী?

এখানে আমি দুটো কথা বলবো। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুল আছে, উনাদেরও ভুল আছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুলটা হলো তারা আরবি শিখে না। যেমন আমি। আলেমদের মত আরবি জানি না। যদিও দু'বছর কোর্স করেছি, তাতে আমার অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। আমি অল্প বয়সে উর্দু শিখে নিয়েছি। ফলে সারা ভারতের আলেমদের চিন্তাধারা আমার জানতে সুবিধা হয়ে গেছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের লোকদের উচিত আরবি শেখার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া। আর মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভুলটা হলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সময়, যুগ ও ইসলামের চাহিদা পূরণ করছে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে আমি দুটি কথা বলে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিতে চাই। একটি কথা হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্ররা দেয় কেন? এবং জামেয়া কামরাঙ্গীরচর কিংবা জামেয়া লালবাগ দেয় না কেন? তার একটা জবাব, দুনিয়া চালাতে যে জ্ঞানের দরকার তা জামেয়া লালবাগ কিংবা জামেয়া কামরাঙ্গীরচরের নেই। দুনিয়া চালাতে কম্পিউটার সাইন্স, অর্থনীতি, বিবিএ, এমবিএ, লোক প্রশাসন লাগবে। অর্থাৎ দুনিয়া চালাতে যা প্রয়োজন একটা মাদরাসায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না।

www.icsbook.info

স্বাভাবিকভাবেই দেশ চালাবার লিডারশিপ গড়ে উঠছে না। এই দোষ তো তাদেরই। তারা করে কী একটা দাওরা ডিগ্রি দেয়। তারা কিছু আরবি শিখায়, কিছুটা হাদীস শিখায়। তাদের উচিত ছিল আমি একটা প্রবন্ধে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আপনারা যদি রোল প্লে করতে চান, তাহলে আপনাদের নতুন আরো দাওরা খুলতে হবে। জামেয়া বা ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে এখানে একটা ডিগ্রি দেয়া হয় না। এখানে অনেকগুলো বিষয় পড়ানো হয়। আমেরিকার হার্ভার্ডে একশ' বিষয় পড়ানো হয়। সেখানে কওমি মাদরাসায় অন্তত আপনারা অর্থনীতিটা ঢুকিয়ে দিন। দুনিয়ার সাথে সংগতি রেখে যদি বিষয়গুলোকে পুনবির্ন্যাস করা না হয় তাহলে লিডারশিপ উঠে আসবে না। আমাদের একটা বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, কোন বিষয়ে আপগ্রেড হচ্ছে। যেমন- অর্থনীতির বইটি যখন পড়ি তখন একশ' বছর আগের বইটা পড়ি না, কারেন্ট বইটা পড়ি? সুতরাং আল্লাহর কালাম ছাড়া, রাসুলের কথা ছাড়া যে কোন বিষয় এর বইগুলো পড়তে হবে। আমাদের শেষ বইগুলো আনতে হবে। আগের তফসিরগুলো কোর্সে আনা উচিত রেফারেন্স হিসাবে। কিন্তু পড়তে হবে কারেন্ট তফসির। তেমনি ফিকার ক্ষেত্রে আজকের যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো আনতে হবে মেইন হিসেবে। আর আগের গুলো নিয়ে যেতে হবে রেফারেন্স হিসাবে। কিন্তু এটা তারা করছে না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তাদের একটা অনীহা রয়েছে। এটা বাস্তব যে ইংরেজি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ল্যাংগুয়েজ। তাই এ ভাষা শিখতে সব চাইতে লাভ বেশি আমাদের। ওরা তো চায় আমরা ইংরেজি না শিখি। আমরা ইংরেজি শিখবো এই জন্য যে, ইংরেজি শিখে আমরা তাদেরই পরাজিত করবো। কিন্তু তারা ইংরেজি শিখবেন না। শুধু ইংরেজি বলি কেন? বাংলাও ভাল করে শিখেন না। তারা ইন্টারনেট জানে না। কম্পিউটার সাইন্স বলতে তারা বুঝে টাইপ করা। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে, তাদের অনেকে মনে করেন সবাই তাদের কাছে যাবে। ঠিক তারা রাসূলুল্লাহর (সা) উল্টা পথ ধরেছেন। রাসূল (সা) সবার কাছে যেতেন। রাসূল (সা) মক্কাতে ঘুরতেনই, তায়েফেও গিয়েছেন, লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ আমাদের অনেক আলেম তা করেন না। যা বলছিলাম, আমাদের আলেমদের কোনদিন দেখিনি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের এ্যাপ্রোচ করছেন।

তাদের তো সেই সুযোগ থাকতে হবে।

তারা যাচ্ছে না কেন? তাদের তো সুযোগ আদায় করে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তাদের বন্ধু-বান্ধব নেই।

তারা তো বলেছে অন্য কথা। একটা সময় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে এক রকম শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশরা আসার পরই শিক্ষাব্যবস্থা দুটো হয়ে গেল। ব্রিটিশরা চাইলো ইসলাম শেষ হয়ে যাক। তখন অস্তিত্ব রক্ষার্থে কওমি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই প্রজন্ম মাদরাসা শিক্ষাকে ঠিক মেনে নিচ্ছে না।

এটা ঠিক এক সময় অবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তবে এটা হতে হবে। আমি আবার

www.icsbook.info

বলছি এটাই হতে হবে কিন্তু যতদিন না হচ্ছে- আমি যেটা বললাম সেভাবে ঐ শিক্ষাকে আপগ্রেড করতে হবে। আমি একটা বাড়ি করলাম। এটাকে কি প্লাস্টার করবো না? চুম-কাম করবো না। যতক্ষণ না শিক্ষাব্যবস্থা এক হচ্ছে ততক্ষণ তো আমার ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা এক হওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। আমার মনে হয় অনেক কঠিন। এটা নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর। ততদিন সিস্টেমকে আপগ্রেড করছে না?

এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তো সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কওমি মাদরাসাগুলোকে তো করছে না।

আমাদের জানতে হবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হলে চলবে না।

এই যে আলেমিনদের অনগ্রসরতার কারণে কী বলে আপনি মনে করেন?

আমাদের মনে হয়, তারা আধুনিক সভ্যতার সমস্যাগুলো জানতে চেষ্টা করছে না।

আপনি কী মনে করেন তারা অহঙ্কারী বলে এগিয়ে আসছে না?

এই রকম অহঙ্কার আছে কিনা আমি জানি না, হয়তো বা নেই। যদি থেকে থাকে তবে অন্যান্য। কারণ ইসলামে অহঙ্কারের কোন জায়গা নেই। আমরা হাদীসও জানি, যার দিলে একবিন্দু অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মনে হয় আধুনিক বিষয় নিয়ে তাঁদের লেখাপড়া একেবারেই কম। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করতেন তাহলে ভাবতেন যে আধুনিক দুনিয়া কী ভাবছে, সমস্যাগুলো কোথায় আজকে আমাকে কি মোকাবেলা করতে হবে। আজকে তো আমি মোতাজিলা আশারিয়া মোকাবেলা করছি না, আজকে আমি মোকাবেলা করছি মার্ক্স, হেগেল, কান্ট অথচ তাদের মাথায় এগুলো আসছে না। সুতরাং আমার মনে হয় এটা একট বড় কাজ হবে যদি আলেমেদিনরা এ দেশে মাদরাসা শিক্ষাকে আপগ্রেড করেন।

শিক্ষাব্যবস্থার কথাই যখন আসলো তখন একটা প্রশ্ন–একটা দেশে একসাথে অনেকগুলো শিক্ষাব্যবস্থা চললে দেশের কল্যাণ কতুটুক হয়?

এই বিষয়ে আমার পুরনো জ্ঞান নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এটা একেবারে অসম্ভব নয়। দুই-তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা থাকতে পারে। যেম হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ব্যবস্থা, এলোপ্যাথিক মেডিক্যাল সিস্টেম ইউরোপের কোন কোন দেশে আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হয়।

ওটা ঠিক আছে। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দূরত্বটা কি বাড়িয়ে দিচ্ছে না? ইংরেজি শিক্ষিতরা মাদরাসার ছেলেদের বলছে কাটমোল্লা। আবার মাদরাসার ছেলেরা বলেছে জাহান্নামের লাঠি। এই যে একটা দূরত্ব। এটাকে কি পরিহার কর যায় না?

আপনারা কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলছি শিক্ষাব্যবস্থা দু-তিন রকম হতে পারে না এমনটি

www.icsbook.info

নয়। যদি প্রত্যেকটি সঠিক হয় তাহলে অসুবিধা নেই এবং দূর করা কঠিন, যেটা আমরা আগেই আলোচনা করছি। এটা দূর করতে সময় লাগবে। আমি এক হওয়ার পক্ষে। শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির আদলে তৈরি করবার জন্য অনেক বড় আলেম দরকার। সেই আলেম কোথায়? আমাদের দেশের আলেমরা কি গত ৫০ বছরে ৫টি অগ্রসর বই লিখেছেন? মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত'-এর মত কয়টা বই রচিত হয়েছে? যেমন ইউসুফ আল কারযাবীর 'যাকাতের বিধান-এর মত কয়টা বই এদেশে রচিত হয়েছে? মোহাম্মদ আল-গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম' এর মত কয়টা বই এদেশে রচিত হয়েছে? আমি তো মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা রচিত' ছাড়া কোন বই দেখছি না। আমার ওপর আলেম সমাজ রাগ করতে পারেন। কিন্তু কেন? এই পর্যায়ের বই আল-আজহার থেকে, ইউসুফ আল কারযাবী, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, সাইয়েদ কুতুব, হাসানুল বান্না বের হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বের হচ্ছে না কেন? আমাদের দেশে আলামা ইকবাল তৈরি হচ্ছে না কেন? মাওলানা মওদূদী তৈরি হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্ন তো তাদেরকে বুঝাতে হবে।

স্বীকার করতেই হবে সৌদি আরব শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুকেশন সিস্টেমটাকে খুব নিকটবর্তী নিয়ে এসেছে। এটা খুব বড় এ্যাচিবমেন্ট। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে খুব নিকটবর্তী নিয়ে আসা হয়েছে এটা হলো সৌদি আরব। অবাক হবেন পাকিস্তানের স্কুল কারিকুলামে ইসলামের স্থান খুব ভাল। যদিও সেখানে নানা ধরনের সমস্যা আছে। কিন্তু স্কুল কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামাইজ হয়ে গেছে। মিসরের ইসলামি কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামি, মালয়েশিয়া একই অবস্থা। আমরা হতভাগ্য দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি যেখানে আমরা সেটা করতে পারিনি, বাংলাদেশের সরকারগুলো ইসলামী ছিল না, এখনও নেই। অতএব দাবি করে আর লাভ কী? ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি বেশি করছে, এসব দিকের কোন গভীর কাজ তারা করতে পারেনি।

কোন একটা পার্টিও কি করেনি?

আমার মনে হয় না যে খুব গভীর কাজ করছে। কাজ করেছে যেমন– আমি একাট পার্টির কথা জানি, যারা নাকি ৭-৮শ স্কুল চালায়। কিন্তু তারা সরকারি কারিকুলাম ফলো করে। এতে তাদের স্বাতন্ত্র্য কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। এখানে তারা আল-আজহার এর স্কুল সিস্টেমকে অনুসরণ করতে পারতো। আল-আজহার এর ১ হাজার স্কুল রয়েছে।

এছাড়া তিনি কওমি মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন

এ প্রবন্ধে আমি যে সব মাদরাসা কওমি মাদরাসা বলে পরিচিত তাদের মান উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার

www.icsbook.info

পর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসা বিশেষ করে এ উপমহাদেশে ছড়িয়ে যায়। তারপর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসাসমূহের ব্যাপক কোন সংস্কার এখন পর্যন্ত হয়নি। এ পদ্ধতির মাদরাসা থেকে যারা পাস করেন তারা সাধারণত অন্যান্য মাদরাসায় কাজ করেন বা মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, প্রশাসন-এ তাদের সাধারণত কোন স্থান হয় না, হলেও তা খুবই কম।

কওমি মাদরাসাসমূহের পরিচালকগণ তাদের মাদরাসা কোর্সের কী ধরনের সংশোধনের চিন্তা করছেন, তা আমার জানা নাই। এ ধরনের কোন রিপোর্টও আছে কিনা তাও আমি অবগত নই। যদি থেকে থাকে তাহলে তার ওপর পদক্ষেপ গ্রহণ কর সংগত।

এ নিবন্ধে আমি কওমি মাদরাসার ব্যবস্থাকে ইসলামের জন্য আরো কল্যাণকর করার লক্ষ্যে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি। ইসলামের স্বার্থেই এটা প্রয়োজন যে, মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্ররা যেন সমাজের সর্বস্তরের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। তারা যেন ইমাম, মাদরাসা শিক্ষক ছাড়াও ব্যাংকার, প্রশাসক ও অর্থনীতিবিদ হতে পারেন। অধিকাংশ বড় মাদরাসাকে জামেয়া বলা হয়। জামেয়া অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় বা University জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে, এখানে সব প্রয়োজনীয় বিষয় বা Subject শিক্ষা দেয়া হবে। সব ছাত্র সব কিছু শিখবে তা নয়, প্রতিটি Subject বা বিষয় কিছু ছাত্র শিখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে যে দাওরাহ ডিগ্রিসমূহ আছে তার সঙ্গে যদি আমরা আর মাত্র দু'টি দাওরাহ কোর্স সব জামেয়ায় খুলতে পারি তাহলে মাদরাসার ছাত্ররা যে কোন স্থানে প্রশাসক হতে পারবে এবং সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে অর্থনীতি (ইকতিসাদ) এবং গণপ্রশাসন বা Public Administration মাদরাসায় বর্তমানে ৪টি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। তাফসির, হাদিস, ফিকাহ এবং আদাব। যদিও সব বিষয়ে দাওরাহ খোলা সম্ভব নয়, কিন্তু দু'টি নতুন বিষয়ে দাওরাহ খোলা খুবই সম্ভব। এর ফলে সারাদেশে প্রশাসনে এ সব ছাত্ররা যেতে পারবে। এবং গোটা জাতির ইসলামীকরণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে। ইত্যোমধ্যে Islamic Economics বা ইসলামি অর্থনীতি একটি নতুন বিজ্ঞান-এ পরিণত হয়েছে। Public Administration -এ অনেক কাজ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি কওমি মাদরাসাসমূহে দু'টি নতুন দাওরাহ খোলার প্রস্তাব করছি। এর ফলে নিচের ক্লাসমূহে কোর্স পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কওমি মাদরাসায় একাদশ/দ্বাদশ ক্লাসে অর্থনীতি ও Public Administration, এর দুটি পত্র (Paper) যোগ করতে হবে। যে কেউ যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে। মাদরাসা সিস্টেমের বিএ পর্যায়ে অর্থনীতি/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এর দুটি করে পত্র থাকবে, যা ঐচ্ছিক হবে। দুটি বিষয় একত্রে নেয়া যাবে না। যারা এ পর্যায়ে অর্থনীতি বা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন নেবেন কেবল তারাই দাওরাহ পর্যায়ে এ সব বিষয়ে পড়তে পারবেন।

আর যে কয়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে আরবি ভাষা শিক্ষা আরো শক্তিশালী করা দরকার।

www.icsbook.info

বাংলা ভাষা শিক্ষাকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যাতে মাদরাসার ছাত্ররা এ দেশে প্রখ্যাত লেখক হতে পারে। ইংরেজি ভাষাতেও উপযুক্তভাবে সব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাহলে তারা কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের ও ইসলামের খেদমত করতে পারবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়া খুব ভাল হবে যদি তাদের তাফসিরে, হাদিস এবং ফিকাহর দাওরাহ কোর্সে আধুনিককালে যে সকল তফসির, হাদিস ও ফিকাহর ওপর যে সকল মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের সকল কোর্স রিভিউ বা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পুরনো কিছু বই বাদ দিয়ে নতুন কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে তাদের কোর্সসমূহ এ যুগে ইসলাম ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

আমাদের মাদরাসাসমূহে যে আরবি শিখানো হয় তাতে তারা আরবিতে দক্ষ হন না, তারা আরবিতে বলতে লিখতে পুরাপুরি সক্ষম হন না। আরবি শিখার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : গালিব হাসান

সূত্র : মাদরাসা শিক্ষা স্মারক

লেখক : সাবেক সচিব এবং চেয়ারম্যান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.icsbook.info

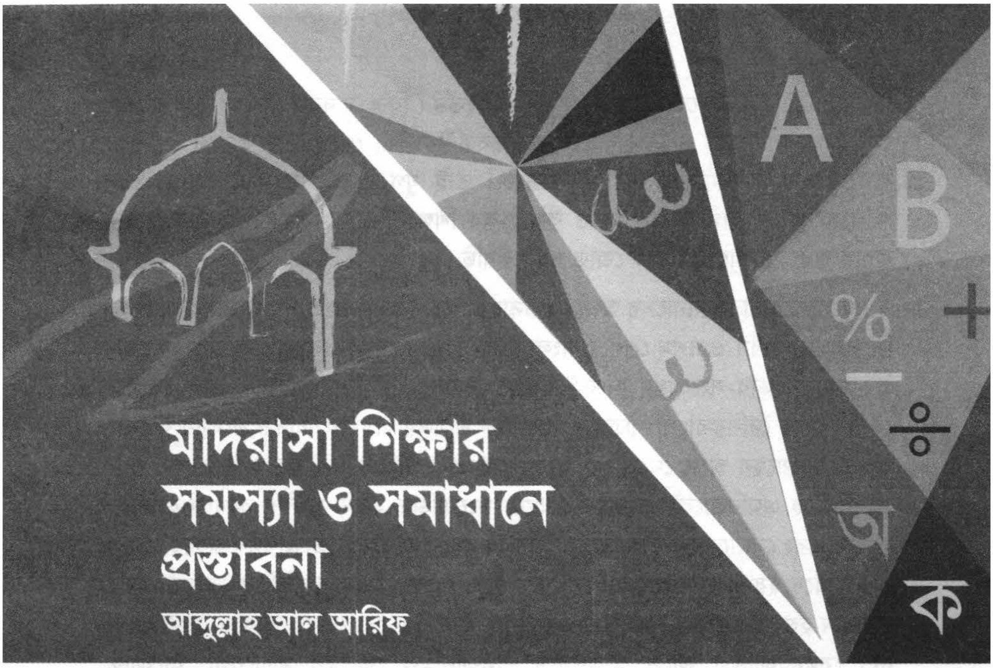

মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানে প্রস্তাবনা

আব্দুল্লাহ আল আরিফ

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লোকই মুসলমান। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম না হওয়ার কারণে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। মুসলিম আমলে এ শিক্ষাব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। মুসলিম আমলে এ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যুযোপযোগী। তখন এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হত রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনা কর্মকর্তা, কূটনীতিক সহ জাতীয় পর্যায়ের দায়িত্বশীল। মুসলিম শাসনের বিলুপ্তির পর থেকে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা বিমাতা সুলভ আচরণের শিকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। তা হচ্ছে-সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা। চিন্তা গবেষণা করলে দেখা যায় যে, শাসক মহলের অবহেলা এবং এনজিও গোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফলে বর্তমান মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। যেমন-

১। মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষানীতিতে যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী কোন বিষয় নেই :

বরং এটা হলো শতবর্ষের পুরনো শিক্ষা (Traditional) শিক্ষাব্যবস্থা। ১৯৮৭ সালের একটি অসম্পূর্ণ অর্ডিনেন্স অনুযায়ী এই শিক্ষাব্যবস্থা আজ অবধিও পরিচালিত হচ্ছে। আজ বিশ্বসভ্যতার পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন সহ মানুষের

www.icsbook.info

চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষানীতিই অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। যে কারণে এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারাতে বসেছে। তাই যুগ বিবর্তনের ধারার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী সর্বজনীন ও কল্যাণকর শিক্ষানীতি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের নিকট জোড় দাবি করছি।

২। যুগোপযোগী সিলেবাসের অভাব : উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাদরাসা শিক্ষা সিলেবাসের নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা বইটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তা কোন প্রকারের সংস্কার-সংশোধন ছাড়াই ২০০১ সালেও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। তাই সেখানে দেখান হচ্ছে দৈনিকবাংলা পত্রিকার সম্পাদক শামসুর রাহমান, যদিও শামসুর রাহমান অবসর নিয়েছেন আজ থেকে ১৫ বছর পূর্বে এবং পত্রিকাটিও বন্ধ হয়েছে পাঁচ বছর পূর্বে। ঠিক এমনিভাবেই সেখানে এখানো সংযোজিত হয়নি সুফীয়া কামালের মৃত্যুর সংবাদ এবং সেখানে লেখা আছে যে, হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীতে আগমন করবে ১৯৮৫ সালে, মনে হয় এখনো আসেনি সেই ৮৫ সাল। এসব সিলেবাসভিত্তিক সমস্যার আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কাউকে ভাবতে দেখা যাচ্ছে না। যেমন-ফাজিল ক্লাসে আকায়েদে নাসফীনামক কেতাবে মুতাযেলা, রাফেজি, খারেজিয়া, জাবরিয়া ইত্যাদি প্রাচীন ফেরকা সম্পর্কে পড়ানো হলেও আধুনিক ফেরকা ও মতবাদসমূহ যেমন আলমানিয়া বা র্ধমনিরপেক্ষতাবাদ, ইস্তেরাকিয়া বা পুঁজিবাদ, মুস্তাসরিক ও কাদিয়ানী ফেতনা সম্পর্কে কোন কিতাব পড়ানো হয় না।

৩। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংযোজিত না হওয়া :

যেমন-এই শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী, কম্পিউটার ইন্টারনেট, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, কারবারপদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই।

৪। যুগপযোগী ইজতেহাদের/গবেষণার অভাব :

এখানে গবেষণাধর্মী নিত্য নতুন মাসয়ালার যুগোপযোগী স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাধান উদ্ভাবনের পরিবর্তে তাকলীদি মাসয়ালায় নির্ভর করা হয়। অথচ আধুনিক সমস্যা যেমন–রক্তদান কর্মসূচি, জীবনবীমা, শেয়ার, ব্যাংকিং করবার, নভচারিদের কেবলা কোন দিকে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নতুন করে ইজতেহাদের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব :

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় শিক্ষকরা বিশ্বের আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেনা না। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ

www.icsbook.info

সাধরণ শিক্ষায় পিটিআই, বিএড, এমএড-সহ নানা ধরনের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করছে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারছে মাদরাসা ছাত্ররা তা পারছে না।

৬। ইবতেদায়ী মাদরাসাকে সরকারীকরণ করা হয়নি

এবতেদায়ী মাদরাসা হল মাদরাসা শিক্ষার সূতিকাগার অথচ এ এবতেদায়ী মাদরাসা আজ চরম অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার। যেমন-উলেক্লখ করতে হয় যে, আজ গোটা দেশে নামেমাত্র ৩৭১০টি একতেদায়ী মাদরাসা থাকলেও একটি মাদরাসাকেও সরকারীকরণ করা হয়নি। তারা সরকারি ভাবে একটি পয়সাও অনুদান পাচ্ছে না। এখানকার ছাত্ররা পাঠ্য পুস্তক থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত। অথচ গোটা দেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬,৯৩০টি, এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭,৬৭৭টি এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯,২৫৩টি এ উভয় প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সরকারি অনুদান পাচ্ছে এবং ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক ও সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতাসহ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির সুবিধাও পাচ্ছে। এ কারণে এবতেদায়ী মাদরাসার কোন প্রকার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

৭। পৃথক পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড না থাকা

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথক পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড না থাকার জন্য ছাত্রদেরকে সীমাহীন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তারা যথাসময়ে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না, যাও পাচ্ছে তাতে ভুলে ভরা। দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে একই সংস্করণ পুর্নমুদ্রণ হওয়াতে ছাত্ররা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

৮। চরম বৈষম্যের শিকার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তর

আজ বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার সকল স্তরেই রয়েছে চরম বৈষম্য। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এসএসসি লেবেলে যেসব বিষয় পড়ানো হয়, মাদরাসার দাখিল লেবেলেও সমান বিষয় পড়ানো হয়। পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত শিক্ষার্থীরা ৫০% নম্বর অবজেকটিভ পরীক্ষা দেয় অথচ মাদরাসা ছাত্রছাত্রীদের ২০% নামে মাত্র থাকলেও তা কোন অবজেকটিভ নয় বরং তা হল ছোট প্রশ্নোত্তরের মত। এ কারণে মাদরাসা ছাত্রদের পক্ষে কোন দিন A+ পাওয়া সম্ভব হবে না। দাখিল ও আলিমকে এস,এস,সি ও এইচ,এস,সির সমমান প্রদান করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিষয়ে তাদেরকে অনার্স ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না। ইংরেজি ও বাংলা আবশ্যিক বিষয় পড়া সত্ত্বেও স্নাতক স্তরে সমমর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। সমান লেখাপড়া করেও তারা আজ এলএলবি, বিএড, বিবিএসসহ সরকারি সকল সেক্টরে চাকুরি থেকে বঞ্চিত। অনুরূপ ভাবে কামিল পাশ করেও বঞ্চিত হচ্ছে স্নাতকোত্তর মর্যাদা থেকে।

www.icsbook.info

৯। স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ না করা

দেশের সাধারণ শিক্ষা স্নাতকোত্তর স্তরে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হয়নি। ফাযিলে অনার্সের অনুপ্রবেশও করা হয়নি এখনও। সবচেয়ে বড় কথা হলো মাদরাসাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে নেই।

১০। শিক্ষা বোর্ডের অভাব

দেশের সাধারণ শিক্ষার পঞ্চম ও অষ্টম বৃত্তি পরীক্ষাসহ এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৬ বিভাগে পৃথক পৃথক ৬টি শিক্ষা বোর্ডসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি বেসরকারি মিলে প্রায় ৩০টির বেশি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও মাদরাসা শিক্ষার, এবতেদায়ী বৃত্তি, অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ক্লাসের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সিলেবাস প্রণয়ন থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছে মাত্র একটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। এতে করে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১১। সহ শিক্ষার প্রতিকূল প্রভাব

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অদ্যাবধি সহশিক্ষার প্রচলন রয়েছে। যা ঈমান-আকিদা ও স্বাভাবিক মানসিকতায় মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাদরাসার ফিকহী মাসয়ালার মধ্যে হায়েজ নেফাস, সঙ্গম, সহবাস, গোসল ফরজ হওয়া না হওয়া বিবাহ-নিকাহ থেকে শুরু করে সকল মাসয়ালা পড়ানো হয় যা সহশিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপত্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১২। গ্রন্থাগার ও পাঠ্য গ্রন্থাবলির অভাব

মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত গ্রন্থ তো দূরের কথা কোন প্রকারের গ্রন্থাগারেই অস্তিত্ব নেই। অথচ সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বেশ নতুন কিছু নতুন বিষয়ের সংযোজন থাকায় মাদরাসা ছাত্রদের জন্য কুতুবখানা বা গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন।

১৩। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন নেই

সিলেবাসভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি মদরাসা ছাদদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন-মৎস্য খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প, হাঁস-মুরগি পালনসহ যে কোন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ নেই।

১৪। শিক্ষায় ডিপ্লোমা স্তরসহ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির সংযোজন করা হয়নি

সাধারণ শিক্ষায় বুয়েট, পলিটেকনিকেল, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আর্থ সামাজিক নির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টা রয়েছে। অথচ মাদরাসা শিক্ষায় এ জাতীয় শাখা খোলার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই।

www.icsbook.info

১৫। বাণিজ্যিক বিভাগের অভাব

মাদরাসা শিক্ষায় বাণিজ্যিক শাখার সংযোজন করা হয়নি, অথচ এ শাখাটি জাতীয় স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বাণিজ্যিক শাখা যেমন- ইসলামী ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, শেয়ার লেনদেনসহ বাণিজ্যিক সকল সেক্টরের জ্ঞান লাভ থেকে মাদরাসা ছাত্ররা বঞ্চিত।

১৬। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ললিতকলার অভাব

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ললিতকলাসহ আর্টশিল্প কারু ও চারুশিল্প মাদরাসা ছাত্রদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। যা ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহজিব তামুদ্দুন ও মননশীল চিত্তবিনোদনের জন্য সহায়ক হত। মাদরাসা ছাত্রদেরকে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে।

১৭। মাদরাসা শিক্ষা সিলেবাসে আইন শিক্ষার অভাব

সাধারণ শিক্ষায় এম এ পাস করার পর এমফিল, পিএইচডিসহ নানা ধরনের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দেয়া হলেও মাদরাসা শিক্ষিত ফাযিল বা স্নাতকোত্তর পাস ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ কামিল পাস করার পরও একজন শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য এমফিল বা পিএইচডি করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।

১৮। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষনার ক্ষেত্রে মাদরাসা ছাত্রদের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থান নেই

সমস্যা সমাধানে কতিপয় প্রস্তাবনা

মাদরাসা শিক্ষার এ বহুমুখী সমস্যা ও সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষার সীমাহীন বৈষম্য দূরীকরণে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জোর দাবি চলে আসছে বেশ কয়েক দশক আগ থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র-আন্দোলন পরিষদ গত শতাব্দীর আশির দশকের পর অর্থাৎ ১৯৮৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লিফলেট-পোস্টারিং, পত্রিকায় লেখালেখি, প্রতিবেদন ও স্মারকলিপি পেশসহ নানাভাবে প্রচার প্রসারের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ বেনিয়াদের যুগ থেকে শুরু করে আজোবধি শাসকগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন মহলের কূটকৌশল মাদরাসা শিক্ষার যে বেহাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, তার আশু সমাধানকল্পে এবং বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে:

১. শিক্ষানীতি প্রণয়ন

শিক্ষার্থীদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী করে তুলে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করে তারা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর হতে পারে। এ ব্যাপারে আদিম ও বিতর্কিত শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন করে যুগোপযোগী শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.icsbook.info

২. জাতীয় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে

দেশে স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরকে পরিচালনার জন্য যেভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ ফাযিল ও কামিল স্তরকে পরিচালনার জন্য ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র মঞ্জুরি ক্ষমতা সম্পন্ন এফিলিয়েটেড ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে করে ফাযিল ও কামিল স্তর দুটি বোর্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

৩. যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে

পাঠ্য সিলেবাসের সময়সীমা ও যুগোপযোগী বিষয়ে সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজন মত সিলেবাস প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংস্কার ও সংশোধনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ইবতেদায়ী মাদরাসাকে সরকারি করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষার সূতিকাগার সকল ইবতেদায়ী মাদরাসাকে সরকারি করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক থেকে শুরু করে সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। তাছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নার্সারি ও শিশু ভবনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫. দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরকে উপযুক্ত মান প্রদান করতে হবে

বর্তমানে এসএসসি লেভেলে যেভাবে ৫০% নাম্বার অবজেকটিভ রয়েছে দাখিল স্তরেও সেভাবে ৫০% নাম্বার অবজেকটিভ এর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বর্তমান ফলাফলের গ্রেডিং পদ্ধতিতে ২০% সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর দিয়ে A+ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই দাখিল স্তরেও অবশ্যই ৫০% অবজেকটিভ প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও দাখিল ও আলিম পাসের পর এসএসসি ও এইচএসসি'র মত অনার্সে ভর্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সমাধিকার প্রদান করতে হবে। যাতে করে তারা সকল বিষয়েই অনার্সে ভর্তি হওয়ার সমান সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে ফাজিলকে স্নাতকের সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে যাতে করে ফাজিল পাসের হার ছাত্ররা এলএলবি, বিএড, বিসিএসসহ সকল সরকারি বেসরকারি সেক্টরে সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে ফাজিলকে স্নাতকের সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে যাতে করে ফাজিল পাসের পর ছাত্ররা এলএলবি, বিএড, বিসিএসসহ সকল সরকারি বেসরকারি সেক্টরে সুযোগ পায়। অনুরূপভাবে ফাজিলে অনার্সপদ্ধতি চালু করতে হবে। আর কামিলকে স্নাতকোত্তরের সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে। প্রতিটি জেলায় একটি করে কামিল সরকারি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অনার্স কোর্স চালু করতে হবে এবং থানায় থানায় একটি করে সরকারি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.icsbook.info

৬. সমাজ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

বর্তমানে জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বিশেষ করে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, বিচারনীতি, কৃষি, কারিগরিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড গঠন করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড গঠন করতে হবে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা সঠিক সময় সঠিক চাহিদা মাফিক পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে।

৮. উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কোর্স চালু করতে হবে

স্নাতকোত্তর স্তরের পর সাধারণ শিক্ষায় যেভাবে, এমফিল, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরেট ইত্যাদি উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতি চালু আছে, মাদরাসা শিক্ষাতেও অনুরূপ উচ্চতর কোর্সের ব্যবস্থা করে ইজতেহাদধর্মী স্বাধীন স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আধুনিক জীবন পরিক্রমার সকল নিত্য-নতুন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণাগার ও গবেষণাসমাগ্রী ও গবেষণা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পর্যন্ত সকল স্তরের সহশিক্ষা প্রথা বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে নারী শিক্ষার জন্য সকল স্তরেই পৃথক মহিলা মাদরাসা চালু করতে হবে।

১০. কুতুবখানা বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

মাদরাসা ছাত্রদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি যেহেতু শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়, তাই তাদের রেফারেন্স বিভাগ হিসেবে কুরআন, তাফসির, হাসীসসহ ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই কুতুবখানা বা লাইব্রেরির সাহায্য নেয়া জরুরি। এজন্য প্রতিটি মাদরাসায় একটি করে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. শিক্ষা প্রশাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শিক্ষা প্রশাসন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে হিসেবে ইবতেদায়ী দাখিল

www.icsbook.info

ও আলিম ক্লাসকে পরিচালনার জন্য দেশের সাধারণ শিক্ষার মতই দেশের ৬ বিভাগে ৬টি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর ফাযিল, ফাজিল অনার্স ও উচ্চতর শিক্ষাকে পরিচালনা করার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় যেভাবে বিএড, পিটিআই, এমএড, বিপিএড ইত্যাদি কোর্স চালু আছে, মাদরাসা শিক্ষকদের জন্যও অনুরূপ প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ প্রশিক্ষণই হল সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৩. মাদরাসা শিক্ষায় বৃত্তিমূলক বিষয়ের সংযোজন করতে হবে

সিলেবাসভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি মাদরাসার ছাত্রদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, পশু-পালন, মৌমাছি পালন, তাঁত, হস্তশিল্প, গার্মেন্টস, কারুশিল্প, কাঠের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, আর্ট শিল্প, মুদ্রা শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবস্যা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ইলেক্ট্রনিকস, ড্রাইভিং ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ছাত্রদেরকে ছাত্র বৃত্তিমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করতে হবে।

১৪. মাদরাসা শিক্ষায় ডিপ্লোমা স্তর সংযোজন করতে হবে

সাধারণ শিক্ষার মতই, মাদরাসার ছাত্রদের জন্যও বুয়েট, পলিটেকনিক্যাল, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমো, পর্যটন ডিপ্লোমা, গার্হস্থ্য ডিপ্লোমা, ক্রীড়া-কৌতুক রেডিও-টিভির সংবাদ পাঠ, উপস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কোর্স, সাংবাদিকতা, সম্পাদনাসহ সর্বপ্রকার পেশাবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সংযোজন করতে হবে।

১৫. মাদরাসা শিক্ষার বাণিজ্যিক বিভাগের সংযোজন করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষায় বাণিজ্যিক শাখার সংযোজন করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ব্যাংকিং কারবার, শেয়ারবাজার মুদ্রাস্ফীতি, ইন্সুরেন্স পদ্ধতিসহ সকল বাণিজ্যিক বিভাগে মাদরাসা ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষার সাধারণত আইন, আন্তর্জাতিক আইনসহ, ইসলামিক আইন (শরিয়াহ) শিক্ষার ব্যাপারে এলএলবি, এলএলএমসহ আইন বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।

www.icsbook.info

১৭. সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে

মাদরাসা শিক্ষায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, ললিতকলা চারু কলাসহ সকল নান্দনিক কর্মকাণ্ডের সংযোজন করতে হবে, তবে এ ব্যাপারে শালীনতা রুচিশীলতা ও মানবকল্যাণের সমন্বয় সাধনমূলক কর্মকাণ্ড সংযোজিত করতে হবে।

পরিশেষে

আমাদের খুঁজে বের করা দরকার, সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেকেই কেন মাদরাসায় তাদের সন্তানদের পড়তে দিচ্ছেন না? কেনই বা মাদরসা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে? মাদরাসা শিক্ষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে হবে। বিশেষ করে দেশের আলেমসমাজকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষার প্রতি বৈষম্য দূর করতে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফাযিল ও কামিলকে বিএ ও এমএ'র মান দেয়ার ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের পরও তা বাস্তবায়িত আজও হয়নি। বিসিএস-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না মাদরাসার ছাত্ররা।

মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সিলেবাস এবং পাঠদানপদ্ধতি উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারলে, মাদরসার ছাত্ররা সন্ত্রাসী নয়, উন্নত নৈতিকতাসম্পূর্ণ আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠবে।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

Islamic Education Movement Recent Historty & Objectives

Shah Abdul Hannan

Islamic Education Movement, which is otherwise widely known as the Movement for the Islamization of Knowledge, as a new phenomenon started its journey sometimes in 1977-1978. A group of scholars thought that the educational system in the Muslim World in not fulfilling the needs of the Muslim countries and that it should be thoroughly revised and updated. In this backdrop, the first Islamic Educational World Conference was held in Makkah in 1977 in which more than 300 academicians, scholars and intellectuals participated. The first Conference made certain significant recommendations for the Islamization of Knowledge. Later on more such Conferences were held in other parts of the world in whtich Ulama, academicians, scholars and intelectuals of various countries held among other countries, in Pakistan, Indonesia and Bangladesh. This writer had the opportunity to take part in the Confrences held in Pakistan, Indonesia and Bangladesh. This Conference helped to a great extent in crystallizing and conceptualizing what should be the future shape and structure of the Islamic Education. Later notable institutions like International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA joined in this Movement. The prime focus of IIIT since then had been on the Restructuring of Throughout and Islamization of Knowlege, including Islamization of Education.

www.icsbook.info

As the outcome of the painstaking efforts of the learned scholars of various disciplines to formulate a pragmatic Islamic Education Policy through the Islamic Education Conference and contribution of eminent Islamic organizations an individuals, the first Islamic University, the International Islamic University (IIU), Malaysia, was established. Distinguished Islamic scholar of the world, well known for their own discipline and subject and at the same time firm believer in Islam, assembled in the new alma nature. Many of these scholars were leaders of the Islamic Monument in their own countries and were at the forefront of Dawah, Islamic activities in their own arena. Dr. Abdul Hamid abu Sulayman renewed scholar and current Chairman of IIIT, USA took the responsibility of the IIU. Malaysia in the initial stage. A prolific writer, Dr. Abul Hamid, on assuming the responsibility of the University, vigorously started the work of Islamization of Education. Arabic and Fiqh, Islamic Law and Jurisprudence were introduced as compulsory university-requirement courses. The University from the very beginning took steps to gradually Islamic the subject of the social science discipline and the efforts is still on.

Later on more Islamic universities have been established in other parts of the world following the model of IIU, Malaysia. One such University has been established in Islamabad (Pakistan. Another in Uganda (Africa) and another in Kushtia (Bangladesh). It must be admitted that the Islamic University, Bangladesh has, to some extent, lost direction because of political environment within the country, and the University could not make much headway following the molel of IIU, Malaysia, nevertheless it has to be accepted that Islamic University. Bangladesh also make some contribution in the Islamization of Education and Islamization of Knowledge. Latter Darul Ihsan University and Islamic University, Chittagong were established with the same mission.

To many it remains a question why Islamization of Education is important and this demands an in-depth examination and critical and careful analysis Islamization of Education is significant because the root cause of all problems and malaise's of the Ummah, the Muslim community, it education. If we look at the setback and crisis of the Ummah, if we evaluate the political.

Economic and social dilemman of the muslim world and

www.icsbook.info

particularly if we refer to the overall scenario prevailing in the Muslim countries from Islamic point of view and look at them from Islamic vision and perspective then we shall reach to the conclusion that the ultimate reason for all these ills in the Muslim world lies in our failure to restructure the education which shall not only meet the demand of our tie but at the samne time make a Muslim. Had we been able to educate Muslims, as worthy Muslims there would not have been political, economic and social problems in the Muslim world of the size and level as exist now. Such prominent scholars and academicians as Islamil Raji al Faruqi, Abul Hamid Abu Sulayman and Syed Ali Ashraf, eminent educationists, Islamic scholar and forunder of Darul Ihsan University Bangladesh share this view.

Isalmic educationsts and scholars afe of unanimous opinion that the root cause of all problems of the Ummah is education, it is more crisis faced by the world today, They think that education has failed to achieve the desired objective becuase our educations has ignored ethics and morality during the last one hundred years.

The crisis humankind, the world civilization is facing becuase the curriculum of the educational institutions have ignored ethics and morality for at least last one hundred years. As an outcome of this disrespect to eternal values, our educational institutions have produced violent and cruel man devoid of love, affection, fraternity, brother-hood and to follow feeling. What has happened in Bosnia, Kosava, Chechmya, Iraq, Kashmir, Afghanistan and more recently in Gujrat in India is the result of modern education, which has produced cruel and violent man. Modern man is not imbed with the eternal hauman values and therefore most sophisticated nations do not mind to bonmb unearned civilian, woman and children in Afghanistan and does not mind to continue sanction against Iraq at the costs the lives of millions of Iraqi children. Nobody can hope to change this sorry state of affairs, to really improve the face of modern civilization unless the educational curriculum is restructured and emphasis is given on moral and ethical values.

What is, therefore, Enquirer is to reorganize the education on the foundation of ethical principles, to combine moral edcuation with professional excellence has to be integrated with morality and ethics, which basically can be derived from

www.icsbook.info

religion, As far as Muslims are concerned such values can be drawn from Islam and if Muslim societies are not rectified in the light of the precept and teaching of Ilsam then the Muslim societies may the whole world is bound to suffer. That means humankind will suffer. The solution, therefore, lies in combining Islamic values with modern subject in case of Muslims. Where non-Muslims are in majority as in Japan. China and other countires modern subject should be combined with ethics and morality. Nobody should forget that in the days of globalization and Internet in the new millennium no region remains unaffected if any part of it is affected. Therefore the problem has to be addressed both at regional and international levels.

Dr. Abdul Hamid. Abu Sulayman, former Rector IIU. Malaysia and currently Chairman of IIIT USA addressing a seminar in Dhaka during his recent visit to Bangladesh pointed out : "Muslims are not performing. The Muslim world is not performing". He pointed out that in January 2001 (or December 2000) the total GDP of the Muslims world was US $ 1100 billion whereas the GDP # 5500 billion, five times more than Muslim world where as Muslim world is spread over from Pacific to Atlantic. Why this is the condition of the Muslim world. Dr. Abdul Hamid asked? "Why are not Muslims performing. Why are not Muslims motivaed, why are not Muslims big actors in the world scene. Why are they only spectators, why they are in the fringe". Dr. Abdul Hamid asked his learned audience in the seminar.

Dr. Abdul Hamid thinks that Muslims are marginalized because: "We are not motivatied". They present educational system has failed to motivate Muslims and one of the foremost reasons of this is that Muslims still have slavish mentality of the colonial period. We could not leave, get rid of slavish mentality. We only imitate. We do not think positively and in a construtive way. We have lost our originality and creativity. Dr. Abdul Hamid thinks that we must give due importance education deserves and integrate moral values and ethics with modern professional knowledge. He believes that we as Muslims integrate professional education and social science with Islamic values.

Now if we look back to history what we see. If we fall back to Abbasi, Usmania or Mughel period we will find that their educational system did not produce army generals or civil servants who studied the then modern subjects and at the

www.icsbook.info

same were fully conversant with teachings of the Quran. Sunnah, the Tradition of the Prophet (SAWS), Fiqh, Islamic law and jurisprudence.

There was integration in the educational systems of them. An army officer during the Abbasi used to know not only military science but also such an officer was conversantd with the teaching of Quran. Sunnah. Fiqh and Arabic. Apprwoimately 150 to 200 years earlier, the system of education was an intergrated whole.

What is then the responsibilty of the new generation of Muslims? The duty and obligation of the Muslims, the task of the entire humankin is to think and reflect on how to restructure the educational system and not to give over emphasis only on professional knowledge for if we only over emphasize on professional knowledge then we shall only over emphasize on professional knowlege then we have to structure educational system is such a way, for all nations in all countries woldwide. Which shall integrate professional knowlege with ethics and morality and we Muslims believe it and are fully committed to it. This can be establishment of Islamic University does not mean that the door of such educational institutions shall remain closed for the non-Muslim. Islamic University is open for all. Any student can study in such a university and the teaching of Islam shall not be imposed on the non-Muslim student. Non-Muslim student shall have to study only the educatinal program. It needs to be further examined whether non-Muslim students can be offered optional subjects in some discipline or areas.

The message of Islam is universal. Islam address humankind: Ya Ayyuhan nass, O mankind, Allah has revealed Quran not to divide mankind. The duty of the Prophet (SAWS), was to unite poeple, Islam teacher man not to take away the rights of others but to protect it. Islam stands for moderation. In real sense there is no extremism in Islam. Islam is middle way. Allah (SWT) in Surat Al Baqarah has revealed : "We have created you as a balanced community" (2 : 143). Allah did not tell that we created you as extreme community. It is therefore, clear that if we are fully able to appreciate and realize the true meaning of Islam, when we cannot turn out to be extremist. There is no reason of Non-Muslim being afraid of Islam. If we look back to history then we shall find that Prophet Muhammad (SAWS) established a system in which life. Honor and property of the non-Muslims were fully secured.

www.icsbook.info

Moreover, in the commonwealth established by the Prophet (SAWS) under the Charter of Median the Jews were self governing and autonumous and they used to conduct the life according to thier own laws. The Muslims used to follow thier own law, Shariah and the state was run according to set principles as in the case of defense.

The essence of Islam is Tawheed, which not only menas that Allah is one but also it signifies that humankind is one and its honour is indivisible. The objectives of the Shariah is welfare of the mankind. Tawheed signifies the welfare of the Shariah is welfare of the mankind. It also means and implies that believers of Tawheed must always wish, carves and long for wellbeing and happiness of others and must not distinguish between man and man. It is against the principle of Tawheed Prophet Muhammad (SAWS) fully absorbed the full meaning of Tawheed. He (SAWS) said in his farewell pilgrimage speech : No Arab has superiority over non-Arab White colored has no superority over the black. What is the meaning of this? There is male and female of a particular race is superior to male of another acernor male of a particular race is not superior to another. Likewise what is the meaning of Arabes and non-Arabs are equal. It means Arab female is to equal to non-Arab male and non-Arab male is equal to Arab female.

It becomes clear from the teaching of Prophent (SWAS) that in spite of small difference Islsma makes no significant distinction between man and man as regards their honour, respect and dignity. Islam firmly upholds human and man as regards therir honor, respect and dignity. Islam firmly upholds human equality. These small differnces that exits in our society are the result of the prevalent education system. There is nothing to fear from Islamic education. If Islamic educational system. Is Islamic education system is established in Bangladesh the door of education shall remain wide open for all. There shall be various options open for the non-Muslims to prosecute their studies. New avenues shall be opned and new scopes and opportunities shall be created. Human equality shall be pursued meticulously. The honour, dignity and respect of the non-Muslims shall be vigorously guraded. There shall be no compulsion in respect of religion as enunciated in the Quran : La Ikraha Fiden (Surat Al Baqarah : 256).

Writer : Former Secretary, Peoples Republic of Bangladesh, Chairman, Islami Bangk Bangladehs Limited.

www.icsbook.info

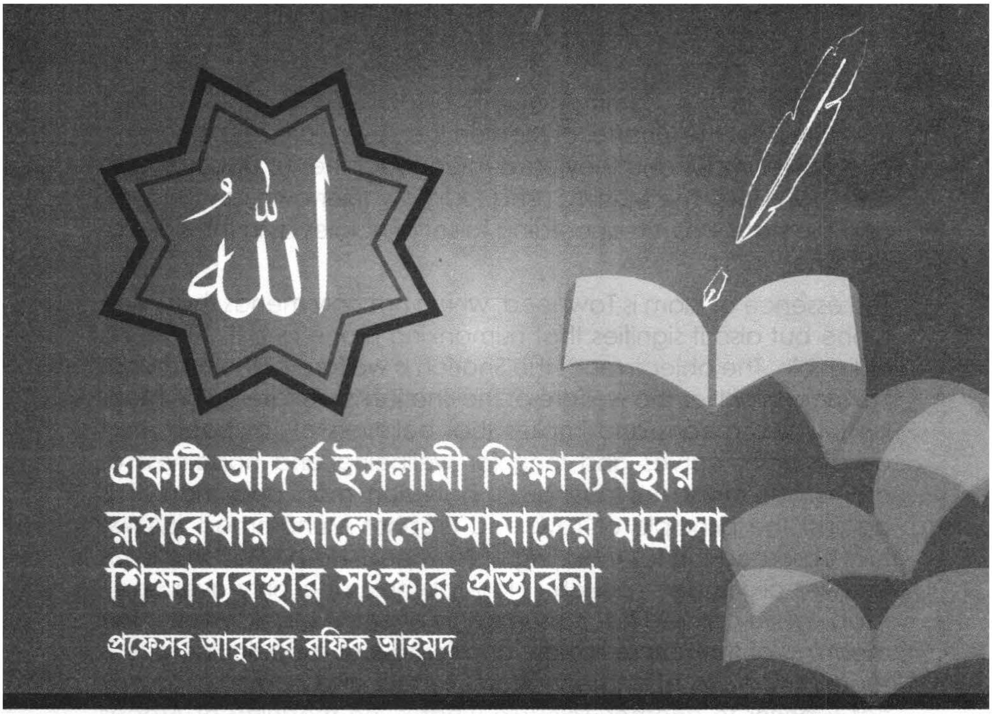

একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার আলোকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাবনা

প্রফেসর আবুবকর রফিক আহমদ

১. প্রসঙ্গ কথা

১.১ চীন দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, 'তুমি যদি স্বল্পতম সময়ে ফল লাভ করতে চাও, তাহলে মওসুমি ফসলের চাষ কর; তবে তুমি ফসল পাবে একবার মাত্র, আর যদি তুমি দশ বছর ধরে ফল পেতে চাও, তাহলে চাষ কর ফলদার বৃক্ষের। আর তুমি যদি শতাব্দীকাল ধরে ফল পেতে চাও তাহলে মানুষের চাষ কর।'

বলাবাহুল্য মানুষের চাষ মানে হলো একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। এই শিক্ষাব্যবস্থার ওপরই কোন জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাসাদ বিনির্মিত হয় এবং এই ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতাই বিশ্বের দরবারে কোন জাতির মর্যাদা নির্ণয়ের প্রধান সূচক।

১.২ কোন জাতি তখনই সভ্যতার সোপান বেয়ে সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয় যখন তার শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত ও সুস্থ এবং মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যদি সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা হয় ত্রুটিযুক্ত তাহলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে বাধ্য গোটা জাতির মন-মানসিকতায়, আচার-আচরণে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। হয়ত একটি শিক্ষানীতির সুফল বা কুফল বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং দুই এক দশকের ব্যবধানে ধরা নাও পড়তে পারে, কিন্তু শতাব্দীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে অবশ্যই ধরা পড়বে, এতে সন্দেহ নেই।

www.icsbook.info

১.৩ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কিত দু'টি উদাহরণ এখানে পেশ করতে চাই। এর একটি হচ্ছে মহানবী (সা)-এর হাতে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, আর দ্বিতীয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা।

এর প্রথমটি প্রবর্তিত হয় আল্লাহর প্রতি ঈমান, তথা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাকওয়া বা পরকালের জবাবদিহিতার ভয়কে নৈতিকতার মূল উৎস এবং রাসূলের আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ বিবেচনা করে। আর দ্বিতীয়টি প্রবর্তিত হয় মানব রচিত আইন এবং জনগণের পছন্দ অপছন্দকে সার্বভৌমত্বের মূল ভিত্তি এবং আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের ধারণা ও পরকালে জবাবদিহিতার ভয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে।

প্রথমোক্ত দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে গড়ে ওঠে ইসলামী সভ্যতার এক গগনচুম্বী প্রাসাদ। মুসলমানগণ দীর্ঘ ৬৫৩ বছর ধরে শুধু যে অর্ধ পৃথিবীর ওপর একচ্ছত্র শাসন করেন এবং বিশ্বের অপ্রতিরোধ্য একক শক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তা নয় বরং তারা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অগ্রণী, সভ্যতার পতাকাবাহী, সংস্কৃতির ধারক ও মানবতার মুক্তিদূত। আব্বাসীয় শাসনের পতনের পর মুসলিম শক্তি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকলেও এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যেখানে মুসলমানদের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল ইসলামী আদর্শনির্ভর, সেখানকার শাসনব্যবস্থা ছিল অধিকতর ন্যায়পরায়ণ, জনগণ ছিল নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ এবং মানবাধিকার ছিল সংরক্ষিত। প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান করুণ চেহারা তথা আদর্শের দেউলিয়াত্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দৈন্যদশা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি সব কিছুর মূলে দায়ী হচ্ছে সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দী হতে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে মুসলিম বিশ্বের পতন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন।

পক্ষান্তরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা আমেরিকানদের কতটুকু শান্তিও নিরাপত্তা দিয়েছে এবং বিশ্ববাসীর জন্য কতটুকু কল্যাণকর ভূমিকা পালন করেছে তার চিত্র আজ সচেতন ব্যক্তি মাত্র অজানা নয়। বাহ্যত তাদের জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ দাবি করা হলেও আল্লাহকে বিশ্বাস ও পরকালের ভয়ের ধারণা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিলুপ্ত হওয়ার কারণে সেখানে জনগণ বাস করছে নেকড়ে ও মেষের মত। আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন অন্যজনকে অহরহ প্রতারিত, পদদলিত ও পরাভূত করার প্রতিযোগিতায় তারা লিপ্ত। সেখানে দুর্বলরা সর্বদাই সবলদের হাতে অত্যাচারিত। কোন নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে সেখানকার মানুষ চরমভাবে নৈতিক অধঃপতনের শিকার। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধনের পরেও আদর্শিক দিক দিয়ে তারা অন্তঃসারশূন্য। মানবাধিকারের ফাঁকা বুলি আওড়ালেও তাদের হাতে মানবাধিকার চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত। নারী স্বাধীনতার পক্ষে যতই ওকালতি করুক না কেন সেখানে নারীরাই সর্বাধিক নির্যাতিত এবং নরপশু বৎ

www.icsbook.info

হায়েনাদের অবৈধ যৌনতৃষ্ণা নিবারণের প্রধানতম হাতিয়ার। জনগণের ইচ্ছাই আইনের প্রধানতম উৎস বিবেচিত হওয়ার কারণে অধিকাংশের সমর্থনের অজুহাতে সমকামিতার মত ঘৃণ্য অপরাধকেও আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত করা হয়েছে। শুধু এই একটি উদাহরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় তাদের রুচিবিকৃতির মাত্রা কত অধঃপতিত। মার্কিন পরাশক্তি বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি হওয়ার দরুন গোটা বিশ্বে বিরাজ করছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ছোট ছোট দেশকে তার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই তার পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করা হয়েছে। যারা তার মোড়লগিরি মানতে নারাজ তাদেরকে নানাভাবে কোণঠাসা করার কোন সুযোগই সে হাত ছাড়া করতে চায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বর্তমানের প্রধান সমস্যা হল ইসলামের পুনরুত্থান। যাকে মৌলবাদ নামে আখ্যায়িত করে একে ঠেকাবার জন্য আটঘাট বেঁধে নেমেছে। তাদের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশে এমন কিছু লোককে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে, যারা সম্ভাব্য সকল উপায় উপকরণকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন নীতিমালা অনুযায়ী নিজ দেশের সকল পলিসি নির্ধারণ করছে। এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। বাংলাদেশে দুই শতাব্দীকাল পূর্বে ব্রিটিশ বেনিয়ারা যে শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া পত্তন করে গিয়েছিল তার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের সীমিত সুযোগ থাকার দরুন এখন মনে করা হচ্ছে যে ব্রিটিশ পলিসি ১০০% সফল হয়নি। তাই এখন আবার মার্কিন পলিসি বাস্তবায়নের প্রয়াসী। এই পলিসিকে সীমিত আকারের হলেও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের আর কোন সুযোগই থাকবে না। এভাবে একটি নীলনকশা প্রস্তুত করা হয়েছে আমাদের আদর্শিক ভিত্তি চুরমার করে দিয়ে গোটা জাতিকে নৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের পথে ঠেলে দেয়ার।

১.৪ এদেশে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার কুফল কী তা আল্লামা ইকবালের মত সচেতন দার্শনিকের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রসূত নতুন প্রজন্মকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন-

“তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করেছ

নিজের চেহারায় মেক আপ করেছ অন্যের কাছ থেকে

ধার করা রুজ দিয়ে।

আমি জানি না তুমি কি আসলে ‘তুমি’ না অন্য কেউ।

তোমার বুদ্ধিমত্তা বন্দী অপরের চিন্তার শৃংখলে।

তোমার গভীরের নিঃশ্বাসটুকু ও আসছে অন্যের সূত্র থেকে।

ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে

ধার করা আকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ের গভীরে।

www.icsbook.info

তোমার ক্যানারি পাখি ধার করা গান গায়।

তোমার সাইপ্রাস বৃক্ষের আবরণ ধার করা।

তোমার পানপাত্রে রক্ষিত সুরা সেওতো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া

সুরাপাত্রটিও তুমি এনেছ ধার করে।

তুমিতো একটি সূর্য। একবার চেয়ে দেখ আপন সত্তার পানে

অপরের তারকার আলো তুমি চেয়ো না কোন ক্ষণে।

সভার মোমবাতির আলোতে তুমি আর কতিদন নাচবে?

তোমার হৃদয়ের অনুভূতি যদি থাকে তাহলে জ্বালো

অনতিবিলম্বে আপন আলো। (১)

১.৫ একটি শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক দিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে আল্লামা ইকবাল আরও বলেন : একজন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করছে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ওপর, একটি জাতির জীবন নির্ভর করছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর। আত্মার জীবনপ্রবাহ বন্ধ হলে ব্যক্তিদেহ হয়ে পড়ে মৃত। জাতি মৃত্যুবরণ করে যদি তার আদর্শ হয় পদদলিত। (২)

বলাবাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষ ও আদর্শবিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রজন্মের আত্মা ও অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। মনের চাহিদা ও দেহের প্রয়োজন পূরণ নিয়েই সে ব্যস্ত। আত্মা চাহিদার প্রতি আদর্শিক প্রয়োজনের প্রতি তা চরমভাবে উদাসীন। যে শিক্ষাব্যবস্থায় আত্মার পুষ্টি ও আদর্শিক প্রয়োজনের দিক বিবেচিত হয় না তা জাতির জন্য মারাত্মক।

আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

জ্ঞান যদি নিয়োজিত হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য

তবে এ জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর সর্প।

জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদিত

তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু, তোমার গর্ব। (৩)

১.৬ আদর্শ নিরপেক্ষ জ্ঞান তথা শিক্ষাব্যবস্থা কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে নিয়ে আসে তার উপলব্ধি অনেক সচেতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও করতে পেরেছেন। এখানে Prof. Harold H Titas এর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দেয়াই সমীচীন মনে করছি। "সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডারের অভাবের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে সাধারণ আদর্শ ও প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি। শিক্ষা সত্যাপণ দৃঢ় বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, মানবিক মূল্যবোধ এবং বাধ্যতা থেকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ...... শিক্ষা অতীতের অধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে

www.icsbook.info

নিয়েছে এবং তদস্থলে বিকল্প মূল্যবোধ প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে শিক্ষিত লোকেরাও আজ বিশ্বাস বঞ্চিত, মূল্যবোধ বিবর্জিত এবং বঞ্চিত একটি সুসংহত বিশ্বদর্শন থেকে।' (৪)

২. একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.১ একটি শিক্ষাব্যবস্থা তখনই শুধু আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে হতে পারে যখন ঐ ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষার্থীর ঈমান হবে সুদৃঢ়, চরিত্র হবে সুন্দর, জীব ও জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা হবে স্বচ্ছ, তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পথ হবে উন্মুক্ত, সমাজের প্রতি দায়দায়ীত্বের অনুভূতি হতে তীব্র। পরকালে আপন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহীতার ভয় থাকবে অন্তরে সদা জাগ্রত। আপন সত্বা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে থাকবে সচেতন এবং সর্বোপরি নিজের অর্জিত জ্ঞান ও লব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার অনুপেরনায় হবে সর্বদা বিচলিত। যে শিক্ষাব্যবস্থায় এর এক বা একাধিক দিক ক্ষুন্ন হবে, তা তত অপূর্ণাঙ্গ ও অকল্যাণ কর বিবেচিত হতে বাধ্য।

২.২ (ক) লক্ষ্যের সুস্পষ্টতা : একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাহলো 'লক্ষ্যের সুস্পষ্টতা'। এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চাই, কোন চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ করার ইচ্ছে এবং দেশ ও জাতির জন্য কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করার প্রয়োজন সেসব বিষয়কে সামনে রেখে তার অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। বস্তুত শিক্ষা হচ্ছে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম। একটি আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে একটি জাতির মৌলিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাদের স্বকীয় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, কেননা আদর্শ দ্বারাই তো জীবন হয় ঐশ্বর্যপূর্ণ। আদর্শ বিবর্জিত কোন জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তা কোন জাতির জন্য প্রকৃত সুফল বয়ে আনতে পারে না। লক্ষ্যস্থলের স্পষ্টতা ছাড়া কোন কাফেলা সঠিক গন্তব্যে পৌছতে পারে না। যেসব প্রত্যয় এবং আদর্শের জন্য একটি জাতি কোন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সেগুলোকেই শিক্ষাব্যবস্থায় অনুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি জাতির ধর্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া চাই শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

আল্লামা ইকবাল দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, "জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝি। জ্ঞান প্রদান করে শক্তি, আর এ শক্তি দ্বীনের অধীন হওয়া চাই। কারণ তা যদি দ্বীনের অধীন না হয় তবে তা হবে নির্ভেজাল পৈশাচিক।' (৫)

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞানের 'ইসলামীকরণ' (Isamization of knowledge)। তথা মানব সৃষ্ট ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে প্রত্যাদিষ্ট বা অহিলব্ধ জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করা। এভাবে জ্ঞান হতে হবে বৃহত্তর মানবকল্যাণে নিয়োজিত ও আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত।

www.icsbook.info

আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে :

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (৬) এ আয়াতের আলোকে জ্ঞানীদের হতে হবে সত্যের সাক্ষ্যদাতা।

এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে তখন যদি শিক্ষাব্যবস্থাটি সার্বিকভাবে ইসলামী আদর্শের আলোকে সাজানো হয়। নতুন বই রচনা ও সঙ্কলনের সময়েও এ দৃষ্টিকোণটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়াবার সময় ছাত্রদের কাছে ইসলামী দৃষ্টিকোণটিও ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং শিক্ষার প্রতিটি স্তরেও তার মনে আদর্শিক চেতনা সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। বলাবাহুল্য এটাই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

২.২ (খ) আত্মসচেতনতা সৃষ্টি : একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিসত্তার পরিচয় লাভ করে ও সৃষ্টিকূলে নিজের অবস্থান এবং আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লাভ করে সর্বোচ্চ ধারণা।

ব্যক্তিসত্তার পরিচয় লাভের অর্থ একথা বিশ্বাস করা যে, মানুষ আল্লাহর দাস। তাই তার কোন আচার আচরণ বা ক্রিয়া কর্ম এমন হতে পারবে না যা আল্লাহর প্রতি দাসত্বের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। তাকে এ বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে যে মানুষ দুনিয়ার বুকে আলাহর খলিফা। এজন্য তাবৎ সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত সৃষ্টিকুলের সকল উপায় উপকরণকে যেন এমন পদ্ধতিতে ও এমন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যার মাধ্যমে সে আল্লাহ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। খিলাফতের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে শিষ্টের লালন দুষ্টের দমন। আরও একটি বিশেষ দায়িত্ব হলো সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা।

২.২ (গ) জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের তাদের আত্মপরিচয়ের সাথে জাতীয় পরিচয় ও বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান সম্পর্কিত ধারণা দেয়া। অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের জন্য এক বা একাধিক বই অধ্যয়নের সুযোগ থাকা দরকার।

২.২ (ঘ) সমাজ পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান সমৃদ্ধি

ব্যক্তিসত্তার পরিচয় এবং জাতীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান দানের পাশাপাশি একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা থাকাও

www.icsbook.info

বাঞ্ছনীয়। কারণ ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা। ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের আওতায় ব্যক্তি মানুষগুলোকে সংগঠিত করে এবং ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণে অংশগ্রহণের অনুভূতি জাগ্রত করে। যেহেতু ইসলাম মাতা-পিতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেকের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিত করেছে, তাই শিক্ষাব্যবস্থায় এসব দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞাত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতদুদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণে রচিত সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যবই সিলেবাসভুক্ত থাকতে হবে।

২.২ (ঙ) চরিত্র গঠন

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বিশেষ করে শিশু চরিত্র গঠনে চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর তা হবে পাঠ্যপুস্তককে আদর্শিক ছাঁচে ঢালাই ও শিক্ষার্থীদের যথাযথ তারবিয়তের মাধ্যমে। পবিত্র আল কুরআনের ভাষায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে প্রেরণের মাধ্যমে মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। এ উপলক্ষে নবীর প্রধান প্রধান কাজের অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেন। (৭) অর্থাৎ উত্তম তারবিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে সকল চারিত্রিক কলুষতা থেকে মুক্ত করেন।

শিক্ষা যতক্ষণ না উত্তম চরিত্র গঠনে ব্রতী হবে, একে ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হবে না। Prof. Lester Smith. বলেন, "সমাজ সদৃশ ধারণার সাথে চরিত্র গঠনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (৮)

ইমাম গাজ্জালি বলেন, শিক্ষা পদ্ধতি তরুণ মনকে মধু জ্ঞানপূর্ণ করতেই চাইবে না একে অবশ্য শিশু নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি এবং তার মন সামাজিক জীবনের নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা দিতে হবে। (৯)

শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রদের আল কুরআনের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনাদর্শ শেখাতে হবে। এর জন্য চাই পরিকল্পিতভাবে একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের নির্দিষ্ট অংশ পাঠ্যভুক্তকরণের ব্যবস্থা। তদুপরি শিক্ষা নিকেতনগুলোর সামগ্রিক পরিবেশ চরিত্র গঠনের উপযোগী হতে হবে। এ দুটি বিষয়ের কোন একটি ক্ষুন্ন হলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য আদর্শ মুমিন তৈরি করা সম্ভব নয়।

২.২ (চ) মেধার লালন ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মেধার লালন নিশ্চিত হবে এবং বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। সকল শিক্ষার্থী একই মেধার অধিকারী নয় এবং সকলের ঝোঁক বা আকর্ষণও ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কারও মেধা খুব তীক্ষ্ণ অপর কারও মেধা সাধারণ স্তরের। কেউ বিজ্ঞান মাধ্যমে বেশি মনোযোগী, কেউ সাহিত্য ও কলা চর্চায়

www.icsbook.info

আনন্দ পাবে, হয়তো বা কেউ প্রকৌশলী হতে চাইবে, আবার কেউ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপার্জনের সহজ পথ হিসাবে হস্তশিল্প তথা ভোকেশনাল এডুকেশনও নিতে চাইবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের মেধা ঝোঁক ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন এমনকি গবেষণার সুযোগও রাখা হবে।

শিক্ষার্থীদের মেধা চিহ্নিতকরণ এবং লালন তার ঝোঁক কোন কোন দিকে তা যাচাইয়ের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে তাদেরকে প্রাথমিক স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানের ভাষা হিসাবে আরবি ও বর্তমান কালের আধুনিক বিষয়াদির মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষা, অংক ও বিজ্ঞান বিষয়াদি নির্বাচনের সুযোগ রাখা হবে। মূলত মাধ্যমিক স্তরে গিয়েই একজন ছাত্রের মেধা ও ঝোঁক সম্পর্কিত একটি ইংগিত পাওয়া যায় তাই পরবর্তী স্তরসমূহে যে পথ বেয়ে চলার জন্য তাকে সুযোগ করে দেয়া হবে।

২.২ (ছ) সমন্বিত জ্ঞান দানের ব্যবস্থাকরণ

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো ইহা শিক্ষার্থীদের জন্য খণ্ডিত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে সমন্বিত জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করে, তথা বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয়সমূহের বিভিন্নতার মাঝে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত উপলব্ধির সন্ধান দান করে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে সর্ববিধ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের একটি সুসংগত নকশা এবং একটি সমন্বিত জীবন পদ্ধতি প্রদান। (১০)

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এ শিক্ষাব্যবস্থায় তাই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত লাভ করতে পারে এবং বিশিষ্টকরণের (Specialization) স্তরে প্রবেশ করার আগে জীবন ও জীবনের সমস্যাবলির প্রতি সুসংহত দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে পারে। ইসলাম জ্ঞানকে সমন্বিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সামগ্রিক বলেই বিবেচনা করে। আল কুরআনই সমন্বিত জ্ঞানের উৎকৃষ্ট নমুনা। সেখানে রয়েছে আকিদা বিশ্বাসগত শিক্ষা, আদর্শিক দিকনির্দেশনা ইতিহাস বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি রহস্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যাবলি, সৌরজগৎ সম্পর্কিত বিবরণ ও পরকালে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা এবং আখেরাতের বিস্তারিত ধারণা।

৩. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া চাই?

২.১ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে প্রশ্নটির ফায়সালা হয়ে গেছে আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরিতে অনুষ্ঠিত OIC কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

OIC এর বিভিন্ন সদস্য দেশে প্রচলিত দ্বি-মুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করে তদস্থলে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে চরিত্রগতভাবে

www.icsbook.info

ইসলামী। (১১) বলা বাহুল্য বাংলাদেশও OIC এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের শরিক দেশ। অতএব বাংলাদেশ নীতিগতভাবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অংগীকারবদ্ধ। উক্ত সম্মেলনে শুধু ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাতে শিক্ষা সংস্কার কমিটি নামক একটি কমিটিও গঠন করা হয়। ঐ কমিটি পরবর্তী বছরগুলোতে যথাক্রমে ইসলামাবাদ, ঢাকা ও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যসূচির একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজও সমাপ্ত করে।

ইতোমধ্যে OIC এর বিভিন্ন সদস্য দেশ ঐ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেও বাংলাদেশের সরকার অজ্ঞাত কারণে তা বাস্তবায়নে রীতিমত অনীহা প্রদর্শন করে। যদ্দরুন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হবে সে প্রশ্ন এখনও একটি বিতর্কিত ইস্যু হয়ে রয়েছে।

৩.২ যেহেতু সরকারি উদ্যোগ ছাড়া একটি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প কিছু প্রবর্তন সম্ভব নয় তাই বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় এ প্রস্তাবনাগুলো চালু হওয়ার বিষয়টি সুদূর পরাহত। অতীব দুঃখজনক যে ইদানীং বাংলাদেশ সরকার এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন যা চালু হলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আদর্শিকভাবে হয়ে পড়বে পঙ্গু। ধর্মীয় দিক দিয়ে হবে চরম ধর্মহীন, চারিত্রিকভাবে দেউলিয়াপনা, দৃষ্টিকোণের দিক দিয়ে সংকীর্ণ জংলীবাদী এবং জ্ঞানার্জনে হয়ে পড়বে খণ্ডিত জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ আমাদেরকে এ অবস্থায় থেকে মুক্তি দান করুন।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাটি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য আরবি ভাষা ও সাহিত্য, কুরআন-হাদীস, ফিকাহ, আকাইদ, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ থাকলেও এ ব্যবস্থাটি একটি লক্ষ্যহীন গন্তব্যের পথে ধাবিত ও অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। সচেতন মহলের সকলেই এর একটি উত্তম বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছেন। তাই প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থারই একটি বিকল্প প্রস্তাব আমি এখানে পেশ করার প্রয়াস পেলাম।

৪. প্রস্তাবিত বিকল্প ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও পাঠ্যসূচি

৪.১ প্রস্তাবিত এ শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত চারটি স্তর থাকবে

৪.১ (ক) প্রাথমিক শিক্ষা স্তর ঃ শিশু শ্রেণী ছাড়া ছয় বছর। (১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত)

(খ) নিম্নমাধ্যমিক স্তর তিন বছর (সপ্তম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত)

(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর তিন বছর (১০ম থেকে ১২শ শ্রেণী)

(ঘ) ডিগ্রি স্তর তিন বছর

www.icsbook.info

(ঙ) স্নাতকোত্তর দুই বছর। মোট ১৭ বছর।

তা ছাড়া কোন শিক্ষার্থী মাস্টারস ডিগ্রি অর্জনের পর গবেষণা করতে চাইলে তার জন্য এমফিল ও পিএইচডি মানের অধ্যয়ন এবং গবেষণার সুযোগ রাখা হবে।

৪.২ পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত আলোচনা

প্রস্তাবিত এ শিক্ষাব্যবস্থার স্তর সমূহের মধ্যে শিশু শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং এর কোন সিলেবাসও প্রস্তাব করা হচ্ছে না। কারণ এ স্তরটি মূলত শিশুদেরকে স্কুলের পরিবেশের সাথে পরিচিত করানোর সময় এবং খেলাধুলার মাধ্যমে বর্ণ ও রং সম্পর্কিত পরিচয় দানের মধ্যেই তাদের পাঠ সীমিত থাকে।

৪.২ (ক) প্রাথমিক স্তর

প্রাথমিক স্তরে প্রথম ৩ বছরের পাঠ্যসূচি থাকবে আরবি বর্ণ পরিচয়, বাংলা লিখন ও গঠন, বিশুদ্ধ আরবি উচ্চারণসহ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা, ধারাপাত ও গণনা শিক্ষা, প্রয়োজনীয় কিছু দোয়া দরুদ ও অজু নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দান। ৩য় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বর্ণমালা ও সহজ অংক যথা-যোগ বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিখানো হবে। পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে থাকবে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ, ইংরেজি ও আরবি ভাষা, ইসলামিয়াত তথা আকাইদ ও ফিকাহ প্রশিক্ষণ, সমাজ ও পরিবেশ বিজ্ঞান, অংক ও ভূগোল ইত্যাদি। প্রাথমিক স্তরের সিলেবাসভুক্ত বিষয়াদির পাশাপাশি ব্যবহারিক আমল আখলাক শিক্ষা, শরীর চর্চা ও ব্যায়াম এবং শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য কিছু কুইজ জাতীয় বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪.২ (খ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৭ম থেকে ৯ম শ্রেণী)

এ স্তরের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে : বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষা এবং ব্যাকরণ (প্রত্যেক ভাষায়), সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ, অংক, ইসলামের ইতিহাস, আকাইদ ও ফিকাহ শিক্ষা, তাজবিদ শিক্ষা, ভূগোল, বাংলাদেশের ইতিহাস (এদেশে মুসলমানদের আগমন ও তাদের শাসনকালে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কেত বিবরণ সম্বলিত)।

আকাইদের পাঠ্যপুস্তক কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে মৌলিক আকিদা বিশ্বাস তথা তৌহিদ ও রেসালত, পরকালে বিশ্বাস, নৈতিক মুল্যবোধ ও তাকওয়ার ধারণা ইত্যাদির ভিত মজবুত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুস্তক রচনা করতে হবে।

ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস ৩ বছরের সিলেবাসভুক্ত থাকবে। ইসলামের ইতিহাস ঘটনাপঞ্জির নিরস বর্ণনা

www.icsbook.info

হিসাবে উপস্থাপন করার পরিবর্তে ইসলামের মহান আদর্শ এবং সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও আর্তমানবতার সেবায় এর বিশেষ অবদানসমূহের ওপর আলোকপাত করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু যেন না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

৪.২ (গ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর (১০ম থেকে ১২ম শ্রেণী)

এ স্তরে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে।

বাংলা (২০০), আরবি (২০০), কুরআন (১০০), হাদীস (১০০), ইসলামের ইতিহাস (১০০) = মোট ৭০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক বিষয়। বাকি ৮০০ নম্বরের বিষয়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা থাকবে, যা আপন প্রতিভা ও পছন্দ অনুযায়ী নিম্নের যে কোন একটি গ্রুপ থেকে নির্বাচন করতে পারবে :

গ্রুপ-ক : ফিকহ ও উসুলে ফিকহ (২০০), আরবি ব্যাকরণ ও বালাগাহ (২০০), ইলুমুল হাদীস ও উলুমুল কুরআন (২০০), অর্থনীতি অথবা পৌরনীতি (২০০), বিদেশী ভাষা (ইংরেজি অথবা উর্দু অথবা ফারসি) (২০০)। উপরোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে যে কোন ৪টি = মোট ৮০০ নম্বর।

গ্রুপ -খ : হিসাব বিজ্ঞান (২০০), বুক কিপিং ও অংক (২০০), অর্থনীতি অথবা পৌরনীতি অথবা সমাজ বিজ্ঞান (২০০), ইংরেজি (২০০) = ৮০০ নম্বর।

গ্রুপ-গ : রসায়ন (২০০), পদার্থ বিদ্যা (২০০), অংক অথবা জীব বিজ্ঞান (২০০), ইংরেজি (২০০) = ৮০০ নম্বর।

গ্রুপ- ঘ : অর্থনীতি (২০০), পৌরনীতি (২০০), সমাজ বিজ্ঞান (২০০), তর্কশাস্ত্র (২০০), কৃষি বিজ্ঞান (২০০), ফিকহ ও উসুলে ফিকহ (২০০), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (২০০), মনোবিজ্ঞান (২০০)- এগুলোর যে কোন ৩টি তৎসহ ইংরেজি (২০০) = মোট ৮০০ নম্বর।

৮.২ (ঘ) ডিগ্রি স্তর : (৩ বছর)

ডিগ্রি স্তর সাধারণ ও সম্মান এ দুটো ধারায় বিভক্ত হতে পারে। তবে উভয় ধারায় এমন কিছু মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলক রাখা হবে যা একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তার মধ্যে ইসলামী সচেতনতা Awareness বৃদ্ধি আদর্শিক মনোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। সাধারণ ও সম্মান উভয় কোর্সের সময়সীমা হবে ৩ বছর করে। তবে সাধারণ (পাস) কোর্সের জন্য শিক্ষাবর্ষ পদ্ধতি ও সম্মান (Hon's) কোর্সের জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হবে।

সাধারণ (পাস) কোর্সে ৩ বছরে মোট ১৫০০ নম্বর বিষয়ে অধ্যয়ন ও পরীক্ষা দিতে হবে। তন্মধ্যে বাধ্যতামূলক বিষয় হচ্ছে বাংলা (২০০), ইসলামের ইতিহাস (২০০), ইংরেজি অথবা আরবি (২০০) = মোট ৬০০। ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের প্রত্যেকটিতে

www.icsbook.info

(৩০০ নম্বর) করে যে কোন ৩টি গ্রুপ নির্বাচন করার সুযোগ থাকবে। এ গ্রুপগুলো হবে নিম্নরূপ :

সাধারণ: ক. হাদীস ও উলুমুল হাদীস খ. তাফসীর ও উলুমুল কুরআন, গ. ফিকহ ও উসুলুল ফিকহ (৩০০) ঘ. আকাইদ ও উসুলুল দ্বীন (৩০০) ঙ. অর্থনীতি (৩০০) চ. রাষ্ট্র বিজ্ঞান (৩০০) ছ. সমাজ বিজ্ঞান (৩০০) জ. মনোবিজ্ঞান (৩০০) ঝ. কৃষি বিজ্ঞান (৩০০) ঞ. ভুগোল (৩০০) ইত্যাদি।

বিজ্ঞান : ক. রসায়ন (৩০০ খ. পদার্থ (৩০০) গ. অংক (৩০০) ঘ. জীব বিজ্ঞান (৩০০), ঙ. মনোবিজ্ঞান (৩০০) চ. পরিসংখ্যান (৩০০) ছ. আকাইদ ও উসুলুল দ্বীন (৩০০)।

বাণিজ্য : ক. বাণিজ্য বিষয়ের যে কোন ৩টি, তবে কেউ ইচ্ছা করলে এর একটি বিষয়ে হিসাবে বিজ্ঞান গ্রুপের অনুরূপ আকাইদ ও উসুলুল দ্বীন বিষয়ও গ্রহণ করতে পারবে।

৪.২ ঙ. স্নাতক সম্মান কোর্স

স্নাতক সম্মান কোর্স অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকবে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ও নির্দিষ্ট কয়েকটি মাদ্রাসায় মাত্র। এ কোর্সে সেমিস্টার পদ্ধতি ও ক্রেডিট আওয়ার পদ্ধতি (Credit Hour System) অনুকরণ করা হবে। এ কোর্সে মোট ৬টি সেমিস্টারে ৩০টি বিষয়ে অধ্যায় সমাপ্ত করতে হবে। তন্মধ্যে ১০টি বিষয় মৌলিক (Basic Compulsory Subject) বাধ্যতামূলক বিষয় থাকবে। যথা: আরবি ভাষার ২টি, প্রতিটি (১০০) নম্বর করে (২ সেমিস্টার), ইংরেজি ভাষার ২টি, প্রতিটি (১০০) নম্বর করে (২ সেমিস্টার), ইসলামের ২টি, প্রতিটি (১০০) নম্বর করে (২ সেমিস্টার), বাংলাদেশ স্টাডিজ ২টি, প্রতিটি (১০০) নম্বর করে (২ সেমিস্টার), আধুনিক মুসলিম পরিস্থিতি ২টি; প্রতিটি (১০০) নম্বর করে (২ সেমিস্টার)।

বাকি ২০টি বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে নির্ধারিত হবে। সম্ভাব্য বিভাগ সমূহের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

১. উলুমুল কুরআন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

২. আল হাদীস এবং উলুমুল হাদীস বিভাগ

৩. আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

৪. আকাইদ ও উসুল দ্বীন বিভাগ

৫. আল ফিকাহ ওয়া উসুল আল ফিকাহ বিভাগ

৬. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগ

৮. প্রায়োগিক বিজ্ঞান বিভাগ

৯. চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগ

www.icsbook.info

১০. কম্পিউটার সায়েন্স এবং টেকনোলজি বিভাগ

১১. বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ ইত্যাদি।

(শেষোক্ত ৫টি বিভাগ সকল প্রয়োজনীয় প্রাথিমক প্রস্তুতি ব্যবস্থাকরণ সাপেক্ষে খোলার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে)

৪.২ (চ) স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) পর্ব

স্নাতকোত্তর পর্বের দুই বছরের প্রথম বর্ষে কোর্স সিস্টেম এবং দ্বিতীয় পর্বে গবেষণা অভিসন্দভ (Reasearch Dissertation) প্রস্তুত করার মাধ্যম এ কোর্স চালুর সুপারিশ করা হচ্ছে। ১ম পর্বের দুই সেমিস্টারে মোট (১০০০) নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য থাকবে ৫০০ নম্বর। মোট ১৫০০ নম্বর। তা ছাড়া যদি বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে অথবা শিক্ষাবর্ষ শেষে পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেও এম, এ করার সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৪.৩ কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সনদের নাম ও মান

প্রস্তাবিত এ শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে

৪.৩ (ক) প্রাইমারি সনদ পরিক্ষা (Primary Certificate Exam.) এ পরিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্রেণী সমাপনান্তে অনুষ্ঠিত হবে, আর এ পরীক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

৪.৩ (খ) নিম্ন মাধ্যমিক সব পরীক্ষা : (Lower Secondasry Certificate Exam.) এ পরিক্ষা ৯ম শ্রেণী সমাপনান্তে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ পরীক্ষা একটি বাধ্যতামূলক গণ পরীক্ষা (Compulsory Public exam.)

৪.৩ (গ) উচ্চমাধ্যমিক সনদ পরীক্ষা (Higher Secondary Certificate Exam.)-

এ পরীক্ষা ১২শ সমাপনান্তে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ পরীক্ষা একটি বাধ্যতামুলক গণ পরীক্ষা (Compulsory Public exam.)

৪.৩ (ঘ) স্নাতকোত্তর পর্ব পরীক্ষা (Post Graduate Course Exam.) এ পরীক্ষা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হবে।

৪.৩ (ঙ) স্নাতকোত্তর গবেষণা কর্মসূচি (Post Graduate Research Program)

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মাস্টার্স ডিগ্রি গ্রহণের পর আগ্রহী গবেষকদের জন্য এম. ফিল এবং পি.এইচ.ডি, পর্যায়ে গবেষণার দ্বারা উন্মুক্ত রাখা হবে। আর যারা বিদেশে গিয়ে উচ্চতর স্তরে গবেষণা কর্ম অব্যাহত রাখতে চান তাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পর্যায়ের সনদসমূহকে বিদেশী সনদের সমমান দানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫. সনদ প্রদানকারী কৃর্তপক্ষ

এ প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক পবিরর্তন সাধনা

www.icsbook.info

করতে হবে

৫.১ বর্তমানে বিদ্যমান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একটি ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে হবে। এর নামকরণ করা হবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক এডুকেশন। এ ইনস্টিটিউট প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের এফিলিয়েশন দান করবে এবং সরাসরি পরীক্ষাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে।

৫.২ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর ফ্যাকাল্টি অব শরিয়াহ্ এবং ইসলামিক স্টাডিজকে ঢাকায় স্থানান্তর করে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় তা পুনঃস্থাপন করতে হবে।

৫.৩ ডিগ্রি ও মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপরে বর্ণিত ইনস্টিটিউট নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে। তবে ডিগ্রি ও মাস্টার্স লেভেলে প্রতিষ্ঠানসমূহের এফিলিয়েশন ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ের দায়িত্ব পালন করবে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়। এম. ফিল এ ডক্টরেট লেভেলের গবেষণা কর্ম শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিচালিত হবে।

৬. সার্টিফিকেটের নাম ও মান প্রসংগে

এ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও সনদসমূহকে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল ইত্যাদি নামে অভিহিত করার পরিবর্তে তদস্থলে প্রাইমারি বা ইবতেদায়ী পরীক্ষার সনদ /নিম্ন মাধ্যমিক বা মুতাওয়াসসিতা পরীক্ষার সনদ /উচ্চ মাধ্যমিক বা সানাভিয়া উলিয়া পরিক্ষার সনদ, ডিগ্রি (বি. এ. সাধারণ/শরিয়াহ/কুরআন ওসুন্নাহ/ আকীদাহ ও দাওয়াহ/কৃষি ইত্যাদি) পাশ বা সম্মান নামে অভিহিত হবে এবং অনুরূপভাবে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য গ্রুপের সনদকেও যথাক্রমে বি. এস.সি (সম্মান বা পাস) এবং বি. কম (সম্মান বা পাস) ডিগ্রি বলা হবে।

বর্তমানে যেভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মাঝপথে কলেজে পাড়ি জমাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এ প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পাশ করার পূর্বে ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কোন সুযেগাই থাকবে না। তদুপরি বর্তমান ফাজিল শ্রেণীর স্থলে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্সের প্রস্তাব করায় ছাত্ররা অন্তত বিশ্বাস করতে পারবে যে, তাদের সনদও মানসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

৭. পরীক্ষা পদ্ধতি

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো সহজতর করতে হবে। একটি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি থেকে নিয়ে ফল প্রকাশিত হওয়া এবং পরবর্তী স্তরে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের এক একটি বছর করে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে ফল প্রকাশ পর্যন্ত সময়সীমা ৩/৪ মাসের অধিক হওয়া কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। পরীক্ষার নামে ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধকল্পে এ শিক্ষাব্যবস্থায় দু'বছর অন্তর গণপরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা

www.icsbook.info

হয়েছে। তবে ৩ বছরের মাথায় গিয়ে এক সাথে অনেক বিষয়ের পরীক্ষা দান যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্য নিম্ন মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত প্রতি বছরান্তে সে বছরের অধীত বিষয়াদির পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু এ পরীক্ষার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা কিংবা পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পূর্ব শর্ত স্বরূপ ফল প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কোন ছাত্র সংগত কারণে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে অথবা কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে কিংবা কম নম্বর পেলে তার জন্য পরবর্তী বছরের উক্ত বিষয়ের পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৮. পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন

৮.১ উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশনের অধীনে একটি কমিটি থাকবে, উক্ত কমিটি বিভিন্ন সময়ে বৈঠকে মিলিত হয়ে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও মান পরীক্ষা করবে।

৮.২ ডিগ্রি ও মাস্টার্স পর্বের পাঠ্যসূচি ও রেফারেন্স ইত্যাদি নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়।

তথ্যসূত্র :

১. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি (বাংলা সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ৭ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

২. প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা ১০ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

৩., প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা ১০ (পরিবর্তিত)

৪. প্রাগুক্ত ; পৃষ্ঠা ১২-১৩

৫. ইকবাল ; বাংগে দায়া

৬. আল কুরআন : আল ইমরান -১৯

৭. আল কুরআন : আলে ইমরান -১৬৪

৮. ইসলামী শিক্ষার মুলনীতি-২১

৯. প্রাগুক্ত -২২

১০. প্রাগুক্ত-২০

১১. দেখুন ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের দলিল।

লেখক : প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

www.icsbook.info

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আমাদের জাতীয় জীবনের বড় সমস্যাগুলির অন্যতম। এ সমস্যা জাতির প্রাণশক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষাংগন মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের রণক্ষেত্রে। ফলে এড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অনির্ধারিত ছুটি ঘোষণা করতে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাহীন সেশনজট, চার বছরের শিক্ষাজীবন যেন তেন প্রকারে সমাপ্ত হয় আট বছরে। ছাত্রাবস্থাতেই অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সরকারি চাকরির বয়স সীমা। সন্ত্রাসী গ্রুপের দৌরাত্মে নিরীহ ছাত্র সমাজ হয়ে পড়ছে তাদের ইচ্ছার ওপর জিম্মি; স্বাধীনতার পরে তাই খালি হয়েছে কয়েকশ মায়ের বুক। সন্তান বুক ভরা আশা নিয়ে শিক্ষাংগনে ঢুকেছে, আর ফিরে গেছে মা-বাবার কাছে লাশ হয়ে কাফন পরে। শত শত তাজা প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ। এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই। তাই শুধু বিত্তশালী নয় মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি শংকিত হয়ে লেখা পড়ার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের শিক্ষাংগনগুলোতে। আড়াই দশক আগেও যাদের থেকে আমাদের শিক্ষার মান ছিল অনেক উন্নত, আজ পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিক্ষা লাভের আশায় আমরা ছুটছি তাদের দ্বারে।

হত্যাকাণ্ড, হানাহানি, অংগ-প্রত্যংগ ছেদন প্রভৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসের নতুন মাত্রা। তাহলো জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন। দরিদ্র দেশে বহু কষ্টে সংগৃহীত দ্রব্যাদি, অফিস-আসবাব, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ছাত্রাবাস ভস্মীভূত

www.icsbook.info

করা এসব আর নতুন নয়। সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে নিগৃহীত হচ্ছেন শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও সরবরাহকারী মহল। উন্নয়নের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারকরা হয়েছে দুষ্কর। টেণ্ডার প্রদানে বাধা সৃষ্টি, অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে প্রাণ নাশের হুমকি, প্রশাসনিক অযাচিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কার্যাবলি উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। শিক্ষাংগনকে "মানুষ গড়ার আঙিনা" বলা হয়ে থাকে তা আজ পরিণত হয়েছে "ডাকাতদের গ্রাম"-এ। জাতির জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে?

সন্ত্রাসের কারণসমূহ

গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের প্রধান কারণ হলো অশুভ রাজনীতি। দুনিয়ার পাওনা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নেবার জন্য অনেকেই রাজনীতিকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে বেছে নেন। রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে আদর্শিক, অর্থনৈতিক এবং আরো কিছু উপাদান। এখানে স্বল্প পরিসরে বিষয়গুলোর প্রতি কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

১. রাজনৈতিক ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে আরোহণের জন্য ছাত্রসমাজকে ব্যবহার

একথা অনস্বীকার্য যে, সুসংহত ছাত্রসমাজ একটি শক্তি। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রসমাজ জাতিকে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় পথনির্দেশ দান করেছে এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির বেড়াজালে জড়িয়ে তাদের অংশবিশেষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে, যে সকল রাজনৈতিক দলের তেমন কোন আদর্শ নেই, জাতিকে দেবার মত কোন প্রোগ্রাম নেই সেসব অন্তঃসারশূন্য দলের উচ্চাভিলাষী অথচ আদর্শহীন নেতারা কোমলমতি ছাত্রদেরকে দাবার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। ছাত্রদের পিঠে পা রেখে তারা ক্ষমতার সোপানে আরোহণ করতে চান। তাই তারা ছাত্রদেরকে দলীয় এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এমন সব দল ও তাদের নেতৃবৃন্দকে দেশবাসী কয়েক যুগ থেকে দেখে আসছে এবং তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে।

২. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ও নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের ভ্রান্তনীতি সন্ত্রাসের জন্য দেয়

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ও নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের ধার করা মতবাদ ও সন্ত্রাসী নীতি শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ। "শ্রেণী সংগ্রাম" বিশ্বাসী, তাই শ্রেণী সংগ্রামের "লাল আগুন" দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়া তাদের প্রধান কাজ। এজন্য তাদের সর্বদা প্রতিপক্ষের প্রয়োজন। স্বাধীনতার মনগড়া পক্ষ-বিপক্ষ, বুর্জোয়া-সর্বহারা, বিত্তবান মেহনতী জনতা, তথাকথিত বিপ্লবী ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল, জাতিগত, বর্ণগত, আঞ্চলিক, ভাষার ভিন্ন তা প্রভৃতি বিভেদের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রাম জারি রাখা তাদের আদর্শিক দায়িত্ব। তাদের তথাকথিত বিপব সফল ও ত্বরান্বিত করার জন্য কোথাও বাস্তব আবার কোথাও কাল্পনিক প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করে শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। বন্দুকের নল দিয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। সুতরাং

www.icsbook.info

এদের কাছে সমাজে ও শিক্ষাংগনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আশা করা বাতুলতা মাত্র। ঘটনা কী ঘটলো তা মুখ্য নয়-কি ঘটা উচিত ছিলো সেটাই মুখ্য এবং তদনুযায়ী তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাঠে নামতে হয়। তাই জাতি হতবাক হয়ে দেখলো যে, কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন হত্যা ও জনাব রাশেদ খান মেননের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার সাথে যাদের আদৌ সংশ্লিষ্টতা নেই তাদেরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হলো। এদের স্বর্গ ভূমির পতন ঘটেছে, কিন্তু তাদের এদেশীয় গুরু কর্মীরা "সিন্দাবাদের ঘাড়ে চাপা বুড়ো'র ন্যায় অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে জাতির রক্ত শোষণ করেই চলেছে।

৩. অবৈধভাবে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়

আমাদের দেশে এমন অনেক রাজনৈতিক দল আছে যাদের জাতিকে দেবার মত নেই কোন আদর্শ নেই কোন জনসমর্থন। তাদের অস্তিত্ব প্রকাশের একমাত্র উপায় দলীয় অংগ সংগঠন ছাত্র সংগঠনকে চাঙ্গা রাখা এবং তাদের শ্লোগান, মিছিল ও সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখা। এ উদ্দেশ্যে তারা ছাত্র যুব সমাজের হাতে তুলে দেয় অস্ত্র এবং তার পরিণতি যা হবার তাই হয়। এ অস্ত্র হাতে পেয়ে তারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে, ঠিকাদার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকট হতে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে, ডাকাতি রাহাজানি অবাধে চালিয়ে যায়। যারা যেন তেন প্রকারে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন তারা এ ধরনের পেটোয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি করে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার মোক্ষম উপায় বলে বিবেচনা করেন। এসব ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসন সন্ত্রাসীদের প্রয়োজনীয় ছাত্রছায়া প্রদান করে থাকে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি, ছাত্রভর্তি, টেণ্ডার, ঠিকাদারি, প্রশাসন প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করে এবং সময় মত বেপরোয়া ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর চড়াও হয়।

৪. সন্ত্রাস সন্ত্রাসের জন্ম দেয়

কোন দল বা গোষ্ঠীই উৎখাত হয়ে যেতে চায় না। তাই কারো ওপর বারবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালালে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারোনা টিকে থাকার জন্য বাধ্য হয়েই তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

৫. সন্ত্রাসীদের প্রতি উদার নীতি সন্ত্রাস লালনে সহায়তা করে

দেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইন আছে, কিন্তু সন্ত্রাসীরা তা থেকে নিরাপদ বা রেহাই প্রাপ্ত। আর সেই সন্ত্রাসী বাহিনী সরকারের পোষ্য হলে তো কথাই নেই। তাদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে "শিক্ষাঙ্গনের গণ্ডগোল" "রাজনৈতিক হত্যা" ইত্যাদি বিশেষণের আবরণে ঢেকে দেয়া হয়। হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ডই। এর কোন বিশেষণ থাকতে পারে না। বরং এসব ক্ষেত্রে বিশেষণের ব্যবহার ন্যায়নীতি বিরোধী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এদের দৌরাত্ম্যের কাছে অসহায়। এদের বড় ভাই বা গড ফাদারগণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। তাই এদেরকে খাঁটানো খুব শুভকর নয় বলে তারা মনে করেন। তাইতো সংকট কালেও আমরা কৌতুকের সাথে লক্ষ্য

www.icsbook.info

করি, যখন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে কোন এলাকার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তখন আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের কর্মশক্তি প্রয়োগে অবতীর্ণ না হয়ে এ বলে সন্ত্রাসীদের শুধুবুদ্ধির নিকট আবেদন জানাচ্ছে যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ স্থান অতিক্রম করছে তাই কিছুক্ষণ যুদ্ধ বিরতি প্রয়োজন। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতি কৃর্তপক্ষের সমান ও নিরপেক্ষ আচরণের অভাবে অনেক সন্ত্রাসী আশকারা পেয়ে যায়। ফলে তারা তাদের কর্মকাণ্ডে আরো উৎসাহিত বোধ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকার তাদের অংগ দলকে শিক্ষাংগনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে নিজেদের দলীয় এজেন্টদের বসিয়ে থাকে। এদের কাজ সরকারি অংগ সংগঠনকে শিক্ষাংগনে দাঁড়া করানো। এভাবে সন্ত্রাসী বাহিনীর পত্তন হয়। পরিণামে এসব সন্ত্রাসীরাই আবার প্রশাসনের ঘাড়ে চেপে বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কারণে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজস্ব আইন ও প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু সেসব অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় না। আর প্রয়োগ করা হলেও সেক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও পক্ষাপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এমনও দেখা গেছে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সন্ত্রাসী দলকেই মদদ দান করা হচ্ছে।

৬. সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপের সমর্থনে দার্শনিক যুক্তির অবতারণা

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ মানবেতিহাসের কোন পর্যায়েই প্রশংসিত হয়নি। বরং এসব কার্যকলাপকে সর্বদাই ঘৃণার চোখে দেখে আসা হয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় অধুনা একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসীদের পক্ষে নানান কুযুক্তির অবতারণা করে এদের পক্ষে সাফাই গাওয়া শুরু করেছেন। এরা সন্ত্রাসীদের ফ্রেণ্ডস, ফিলোসোফার ও গাইড। একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা দিতে শুনেছি- শিবির মারায় কোন অন্যায় নেই। এসব দার্শনিক তাদের ক্ষুদে সংস্করণের বন্ধুদের কৃত নৃশংস কর্মকাণ্ডের সমর্থনে বলে থাকেন- এটাই স্বাভাবিক এসবের প্রয়োজন আছে, ইতিহাসিক কারণেই এর প্রয়োজন ছিলো এ ধরনের আরো নানান অন্তঃসারহীন উক্তি। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংবাদমাধ্যম অব্যাহতভাবে সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জনমত বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত আছে। স্বমতাবলম্বী পেটোয়া বাহিনীর অপকর্মসমূহকে এসব সংবাদমাধ্যম আবরণ দেয় এবং নির্যাতিত প্রতিপক্ষকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। জাতির জন্য এমন বজ্জাতি খুব কমই আছে।

ছাত্রদের রক্তে স্রোত বয়ে গেলে ক্যাম্পাসের মাটি অপবিত্র রাখার উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আলোচনার যোগদানের জন্য জননেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। সেদিন উপাচার্যের কক্ষে প্রতিপক্ষ ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের হাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলে জাতির বিবেকবান অংশ ঘৃণায় ফেটে পড়ে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের সমর্থনে সেদিন যুক্তির অভাব হয়নি। তাদের মুরুব্বি ও দার্শনিকগণ এ ঘটনাকে সাধারণ ছাত্রদের আবেগের বা বিশেষ ধরনের

www.icsbook.info

চেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে আখ্যা দিতে পিছপা হননি।

৭. ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সন্ত্রাসে ইন্ধন যোগায়

বিগত বছরগুলিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। চালু করা হয়েছে নতুন নুতন বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও সেন্টার। সে অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। কিন্তু ছাত্রদের আবাসনের ব্যবস্থা সে অনুপাতে একেবারেই অপ্রতুল। এমনিতেই সেশনজট ও সময় মত পরীক্ষা না নেবার কারণে অনেক 'আদু ভাই' ছাত্রাবাসগুলোতে স্থায়ী ভাবে গেড়ে বসেছে। তাই নতুন শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাসে স্থান না পেয়ে শহরের আনাচে কানাচে নিম্নমানের আবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনেকের শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি হচ্ছে অথচ হলের আবাসিকতা ভাগ্যে জুটছে না।

ছাত্র সংগঠনগুলি বিভিন্ন ছাত্রাবাসে তাদের নিজ নিজ দলীয় প্রাধান্য বিার করে নিজেদের দুর্গ গড়ে তুলেছে। প্রতিপক্ষের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তির বিশেষ দলপ্রীতি, দুর্বল প্রশাসন, সরকারি আশকারা ও হস্তক্ষেপ পরিবেশকে আরো বিষময় করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের সুপারিশে নতুনেরা হলে বসবাসের সুযোগ পায়। এ পন্থায় দলীয় রিক্রুট বাড়ে এবং তাদেরকে দলীয় কার্যক্রম ও মিটিং মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয়। হলে হলে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিপক্ষকে উৎখাত করে হল দখলের ঘটনা আজকাল অহরহ শুনা যাচ্ছে।

৮. বিদেশী সেবাদাসদের ষড়যন্ত্র

কোন জাতিকে পংগু করার সহজ পন্থা সম্ভবত তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বন্ধ বা অস্থির করে রাখা। যাতে মানুষ গড়া আঙিনায় সত্যিকার মানুষ তৈরি হতে না পারে। সৃষ্টি হতে না পারে ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, যোগ্য নাগরিক ইত্যাদি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন বৃটিশগণ এদেশ ছেড়ে চলে যায় তখন থেকেই স্বল্প পরিসরে হলেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষা লাভ এদেশেই করা যেত। ভারতে যাবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আজ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা লাভের আশায় পাড়ি জমিয়েছে ভারতে। অথচ দুই যুগ আগেও তাদের শিক্ষার মান আমাদের থেকে কোন অংশেই উন্নত ছিলো না। ওদের তাঁবেদার সেবাদাসগণ আমাদের মাটিতে বসে তাদের বিদেশী প্রভুদের মনোতুষ্টির জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস জিইয়ে রাখছে-যাতে করে আরো অধিক সংখ্য শিক্ষার্থী সে দেশে পাড়ি জমিয়ে মস্তক ধোলাই হয়ে দেশে ফিরতে পারে।

৯. সার্বিক সামাজিক অবস্থা

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও দেশের সামাজিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ শিক্ষাংগনের অনুকূলে নয়। শিক্ষা শেষে সীমাহীন বেকারত্ব, চাকুরি ও কাজের অনিশ্চয়তা, প্রয়োগবিহীন

www.icsbook.info

শিক্ষা, যাতে মানসিক উৎকর্ষতা অর্জনের কোন উপাদান নেই এসব সামাজিক সমস্যা একজন শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে একেবারে হতাশ করে তুলে।

প্রতিকার

কোন জলাশয়ে একটি মাছ মরে ভেসে উঠলে মাছটিকে রোগাক্রান্ত বলা যায়, কিন্তু যখন শত শত মাছ পানির ওপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে তখন মাছের রোগ নয় বরং বুঝতেহবে জলাশয়ের পানি পচে দূষিত হয়ে গেছে। তদ্রুপ দুই একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কারণে সন্ত্রাসী ঘটনার উদ্ভব হতে পারে কিন্তু সর্বত্র ব্যাপক হারে বছরের পর বছর ধরে নানা প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকলে সে অবস্থাকে আর স্থানীয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে ধরে নেয়া যায় না। বরং এ অবস্থাকে সমাজের পচন ও দূষিত অবস্থা বুঝতে হবে। উপরের সন্ত্রাসের যে সকল কারণ উল্লেখ করা হলো সেগুলো দূর করার ব্যবস্থা নিলেই শিক্ষাংগনে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবসান হবে একথা মনে করা সঠিক হবে না। এগুলো আসলে সমাজের রোগ নয়, জরাগ্রস্ত সমাজের রোগের লক্ষণ মাত্র। সুতরাং শুধুমাত্র রোগের লক্ষণ নয় বরং প্রকৃত রোগ নির্ণয় করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। সমাজের পচন ধরেছে, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে জনজীবন ওষ্ঠাগত । এ পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য নতুন সমাজ গঠনে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে শিক্ষাংগন দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চল নয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে, কিন্তু সে অজুহাতে সন্ত্রাসীরা এখানে আশ্রয় নিয়ে নির্বিঘ্নে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে, দেশের প্রশাসন সেখানে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এ যুক্তি মেনে নেয়া যায় না। সন্ত্রাস দমন ও দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারের। অন্যান্যদের সহযোগিতা বা ঐকমত্যের অপেক্ষা না করে সরকারকেই সন্ত্রাস দমনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর সে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিরপেক্ষ ভাবে তার নিজস্ব ধারা ও প্রক্রিয়ায় আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সরকার সেখানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করবে। ক্যাম্পাসে ছাত্র হত্যা হচ্ছে অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ নেই বলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এটা বড়ই দুঃখজনক অবস্থা।

সন্ত্রাস নির্মূলের প্রতিকার সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এজন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মধ্যে পড়ে সামাজিক পুনর্গঠন, ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠা করা, সমাজকে অশিক্ষা, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। শুধু আখের গোছানোর জন্য নয় বরং দেশবাসী সত্যিকার মঙ্গলের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও

www.icsbook.info

নেতৃবৃন্দকে নিবেদিত হতে হবে। সেই সংগে সরকারকে নিম্নলিখিত স্বল্পমেয়াদি অথচ সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

১. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও যোগানদাতাদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।

২. রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতিকে বিভক্ত করা ও উর্ধ্বতর সোপানে আরোহণের জন্য জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র সমাজের ঘাড়ে ভর করার পুরাতন কৌশল রাজনৈতক নেতৃবৃন্দকে পরিহার করে সহনশীল সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে তোলার যত্নবান হতে হবে।

৩. সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী ঘটনার দোষী ব্যক্তিদের আইনের সোপর্দের মাধ্যমে বিচার করতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করতে হবে।

৪. ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা দূর করতে হবে এবং মেধার ভিত্তিতে হলসমূহে সিট বন্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. শিক্ষাঙ্গনে সামগ্রিক পরিবেশ উন্নতিকল্পে ছাত্রদের হানাহানির তথাকথিত রাজনীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও সচল করে এ ধরনের কার্যকলাপকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। সেই সংগে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শিক্ষামূলক ও শিক্ষা বহির্ভূত কর্মতৎপরতায় উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সময়মত ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ছাত্রদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যাদি সুসম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের অবজ্ঞা করে কোন ক্রমেই সংগঠন বা দলীয় নেতাদের প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

৭. শিক্ষকদের গ্রুপ রাজনীতি অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পুনর্মূল্যায়ন করে একে যুগোপযোগী ও অর্থবহ করতে হবে।

৮. শিক্ষার ধস রোধকল্পে শুধুমাত্র সরকারি দলের এজেন্টদের দ্বারা নয় বরং জাতির যোগ্য ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে যুগের চাহিদা ও জন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের মতো যেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

লেখক : চেয়ারম্যান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ও সিন্ডিকেট সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

আমরা কি পড়তে চাই, কি পড়ছি , কি পাচ্ছি?

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

কী পড়তে চাই?

"তিনি (আল্লাহ) তার পক্ষ থেকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।"

(সূরা আল-জাসিয়াহ : ১৩ আয়াত)

"আমি অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছি।"

(সূরা বাকারাহ : ৩০ আয়াত)

প্রশ্ন জাগে আমরা কি প্রকৃতই চিন্তাশীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত? প্রশ্ন জাগে আল্লাহ্ যা কিছু আমাদের অধীনস্থ কররেছেন যে উদ্দেশ্যে তা কি আমরা অনুধাবন করেছি? আল্লাহ্ আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে। যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাদেরকে তার প্রতিনিধি করেছেন সেই উদ্দেশ্য কি আমাদের কাছে পরিষ্কার? না হলে কেন নয়? অথবা আমরা কি সেই দায়িত্ব লাভের জন্যে উপযুক্ততা বা যোগ্যতা অর্জনের প্রয়াস চালিয়েছি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে যা পাওয়া যাবে তা আমাদের হতাশই করে।

বস্তুত খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব হলো তার প্রভু বা মালিকের হুকুম মান্য করা। কিন্তু আমরা কি জানি কি সেই হুকুম বা নির্দেশ. এই প্রশ্নের যথার্থ ও সত্যনিষ্ঠ উত্তর হলো না। আমাদের তো উচিত ছিল সেই সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে

www.icsbook.info

প্রতিনিধি হিসাবে আমরা উপযুক্ততার পরিচয় দিতে পারতাম। যিনি আমাদের এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার প্রদত্ত দায়িত্ব, কর্তব্য ও নির্দেশ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে পারতাম।

আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুশীলন করা উচিত ছিল সেই মহাপ্রভু আল্লাহর নির্দেশাবলি যা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের ওপর প্রেরণ করেছেন তার নবী ও রাসুলদের মাধ্যমে। বিশেষ করে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে যখন তিনি তার দ্বীনকে পূর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন এবং ইসলামকেই তার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন তখন তো আর দ্বিধা সংশয় থাকার কথা নয়। কিন্তু আফসোস, মানব সৃষ্টির প্রথম হতেই মরদুদ শয়তান তার পেছনে লেগে রয়েছে কিভাবে প্রতি পদে তাকে পথভ্রষ্ট করা যায়; কোন কৌশলে তাকে মতিছন্ন করে তাগুতি শক্তির অনুগত দাস বানিয়ে ভয়ঙ্কর জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানানো যায়।

এ থেকে পরিত্রাণের জন্যেই তো আমাদের জানা দরকার ছিল তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের মর্মকথা কী? তার দাবি কী, এবং সেই দাবি পালনের পথ কি? আমাদের সকল জ্ঞনচর্চা সেই লক্ষ্যের অভিসারি হওয়াই উচিত ছিল। আল্লাহ যে জ্ঞান চর্চার কথা বলেছেন বিজ্ঞান তারই এক রূপ। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই তিনি যে প্রতিনিধির আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন সেসব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের প্রয়াস ও প্রতিক্রিয়াই হলো বিজ্ঞান। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের , বিজ্ঞান চর্চাকে অনেকেই অনাবশ্যক নাস্তিকতা ও খোদাহীনতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। হালাল-হারাম সম্পর্কে ইসলামের যে নির্দেশ, নীতি -নৈতিকতা সম্মন্ধে যে অনুজ্ঞা সেসব জানা ও অনুশীলনের ব্যাপারে আমাদের অনেকেই রয়েছে অমার্জনীয় উদাসীনতা ও নিদারুণ অবহেলা। অথচ এগুলিইতো আমাদের জানা উচিত, মান্য করা উচিত। কারণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ ও সফলতা।

পার্থিব এই জীবনে শান্তিপূর্ণ ও বরকতময় জীবন যাপনের পাশাপাশি আমরা পরকালের অনন্ত জীবনেও আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে পরিত্রাণ চাই। বরং আমরা তার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার চাই। এজন্যে যা প্রয়োজন তা হলো যিনি এই দুনিয়াতে আমাদেরকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে জানা। তার রবুবিয়াতকে জানা, তার প্রেরিত রাসূল (সা:) সম্পর্কে জানা, আখিরাত সম্পর্কে জানা। তানা হলে কোন জানাই সম্পূর্ণ হলো না। এরই সাথে প্রয়োজন সেই জ্ঞান ও তার দাবি অনুসারে জীবনের সকল কাজের ফায়সালা করা। তা না হলে প্রতিনিধির সম্মানই শুধু খোয়াবো না, বরং নির্দেশ অমান্যের জন্য কঠিন শাস্তির নিগড়েও বন্দী হবো। পার্থিব জীবনের সকল স্তরে ও সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ কি এবং কিভাবে তা পালন করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি একটা গাইড বইও প্রেরণ করেছেন তার প্রতিনিধি মানুষের জন্যে। সেটিই হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত এই গাইড বই অনুসরণ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে না, বরং সৎ ও সুন্দর, নির্মল ও শান্তিপূর্ণ জীবনের

www.icsbook.info

অধিকারী হবে।

মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, তার অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচার, নীতি-নৈতিকতা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার আচরণ কেমন হবে সবেরই পরিপূর্ণ গাইড রয়েছে আল কুরআনে এবং তার বাস্তব নিদর্শন বা বহিঃপ্রকাশ রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনে। এই দুয়ের অনুসরণ ও সতত অনুশীলনের মাধ্যমে আমরাও হতে পারি ইনসানে কামেল। সেই জন্যেই আজ প্রয়োজন আল কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, এবং বিজ্ঞান সব কিছুই পড়তে চাই সেই আলোকেত যার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হবে আমাদের নশ্বর জীবন। উপরন্তু পরিণামে লাভ করব আখিরাতের মহাপুরস্কার।

আমরা কী পড়ছি?

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীতি ছাড়া কোন জাতি উন্নতি ও প্রগতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য সর্বাংশে। মুসলমানদের জাতিসত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্য একটি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্রিটিশ আমলের ঔপনিবেশিক শিক্ষা থেকে মুক্তির জন্য পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান আমলেই মাওলানা আকরম খান শিক্ষা শিক্ষা কমিশন (১৯৫১), মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান শিক্ষাকমিশন (১৯৫৭), এ. এস. এম শরিফ শিক্ষাকমিশন (১৯৫৮), বিচারপতি হামুদুর রহমান শিক্ষাকমিশন (১৯৬৬), এয়ার মার্শাল নূর খান শিক্ষাকমিশন (১৯৬৯) গঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশনগুলোর কোনোটিই একজন খাঁটি মুসলমান তৈরির জন্য যা যা দরকার ছিল তা করার জন্য সুপারিশ পর্যন্ত করতে ব্যর্থ হয়।

ঐ সব কমিশনের রিপোর্টে ৩ বছর মেয়াদে ডিগ্রি কোর্স, ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক ভাষা, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদির উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে একজন শিক্ষার্থী কিশোরের ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা একজন পরিপূর্ণ মুসলমানে পরিণত হওয়ার কোন যথাযথ সুপারিশ ও কৌশল ছিল না। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এর নেতৃবৃন্দ ইসলামী সমাজ কায়েম তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহুবার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তথা সরকার নবীন এ রাষ্ট্রটিকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরের কোন উদ্যোগই নেননি। তারা যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতেন তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার ও পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তুলতে তৎপর হতেন।

পাকিস্তান আমলে যতটুকুও ইসলাম দেশের বহিরঙ্গে ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে সেটুকুও

www.icsbook.info

অবশিষ্ট রইল না। স্বাধীনতার পর পরই ইসলাম নির্মূলের প্রথম টার্গেট হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা' শব্দ পরিত্যাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনের আয়াত সম্বলিত মনোগ্রাম পরিবর্তন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বাহক হিসাবে রূপান্তরের জন্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকটি শিক্ষাকমিশন গঠন করেন। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৬), অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (১৯৭৯), ডঃ আব্দুল মজিদ খান রিপোর্ট (১৯৮৩), অধ্যাপক মফিজউদ্দীন জাতীয় শিক্ষাকমিশন (১৯৮৭), প্রফেসর শামসুল হক শিক্ষাকমিশন (১৯৯০) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (২০০০) এ উদ্যোগেরই ফসল।

এসব কমিশনের রিপোর্টে ও গৃহীত শিক্ষানীতিতে শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণের নামে পাশ্চাত্য ধারার ইসলামবিদ্বেষী শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমেরই অনুসরণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র জনরোষের ভয়ে তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থন হারবার ভায়ে কোন কোন কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামিয়াত বা দ্বীনিয়াত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত পক্ষে এসব কমিশনের যারা সদস্য ছিলেন তারা ইসলামী আকীদা বাস্তবায়নের জন্যে কেউই কমিটেড বা দায়বদ্ধ ছিলেন না। তাই তাদের রিপোর্টে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন না ঘটাটাই স্বাভাবিক।

তাহলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কী পড়ছি? আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠিত বিষয়সমূহ যেমন ইতিহাস, ভুগোল, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, এমনকি প্রকৃতি ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ইসলামবিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত এবং এসবের মাধ্যমে অনৈসলামী ভাবধারাই আমাদের তরুণদের মনে প্রবিষ্ট হয়েছে। ফলে তাদের বাহ্যিক পরিচয় যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে উঠছে পাশ্চাত্যেল খোদাদ্রোহী, ভোগবাদী, তাগুতি জীবনর দর্শনের এক একটি বাস্তব নমুনা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তা নিছক ইহজগৎকেন্দ্রিক। এই সীমিত গণ্ডিতে মানব জাতির অর্জিত সাফল্য বা ব্যর্থতাকে একটি বিশেষ মাদণ্ডে বিচার করা হয়। সেই মানদণ্ড তথাকথিত প্রগতিশীলতা অথবা প্রতিক্রিয়াশীলতার। এই মানদণ্ডেই ঘটনাবলির যৌক্তিকতা, অপরিহার্যতা ও সাফল্য বিচার করা হয়। শুধু তাই না, বিচারের মানদণ্ড হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা খুবই সুক্ষ্মভাবে অনসৃত হয়ে আসছে। এ কারণেই একজন মুসলমানের কাছে যা সাফল্য, একজন অমুসলিম ইতিহাসবিদের কাছে তা ব্যর্থতা বলে বিবেচিত হয়েছে। মুমিন বান্দার কাছে বস্তুগত সাফল্য মুখ্য বিবেচ্য নয়, তার কাছে বিবেচ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ।

অনুরূপভাবে সমাজবিজ্ঞান পাঠদানের ক্ষেত্রে ইহুদি পণ্ডিতদের মতবাদ সযত্নে শিক্ষা

www.icsbook.info

দেয়া হয়, অথচ বা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম, নৈতিকতা, বিবাহ, পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে খোদায়ী বিধান সমাজবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বেই পড়ানো হয় না। একইভাবে মনস্তত্ত্বে ফ্রয়েডের যৌন সম্পর্কীয় এমন সব মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যেগুলো ধর্মকে মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে না।

এজন্যই আমরা শিখছি মানুষের জীবন, তার অভ্যাস রীতিনীতি আবেগ চিন্তা এবং আচরণ পদ্ধতি তার পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশই এসব কিছু গঠন করে। এই মতবাদ ডারউইনবাদেরই সরাসরি প্রতিধ্বনি। আমরা বিনা প্রশ্নে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব পড়ছি। কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক সূত্র বা হাইপথেসিস রূপে সঠিক বা ভুল তা প্রমাণের জন্য নয়, বরং সন্দেহাতীত বাস্তব সত্যরূপেই তা আমাদের শেখানো হয় অথচ ডারউইনের মতবাদ তার জন্মের পর থেকে আজ অবধি বৈজ্ঞানিকদের সর্বসম্মত স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি, বরং পদে পদে তার ভুল ও প্রয়োগ অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়েছে।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো সকল বিষয়কে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে থাকে। এরই উল্টোপিঠে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পার্থিব জীবনের সকল বিষয়কেই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে। কিন্তু আমাদের অবস্থা না ঘরকা না ঘাটকা। পুঁজিবাদে আমাদের আস্থা কম, সমাজতন্ত্রেও আমাদের অবিশ্বাস। আবার একই সঙ্গে আমাদের স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জীবনের প্রয়োজনীয় দিকগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনার কোন সুযোগ নেই। কারণ আমাদের কোন লক্ষ্য নেই। ফলে ইহকালেও আমরা সফল হতে পারছি না, পরকালেও পুরস্কার ও কল্যাণের কোন নিশ্চয়তা নেই।

আধুনিকতার নামে, সেক্যুলার শিক্ষার নামে রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, গণিত, প্রকৌশল, ভেষজশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানকে খোদায়ী বিজ্ঞানের উৎস থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়া হয় প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং প্রকৃতিই তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। আর প্রকৃতির আইনই হচ্ছে স্বচ্ছ ও অলঙ্ঘনীয়। অথচ এই বিশ্বাস বা এর ওপর আস্থা রাখা চরম খোদাদ্রোহিতা। কিন্তু আমাদের লক্ষ লক্ষ কিশোর ও যুবকের এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল হওয়ার আদৌ কোন সুযোগ নেই।

উপরে যে অবস্থা তুলে ধরা হলো তা হল হিমশৈলের পানির উপরি ভাগের অংশ মাত্র। প্রকৃত অবস্থা আরো ভয়াবহ। আমাদের সমাজ জীবনের যে কোন দিকে তাকালে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে। আসলেই অনৈসলামী চেতনা ও ইসলামবিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য বা কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পাঠ দেয়া হচ্ছে তাতে কি করে আশা করা যায় যে আমরা বা আমাদের বংশধররা প্রকৃত মুসলিম রূপে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসবে?

www.icsbook.info

আমরা কী পাচ্ছি?

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারা আছে একটি সাধারণ শিক্ষা, অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা। দেশের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিতদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জীবিকার তাগিদে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে পাঠ নেয়। ফলে এ প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে তারাও এর রঙে রঙিন হয়। তাই যতদিন আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি পাঠ্য বিষয়ে ইসলামবিরোধী প্রচারণা ও তাগুতি শক্তির পৃষ্ঠপোষকাত ও সেই ভাবধারার পরিপুষ্ট হওয়ার আয়োজন অব্যাহত থাকবে ততদিন আমরা প্রকৃত মুসলমান রূপে গড়ে উঠার আশা করতে পারি না।

এদেশের পাঠ্যবস্তুতে ইসলামীবিরোধী স্রোত এতই প্রবল যে বিপরীতমূখী এই প্রচণ্ড স্রোতের মুখে স্কুল জীবনে পড়া একশ নম্বরের ইসলামীয়াতের শিক্ষার কোন তাৎপর্যই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আমরা গ্রীক, রোমান, ব্যবলনীয়, আসেরিয়ি ও মিসরীয় সভ্যতাগুলোর বাদে লিপ্ত হই সেগুলি ইসলামী সভ্যতার চাইতে অধিকতর উন্নত ও পরিশীলিত হিসাবে। সেগুলি আমাদের প্রায় নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। এরই বিপরীতেক মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের কালজয়ী অবদান, সমাজ গঠনে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের যে মৌলিক শিক্ষা এবং নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে অনন্য ভূমিকা তার স্বীকৃতি দিতে আমরা কুণ্ঠিত। এমনকি আধুনিক (?) শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই এ সম্পর্কে অজ্ঞ বললেও খুব বেশি বলা হবে না। এ পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা কী পাচ্ছি তা সমাজের দিকে তাকালেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আজকে শিক্ষিত যুবকেরা কুরাআনি শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার কারণে সমাজে ধ্বংসের ধস নেমেছে। চরিত্রের মাধুর্য ও পবিত্রতা আজ এক দুর্লভ ব্যাপার। একই সঙ্গে মানসিক ব্যাধি, মাদকাসক্তি, পিতা-মাতার প্রতি অযত্ন, সমাজের বঞ্চিতদের প্রতি অবজ্ঞা, এবং ধর্মীয় অনুশাসন পালনের প্রতি অমার্জনীয় অবহেলা বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থারই কুফল। এ প্রসঙ্গে এদেশের অন্যতম মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কথা স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন -Reading Writiing and Arithmatic- এর সঙ্গে যদি Religion এর পাঠদান না হয় তাহলে পরিণামে জন্ম হয় Rascal-এর। কথাটি যে কতখানি দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন তা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ আমাদের শেখানো হচ্ছে, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের কথা প্রচার করা হয় না কিংবা ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা হয় না সেই শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। অথচ কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষাই মানুষকে তার প্রভুর নিকট জবাবদিহিতার এবং তার নির্দেশিত পথে চলবার ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে পারে। আমাদের পাঠ্যক্রমে পশ্চিমা মতবাদসমূহের আধিক্য এত বেশি এবং সেগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অনুসৃত কৌশল এতে দুরভিসন্ধিমূলক ও

www.icsbook.info

সুদূরপ্রসারী যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল থাকলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের উর্ননাভের এই জাল থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই। আমাদের মত গরিব দেশের দুর্বল চিত্তের শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোনক্রমেই তা সম্ভব নয়।

আমরা কী চাই?

এখন তাহলে করণীয় কী? উপরের আলোচনা থেকে যে চিত্র পাওয়া গেল এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একমাত্র উপায় শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগ ও ব্যবহার। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে:

১. শিক্ষার্থীদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল করে গড়ে তোলা।

২. পরকালের জীবনের প্রতি তাদের বিশ্বাসী করে তোলা এবং পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসাবে গ্রহণ করার জ্ঞান সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ একই সঙ্গে আল্লাহর দাস ও প্রতিনিধি এই চেতনা সৃষ্টি করা।

৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ইসলামী বিশ্বাস ও নীতির আলোকে গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৫. রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন পেশার জন্যে উপযুক্ত খোদাভীরু ও নৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোক তৈরি করা।

উপরের বিষয়গুলোকে মনে রেখে আমাদের যথোপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে আমরা যে তিমিরে রয়েছি সেখান থেকে উঠে আসার কোন পথ নেই। এজন্যে শিক্ষার যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে সে স্তরভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণ করাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে এ বিষয় সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এই স্তরগুলোই হলো মানুষ গড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়কে অবহেলা করলে আর কোন পদক্ষেপই কাঙ্খিত সুফল বয়ে আনবে না।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রকৃত যুগোপযোগী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা হলো প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি নির্ধারণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চূড়ান্ত ও যথাযথ ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা যে ঘূর্ণাবর্তে আছি সেইখানেই রয়ে যাব। বরং আশংকা রয়েছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার। স্বাধীনতার ত্রিশ বছরেও এই প্রশ্নের সমাধান না হওয়ার কারণেই আজও জাতির দুর্দশা কমেনি বরং বেড়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকার জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ খ্রিষ্টান। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা একই সঙ্গে পুঁজিবাদের অনুসারী ও খ্রিষ্টের শিক্ষা বাস্তবায়নে তৎপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অংগরাজ্যে এজন্যেই ডারউইনের মতবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ। আবার অনেক অংগরাজ্যে এই শর্তে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় যে পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্ববাদও পড়ানো হবে। শুধু তাই না। যীশু খ্রিষ্ট সম্পর্কে কোন ব্যঙ্গোক্তি বা কটাক্ষমূলক রচনা সে দেশের

www.icsbook.info

আইনত দণ্ডনীয়। অথচ মুসলিম বিশ্বের বহু দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ মহানবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কটূক্তি বা ব্যঙ্গরচনা লিখলেও শাস্তির কোন বিধান নেই। ইংল্যাণ্ডের মত সভ্যতাগর্বিত দেশে ব্লাসফেমি আইনে যীশুকে রক্ষা করা হলেও আর কোন নবী, এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটিরও রক্ষা পাননি। আইনের এই দ্বিচারিণী ব্যবহার নিন্দারও অযোগ্য।

সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্র ও গণচীনসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সকল পর্যায়সহ শিক্ষার সকল স্তরে নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতাকে সযত্নে লালন করা হয়। সে দেশের কোন শিক্ষার্থীর কাছে জাতীয় সমস্যা ও যুগজিজ্ঞাসার সমাধান জানতে চাইলে তারা নির্দ্বিধায় উত্তর দেবে সমাজতন্ত্রেই তাদের সব প্রশ্নের সমাধান নিহিত আছে।

কিন্তু আফসোস! এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রাধারী কোন ছাত্রের কাছে এই একই প্রশ্ন করলে তার উত্তর হয় সংশয়পূর্ণ, দ্বিধান্বিত ও অসম্পূর্ণ। কারণ সে মুসলমানের ছেলে হলেও ইসলামকে জানে না, পুঁজিবাদী চিন্তাচেতনায় সে আচ্ছন্ন এবং এককালের সমাজতন্ত্র তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তার নিজের কাছে জীবনের দর্শন সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা নেই। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এজন্যে আজ আমাদের দাবি হলো :

ক. শিক্ষা আদর্শিক ভিত্তি হবে ইসলাম এর সপক্ষে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান;

খ. জ্ঞানের ইসলামীকরণ

গ. শিক্ষাব্যবস্থা হবে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক

ঘ. শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে পরিকল্পিত।

ঙ. শিক্ষার লক্ষ্য হবে অভিন্ন ও একমুখী

চ. শিক্ষা হবে সার্বজনীন ও বৈষম্যহীন এবং

ছ. শিক্ষার জন্যে চাই আদর্শ পরিবেশ।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, শিক্ষার বহু ক্ষেত্রে আমরা পেছনে পড়ে রয়েছি। বিশেষ করে অবকাঠোমো, প্রযুক্তি ও উপকরণের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কিন্তু এসব সমস্যার চাইতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক লক্ষ্যহীনতা। স্বাধীনতার ত্রিশ বছরে এ ব্যাপারে আমরা এক পাও এগুইনি। এর আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। আমাদের দাবি ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন ও গণজোয়ার গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জিহাদী প্রেরণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেটাই এখন সময়ের দাবি।

লেকখ : প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতা ও আমাদের প্রত্যাশা

নূরুল ইসলাম বুলবুল

ভূমিকা

শিক্ষা হচ্ছে সভ্যতার বাহন, উন্নয়ন অগ্রগতির বাহন। পরিকল্পিত, কর্মমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা জাতিগঠনের জন্য অপরিহার্য। যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের অধিকাংশ মানুষের নৈতিক ধর্মীয় মূল্যবোধকে ভিত্তি করেই প্রণয়ন করা হয়। বরাবরই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল হিসেবেই একটি প্রশিক্ষিত জাতি গড়ে ওঠে কিন্তু দুঃখজনকভাবে স্বাধীনতার পরবর্তী এ দীর্ঘ সময়ে আমাদের দেশে কোন পরিকল্পিত স্থায়ী ও কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে তাতে দেশের অধিকাংশ মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের কোনই প্রতিফলন ঘটেনি। সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রস্তাবিত প্রণীত শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন বন্ধ থেকেছে, গঠিত হয়েছে নতুন নতুন শিক্ষা কমিশন। ফলে এদেশের জনগণ ব্যক্তিগতভাবে ও জাতিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি বাধাগ্রমবদ হয়েছে। আমরা যা পড়তে চাই আর আমরা যা পড়ছি এবং এর বিষময় ফল হিসেবে আমরা যা পাচ্ছি তা হচ্ছে চরম বাস্তবতা। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অন্য কিছু আশা তেমনই অবান্তর যেমনি অবান্তর আমড়া গাছ থেকে আম পাবার প্রত্যাশা।

আমরা কি পড়তে চাই ?

আমরা কি পড়তে চাই ? যা পড়ার জন্য আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মু'মিন হিসেবে, একজন সচেতন যুবক হিসেবে, ছাত্র হিসেবে আমরা সেটাই পড়তে চাই। اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ (সূরা আলাক-১) 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি

www.icsbook.info

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। অর্থাৎ রব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে চাই। আমরা রবকে জানতে চাই এবং তার আলোকে আমরা দুনিয়াকে জানতে চাই। নবী করিম (সা) বলেছেন 'বুয়িসতু লি উতিম্মা মাকারিমাল আখলাক্ব'। উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিকাশের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। 'বুয়িসতু মুয়ালিয়ান' আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। শিক্ষক হিসেবে রাসূল (সা) মানুষের চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং আমরা তাই পড়তে চাই যা উত্তম চরিত্র বিকাশ সাধনে প্রয়োজন। আমারা তাই পড়তে চাই যা মানুষের বিবেককে বিকশিত করে তাকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهٗ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(সূরা জুমআ-২) অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলকে প্রেরণের যে উদ্দেশ্য এখানে বলা হয়েছে তাদেরকে আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাবেন, মানুষকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে বিজ্ঞান-কৌশল শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ রাসূলকে (সা) মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মানুষের সামগ্রিক পরিশুদ্ধির জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, এই দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মৃত্যুর পরের জীবনে আল্লাহর সামনে নিজেকে মুমিন হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য যে শিক্ষার মিশন দিয়ে আল্লাহর রাসূলকে (সা) এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল আমরা সেই শিক্ষাই পেতে চাই।

পবিত্র কুরআন এক মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এখানেই রয়েছে বিজ্ঞানের মৌলিক দিকনির্দেশনা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতই তার সাক্ষ্য বহন করে। যেমন

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَان

(সূরা আর রাহমান : ১৯-২০) অর্থাৎ তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করে না-এটা আজ প্রমাণিত সত্য। আমরা কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানকে জানতে চাই।

মহান রাব্বুল আলামিন আরো বলেছেন, 'ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়াতিলা ফিল লাইলি ওয়ান নাহারি লা আয়াতিল লি উলিল আলবাব। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সব সৃষ্ট বস্তুর মাঝে দিন ও রাতের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন'। অর্থাৎ কুরআন আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে প্রাকৃতিক উপায় উপাদান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। তাই আমরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চাই যা আমাদেরকে শিক্ষা দেবে সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। কুরআন হচ্ছে এক মহাবিজ্ঞান। ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত সমস্ত জ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, ভূগোল, আকাশ এবং পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ অন্যান্য সমস্ত প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান) আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে এবং রাসূল (সা) দেখানো পন্থায় আমরা জানতে চাই।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام

(সূরা জারিয়া-১৯) অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ আরো বলেন- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

www.icsbook.info

(সূরা মায়েদা-৩) অর্থাৎ 'আজ আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম, আমরা আজকের লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে জানতে চাই যে ইসলাম সত্যি সত্যিই পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রত্যেকটি দিক এবং বিভাগে ইসলামের সমাধান রয়েছে, এই শিক্ষাই আমরা আমাদের লেখাপড়ার মাধ্যমে অর্জন করতে চাই। আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (সূরা জারিয়া-৫৬) অর্থাৎ 'আমি জিন এবং ইনসানকে ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। কী করলে প্রত্যেকটি কাজ ইবাদত হবে এবং কী করলে প্রকৃত অর্থে দাসত্ব করা যাবে' আমরা সেটাই জানতে ও বুঝতে চাই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে।

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْخَلِيْفَة অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব, আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? সেটি আমরা জানতে চাই। ''কুল্লু নাফসিন জায়িকাতুল মাওত" প্রত্যেক জীবনকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। মৃত্যুর পরের জীবন কী? আখেরাত কী? এই জগতের সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মৃত্যুর পূর্বে কী করা প্রয়োজন, মানুষের জীবনের প্রকৃত সফলতা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব আমরা তা জানতে চাই, পড়তে চাই।

আমরা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে জানতে চাই যে মানুষকে আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের উপযোগী করে একটি মধ্যমপন্থী উত্তম জাতি গঠনের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে মহান রাব্বুল আলামিন আল কুরআন নাজিল করেছন।

''জালিকাল কিতাবু লারাইবাফিহি"। এ কিতাবে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই আল কুরআনের পরিচয় কী? সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্দেশকারী। "হুদাল লিন্নাস ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হদা ওয়াল ফুরক্বান"- এটা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক, হেদায়াতকে সু-স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা সত্য জানতে চাই। হেদায়াতের পথ পেতে চাই। মিথ্যা প্রতারণা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এজন্য কুরআনকে আমরা পরিপূর্ণরূপে জানতে চাই।

কুরআন সম্পর্কে আমরা আরো যা জানি তা হচ্ছে : "মা আনযালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাসক্ব"-আমি আপনার প্রতি এই জন্য কুরআন নাযিল করিনি যে আপনি কষ্ট অনুভব করবেন। এ থেকে বুঝতে পারি কুরআন আমাদের ওপর এসেছে কল্যাণের পথ বাতলে দিতে, সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা কুরআন থেকে পরিপূর্ণ কল্যাণ পেতে চাই। ''হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমিকে স্বাধীন, সার্বভৌম ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য যে চেতনার প্রয়োজন, সাহসিকতা ও দেশ প্রেমের প্রয়োজন তা জাগ্রত করতে যে শিক্ষার দরকার, আমরা তাই শিক্ষাতে চাই, পড়তে চাই।

www.icsbook.info

শিক্ষার সংজ্ঞা

Education শব্দটি বাংলা শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় Pack the information in and draw the talents out' মূলত এর অর্থ অবগতি বা জ্ঞান প্রদান এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ । বস্তুত 'মানুষকে মানুষ বানানোর আয়োজনই শিক্ষা' ।

মহাকবি মিলটন বলেছেন, Education is the hermonious development of body, mind and soul অর্থাৎ 'শরীর মন ও আত্মার সুসমন্বিত উন্নয়নই শিক্ষা' । অক্সফোর্ড ডিকশনারি মতে, Education is a process of teaching, training, and learning to improve knowledge and develop skills'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দি রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে বলেছেন, মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'যাহা মানুষকে মুক্তি দান করে তাহাকেই শিক্ষা বলে' ।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব ''কনসেপ্ট অব ইসলামিক এডুকেশন" প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানবদেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা তার বস্তুগত আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিও পরিত্যাগ করে না। আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না'। তাহলে আমরা এক বাক্যে বলতে পারি শিক্ষার লক্ষ্য মানসিক উৎকর্ষ সাধন।

আলবার্ট সিজার Teaching of Reference for life গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, Three kinds of progress are significant. These are progess in knowledge and tenhnology, progress in socialization of man and progress in sprituality. The last one is the most important. তার ভাষায়, আধ্যাত্মিকতার বিকাশই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের আত্মার বিকাশ, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, মানসিক বিকাশ।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে Declaration of Human এ বলা হয়েছে "Education shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations.'' অতএব এ কথা আমাদের কাছে পরিষ্কার একজন মানুষকে দৈহিক, মানসিক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণরূপে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলায় শিক্ষার লক্ষ্য ।

www.icsbook.info

১. ধর্মীয় শিক্ষার নামে সংক্ষিপ্ত অংশকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

আমরা যা পড়ছি তাতে দ্বীনিয়াত নামে ইসলামের একটি আংশিক শিক্ষা জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্ম তো হচ্ছে একটি সামগ্রিক ব্যাপার, একটা পরিপূর্ণ ব্যাপার। ইসলাম ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক নয়, বৈষয়িক ব্যাপারসহ একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে তুলনা করার সুযোগ নাই।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْناً

(সূরা আল মায়েদাহ-৩) অর্থাৎ 'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম'। অথচ আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে আছি সেখানে ইসলামের ছোট্ট একটি অংশকে লেখাপড়ার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে এখানে ইসলাম আছে।

২. সৃষ্টিকর্তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়নি

নব্বইভাগ মুসলামানের এই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষার কোথাও সৃষ্টিকর্তার তথা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়। এখানে শিক্ষা দেয়া হয় ঋষি পূজায় বসিল, কণা বীণ বাজায়, উষা গান গায়- আরো কত কী। যদি ইসলামী ভাবধারায় এই শিশু সাহিত্য গড়ে ওঠে তখন বলা হয় মৌলবাদী বানানো হচ্ছে। অথচ নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষায় ধর্ম এমন এক আবশ্যিক বিষয় যে A. N. Whitehead বলতে বাধ্য হয়েছেন যে 'শিক্ষার সার কথা হবে ধর্মীয়'।

১৯৪৪ সালে যুক্তরাজ্যে ধর্ম শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা এছাড়া সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ আমরা ধর্ম শিক্ষাকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করছি।

Education নিবন্ধে encyclopedia (১৯৭৬) মন্তব্য করেছে: Many found religion essential for the U.S.A stability and progress .

মহাকবি ইকবাল বলেছেন 'সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা আমার নৈতিক অধিকার আমার জন্মগত অধিকার।' আজ সেই অধিকার; আমাদের নেই।

Stanly Hull বলেছেন, If you teach your children three R'S reading, writing and arithmetic and leave the fourth R that is religion then you will get a fifthe R that is rascality .

আল্লামা ইকবাল এজন্যই বলেছেন- 'ধর্মহীন রাজনীতি চেঙ্গিস খানের বর্বরতাকেও হার মানায়। জয়নাল হাজারী, হাসনাত আব্দুল্লাহ, হাজী সেলিম আর শামীম উসমানদের মতো গডফাদারের নৃশংস ভূমিকায় প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের রাজনীতি ধর্মহীণ হওয়ার কারণে চেঙ্গিস খানের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে।

www.icsbook.info

ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন : Religion has the right place on the formation of right motives (1956)

আধুনিক বিজ্ঞানের জনক আইনস্টাইন বলেছেন, ''ধর্মহীন বিজ্ঞান খোঁড়া, বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ" ইসলাম কোন খোঁড়া ধর্মের নাম নয়। জ্ঞান--বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামিনের কুদরাতে আল কুরআন ও ইসলাম ধর্মের যথার্থতা নতুন নতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। মহান রাব্বুল আলামিন নিজেই কুরআনকে বিজ্ঞানময় বলে উল্লেখ করেছেন। (সূরা ইয়াসিন : আয়াত ২) একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ধর্ম ও বিজ্ঞানকে বিপরীতমুখী করে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। এর জবাব দিয়েছেন ফ্রান্সের পণ্ডিত মসিউর্মিউব । তিনি বলেছেন, ''ইসলামকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে তারা আল কুরআন অধ্যয়ন করেনি" ।

৩. পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রণীত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আছি। অথচ পাশ্চাত্য যখন তাদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলছে তখন আমরা আবার সেদিকে দৌড়াচ্ছি। সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বলছি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. ইসমাইল রাজী আল ফারুকী বলেছেন, ''তথাকথিত মানবিক বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা বিভিন্ন দেশে যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা মানবিক বিষয় নয় বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়বস্তু ও উপকরণ যেগুলোর সাথে মুসলমানদের চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশের সংগতি ও সম্পর্ক নেই।"

The State of Education in this Troubled World বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে ওয়ালটার লিপম্যান বলেন যে, "স্কুল-কলেজসমূহের ছাত্ররা নীতিশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।" আমরা এই ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতা অনুসরণের মাধ্যমে তথাকথিত সভ্য হবার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ইউনেস্কোর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জীন টমাস বলেন, "আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে একটি Artificial barrier between education and society, between educational institutions and life.' (UNESCO Press, Paris 1975 P-104)

অধ্যাপক হ্যারল্ড টিটাসের মতে, ''বর্তমান শিক্ষায় আদর্শ ও প্রত্যয়ের অনুপস্থিতির ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ লাভ থেকে বঞ্চিত।"

১৯৮০ সালে ইউনেস্কো সম্মেলনে একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে সে দেশের ধর্ম সামাজিক মূল্যবোধ এবং নীতি বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

প্রচলিত শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি কী ?

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তা বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা থেকেই উগ্র জাতীয়তাবাদ,

www.icsbook.info

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্য। এই চেতনার কারণে এ দুনিয়া ও মৃত্যুর পরের জীবনে কোন দায়বদ্ধতা নেই, জবাবদিহিতা নেই এমন মানসিকতা সম্পন্ন এক শ্রেণীর মানুষ নামের জীব তৈরি করার কাজ করছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্বজাহানের সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার ওপরেই নীতি-নৈতিকতা, দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি নির্ভর করে। ফলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার জীবনকেই শেষ জীবন, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই, কারো কাছে কোন জবাবদিহির প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। এজন্যই তারা 'Eat, Drink and be Merry,' 'খাও দাও ফুর্তি কর, নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক' দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। ভোগ-বিলাস, স্বার্থ চরিতার্থ এবং জাগতিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। কারণ নীতিবোধ জবাবদিহিতাবোধ ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে মানুষের মানবিক বৃত্তিকে বিকশিত করার কোন উপাদান এখানে নেই।

উপমহাদেশে শিক্ষা নিয়ে ষড়যন্ত্র

এই উপমহাদেশে শিক্ষার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছে তার শেকড় অনেক গভীরে। লর্ড ম্যাকলে ১৮৩৫ সালে উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন তা থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে। "We must at present do our best to from a class, who may be interpreters between us and the million whom we govern a class of persons indians in blood and colour but English in taste in opinion in morals and in intellect 'বর্তমানে আমাদেরকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায় যারা আমাদের ও লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের আমরা শাসন করছি তাদের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারে। এরা এমন এক ধরনের মানুষ হবে যারা রক্তে বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা চেতনা ও মনমানসিকতায় নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।'

১৮৩১ সালে উইলিয়াম হান্টার বলেছেন, ''মুহাম্মদীদের একটি নব্য বংশধর আমাদের তৈরি করতে হবে যারা তাদের সংকীর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত নয় বা তাদের মধ্যযুগীয় আইন শাস্ত্রের তিক্ত কার্যাবলি দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় বরং তারা পাশ্চাত্যের বিচক্ষণাতাপূর্ণ ও শান্ত জ্ঞানরসে সিক্ত।

১৮৭১ সালে তার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলিমানস' গ্রন্থে বলেছিলেন ''এ ভাবেই শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুহাম্মদী যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে তাদের ধর্মে কোন রকম হস্তক্ষেপ না করেই এবং তাদেরকে ধর্মীয় দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দিতে দিতে আমাদেরকে ঐ ধর্মকে সম্ভবত কম আন্তরিকতাপূর্ণ করে হলেও অবশ্যই কম গোড়া করে ফেলতে হবে।"

তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার কোন শক্তিশালী উপাদানটিকে বাদ দিলে

www.icsbook.info

মুসলিমদের নির্জীব করে পোষ মানানো যাবে সে ব্যাপারেও উইলিয়াম হান্টার বলেছেন যে, `It is more than doubtful whether the muhammadan law should be taught as a regular study incumbent in all. it certainly should not be made the chief object instruction . for the muhammadan law means the muhammadan religion that religion too. At a time when its followers looded upon the whole earth as t heir lawful pray and before they had learned the duties of modern musalman states in alliance with or in subjection to a christian governmenta.... ভাবানুবাদ : মুহাম্মদী আইন সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয়া উচিত হবে কিনা, এটা শুধু সন্দেহজনক নয় তার চেয়েও বেশি। এটা অবশ্যই শিক্ষার প্রধান বিষয় করা যাবে না। কারণ মুহাম্মদী আইনই হচ্ছে মুহাম্মদী ধর্ম, সেই সময়কার সেই ধর্ম যখন এর অনুস-ারীরা সমস্ত পৃথিবীকে তাদের আইনসম্মত শিকারের বস্তু হিসেবে দেখত এবং যখন পর্যন্ত তারা শিখে ওঠেনি খ্রিষ্টান সরকারের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ বা অধীনস্থ মুসলিম রাষ্ট্রের কী দায়িত্ব।

ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার টার্গেট ছিল মুসলিমরা যা শিখতে চায় তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা। মুসলমানরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না যে পড়ালেখা করতে চায় না তা অর্জন করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। উইলিয়াম হান্টার এজন্যই সম্ভাব্য করেছেন যে, বৃটিশরা বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছে কিন্তু মুসলমানরা কখনই সে সব স্কুল কলেজের দিকে আকর্ষণ বোধ করেনি। এ ব্যাপারে হান্টার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

১. ফার্সি ও আরবি ভাষার পরিবর্তে তদানীন্তন বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ ও তাতে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে।

২. মুসলমানদের জীবনের মর্যাদা ও স্বীয় ধর্মের চর্চা ও অনুশীলনসমৃদ্ধ ভাষা ও বিষয়বস্তু বঞ্চিত। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। মুসলমানদের মর্যাদাবৃদ্ধি করবে তাদের চেতনা বৃদ্ধি করবে এমন পাঠ্যক্রম সেখানে রাখা হয়নি। এবং

৩. মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষা করা হয়েছিল।

এই তিনটি কারণে মুসলমানরা সেই সময় বৃটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বৃটিশরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যাতে ইসলামের অনুসারীরা শিক্ষার দিকে থেকে পেছনে থাকে। লর্ড ম্যাকলে স্বীকার করেছেন `We Are withholding from them the learning for which they are craving, we are forcing on them the much-learning which they now seek.' এরা (মুসলমানগণ) যা শেখার জন্য উদগ্রীব তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করছি। আর যা তাদের ঘৃণার উদ্রেক করে তা বহুল পরিমাণে শিক্ষার জন্য বাধ্য করছি।

এরপর ভারত বিভক্ত হয়েছে, পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল ইসলাম

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, কিন্তু এমন কোন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি যাতে প্রকৃত অর্থে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকূলে উন্নত ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা চালু না করার কারণে দুই এলাকার প্রজন্মের মধ্যে, মানুষের মধ্যে মানসিক ঐক্য গড়ে তোলে নাই। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যাওয়ার যতগুলো কারণ রয়েছে মানসিক ঐক্য গড়ে না ওঠা তার অন্যতম কারণ। এই মানসিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী ধর্মীয় বন্ধন, এ বন্ধনের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি আধুনিক ও সমন্বিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এখানেও ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক যে কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অমুসলিমপ্রধান, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, আগ্রাসনবাদী ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তাদের পরামর্শের আলোকে তৈরি রিপোর্টের মাধ্যমে মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের ওপর ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা চাপানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেননি। কিন্তু আফসোস বাংলাদেশের মত একটি দেশে এখন পর্যন্ত কোন স্থায়ী শিক্ষানীতি গড়ে ওঠেনি। কোন আদর্শিক ভিত্তিকে সামনে রেখে কোন শিক্ষানীতি গড়ে ওঠেনি। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষাকমিশনে শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ,ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে সেটিকেই বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করেছে ১৯৯৬-২০০১ সালে আবারও আওয়ামী লীগ সরকার। অথচ তখনও বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ ছিল। সেই মূলনীতিকে উপেক্ষা করে শামসুল হক শিক্ষাকমিশন ২০০০ সালে যে রিপোর্ট পেশ করেছে নিঃসন্দেহে সেই রিপোর্ট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবিলম্বে সেই রিপোর্ট বাতিল এবং নতুন শিক্ষাকমিশন গঠন করার দাবি উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। ২০০৮ সালের ডিজিটাল কারচুপির নির্বাচনের মাধমে ক্ষমতায় এসে কবীর চৌধুরী শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে আবারো দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ধর্মহীন ও সংবিধান বিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে। ইতোমধ্যেই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা কি পাচ্ছি ?

এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আমরা যা পাচ্ছি-

১. নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ছাত্র ও যুবসমাজ

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার কারণে দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ অনৈতিকতার সয়লাবে হাবুডুবু খাচ্ছে। পাশবিকতার দমন ও মানবিকতার বিকাশের

www.icsbook.info

মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হওয়ার কোন উপকরণ প্রচলিত শিক্ষায় নেই কিন্তু নৈতিকতা ধ্বংস করার আয়োজন আজ সম্পন্ন তাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের শতপূর্ণ উৎসব করার পরও ধর্ষকরা পুরস্কৃত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্টিফার্স্ট নাইটে বাঁধনদের বস্ত্র হরণ হয়। তথাকথিত আধুনিকতার নামে ছাত্রছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা তাদের চরিত্রকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে ছিনতাই, অপহরণ, মুক্তিপন আদায়, ফেন্সিডিল, হিরোইন, গাঁজা, মদসহ সার্বিক অনৈতিকতা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার করুণ বাস্তবতা। এটি অতুক্তি নয় যে বাংলাদেশের ছাত্রনেতাদের অনেকেরই হাতে পিস্তল এবং পকেটে ফেনসিডিল পাওয়া যায়। এই শিক্ষা নৈতিকতা বিবর্জিত মূল্যবোধহীন এক শ্রেণীর প্রাণী ছাড়া আর কিছুই তৈরি করতে পারছে না এবং পারবেও না।

২. শিক্ষাঙ্গনে লেখা পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই

শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। সন্ত্রাস আজ এক মরণব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। চর দখলের মত হল দখল ও সিট দখলের প্রতিযোগিতা চলছে। আধুনিকতার নামে ছেলেমেয়েদের অবাদ মেলামেশা ছাত্রছাত্রীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। থার্টিফার্স্ট নাইট ও লিভ টুগেদারের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রসারিত হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সাথে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক নামে কলঙ্ক নরপশু পরিমলদের মাধ্যমে ছাত্রীরা নিপীড়িত হচ্ছে। ছাত্ররা শিক্ষকদের হত্যা করছে। ছেলেরা মাকে হত্যা করছে, বাবাকে প্রহার করছে, আজকের শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত যুবকেরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা পাঠদান নয় ব্যক্তিগত উপার্জনেই ব্যস্ত। আত্মীয়করণ দলীয়করণ ও তোষামোদীর মাধ্যমে ফলাফলেও কারচুপি চলছে।

৩. বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত আমরা

কর্মমুখী শিক্ষার অভাব। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারার কারণে দুই কোটি শিক্ষিত বেকার। শিক্ষার সাথে পেশার সামঞ্জস্য নেই। বেকার যুবকরা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সমাজকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

৪. আইনশৃংখলার অবনতি

মানুষের জানমাল ইজ্জত আব্রুর কোন নিরাপত্তা নেই। রক্ষক আজ ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। আইন শৃংখলার মারাত্মক অবনতি, পারস্পরিক বিভেদ বিশৃঙ্খলা সমাজকে বিষময় করে তোলেছে। ৬ বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা আজ অহরহ। সবচাইতে দুর্ভাগ্যজনক আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত বাহিনীর কোন কোন সদস্যদরে হাতে কলেজ ছাত্র লিমনের পঙ্গুত্ব বরণ, ঢাবির মেধাবী ছাত্র আব্দুল কাদের নির্যাতনের ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। এমতাবস্থায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা উঠে গিয়েছে। যার কারণে জনগণ আইন হাতে

www.icsbook.info

তুলে নিচ্ছে। আমিনবাজার ট্রাজেডি ও নোয়াখালী ট্রাজেটি দেশবাসীকে হতবাক করেছে। ডাকাতির অজুহাতে আমিনবাজারে ৬ জন ছাত্রকে এবং নোয়াখালিতে ৬ জন মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। রিমান্ডের নামে চলছে বরবর নির্যাতন। শিক্ষাব্যবস্থার চরম দেউলিয়াত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর পেশাগত ও নৈতিক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততাও কম দায়ী নয়।

৫. মেধা পাচার

দেশ হতে ব্যাপকভাবে মেধা পাচার হচ্ছে, ছাত্ররা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। ডিগ্রি অর্জনের জন্য গিয়ে দেশে ফিরে আসছে না। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব দেশে গিয়ে অপসংস্কৃতির প্রভাব ও তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়ায় নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিচ্ছে।

৬. দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা বেড়েই চলেছে

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বচ্যনম্পিয়ন । প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি আজ জেঁকে বসেছে। দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও জন্ম হয়েছে। ভোট চুরি, কারচুপি ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট ডাকাতি এবং ভোট কেনাবেচার মাধ্যমে যেকোনভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার মানসিকতা প্রবল। ডজন ডজন অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি কিনেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পড়ালেখা করে যদি ডিগ্রি নিতে হত তবে একটি ডিগ্রিও হয়তো ভাগ্যে জুটত না। যার কারণে আর পড়ালেখা করার দরকার নেই আমাদের ছাত্রদের। দেশে চলছে নকলের মহোৎসব যা' ৭২ স্টাইলকেও হার মানিয়েছে।

৭. আদর্শিক দায়বদ্ধতার অভাব

কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি আজ আর কেউ ওয়াদাবদ্ধ থাকছে না। আজ এক পার্টি, কাল আরেক পার্টি। সকালে এক বিকালে আরেক। মহাসমারোহে যোগদান আর সংবর্ধনার হিড়িক। এ যেন এক Political sporting club. আদর্শিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন নয়, ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ ও ক্ষমতা লিপ্সাই মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৮. জাতিকে বিভক্ত করা

ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন সময়ের সবচাইতে বড় দাবি। অত্যন্ত সুকৌশলে এদেশের জনগোষ্ঠীকে দ্বিধা বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বস্তরের জনগণের মানসিক ঐক্য তথা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা । কিন্তু স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষে ধুয়া তুলে জনগণকে মুখোমুখি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ করলেই মুক্তিযোদ্ধা আর না করলেই রাজাকার। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হওয়ার পরও মেজর জলিল রাজাকার! কারণ তিনি ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, গর্জে উঠেছিলেন আওয়ামী অপকর্মের বিরুদ্ধে, গঠন করেছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং পরবর্তীতে অকপটে

www.icsbook.info

বলেছিলেন, 'সমাজতন্ত্র মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, মানুষের মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম'। ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গি, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে দেশের অগ্রগতিকে ব্যনহত করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক ও নভেল নাটকে আর প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে জাতিবিভক্তির প্রচেষ্টা চলছে অবিরাম।

৯. ইতিহাস বিকৃতি

মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই দেশে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস জানার কোন সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেও দলীয়করণ করা হয়েছে। ৪০ বছরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়নি। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হয়নি। একটি দল মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় ক্রেডিট হাইজ্যাক করতে চায়।

১০. নতুন প্রজন্ম দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত

ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে দু'টি শ্রেণীর জন্ম দেয়া হয়েছে। তারা না পারছে ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে জানতে, না পারছে আধুনিক উন্নত শিক্ষা অর্জন করতে, আর না পারছে এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে। পরকালবিমুখ দুনিয়াপূজারী একদল মানুষ ছাড়া আর কিছুই তৈরি হচ্ছে না।

ইসলামী শিক্ষা বলতে কী বুঝায় ?

ইসলামী শিক্ষা বলতে মাত্র কুরআন হাদিস আর কিছু মানতেক শিক্ষা দেয়া বুঝায় না। যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরা হয়, তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিককে ইসলামীকরণ করা।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি সে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে

১. আল্লাহর পরিচয় ও অধিকার সম্পর্কে জানা যায়।

২. আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত হওয়া যায়।

৩. আল্লাহ ও তার সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের ব্যাপারে জানা যায়।

৪. মানুষের পরিচয় জীবন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত হওয়া যায়।

৫. জীবন ও জগতের সমস্ত কর্তব্যের যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

৬. সৃষ্টি জগৎ ও মানুষের কাজের ফলাফল সম্পর্কে জানা যায়।

এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পার্থক্য যাই হোক না কেন উপরোক্ত মৌলিক বিষয়গুলো জানার সুযোগ যেখানে পাওয়া যাবে তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হতে পারে।

শিক্ষার মূলনীতি ও আদর্শিক ভিত্তি কী হওয়া উচিত?

১. আল্লাহর পরিচয় : আল্লাহর এক ও অদ্বিতীয়

www.icsbook.info

শিক্ষার মূলনীতি হতে হবে আল্লাহর পরিচয় অর্থাৎ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। Muhammad and the Islamic Tradintion গ্রন্থে এমিলি ডার্মেনগেম বলেন যে, "বিধাতার অসীম শক্তি ও ক্ষমতার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারে এবং এ বিশ্বাসই মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্তি দানে সক্ষম"। (পৃ:১৮৮)

২. মানুষ ও বিশ্বজাহান তাঁরই পরিকল্পিত সৃষ্টি

মানুষ ও বিশ্বজাহান তাঁরই সৃষ্টি। এই বিশ্বে মানুষকে প্রধানত নৈতিক জীব হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। Man is basically a moral being তাকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যা ইচ্ছা তাই সে করতে পারে না। অধ্যাপক বার্বাস বলেন, 'বুদ্ধি ও নৈতিকতার অধ্যয়ন পাশাপাশি চালু থাকা উচিত । পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে নৈতিক তত্ত্বও এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে'।

নিউইয়র্কের Academy of Science এর সভাপতি প্রফেসর ক্রেসী মরিসন বলেন, 'শিষ্ঠাচার, আত্মসম্মানবোধ, বদান্যতা, কর্মোদ্দীপনা, সচ্চরিত্র, উন্নত মনোবৃত্তি এবং ঐ সমস্ত জিনিস যেগুলোকে আল্লাহর গুণাবলি আখ্যা দেয়া হয়, তা কখনো নাস্তিকতা থেকে সৃষ্টি হতে পারেনা-যা মূলত আত্মরম্ভিতারই এমন একটি বিস্ময়কররূপ যার মধ্যে মানুষ নিজেকে নিজেই আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করে। বিশ্বাস ছাড়া সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলায় রূপান্তরিত হবে এবং নিজের মন তথা নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাবে। ফলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে অমঙ্গল । অতএব আল্লাহর ওপরই পুনরায় আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে'।

৩. সৃষ্টি জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক

বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে সৃষ্টিকুলের সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সম্পর্ক নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে। এ বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া বা ধারণ করাকে ধর্ম বলা যায়। কোন একটি দেশের শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তিও হবে সে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ সম্বলিত। ধর্মসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণে ইসলামই যে পরিপূর্ণ ধর্ম তথা জীবনব্যবস্থা, তা সর্বজনবিদিত। তাই ৮৫ ভাগ মুসলমানের বাংলাদেশে ইসলামই হতে হবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি। কোনভাবেই উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সমাজতন্ত্র এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু এদেশে সেই ষড়যন্ত্রই চলছে।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রশিবির

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রশিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য জীবন দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক। তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর

www.icsbook.info

অনুষ্ঠিত সমাবেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তিনি যে ক্ষুরধার তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন তা সর্বস্তরের ছাত্র-জনতাকে আলোড়িত করেছিল। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের এই দিনটিকে ছাত্রশিবির ইসলামী শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে দুই ধরণের পরস্পরবিরোধী মানসিকতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরির কার্যক্রম আজও অব্যাহত আছে। ফলে একদিকে কিছু মিস্টার তৈরি হচ্ছে যারা ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরো অন্ধকারেই রয়ে যাচ্ছে ফলে তারা ধর্মের বিরোধিতা করছে। অপরদিকে এমন কিছু মাওলানা তৈরি হচ্ছে যাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তো দূরের কথা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে জানার সুযোগও হচ্ছে না।

ইসলামী ছাত্রশিবির সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে জানার ও অনুশীলনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠা থেকেই করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচলিত শিক্ষার কুফল জাতির সামনে তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম আলোচনা সভা, স্মারক, বুকলেট ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালাচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাস্তবায়ন করতে না পারলেও শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে ড. কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন পাস করার জন্য শামসুল হক শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই রিপোর্টে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা উপেক্ষিত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। এ জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন করার পরিবর্তে ভারতমুখী পরনির্ভরশীল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিবির কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল শামসুল হক কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করে আধুনিক ইসলামী শিক্ষার একটি রূপরেখা পেশ করে।

বিভিন্ন সময়ের সরকারগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মসজিদ, মাদ্রাসা, ও ইসলামপন্থীদের প্রথমে টার্গেট করে। শত শত মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী চেতনাকে উৎখাত করে শেখ মুজিব পরিবার ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে পুনর্বাসন করেছে, করেছে ইতিহাস বিকৃতি। মাদ্রাসা শিক্ষায় বাজেটে বরাদ্দ কমিয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামিক ইতিহাসের শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভর্তি করা বন্ধ করে দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের পরিবর্তে এখনও সেখানে যতটুকু লেখাপড়ার সুযোগ আছে তা ধ্বংসের জন্যেই সরকার উঠে পড়ে লেগেছে।

www.icsbook.info

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাকে ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী শিক্ষায় পরিণত করেছে। সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দিয়েছে। ফতোয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ষড়যন্ত্র করছে। ইসলামের নামে রাজনীতির অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। শিবির বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর শক্তি। শিবির ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বরাবরই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই এ সরকার শিবিরকেও উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছে।

আমাদের করণীয়

ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন ছাত্রশিবিরের পক্ষে একা সম্ভব নয় । এ জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব রয়েছে। সে জন্যই ঐক্যবদ্ধভাবে এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে:

১. ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. ধর্মহীন নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থার কুফল জাতির কাছে তুলে ধরে জনগণকে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত ও সক্রিয় রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

৩. স্বাধীনতার ৪০ বছরেও কোন স্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। অবিলম্বে এ দেশের অধিকাংশ জনগণের মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জোরদার করতে হবে।

৪. শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমানের বাংলাদেশে তাওহিদ তথা ইসলামই হবে শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি। সুতরাং কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে কবীর চৌধুরী শিক্ষা কমিশন প্রণীত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

৫. দ্বিমুখী শিক্ষা নয়, সমন্বিত কল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। শহীদ আবদুল মালেক এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। তিনি ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের কাছে আমার আহবান-বাংলার এ জমিনে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল, শহীদ আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সেই সূচনাকে সফল সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবি আদায়ের মাধ্যমেই আমরা শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের বদলা নেব- ইনশাআল্লাহ।

লেখক : সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

ধর্মভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা

সৈয়দ আলী আশরাফ

পৃথিবীতে, বিশেষত মুসলিম জগতে দুটি শিক্ষার ধারা প্রচলিত রয়েছে, যার মূল্যে মানুষ সম্বন্ধে এবং জ্ঞান সম্বন্ধে দুটি বিভিন্ন ধারণা কার্যকরী যার একটি হচ্ছে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা আর একটি আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত লিবারাল (Liberal) শিক্ষা।

প্রথম শিক্ষার ভিত্তিমূলে মানুষ সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে তার মূল কথা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার আত্মিক ক্ষমতায়। তার ভেতরে জৈবিক সত্তা রয়েছে যা তাকে কামনা, বাসনা, লালসা, লোভ, গর্ব, শক্তিমত্তা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং তাতেই সে আনন্দ লাভ করে। আত্মিক ক্ষমতা জৈবিক সত্তাকে যখন নিজের আয়ত্তে আনতে পারে তখন ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, স্বার্থলেশহীনতা তাকে মহৎ আনন্দ দেয় এবং জৈবিক সত্তাকে মহৎ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় বুদ্ধি সেই আত্মিক ক্ষমতার সাহায্যকারী হয় তবে বুদ্ধিও আত্মিক ক্ষমতার অধীন হলেই জৈবিক সত্তাকে সহজে আয়ত্তে আনা হয়।

এই আত্মিক ক্ষমতা শক্তিলাভ করে এক অনন্য পরম সত্তাকে আত্মসমর্পণ করে। তিনি সমস্ত শক্তির, ন্যায় অন্যায়বোধের বিচারবোধের সত্য প্রীতি উৎসমূলে। আরবিতে তাঁকে আমরা বলি 'আল্লাহ'। 'আল্লাহ'তে বিশ্বাস যত মনে দৃঢ় হয় ততই মানুষ অধিক থেকে অধিকতর স্বার্থলেশহীন হয়ে সত্য, ন্যায় এবং মঙ্গলের চরম মানদণ্ডকে দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করে। এই মানদণ্ড যে জীবন বিধানের রূপে প্রকাশিত হয় তাকেই বলি ধর্ম।

দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষার মূলে মানুষের সম্বন্ধে যে সেই জীবের শ্রেষ্ঠত্ব তার বুদ্ধি শক্তিতে নিহত। আল্লাহতে বিশ্বাসকে একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধি বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়,

www.icsbook.info

এর সংগে সমাজব্যবস্থার বা মানুষের জ্ঞান আহরণের সংযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান যা কুরআনের মারফত পেয়ে থাকে, তা সার্বজনীন বুদ্ধিজাত জ্ঞানের মত জ্ঞান নয়। অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে কোন জ্ঞান আসতে পারে, তা তারা স্বীকার করতে রাজি নন। আত্মিক শক্তিকে তাই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করাই এদের মতে উচিত।

আত্মিক ক্ষমতার বলে কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে মানুষে যে মানুষ্যত্ব অর্জন করে, বুদ্ধির মারফত তা কি করে সম্ভবপর? বুদ্ধি মানদণ্ড পাবে কোত্থেকে? তার উত্তরে বলা হয়, এ মানদণ্ড তৈরি করবে সমাজ। ফলে সমাজ কাল যদি এ মানদণ্ড ছুঁড়ে ফেলে নতুন মানদণ্ড করতে চায় তাহলে সমাজে বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর ভেতরে দ্বন্দ্ব হতে পারে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সুতরাং আজকের মানদন্ড কাল নাও থাকতে পারে। ফলে মানবতার এবং মানুষ্যত্বের মানদণ্ড বলে কোন স্থির কিছু নেই।

মানুষ হিসেবে যেহেতু এই অনিশ্চয়তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং সত্য ন্যায়, উচিত বিচারবোধে যেহেতু মানুষের জন্মগত বোধশক্তির সংগে সম্পৃক্ত, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে তাই মানুষের একটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা রয়েছে। তবে সত্তা ন্যায়কে পছন্দ করে, অন্যায়কে ঘৃণা করে, সত্যকে ভালোবাসে, মিথ্যাকে অবিশ্বাস্য করে, প্রেমকে মর্যাদা দেয়, কৌটিল্য, স্বার্থপরতা এবং ক্রুরত্বকে ঘৃণা করে ফলে সমাজের দলগত মানদণ্ড দ্বারা মনুষ্যত্বের বিচার করা সম্ভব নয়।

আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিমূলে এই বুদ্ধিজাত মানদন্ড থাকার ফলে এবং এই মানদণ্ডের পরিবর্তন বর্জন এবং অনিশ্চয়তার ফলে পাশ্চাত্য জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনিয়ম প্রবণতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া বিজ্ঞান চর্চার নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন থিওরিগুলি বাতিল হচ্ছে এবং নতুন থিওরি সাময়িকভাবে গৃহীত হচ্ছে। সুতরাং বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে সত্যকে অনুসন্ধান করা সম্বন্ধে এখন বৈজ্ঞানিকরাই সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ তারা এখন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বুদ্ধির মারফত থিওরি তৈরি করা যায়, কিন্তু সেই থিওরিকে চিরন্তন সত্য বলে আর গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাহলে ধর্মদত্ত সত্যকে কি গ্রহণ করবে? অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আনবিক বিশারদ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক পলকিংহন তাদেরই একজন।

প্রশ্ন উঠেছে, ধর্মদত্ত সত্যকে যদি গ্রহণ করে তাহলে কি ধর্মে ধর্মে বিরোধকেও মানতে হবে? এখানে কি কোনটি সত্য এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়? ধর্মভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে এই প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন।

এর সমাধানকল্পে আমি বিলাতের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত ছয়টি ধর্মের নেতাদের অনুরোধ করি তাদের তরফ থেকে শিক্ষাবিদ প্রেরণ করতে, তাঁরা ধর্মভিত্তিক শিক্ষা

www.icsbook.info

সেমিনার যোগদান করলেন। সে কটি ধর্ম হল -হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম এবং শিখ ধর্ম। ১৯৯০ সালে এই সেমিনার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ এবং ক্যামব্রিজে স্থাপিত ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সব ধর্মের শিক্ষাবিদরা স্বীকার করলেন যে সব ধর্মই চারটি মূল ধারণায় বিশ্বাস করে-

১) সর্বগুণাতীত অথচ সর্বগুণ সৃষ্টিকারি এক পরম সত্তাকে যাঁকে আমরা "আল্লাহ' বলি এবং যিনি আমাদের উপাস্য।

২) মানুষ যদিও দেহধারী জৈবিক পদার্থ, তার এক জৈবিক দেহাভ্যন্তরে রয়েছে একটি আত্মা যাকে আরবিতে বলা হয় রূহ, সংস্কৃতিতে বলা হয় 'পরমাত্মা' ইংরেজিতে বলা হয় 'Spirit'।

৩) পরমসত্তা কর্তৃক এই রূহতে চিরন্তন মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা গুপ্তভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তার জন্যই প্রতিটি শিশুর মনেও সত্যপ্রীতিক এবং সত্যবাদীকে বিশ্বাস করা এবং অসত্যের অবিশ্বাস্য এবং অসত্যবাদীকে বিশ্বাস না করা স্বাভাবিক বা সহজাত বলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে।

৪) সব ধর্মই বিশ্বাস করে এবং মানে যে, মানবাতীত অর্থাৎ পরিবর্তনশীলতার অতীত একটি দিক।

৫) দর্শন মানুষের জন্য প্রয়োজন এবং সেই নির্দেশনা সেই পরমসত্ত্বার নিকট থেকে এসে থাকে।

৬) ধর্মে ধর্মে বৈষম্য যা-ই থাকুক না কেন- এই মুলনীতি মনুষ্যত্বের এক চরম এবং পরম।

মানদণ্ড দান করে যে মানদণ্ডই মূল্যবোধের মূল। আল্লাহকে বিশ্বাস ছাড়া এই মূল্যবোধের কোন রক্ষণাবেক্ষনকারী কোন বিধান নেই এই বিশ্বাসই মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস থাকলে মূল্যবোধের আত্মিক অবহিতি সম্বন্ধেও অবিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে। তখনই মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে এবং সমাজ বা গোষ্ঠীকে সাময়িক মূল্যবোধের স্রষ্টা মনে করে। অথচ যে মুহূর্তে সেই অবিশ্বাস ব্যক্তির চিত্তে বিশ্বাসের উদয় হয়, সেই মহূর্তেই ব্যক্তি সত্যকে ভালবাসতে শুরু করে অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে, ন্যায়বিচার পছন্দ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার মত মানকি বলিষ্ঠতা অর্জন করে। এর অর্থ আলাহর ওপর বিশ্বাস যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যে মূল্যবোধ আল্লাহর তরফ থেকে মানবাত্মায় প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে সে মূল্যাবোধ সম্বন্ধে সচেতনতার উদয় হয় এবং মানুষ মনুষ্যত্বের মানদণ্ডকে নিজের জীবনে এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জেহাদ করতে চায়। এই মন মানসি-কতা কোন প্রোপাগাণ্ডজাত নয়, এ এক সহজাত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম প্রচারের রীতিই তাই ছিল অন্তর্লীন এই বিশ্বাসকে জাগ্রত করা। কুরআন শরিফে এ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, বণি আদমের

www.icsbook.info

নিকট থেকে সমস্ত আত্মাকে বের করে আল্লাহ প্রশ্ন করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু?' তারা বলল 'হ্যাঁ'। এই স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে প্রতিটি আত্মার ভেতরে এই বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

জন্মের পর পিতামাতা বা সমাজ তাকে এই সত্য বুলিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করে। সে গোষ্ঠীকে বা বিভিন্ন মতবাদকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, প্রতিটি শিশুই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি (ফিতরাত) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে (অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে)। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। অর্থাৎ মানব প্রকৃতিতে তার রূহের ভেতরে সত্য, ন্যায়, সৌন্দর্য, মঙ্গল ইত্যাদি মনুষ্যত্ব নির্ধারক গুণাবলি নিহিত রয়েছে। শিক্ষার মারফত এই গুণাবলিকে সতেজ করা আমাদের কর্তব্য। যেহেতু আল্লাহকে বিশ্বাস হৃদয়ের অভ্যন্তরের উদগত হওয়ার সাথে সাথে অন্তরাত্মা এই অন্তরীণ মূল্যবোধের মানদণ্ড কে সহজাত স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং যেহেতু বিশ্বাসহীন ব্যক্তি মানদণ্ডের খোঁজে অস্থির অনিশ্চয়তার মধ্যে বিচরণ করে। বিশ্বাস মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজণয়ি বস্তু। শিক্ষার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে আরো গভীর উপলব্ধির জগতে উত্তীর্ণ করে দেয়াই তাই শিক্ষাবিদদের কর্তব্য।

আধুনিক শিক্ষা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেছে। তার সংগে সংগে আত্মা আত্মিক উন্নতি এবং চিরন্তন মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেছে। তারই ফলে শিক্ষাক্রম তৈরি করার জন্য কোন সার্বজনীন চিরন্তন মানদণ্ড নেই। শিক্ষা হচ্ছে-বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা। ফলে এক বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের কোন সংযোগ নেই। ইতিহাস, ভুগোল, ভাষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, অংক, বিজ্ঞান এদের প্রত্যেকটিরই যেন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা সত্তা আছে এবং কোনটাই একই মূল্যবোধ এবং একই মানবসত্তার সমন্বিত উন্নতির কথা চিন্তা করে না। বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করছে বা প্রকৌশল ক্ষমতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই মানুষ মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ চিরন্তন মূল্যবোধের মানদণ্ড দিয়ে স্থিরকৃত যে জীবন-বিধান তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র বাহ্যিক এবং জাগতিক উন্নতি এবং বৈচিত্র্যের সন্ধানই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই ফলে ধর্মবোধ এবং জাগতিক বোধের মধ্যে কোন সমন্বয় সাধন হচ্ছে না। পাশ্চাত্য তার পরে পরিবারকে আর সমাজের ভিত্তিমূল রাখার চেষ্টাও চলছে না। ফলে পৃথিবীব্যাপী দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে -ধর্মভিত্তিক এবং ধর্মবিরোধী শক্তির।

অনেকেই প্রশ্ন করেন-ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান, অংক এগুলোর সংগে ধর্মের কী সম্পর্ক, ধর্মকে এসবের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা করা সম্ভব কি? এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইংরেজি পুস্তক এবং প্রবন্ধে করেছি। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইতিহাস, বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলেই ধর্মের সংগে এ বিষয়গুলির কি সম্পর্ক রয়েছে এবং এ বিষয়গুলি পড়াতে গেলেও ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত, ইসলাম ইতিহাস এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা দান করে তাই এখানে

www.icsbook.info

আলোচনা করব। অন্য ধর্মের কথা বলব না। তবে প্রয়োজন মত অন্য ধর্মের উল্লেখ করব।

ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। ইতিহাস হচ্ছে মানবজীবনের অতীত কাহিনী। যে ইতিহাস আধুনিক শিক্ষায় পড়ানো হয়ে থাকে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে বিবর্তনবাদ। জীবন সম্বন্ধে তিনটি ধারণার ভিত্তিতে ইতিহাস লিখিত হচ্ছে। প্রথম ধারণা হচ্ছে মানুষ জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষরূপে ধারণা করেছে। বন্য মূল্যবোধহীন জীবন থেকে সমাজ বেঁধেছে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির জীবজন্তু থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং এই সমাজ রক্ষার খাতিরে মূল্যবোধের কাঠামো তৈরি করে নিয়েছে। সুতরাং সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে মূল্যবোধের স্বীকার করা হয় না। দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, দেশ সমাজ রাষ্ট্রের পরিবর্তন এর কোন কিছুর মূলে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই এ হচ্ছে ক্ষমতার লোভ নিয়ে মারামারি। আল্লাহর কোন ক্ষমতাই ঐতিহাসিকরা অতীতের ইতিকথায় দেখতে পান না। তৃতীয়ত, টেকনোলজির আদিম উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত উদ্দামগতিতে পরিবর্তন পরিবর্ধনের এবং উন্নতির সংগে সমাজের এবং সমাজগত মূল্যবোধের নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে। ফলে মানব সভ্যতার এবং মানুষের উন্নতি' 'অবনতি' সব কিছুর মূলে রয়েছে টেকনোলজি। ইতিহাস লিখতে হলে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে হবে।

ধর্ম অতীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা দেয়। প্রথমত ধর্ম বিবর্তনবাদকে মানে না। ফলে প্রত্যেকটি জীবই ভিন্ন ভিন্ন। মানুষও একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সৃষ্টি। বর্তমানে জেনেটিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, মানুষের 'জিন' অন্য সমস্ত বস্তুর 'জিন' থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে বিবর্তনবাদ একটি সাময়িক থিওরিতে পরিণত হয়েছে। চিরন্তন সত্য নয়। তাছাড়া ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই যে, আদি মানুষ বর্বর ছিল। কারণ সেই আদি মানুষের কোন ইতিহাস কেউ লিখে যায়নি বা কোন প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। তাই ধর্ম যে ধারণা দেয়, যে আল্লাহ আদম (আঃ) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, একে অপ্রমাণ করার কোন যুক্তি নেই ফলে এ বিশ্বাসকে গ্রহণ করে কেউ যদি অগ্রসর হয় তাহলে সেই ধারণাকে অলীক বলারও কোন প্রমাণ কেউ পাবে না। ইসলামে আমরা সেই অতীতকে গ্রহণ করি কুরআন শরিফের বাণী থেকে এবং তার চাইতেও বেশি জাগতিক প্রমাণ বলে মানি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাখ্যা থেকে। তিনি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যে কথা বলে গেছেন তাই আমরা সত্য বলে মানি সেটিকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে গ্রহণ করি।

দ্বিতীয়ত টেকনোলজির ক্রমবিকাশ অনেকটা প্রমাণিত সত্য বলে সকলেই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু টেকনোলজির বিকাশের ওপর মানবতার মূল্যবোধ নির্ভর করছে এবং মানুষের মানুষে সম্পর্ক নির্ভর করে একথা ধর্ম মানে না। ধর্ম বলছে যে, প্রথম মানব টেকনোলজি জানত না কিন্তু পূর্ণ মূল্যবোধসম্পন্ন মানব ছিলেন।

আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিও বলে যে, একটি অজপাড়াগাঁর লোকও আধুনিক

www.icsbook.info

টেকনোলজি সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও মূল্যবোধ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল জেট প্লেনে চড়েছেন বলেই সক্রেটিস থেকে অধিকতর বা নতুনতর মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরিণত হননি। তা ছাড়া এক ব্যক্তি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে বা ডাক্তারি শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতে পারে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গূঢ়তম সত্য জানতে পারে অথচ মানুষ হিসেবে অপরিণত এমনকি অনেকটা অমানুষও হতে পারে। সুতরাং মূল্যবোধের ভিত্তি টেকনোলজি নয় এবং মূল্যবোধের উন্নতি, অবনতি হয় না। এর ভিত্তি মানুষের অন্তরাত্মায় আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। জন্মের বহুপূর্বেই প্রতিটি আত্মার মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা গুপ্ত করে রাখা হয়েছে। তাই প্রতিটি শিশুই সত্যবাদীকে বিশ্বাস করে, অসত্যবাদীকে বিশ্বাস করে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই গুপ্ত মুল্যবোধ সম্বন্ধে শিশুকে ক্রমশ সচেতন করা এবং ধর্ম নিয়ম কানুনের মারফত সমাজের মূল্যবোধকে সক্রিয় করে।

এই মূল্যবোধকে আল্লাহ চরম গুরুত্ব দান করেছেন, তার কারণ প্রতিটি মূল্যেবোধের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলি। তিনিই সত্য, সত্য প্রীতি দ্বারা মুনষ তাকেই নিজের অজান্তেই সম্মান প্রদর্শন করে। তিনিই ন্যায়পরায়ণ এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক। তাই ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারা মানুষ আল্লাহর এই গুণের প্রতি সম্মান জানান। এই চিরন্তন মূল্যবোধ সমাজে রক্ষিত হলেই সেই সমাজ উন্নতি লাভ করে এই মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আল্লাহর গুণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাই যে সমাজ এই রকম ব্যবহার করে সেই সমাজের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি এসে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ সারা সৃষ্টিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন যে, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার এবং মিথ্যাচার সৃষ্টিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। অর্থাৎ মূল্যবোধের মানদণ্ড সারা সৃষ্টিতে এমন স্বাভাবিক নিয়মের মত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, সেই স্বাভাবিক নিয়মের বরখেলাপ কোন কাজ করলেই মূল্যবোধের বিরাট শক্তির আবার নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তারই ফলে রাষ্ট্রের উত্থান পতন নির্ধারিত হয়। ধর্ম আমাদের এই নীতি শিক্ষাদান করে-ইতিহাস সেই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়া উচিত।

সেই সংগে ঐতিহাসিকদের এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, টেকনোলজি আমাদেরকে কোন মূল্যবোধের মানদণ্ড দেয় না। আমরা মানুষ হিসেবে টেকনোলজি দ্বারা কেন পরিচালিত হব? আমরা নিজেরা টেকনোলজি নিয়ন্ত্রণ করব এবং ধর্ম যে চিরন্তন মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদেরকে সচেতন করে দিচ্ছে এবং সেই মূল্যবোধকে রক্ষার্থে যে মূলনীতিগুলি মানতে বলেছে, সেই রীতি মেনে চলার জন্য এবং মূল্যাবোধকে রক্ষা করার জন্য টেকনোলজিকে ব্যবহার করা এবং তার ভবিষ্যৎ উন্নতি বা বিস্তারের ব্যবস্থা পরিচালনা করার নিয়ম আমরাই করব। ফলে আমরা টেকনোলজির অধীন হব না। আমরাই তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাকারী হব।

এই অবস্থা তখন সম্ভব যখন আমরা সময় সম্বন্ধে ধর্মদণ্ড জ্ঞানকে তুচ্ছ না করে তাকে

www.icsbook.info

অতীতকে বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করি। ইসলাম ধর্ম আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে মানুষকে সমাজ পরিচানা করার জন্য সৎ পথে জীবনযাপন করার জন্য, সৃষ্টির ওপর সত্যিকার দয়া -দাক্ষিণ্য এবং ন্যায়বিচার সম্পন্ন প্রভুরমত সৎভাবে কর্তৃত্ব করার জন্য আদম (আ) থেকে মোহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নবী প্রেরণ করেছে, যারা মূলত এই সত্যের এবং একই মূল্যবোধের প্রচারকার্য পরিচানা করেছেন। এই নবুওঅতকে বিশ্বাস করেছিল বলেই আরব জাতির ভেতর একটি অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হয়। তাদের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত, পরিশুদ্ধ হয় এবং অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার ফলে বিশ্বব্যাপী এক অদ্ভুত বিপ্লব সাধিত হয়। ঐতিহাসিকরা এই স্বতঃপ্রমাণিত সত্যকে অগ্রাহ্য করে কেন? আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদকে অস্বীকার করে আমরা ইতিহাসকে বিকৃত করছি। ইসলামের ইতিহাস সময়ের কর্মশালায় আল্লাহর আদশে নির্দেশ নিয়মাবলি এবং সাহায্য অথবা শাস্তির ক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে প্রমাণিত সত্য অথচ ঐতিহাসিকরা মানব ইতিহাসের কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে চলেছে। ইতিহাস রচনার সেই শক্তির প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীলতা নতুনভাবে প্রদর্শন করাই আমাদের কর্তব্য। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে শুধু উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস জীবনদর্শনের ভিত্তিতে লেখা প্রয়োজন তাই লিখেছি। শিক্ষাদানকালে শিক্ষক যদি এই জীবনদর্শন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন তাহলে তিনিও ইতিহাস পড়ানোর সময় নতুন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের সংগে মূল্যবোধের নিগূঢ় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের নিকট তুলে ধরতে পারেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা প্রশ্ন করে যে, ধর্মের সংগে তার কোন যোগ নেই-বিজ্ঞান আবার ধর্মভিত্তিক কি করে হবে এবং বিজ্ঞান পড়ানোর সময় ধর্মের কথা বলতে হবে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমেই জানা দরকার বিজ্ঞান যাকে ইংরেজিতে Natural Science বলা হয়ে থাকে তার মূল বিষয় হচ্ছে যে, প্রকৃতি আমাদের সারা সৃষ্টিতে পরিব্যনপ্তিকে। আজকাল Environment ও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। অর্থ এই প্রকৃতি সম্বন্ধে বলে যে, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর চিহ্ন। আল্লাহকে চিনতে হলে এগুলোর সত্তাকে চিনতে হবে। তার কারণ পরম সত্য যিনি তিনিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাই নিজেই নিজের ভেতরে বিবিধ গুণের সৃষ্টি করে এক একটি বা বহুবিধ গুণ ব্যবহার করে এক একটি বস্তু বা পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। তার সৌন্দর্য দ্বারা বস্তুতে সৌন্দর্যদান করেছেন। তার রহমত দ্বারা সারা সৃষ্টিতে রহমতের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। তারই ফলে সৃষ্টি জীবন্ত রয়েছে এবং রক্ষিত হচ্ছে। সারা সৃষ্টির রহস্য যখন আমরা চেষ্টা করি উদঘাটন করার জন্য তখন আল্লাহর বিচিত্র বিভিন্ন অসংখ্য গুণাবলির আশ্চর্য ছড়াছড়ি দেখতে পাই।

তখনই বুঝতে পারি, এই সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য যে নিয়মাবলি আল্লাহ দিয়েছেন তা আমাদের জানা দরকার কারণ মানুষ হিসেবে আল্লাহর গুণাবলি রক্ষার আমানত

www.icsbook.info

আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে। তারই জন্য যে নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিতে সেই গুণাবলির লীলা চলছে, সেই নিয়মাবলি যাকে ইংরেজীতে Natural Law বলা হয় না জানলে সৃষ্টিকে বুঝতে পারব না এবং নিয়মাবলি ভঙ্গ করে আল্লাহর গুণের প্রতি অসম্মান করব এবং সেই নিয়মাবলির রীতি অনুযায়ী সৃষ্টি নিজেই বিক্ষুব্ধ হয়ে যে আমাদের নিয়ম বর্হিভূত কাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কুরআন শরিফে আমরা পাই শয়তান আল্লাহকে বলছে, যে আদমের জন্য আমাকে বিতাড়িত করেছ এক সময় এরই সন্তানরা তোমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলি ভঙ্গ করে নিজেদের তৈরি নিয়মাবলি দিয়ে সৃষ্টি চালাতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ উত্তর দিলেন -. 'যারা সে চেষ্টা করবে তোমার সংগে তাদেরকে দোজখে ফেলে দেব'। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মাবলি জানা যেমন প্রয়োজন, তা যাতে ভঙ্গ না করি তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এরই জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসের। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকলে আমরা মেনে নেব যে কুরআন শরিফে বলা হয়েছে যে, জমিন আসমানের ভেতর যা কিছু রয়েছে সব কিছু তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আদম (আ) গ্রহণ করেছিলেন, ফলে সে দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। বিজ্ঞান যেহেতু সেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলি গবেষণা করে বের করে, বিজ্ঞান চর্চা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্যের যেসমস্ত বৈজ্ঞানিক আল্লাহর কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে নিজেরাই প্রকৃতিক পরিবর্তন করতে চায় আমরা তাদেরকে অনুসরণ করব না এবং তাদের থিওরিকে গ্রহণ করব না। এ ব্যাপারে ক্রিয়েশনিস্ট বৈজ্ঞানিকেরা আল্লাহর নিয়মাবলিকে মেনে চলতে চায়, তাদের গবেষণাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ বলেছেন, কুরআন শরিফে যে সত্যজ্ঞান (ইলম) একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অহির মারফত আসে আর মানুষ যে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা অর্জন পরিবর্তিত হতে পারে। নিইউক্লিয়ার ফিজিক্সে চর্চা করতে যেয়ে মানুষও আজ সেই সিদ্ধান্তের উপনীত হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতির তাই পরিবর্তন প্রয়োজন একটি ছোট শিশুকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে-বীজ থেকে গাছ হওয়াটাই যে একটি বিস্ময়কর অতিন্দ্রিয় ব্যাপার, কোন সৃষ্ট বস্তুই এই রহস্য পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে না এ কথাটিও শিশুদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করানো উচিত। তাহলেই বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা রহস্য সম্বন্ধে শিশুমনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করতে পারবে।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি একদিকে যেমন নিয়ম কানুন জানা, প্রাকৃতিক নিয়মাবলিকে বোঝা এবং সেই নিয়মমাফিক সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, তেমনি এক মন মানসিকতা তৈরি করবে যা শিক্ষার্থীকে ধর্মপরায়ণ করে তুলবে। এ দুটি উদাহরণ দ্বারাই বুঝতে পারি, আধুনিক শিক্ষা কেন এবং কিভাবে ধর্মভিত্তিক হতে পারে।

www.icsbook.info

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত ও ইসলামী মূল্যবোধ

একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান

প্রস্তাবনা

"শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত ও ইসলামী মূল্যবোধ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ-বাংলাদেশ প্রসঙ্গ" শীর্ষক উপস্থাপনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ অথচ অতীব জটিল। কেননা সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তথা যে কোন সমাজ ব্যবস্থার মূল্য ভিত্তিই হচ্ছে সে সমাজে অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থা। অপরদিকে মানবমণ্ডলীর অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সু-প্রতিষ্ঠিত ও সু-সমন্বিত সমাজব্যবস্থা। আর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় সমাজব্যবস্থার কাঠামো। মানব জীবনের বিশেষ করে কোন জাতির ভাগ্য নির্ণীত হয় শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে অপরদিকে সঠিক মানবীয় মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেই প্রণীত হয় কল্যাণময়ী শিক্ষাব্যবস্থা এবং যার মাধ্যমেই সম্ভব জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র গঠন করা, সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা, সমাজের বসবাসরত মানব গোষ্ঠীর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা এবং সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধির ফল্গুধারা অব্যাহত রাখা।

প্রকৃত প্রস্তাবে মূল্যবোধই শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ভিত্তির পূর্বশর্ত। মূল্যবোধহীন শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক উদ্দেশ্য বর্জিত শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। এ জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে ও যৌথভাবে বৈষয়িক বা আত্মিক হতে পারে। অবশ্য সে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা বা

www.icsbook.info

অনাবশ্যকতা নির্ণীত হবে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবনের মূল্যবোধ থেকে। কোনো দেশের অধিবাসীগণ যদি ধর্মীয় চেতনা বিবর্জিত বা ধর্মে অবিশ্বাসী হয় তা হলে তাদের জীবনের মূল্যবোধ নির্ধারিত হবে বৈষয়িক উন্নতির মাপকাঠিতে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হবে। অপরদিকে, সে দেশে অধিবাসীগণ যদি কোন ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন হয় বা ধর্মে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয় তা হলে এর শিক্ষাব্যবস্থায় সে মূল্যবোধেরই প্রতিফলন ঘটবে।

এমতাবস্থায় যে সমাজের মানুষ আধুনিক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে ধর্মীয় চেতনামুক্ত হয়ে নিজেকে আত্মাবিহীন জড় পদার্থ মনে করে, সে সমাজের মানুষের শিক্ষাব্যবস্থায় বস্তুগত প্রয়োজন এবং বৈষয়িক উৎকর্ষের মূল্যবোধই প্রধানতস্থান পায় এবং ফলশ্রুতিতে সে সমাজের মানুষগুলো নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত জীবনব্যবস্থার অনুসরী হয় পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এর প্রকৃত প্রমাণ। অপরদিকে যে সমাজের মানুষ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি- ধারণা করে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে আত্মপ্রধান হিসেবে চিনবার সুযোগ পেয়েছে, সে সমাজের মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র বস্তুগত প্রয়োজন ও বৈষয়িক উন্নতির মূল্যবোধেই আপ্লুত হয় না বরং সে সমাজ এমন এক শাশ্বত ও কল্যাণময়ী জীবনব্যবস্থার ধারক-বাহক হয় যা মানুষের অন্তর্নিহিত স্থায়ী, বিশ্বাস ও ভাবধারা তথা মানুষের মৌলিক জীবন দর্শনের বা মূল্যবোধের সঙ্গে মিশে যায়। ইসলামী সমাজব্যবস্থা এর জ্বলন্ত প্রমাণ, সেখানে এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে মানুষ তার সঠিক পরিচয়, মর্যাদা, উৎস, অবস্থায় ও তিরোধান সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হয়ে ইহলৌকিক বা জাগতিক উৎকর্ষ সাধন, নৈতিকতার বিকাশ ও পরিণতি নিশ্চিত করতে কার্যকরীভাবে সক্ষম হয়। এহেন অবস্থায়, শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ এবং ইসলামী মূল্যবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন অপরিহার্য যাতে করে মানব সমাজের জন্য শাশ্বত ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা কোনটি তা চিহ্নিত করা যায়। এ জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার প্রকৃত ধারণা এর সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, দৃষ্টিকোণ, প্রচলিত ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যবোধ এর আলোকে বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ইত্যাদি পর্যালোচনা। উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে শিক্ষার প্রচলিত ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্ক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার একটি রূপরেখা ও বাস্তবায়ন পন্থার সুপারিশমালা উপস্থাপন করার প্রয়াসই হচ্ছে অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ হিসেবে সকল প্রকার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য চাই সঠিক যোগ্যতা। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৈহি, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও গুণাবলি তথা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের নিরলস প্রচেষ্টা শৈশবকাল থেকে

www.icsbook.info

চলে তাই। John Milton এর ভাষায় Education is a continueus process through which mental, physical and moral training is provided top new generation who also acquire their ideals and culture throuth it"

অর্থাৎ 'শিক্ষা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবনের মিশন ও জীবন ধারণের কলাকৌশল অর্জন করে থাকে।

অপরদিকে শিক্ষা সম্পর্কে প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব "Concept of Islamic Education" প্রবন্ধে বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে পরিপূর্ণ মানব সত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা। এ এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা, তার আত্মিক জীবন ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোন একটিকেও পরিত্যাগ করে না।" পুঁজিবাদী শিক্ষায় মানুষকে নৈতিক বন্ধনমুক্ত করে অতিমাত্রায় বস্তুগত উন্নতির দিকে ঠেলে দেয়। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রধান হবার সুযোগ না দিয়ে দেহ বা পেটসর্বস্ব বানিয়ে স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোভাব সৃষ্টি করে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্যাদাকে ধ্বংস করে, ইসলামী শিক্ষা মানুষকে তার আত্মা ও দেহের এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় অবস্থা সৃষ্টি করে এ পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার ও ভোগ করার যোগ্যতা দান করে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানুষ হল আত্মাসর্বস্ব নৈতিক জীব। আর মানুষের জন্যই প্রয়োজন শিক্ষার। কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সকল যুগের মানব সমাজ সম্পূর্ণ একমত পোষণ করলেও মতভেদ দেখা দিয়েছে শুধু শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে। কেননা মানবজীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় এ মতভেদ জন্মলাভ করে। মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত স্থায়ী চিন্তা, বিশ্বাস, ভাবধারা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের ফলতি যা মানুষের মৌলিক জীবন দর্শনের সাথে মিশে যায় যাতে মানুষ তার সঠিক পরিচয়, তার মর্যাদা, তার উৎস, তার অবস্থান ও তিরোধান দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর সাথে তার সম্পর্ক, মহামহিম সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক, তার জীবনের শেষ পরিণতি ইত্যাদি খুঁজে পায়। যে সমাজের মানুষ নিজেকে আত্মাবিহীন এক জড় পদার্থ মনে করে, হাত-পা-চোখ-নাক বিশিষ্ট শরীরটাকেই প্রকৃত মানুষ মনে করে, যে সমাজের মানুষ নিজেকে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত মনে করে, সে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য থাকে সমাজের লোকদের শুধু বস্তুগত প্রয়োজন ও বৈষয়িক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করা। আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষতা ও খোদাবিমুখ বলে তার পক্ষে মানুষকে আত্মপ্রধান হিসাবে চিনবার সুযোগ হয়নি। তাই নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট চীন-রাশিয়া এ শিক্ষাব্যবস্থায় তার জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন এমনিভাবে ঘটেছে যার মাধ্যমে

www.icsbook.info

এমন সব মানুষ তৈরি হচ্ছে তাদের ভাষায় মানুষের প্রধানতম দুশমন খোদার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং ব্যক্তিকে ধ্বংস করে সমষ্টির উন্নতি সাধন করবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যে, তাতে মানব জীবনের চরম বস্তুগত লক্ষ্য ও বৈষয়িক উন্নতি উৎকর্ষ লাভ সহজ হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদগণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর আদর্শিক ভিত্তির কথা স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজের মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা যা অপরিপক্ব ও অপরিণত অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে স্রষ্টার থাকে সম্পর্কের আলোকে উৎকৃষ্ট পন্থায় লালন করে ঐ সমাজের উপযোগী ও যোগ্য সদস্য বানিয়ে তাদেরকে সমাজের বিকাশ কল্যাণ ও উন্নতির সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রকারান্তরে, ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন পূরণে, নিজের দেশ ও জাতির প্রয়োজন পূরণে এবং সর্বোপরি নিজের ধর্মীয় অনুশাসনের দাবি পূরণে শিক্ষা সহায়তা করবে। তবে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সকল যুগে এক ও অভিন্ন, কেননা শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি স্বর্গীয় জ্যোতি যার উৎস একক শক্তি বা আধার থেকে উদগত।

মূল্যবোধ

কোন সুনির্দিষ্ট টার্গেট বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে, যুক্তি, দলিল ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা হয় তাকেই মূল্যবোধ বলা হয়। মূলত যে কোন বিষয় বিচার বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক মূল্যবোধের, তদুপরি যে কোন মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে নীতি-নৈতিকতা বা আদর্শ বা ধর্মীয় চেতনা। বিশেষ করে জীবন, জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে ধ্যানধারণা ও এ মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। অবশ্য প্রচলিত শিক্ষায় মূল্যবোধ আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন পুঁজিবাদী দর্শন যা মানুষকে হাত-পা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এর আলোকে যাচাই বাছাই করার মন মানসিকতা ও কৌশল তাই পুঁজিবাদী মূল্যবোধ। পুঁজিবাদী দেশেও ধর্মের চর্চা হয় কিন্তু সেখানকার মূল্যবোধ ধর্মের ভিত্তিতে রচিত নহে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা মূল্যবোধ মানুষকে পেট দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার আহবান জানায় এবং আদৌ ধর্মকে স্বীকার করে না। তাই এ দুটো মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ যা মানুষকে তার উৎস, অবস্থান ও পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সজাগ করিয়ে তাকে আত্মপ্রধান নৈতিক হিসাবে চিনবার এবং মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিয়ে সব কিছু যাচাই বাছাই করার যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেছে তাই ইসলামী মূল্যবোধ। এখানে মূল্যবোধ আপেক্ষিক নহে। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি যা মানুষের মনে সদা জাগরুক থাকে এবং এ মূল্যবোধ মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পৌছিয়ে দেয়। তাই ইসলামিক মূল্যবোধ চিরন্তন ও শাশ্বত। আল্লাহর পছন্দ অপছন্দ এবং আদেশ নিষেধের আওতায় এ মূল্যবোধের পরিধি আবর্তিত হবে।

www.icsbook.info

শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশেরই বৃহত্তর জনগণের ধ্যান-ধারণা, দর্শন, মূল্যবোধ, রুচি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষি থেকে গড়ে ওঠে। এটা ভিন্ন দেশ থেকে আমদানির কোন পণ্য নয়। এর ভিত্তি হবে সে জাতির স্বতন্ত্র জীবনধারা বা জীবনবোধ। শিক্ষাব্যবস্থা সে জাতির মানবীয়, নৈতিক, আত্মিক, বৈষয়িক ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সঙ্গত কারণেই একই জাতির জন্য দ্বিবিধ শিক্ষানীতিও চালু করা যেতে পারে না। যদি তাই হয়, এর ফলশ্রুতিতে জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে বিভেদ, দূরত্ব, বিভাজন ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। গোটা জাতি একটি সুনির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে পরিচালিত হতে পারে না। এ শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই বিপরীতধর্মী মূল্যবোধ ও জীবনধারায় বিভিন্নতা জন্ম দেয়। পরিণামে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। অপরদিকে জনগণের কাঙ্ক্ষিত আসল মূল্যবোধের আলোকে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা সুবিন্যস্ত শিক্ষানীতি ও জনগোষ্ঠীকে দিতে পারে সন্ত্রাসমুক্ত অনুকূল পরিবেশ সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুস্থ ও রুচিশীল সংস্কৃতির বিকাশ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি সমৃদ্ধ ও শান্তিময় ইহলৌকিক মুক্তির দিকনির্দেশনা।

মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা

প্রকৃত মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনটি তা আমাদের বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের মতামত প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবি John Milton বলেছেন "Educations is the harmonious development of body, mind and soul." অর্থাৎ "শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন।" এই harmonious development কোন মূল্যবোধ ছাড়া সম্ভব নহে। তিনি আরো বলেছেন: I call a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices, both private and public of peace and war. অর্থাৎ আমি এ শিক্ষাকেই পূর্নাঙ্গ ও উদার শিক্ষা বলি যা একজন মানুষকে তৈরি করে ব্যক্তিগত বা সরকারি দায়িত্ব, শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ন্যায়সংগত ভাবে দক্ষতাসহকারে এবং উদারভাবে পালন করতে।" আরো একজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ Prof, Heman H. Home শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে বলেছেন: "Education is the eternal process of superior adjustment of the physically and mentally development free and concious human being to God as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man" অর্থাৎ "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত ও মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে স্রষ্টার সঙ্গে উন্নতভাবে ও ঐচ্ছিকভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন

www.icsbook.info

প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধির দিক, আবেগগত ও ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।" এ সম্পর্কে অধ্যাপক Niblet বলেন: The end of education is not happiness, but rather to develop greater capacity for being aware, to deepen human understanding perhaps inevitabley through conflict, struggle and suffering." অর্থাৎ "শিক্ষার মূল লক্ষ্য সুখ নয় বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে সংঘাত, সংগ্রাম ও কষ্টের মাধ্যমে সচেতনতার ব্যাপকতর ক্ষমতা সৃষ্টি করা, মানবীয় বা শক্তির গভীরতা বৃদ্ধি করা।" অপর উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ Professor Clarke শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে বলেন: "For whatever elso education means, it must mean primarily the self perpetuation of an accepted culture which is the life of determined society." অর্থা" "শিক্ষা মানে আর যত কিছুই হোক না কেন, এর এক আবশ্যিক অর্থ হচ্ছে গৃহীত সংস্কৃতির আত্মস্থায়িত্ব বা চিরন্তনতা আর সে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি দৃঢ় সংকল্প সমাজের জীবন।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে শিক্ষা অবশ্যম্ভাবীরূপে আদর্শিক বা মূল্যবোধের রঙে রঙিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। শরীর, মন ও আত্মার সুষম উন্নয়ন যে আমাদের শিক্ষানীতিতে যা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী মূল্যবোধ থেকে উৎসাহিত তাও স্থান পায়নি। এ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বস্তুবাদী মূল্যবোধের মারাত্মক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার কারণে মানুষের জীবন ও শিক্ষায় যে মহামূল্যবান বিষয়টি সযত্নে চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে তা হচ্ছে মানবিক ও নৈতিক মূল্যমান (human and ethical values)। এ শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের দৈহিক, বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ঘটলেও মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়ন না হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আয়োজন ও অর্থবরাদ্দ সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ Albert Schezer তাঁর লেখা "The Teachig of Reverence for life" বইতে শিক্ষানীতিতে নৈতিক পুনর্জাগরণ ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন: Our age must achieve spiritual reewal, A new renaissance must come the renaissance in which mankind discovered the ethical action is the supreme truth and the supreme utilitariarism by which mankind will be liberated"

অর্থাৎ "আমাদের যুগকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক নতুনত্ব লাভ করতে হবে; একটি নতুন লীনর্জাগরণ যেখানে মানবমণ্ডলি নৈতিক কাজকেই চূড়ান্ত সত্য বলে আবিষ্কার করবে এবং এমন চূড়ান্ত উপযোগবাদ যা দ্বারা মানবমণ্ডলী মুক্তি পাবে।" এই Spiritual liberation ছাড়া মানবজাতির কোন মুক্তি আসতে পারে না বলেই তিনি স্পষ্ট বলেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা যা Secular এবং liberal তার ব্যর্থতাকে সামনে রেখে Albert Schezer সে শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি বিশেষ মূল্যবোধ তথা আধ্যাত্মিকতার

www.icsbook.info

ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন: "Three kinds of progress are significant: progress in Knowledge and technology, progress in socialization of man and progress in spirituality, The last one is most important."

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পরিষ্কার যে প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলতঃ সামাজিক আদর্শ, চরিত্র এবং মূল্যবোধ নিয়েই প্রণীত তথা সঠিক ও স্বতন্ত্র মূল্যবোধের আলোকেই শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুকরণ আত্মহত্যার শামিল। কলাকৌশল ও প্রযোগ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যদের অনুকরণ করা যেতে পারে কিন্তু মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতন কিম্বা অবচেতন ভাবেও যদি আমরা ভিন্ন জাতির মূল্যবোধ গ্রহণ করি, তা হলে আমাদের জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে ড. আলামা ইকবাল বলেন: 'কোন আগুন তোমার চাই তা জানার জন্যে তুমি কোন মাটির তা আগে জেনে নাও। অন্যের আলোর পেছনে ছুটে তোমার লাভ নেই। পাশ্চাত্যের কাচ শিল্পীর প্রাচুর্য কামনা করে তোমার লাভ নই। ভারতের মাটি দিয়ে তুমি তোমার জগৎ গড়ে তোল।"

প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব তাঁর লিখা "Concept of Islamic Education." প্রবন্ধে শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে বলেন, "শিক্ষা হবে দৈহিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সমতা, মানুষের বস্তুতান্ত্রিক ও অবস্তুতান্ত্রিক বিষয়ের মধ্যে সমতা, মানুষের প্রয়োজন ও আয়ের মধ্যে সমতা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সমতা। এমনকি জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন সব বিষয়ের মধ্যে সমতা।" শিক্ষা সম্পর্কে আল-কোরআনের ঘোষণা' "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পাঠ কর আর তোমার প্রভু, প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সুরা আলাক: ১-৫ আয়াত)। আল- কোরআনের এ ঘোষণা অনুযায়ী দেখা যায় যে স্রষ্টার নামে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কের আলোকেই শিক্ষার আসল মূল্যবোধ স্থিরকৃত হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণ কিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করা যাতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ধ্যান ধারণার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে সক্ষম এবং যাতে আজকের পৃথিবীর হতাশাগ্রস্ত মানব সমাজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের সাথে সাথে আত্মিক সংকট থেকেও মুক্তি পেতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যদি শিক্ষাব্যবস্থায় এমন একটি আদর্শিক ভিত্তি ও মূল্যবোধকে বেছে নেয়া হয় যা মানুষের জীবনের সবদিক ও বিভাগে একটি নির্ভুল দিক নির্দেশিকা উপস্থাপন করতে পারে, যা মানুষকে একটি কল্যাণকর আদর্শ সমাজব্যবস্থার জন্য উপযোগী ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করতে পারে যারা জ্ঞানের বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক

www.icsbook.info

দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিক মূল্যমান ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারবে যা স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক ও নিয়মিত বন্ধন বা যোগসূত্রের ব্যবস্থা করবে, যা দুনিয়ার সুশৃঙ্খল প্রকৃতি ব্যবস্থার সাথে মানুষের সৃজনশীল গুণাবলির সম্পর্ক স্থাপন ও বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হবে এবং সর্বোপরি যা মানুষকে পারলৌকিক জীবনের সম্পৃক্ততা ও চূড়ান্ত পরিণতির অনুভূতিকে সদা জাগরণ রাখবে। এমনি ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন বা মূল্যবোধ একমাত্র ইসলামই হতে পারে যার পরিব্যাপ্তি শুধুমাত্র ধর্ম তথা স্রষ্টার সাথে মানবকুলের সম্পর্কে সীমাবদ্ধ নয় বরং যা মানব জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগে দিকনির্দেশনা উপস্থাপনা করবে সাথে সাথে একটি দেশ ও জাতির জন্য প্রীত শিক্ষানীতিতেও স্থায়ী ও কার্যকরী মূল্যবোধ পেশ করতে সক্ষম হবে এবং এতে এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠবে যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখার সমন্বয় সাধন করে শিক্ষার্থীদের একটি সুসংহত বিশ্ব অবলোকন করার জন্য উপহার দেবে একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বৃহত্তর কল্যাণে এহেন মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে। এ প্রয়োজনেই দেশের জন্য দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার গোটা সিলেবাস-কারিকুলমাকে সম্পূর্ণ নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। পরিণামে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করবে দক্ষ ও যোগ্য সমাজ বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, কারিগর, প্রকৌশলী, ডাক্তার, সমাজকর্মী, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক যারা নিজ নিজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখায় আরোহী হয়ে জীবন ও জগতের প্রতি অবলোকন করবে একজন মুমিন-মুসলিমের অখণ্ড ও সুষ্ঠু দৃষ্টি দিয়ে আর সমগ্র মানবমণ্ডলীর কল্যাণে নিজেকে করবে উৎসর্গ, বিনিময়ে কামনা করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি যাতে করে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তি পেয়ে তার জীবন সফল হয়। এহেন মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চাই যথার্থ জ্ঞান এবং সৎসাহসের। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সৎসাহস নিয়ে অগ্রপথিকের ভূমিকার অবতীর্ণ হউক এটা জাতির প্রত্যাশা।

শিক্ষায় প্রচলিত মূল্যবোধ

যে কোন সমাজ-সভ্যতা-দর্শনে শিক্ষা আদর্শচ্যুত বা লক্ষ্যবিহীন নহে। যুগে যুগে সকল সমাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন এবং যোগ্যতা সৃষ্টি। তথা মানুষের আসল পরিচয়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে - বস্তুগত জ্ঞানের সাথে নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধন করে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা এর স্বকীয় লক্ষ্য হারিয়ে এখন তা রাজনৈতিক মতাদর্শের হাতিয়ারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধের আলোকে লালিত হয়েও নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও দর্শন সম্পন্ন অনেক মনীষী ও চিন্তাবিদ বের হয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। তারা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী। তাই প্রচলিত মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য

www.icsbook.info

ও উদ্দেশ্যসহ এর অবস্থার মূল্যায়নের অবকাশ রেখে নিম্নে তা আলোচনা হল:

প্রথমত, শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ হচ্ছে বস্তুবাদ ও তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা। পাশ্চাত্যের প্রচলিত শিক্ষা মানুষকে আত্মা প্রধান নৈতিক জীব হিসাবে সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র দেহসর্বস্ব উন্নত সংস্করণের জীব হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া প্রাচ্যের ধর্মীয় শিক্ষা (তথা মাদ্রাসা শিক্ষা) মানুষকে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতার ধারণা দিতে গিয়ে তার বস্তুগত প্রয়োজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তথা মানুষের আত্মার প্রয়োজন ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের সমন্বয় বিধানে শিক্ষার আধুনিক মূল্যবোধ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

দ্বিতীয়তা, শিক্ষার প্রচলিত অন্যতম মূল্যবোধ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈরাগ্যবাদ। আধুনিক শিক্ষা মূলত পাশ্চাত্য খোদাবিমুখ ধ্যানধারণা প্রসূত যেখানে ধর্মের কোন স্থান বা আবেদন নেই তাই ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে হিপ্পীইজম দেখা দিয়েছে। অপর দিকে প্রাচ্যের ধর্মীয় শিক্ষা (বা মাদ্রাসা শিক্ষার) খোদামুখী ধ্যানধারণা সৃষ্টি করলেও জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অনীহা ও নির্লিপ্ত এবং ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবর্জিত হয়ে এক ধরনের বৈরাগ্যবাদিতায় পরিণত হয়েছে এবং সংসার বিরাগী হয়ে অনেকে ভাণ্ডারি সাজে।

তৃতীয়ত, প্রচলিত শিক্ষার আর একটি মূল্যবোধ হচ্ছে বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা এবং একটি আর একটির বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিক করে প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞান ও ধর্ম একই উৎস থেকে উৎসারিত এবং একই মহাশক্তির অবদান এটা প্রচলিত শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলত আধুনিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিজ্ঞানই ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ধর্ম তার কার্যকরী শক্তি হারিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করে চলবে।

চতুর্থত, প্রচলিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজকে পরিপূরক শক্তিতে রূপান্তরিত করার মূল্যবোধ গড়ে তোলেনি। তাইত দেখা যায় পুঁজিবাদী সমাজে সমাজকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির প্রাধান্য এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সমাজের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অধিকন্তু প্রাচ্যের ধর্মীয় শিক্ষা সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে অতীব খাটো করে ব্যক্তির মূল্যমানকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছে, ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্যতা বিঘ্নিত হয়েছে।

পঞ্চমত, শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়নি। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা পরকালীন জীবনকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করে দুনিয়ার জীবনকেই মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই মানুষ হয়ে উঠেছে চূড়ান্তভাবে বস্তুবাদী। অপরদিকে প্রাচ্যের মাদ্রাসা শিক্ষায় পরকালীন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করলেও খোদভীতির নামে সংসার ত্যাগী মনোভাব সম্পন্ন একদেশদর্শিতায় পরিণত করেছে যা মানবতার জন্য আদৌ কল্যাণকর

www.icsbook.info

নহে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের দুনিয়া পূজারী মনোভাব আধুনিক বা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের তুলনায় অনেক বেশি।

ষষ্ঠত, শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে প্রকৃত মৌলিক মানবীয় গুণাবলি ও চরিত্র সৃষ্টির উদ্যোগ বিবর্জিত। এর ফলে আধুনিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে আদর্শের অনুভূতি অনুসরণ, আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সংযমশীলতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, জনসেবামূলক মনোভাব, স্নেহশীল, মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ইত্যাকার চারিত্রিক গুণাবলি সৃষ্টির পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিকতা, হিংসা বিদ্বেষ, স্বজনপ্রীতি, সুদ-ঘুষ-জুয়া-বেশ্যাবৃত্তি মনোভাব, আইন অমান্য করার প্রবণতা, উচ্ছৃংখলতা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, আত্মকলহ, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভোটার বিহীন নির্বাচনে জোরপূর্বক জয়ী হবার প্রবণতা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাব ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি সৃষ্টি করে।

সপ্তমত, শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ নারী ও পুরুষকে স্ব স্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করে তাদেরকে একই কাতারে শামিল করে সহশিক্ষার মাধ্যমে সমাজ রাষ্ট ব্যবস্থার মূলভিত্তি পরিবার সংগঠনকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছন্ন করে দিয়ে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এরই ফলে জন্ম নিয়েছে নৈতিকতা বিবর্জিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবর্জিত ধর্মীয় চেতনা বা অনুভূতি যা কোন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হতে পারে না। তাই পাশ্চাত্যের সহশিক্ষার কুফল থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য এবং পাশ্চাত্য জগতের নারী সমাজের পক্ষে থেকেও আন্দোলন "Save use from the hands of the young" নামীয় শ্লোগান শুনা যায়।

শিক্ষায় ইসলামী মূল্যবোধ

শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী মূল্যবোধ একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবিদার হিসেবে চিরন্তন ও শাশ্বত আদর্শ ও দর্শন পেশ করেছে। জীবন ও জগতের ব্যবস্থার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানব জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলাম তার নিজস্ব বাস্তবধর্মী নিয়ম বিধান উপস্থাপন করেছে। যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যক্তির স্বপ্ন-প্রতিভা ও মননশীলতার উন্মেষ সাধন এবং দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য জ্ঞানার্জনের প্রেরণা ও সাধনায় নিয়োজিত করে ইসলাম ব্যক্তি মানুষকে সৃষ্টির সেরা তথা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তৈরি করে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আলোকে দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালে মুক্তির রাজপথ রচনার দৃষ্টিকোণ নিয়েই তার শিক্ষাকে পরিচালিত করে। এহেন মূল্যবোধেই শিক্ষা মানুষকে তার বস্তুগত জ্ঞানের সাথে নৈতিক শক্তির সমন্বয় সাধন করে তার মন, মগজ ও চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে উঠায় যাতে করে তাকে দিয়ে ইসলামের পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের আলোকে সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় যা সমগ্র মানবতার জন্য সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনবে। অবশ্য এ মূল্যবোধ তথাকথিত

www.icsbook.info

মৌলবাদের ধারণা থেকে সৃষ্টি নয় বরং ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত।

শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধের অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্যতা ও কল্যাণ বিমুখতার বিপরীতে ইসলামে মূল্যবোধে উপস্থাপিত শিক্ষার সামঞ্জস্যতা, পূর্ণতা ও কল্যাণমুখিতার উপাদানসমূহ মূল্যায়নের দাবি রাখে। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

প্রথমত, শিক্ষার ইসলামী মূল্যবোধে ব্যক্তিকে আত্মপ্রধান নৈতিক জীব হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁর জৈবিক দাবি পূরণ ও আত্মার উন্নতি বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণেই সে নিয়োজিত হতে পারে। ইসলামী শিক্ষা ব্যক্তির জৈবিক দাবি ও আত্মার দাবিকে এক ও অভিন্ন মনে করে এবং একটি আর একটির পরিপূরক শক্তি হিসাবে উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার কারণেই। কিন্তু এ স্বাধীনতা যেন লাগামহীন না হয় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধে শিক্ষা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাতে মানবমণ্ডলী চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে পারে এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে।

তৃতীয়ত, শিক্ষায় ইসলামী মূল্যবোধ বিজ্ঞান ও ধর্মের উৎসকে এক ও অভিন্ন মনে করে। এতে এ দ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সহযোগী হয়ে মানবতার সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম মূল্যবোধ। স্রষ্টা প্রদত্ত নিয়মনীতিতে ধর্ম ও শান্তির চূড়ান্ত অধিকার ও ব্যবহারকে শ্রেষ্ঠ এবাদত ও কল্যাণকর কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার এই ইসলামী মূল্যবোধের ফলশ্রুতিতেই আধুনিক যুগে ড. মরিস বুখাইলি ও প্রফেসর আবদুস সালামের মত বিজ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা জন্মলাভ করেছেন।

চতুর্থত, ইসলামী মূল্যবোধ দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য সূচনা ও শেষ নয়, বরং মরণশীল মানুষের জন্য পরকালীন জীবনের ফলাফলই চূড়ান্ত এ শিক্ষা দিয়ে থাকে। বস্তুত মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ এক ও অবিভাজ্য সত্তা হিসাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন তার জন্য স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয়। নৈতিকতার সীমার মধ্যে দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করে পরকালীন অনন্ত-অসীম জীবনের মুক্তির পথ প্রশস্ত করাই মানুষের দায়িত্ব। তাই ইসলামী মূল্যবোধে পরিচালিত শিক্ষা শুধুমাত্র দুনিয়ার প্রয়োজনই পূরণ করে না বরং পরকালীন জীবনের মুক্তির রাজপথ রচনারও সুমহান ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ইসলামী মূল্যবোধে শিক্ষা উন্নত নৈতিক জীব হিসেবে ব্যক্তি মানুষ এবং কল্যাণকামী সামষ্টিক রূপ হিসাবে সমাজকে পরিপূরক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। এহেন শিক্ষায় প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার মত বস্তুবাদী ব্যক্তির ওপর যন্ত্রদানব নামীয় সমাজের প্রাধান্য যেমন স্বীকার করে না তেমনি সমাজের ওপরও ব্যক্তির লাগামহীন

www.icsbook.info

প্রাধান্য স্বীকার করে না। এমনিভাবে ইসলামী শিক্ষার মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজকে পরিপূরক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এক সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে ধরতে চায় যেখানে অমুসলিম সম্প্রদায়ও শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং নিজ ধর্মের চর্চা করতে নির্বিঘ্নে সুযোগ পাবে।

ষষ্ঠত, ইসলামী মূল্যবোধে শিক্ষা মানুষকে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা বিদূরিত করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের সাথে ইসলামী দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার অনন্য সুযোগ স্থাপন করে। শিক্ষার ইসলামী মূল্যবোধে আধুনিক অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ও জীব বিজ্ঞান পড়ানো ও গবেষণার ব্যাপারে আদৌ কোন আপত্তি নেই।

সপ্তমত, সমাজগঠন ও পরিচালন অপরিহার্য অঙ্গ পুরুষ ও নারী উভয়কে স্ব স্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করে শিক্ষার মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত অবদান রাখার মূল্যবোধ থেকেই ইসলাম এর শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালিত ও পরিমার্জিত করতে চায়। এহেন ব্যবস্থাপনাই নারী-পুরুষের মধ্যে জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে তাদের প্রতি প্রকৃত সুবিচার করতে চায়। নারীর ওপর পুরুষের অযৌক্তিক প্রাধান্য এবং পুরুষের ওপর নারীর শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং পরিপূরক শক্তি হিসাবে উভয়কে এহেন শিক্ষায় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধের আলোকে নারী সমাজকে পণ্যসামগ্রীর মত ভোগ-ব্যবহারকে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বনাম মূল্যবোধ

শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ উপস্থাপনের পর বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এর অবস্থান পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যা বহুলাংশেই মানবীয়, আত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান বিবর্জিত তা পরিচালিত হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। সাধারণভাবে শিক্ষার যে সবত স্বাভাবিক সুমহান উদ্দেশ্য রয়েছে সকল দেশে এবং জাতিতে সেগুলোও অনেকাংশে অর্জিত হচ্ছে না আমাদের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায়। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে ও সর্বপর্যায়ে; শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসকসহ শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সবাই আজ শিকার হচ্ছে নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনায়। গোটা শিক্ষাঙ্গন পরিবেশ ভরপুর হয়ে উঠেছে নীতিহীনতা, অদক্ষতা, চরিত্রহীনতা, অনৈতিকতা, অব্যবস্থাপনা ও সন্ত্রাসী তৎপরতায়। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে (যা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে উল্লিখিত) শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষক সমাজের অবস্থা, ছাত্রসমাজের অস্থিরতা, সিলেবাস কারিকুলামের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাদান কার্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরিচালনা পর্ষদ ইত্যাদি বিষয় যথাযথ পর্যালোচনার দাবি

www.icsbook.info

রাখে। অবশ্য বর্তমান নিবন্ধে এ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবুও প্রাসঙ্গিভাবে এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছাত্র-শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীসহ এর সর্বপর্যায়ে এবং বিভিন্ন দিক ও বিভাগে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। সন্ত্রাস ও সেশনজট সহ বহুবিধ শিক্ষা সমস্যা ও সংকটকে শিক্ষাঙ্গনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। আমার মতে এসবের প্রধান কারণ সমাজজীবনের অন্যান্য সেক্টরের মত জাতীয় জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধের আলোকে কোন স্থায়ী শিক্ষানীতি ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থার আজও বিকাশ ঘটেনি। কারণ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যা মূলত বৃটিশ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে Sir William Hunter যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: "The truth is that our system of education (public intruction) is opposed to the tradition, unuited to the requirements and hateful to the religion of Mussalman." অর্থাৎ 'সত্য কথা এই যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের ঐতিহ্য বিরোধী এবং আমাদের ইতিহাসের প্রতি বিদ্বেষী।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বহুবিধ ত্রুটি ও গলদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু দিক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা বা জ্ঞান দিতে পুরোপুরি সমর্থ নয়। কিছুটা বৈষয়িক জ্ঞানদান করলেও শিক্ষার্থীকে সুনির্দিষ্ট কোন আদর্শের আলোকে তার ব্যক্তিগত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার ব্যাপারে সাহায্য করে না। তাই তার জীবনে দেখা দেয় হতাশা এবং ফলে মানবীয় কোন সুমহান আদর্শের চর্চা সে করতে পারে না। এ ছাড়া তার মধ্যে সমাজের জন্য ত্যাগের অনুভূতিও জাগ্রত করে না। সে আত্মকেন্দ্রিকতায় বিভোর থাকে কিছুটা পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করলেও চারিত্রিক মান এবং আত্মিক উন্নতির কোন পথ ও পাথেয় সে খুঁজে পায় না এ শিক্ষাব্যবস্থায়।

মানবজীবনের যদিও বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে যেমন ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক তবুও এগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। বরং গোটা মানব জীবন এক অখন্ড অবিচ্ছিন্ন ইউনিট হিসাবেই স্বিকৃত। কিন্তু আমাদের শিক্ষানীতিতে মানব জীবনের এক একটি দিক ও বিভাগকে প্রাধান্য দান করে মানুষকে খন্ডিত অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে ফলে গোটা মানব জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ শিক্ষার্থী পায়নি। এ কারনেই সে তথাকথিত শিক্ষিত হলেও মানব সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সমস্যার সঠিক ও সামগ্রিক সমাধান দিতে ব্যার্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় মানব জীবনের উৎস অবস্থান ও পরিনতি সম্পর্কেও সঠিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যার ফলে সে মানুষ ইহলৌকিক অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠা লাভের সফলতাকেই জীবন সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত করে।

www.icsbook.info

প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনে জগত সম্পর্কেও সঠিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে আগ্রহী হয়। বৈজ্ঞানীক তথ্য ও গবেষনার মাধ্যমে জগত সম্পর্কে বহু কিছু আবিষ্কার করলেও সৌরজগৎ সহ এ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার পেছনে যে অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্দেশ করতে পারেনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই দেখা যায় বিশ্বস্রষ্টার প্রতি মানবকুলের বিভিন্ন আচরন । মানুষের অন্তরে ও বিশ্বাসে স্রষ্টার প্রতি স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি বা নিরপেক্ষতা। এতে হয়ে উঠেছে মানুষের জীবন মূল্যবোধে বিরাট তারতম্য ও পার্থক্য। এরই ফলে সুনির্দিষ্ট কোন জীবন ব্যবস্থাও গড়ে উঠেনি আমাদের দেশে।

জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ধারনা ও মূল্যবোধের অভাবেই আমাদের শিক্ষর্থী যুবক সমাজ পায় না (পৃথিবীতে সঠিক ভাবে চলার পথ এবং ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক, জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং স্রষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের দিশা। এর ফলে জীবন সমস্যার সঠিক সমাধান খুজে বের করার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। আদর্শ ভিত্তিক কোন সমাজ ব্যবস্থার ভিত রচনা করতে সে দৃঘপদে এগিয়ে আসেনা। দোদুল্যমান অবস্থায় সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

আমাদের শিক্ষানীতিতে আমাদের জাতীয় অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিকজ্ঞান প্রদানের কোন টার্গেট নেই যার ফলে অজানার কারনে অতীতের গৌরবজ্জল ইতিহাস শিক্ষার্থীর মনে কোন মনোবল ও উৎসাহ সৃষ্টি করে না এবং সংস্কৃতির বিকাশ ধারায় সে কোন অবদানও রাখতে পারে না। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান বিবর্জিত শিক্ষার্থী ও জনগোষ্ঠী জীবনের নৈতিকমূল্যবোধ আপুত হয় না বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ববোধ পরিচালিত হয়না। সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শিক পরিবর্তন ঘটানোর বৈপবিক পদক্ষেপ নিতে পারে না।

প্রচলিত শিক্ষানীতিতে আমাদের শিক্ষর্থীকে আত্মপ্রত্যয় ও নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর সুযোগও বহুলাংশে অনুপস্থিত। কেননা শিক্ষা নীতিতে মানবীয় দর্শন ও আদর্শহীনতার কারনে সে দর্বলচিত্ত হতে বাধ্য হয়। বৈষয়িক ও পেশাগত জ্ঞানের পাশাপাশি সাধারন ও নৈতিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ না থাকায় সে নৈতিক শক্তির অধিকারী ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। ফলে মহৎ কর্ম সাধনেও সে সাহসী ভূমিকা নিতে পারে না।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষনা মানবিক মূল্যবোধও স্রষ্টার আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার কোন যোগ সূত্র নেই। এমনকি বিকল্প কোন মূল্যবোধও তদস্থলে গ্রহন করা হয়নি। তাই দেখা যায় শিক্ষার্থীদের সামনে কোন সমুচ্ছ আদর্শ ও প্রত্যয় সদাজাগ্রত থাকে না তার

www.icsbook.info

মধ্যে সৃষ্টি হয় না জীবন ও জগত সম্পর্কে জ্ঞান গবেষনায় পূর্নাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি। এর কারন পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্নভাবে স্থান করে নিয়েছে সে সমস্ড় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ যাদের হাতে হয়েছিল তারা ছিল খোদা বিমুখ যারপা চিন্ড্রজগত ও কর্মজীবন থেকে স্রষ্টার অস্ড়িত্বকে নির্বাসিত করেছিল। বৃটিশ প্রভু তাদের দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সমস্ড় বই পুস্ড়ক চালু করেছিল আমাদের দেশেও জ্ঞান বিজ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা কলা , সমাজবিজ্ঞান, বানিজ্য, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, আইন শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা প্রভৃতিতে আজো সে সমস্ড় বই পুস্ড়ক চালু রয়েছে। ইতিহাস , দর্শন, সাহিত্য,ভুগোল,বানিজ্য, ও বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের কোথাও শিক্ষার্থী বিশ্বনিয়স্ড্র বিশ্ব পরিচালক ও বিশ্বস্রষ্টার যিনি সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস ও একমাত্র আইন রচয়িতা তার অস্ড়িত্ব পায় না।

অশুভ প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষা সংকট :

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে চরম অনিয়ম দুর্নীতি সন্ত্রাস হতাশা ব্যাপক ছাত্র অসন্ড্রেষ খূন খারাবি রাহাজানি অর্থনৈতিক শোষন বঞ্চনা প্রতারনা চরিত্রহীনতা নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ইত্যাদি ব্যাপক হারে সংক্রামক ব্যদির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গন গুলোতে ব্যাপক হারে সন্ত্রাস অস্ত্রের ঝনঝনানি ও মহড়া নোংরা রাজনীতি প্রতিপক্ষ ছাত্র গ্রুপের উপর সন্ত্রাসী হামলা হত্যা বোমাবাজি শিক্ষকদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও তাদের উপর শারীরিক আক্রমন লেখাপড়ার প্রদি অনিহা রাহাজানি ইত্যাদি নৈরাজ্যকর অবস্থা আজ সচেতন নাগরিককেই ভাবিয়ে তুলেছে । শুধু তাই নয় বরং নোংরা রাজনৈতিক কারনেই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্টু শিক্ষা পরিবেশের পরিবর্তে সেখানে চরম অস্থিরতা বিরাজমান। ফলে শিক্ষক সমাজ একদিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষদান ও গবেষনা কর্ম পরিচালনা করতে পারছেনা । অপর দিকে ছাত্ররাও তাদের পাঠ্যসূচী যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পারছে না। যার ফলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দেখা দিয়েছে সেশনজট। তাই সময়ের দাবী হচ্ছে আমাদের গোটা শিক্ষা কার্যক্রমকে বৃহত্তর জনগোষ্টির আদর্শের আঙ্গিকে পুনর্গঠিত করে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে পরিশুদ্ধ করে আগামী দিনের জাতীয় ভবিষৎ ছাত্র সমাজকে চরিত্রবান জ্ঞান ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে জাতিকে উপহার দেয়া। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রুপ কাঠামো তৈরীর ব্যপারে আমাদের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলের মহৎ প্রয়াস ও আশূ উদ্যেগ গ্রহন । ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের আলোকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার রুপ কাঠামো ও বাস্তব পরিকল্পনা সুধী মহলের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করা হল।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রুপ কাঠামো :

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যা মানব কল্যানমুখী ও স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা তা নিম্নোক্ত রুপরেখার দাবিদার ঃ

১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা একসঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়বিধ প্রয়োজন পূরন করতে সক্ষম। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া দুটো সামঞ্জস্যবিহীন আলাদা সত্তা নয়। তাই পার্থিব প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা করে শূধূমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুষ্ঠান সমূহ যথা ঃ নামাজ, রোজা ইত্যাদি পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে পূর্ন ইসলমী শিক্ষা বলা মারাত্মক ভুল মনে করা হবে। বরং পার্থিব প্রয়োজনে অর্থাৎ দুনিয়ায় সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন জন্য আপন প্রযোজনের তাগিদে মানুষের যে শিক্ষা অপরিহার্য তাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবেশন করা য়ায় তবেই তা ইসলামী শিক্ষায় পরিনত হয়।

২. এ শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ তার স্বাভাবিক ও আভ্যন্তরীন প্রেরনায় যা করতে চায় তাকে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষামূলক করে তোলে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলামে মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন করে ইসলামী আদর্শের ছক দান করতে সক্ষম। তদুপরি পরোক্ষ নীতির মাধ্যমে যথা আজকাল খেলার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান শব্দ তৈরী ইত্যাদি শিক্ষা শিশু বিদ্যার্থীদের নিকট আকর্ষনীয় করা যায় এ পদ্ধতিতে পার্থিব জীবনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিক্ষাকে ইসলঅমী দৃষ্টিকোনে ঘেলে দিলে তা বাস্তব দিক দিয়েঅধিক কার্যকরী হয় যেমন সুদ যে এক প্রকার জঘন্য জুলুম তা সুদকষা অংকের মাধ্যমেই শেখান যাচয় ইসলামের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধান সমূহ স্বাস্থ্য বিজ।এ্রান পড়ানোর মাধ্যমে তুলে ধরা যায় সৌরজগত সম্পর্কে আলোচনাকালে কোরআনের চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কীয় শিক্ষা সমূহ শিক্ষার্থীর সামনে আনা যায় ইত্যাদি এ ভাবে সকল স্ড়রের শিক্ষাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা সম্ভব।

৩. এ শিক্ষাব্যবস্থা এর ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগনকে চিন্তা ও কর্মে আদর্শবাদী মানুষ বানাতে চায়। কেননা কেতাবী বিদ্যা অপেক্ষা বাস্তব উদাহরন অনেক বেশী কার্যকরী হয়। মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় নিয়োজিত আদর্শবিরোধী শিক্ষকদের বুলি ছাত্রদের জীবনে কোন প্রবাব বিস্তার করতে পারে না । বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষ গড়ার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যদি ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শস্থানীয় ও অনুসরনীয় হন তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার কোন ধরনের কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকলেও শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অর্জনে কোন রকম অসুবিধা হবে না।

৪. সর্বোপরি এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশকে ইসলামী দাচে গড়ে তুলতে চায়। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের নিকট নামাজ একটি ঐচ্ছিক কাজে পরিনত হয়েছে। পর্দা প্রথা সেখানে নাজায়েজ হয়ে যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ও যৌন কাজের পথ সহজ হয়েছে। মিথ্যা ওয়াদা ও মিথ্যা প্রচারের

www.icsbook.info

মাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের বিভিন্ন নির্বাচনে জয়ী হওয়া এখন অন্যায় মূলক ও ঘৃন্যনীতি বলে মনে করা হচ্ছে না। পরীক্ষায় গহনটোকাটুকি একটি আর্টে পরিনত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ক্ষেত্রে বিশেষে শিক্ষকদের অশ্লীল গালাগালি ও মারধর করে এবং সামগ্রিক ভাবে মুরব্বী ও শিক্ষকদের প্রতি বেআদবী ও অসম্মান প্রদর্শন করে তথাকথিত নামকরা ছাত্রনেতা হবার প্রাকটিস অহরহই চলছে। তাই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চায় ইসলামী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ অনুসারে শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবন গঠন করে তদন্তনুযায়ী গোটা পরিবেশকে সুষ্ঠু সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাপযোগী করে তুলতে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের পন্থা :

উপরোক্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে উচ্ছ্বসিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্তার রুপরেখা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের দেশে গোলাম জাতির উপযোগী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রবর্তিত তথাকথিত প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এ উভয়বিধ শিক্ষাব্যবস্থাকে পুর্ণগঠিত করে স্বাধীন মুসলিম জাতির উপযোগী একক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের এক বিপবী পদক্ষেপ গ্রহন করা। কারন ইংরেজ গভর্নমেন্ট প্রবর্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লর্ড মেকলের বক্তব্য ছিল: "আমাদের উদ্দেশ্য বৃটিশ রাজ্যের জন্য উক্ত প্রজা এবং কর্মচারী তৈরী করা এবং ভারতীয় জনসাধারনকে তাদের নিজস্ব তাহজীব হতে বিচ্যুতি করে পাশ্চত্য মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা । তদুপরি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেও যে শিক্ষা দেওয়া হতো তাতে ইসলামের কতকগুলো ধর্মীয় দিক যথা নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত বিবাহ তালাক ফরায়েজ ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে কিন্তু ইসলামকে একটি জীবন দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয় না" । কাজেই এই দ্বিবিধ শিক্ষাব্যবস্থাকে একত্রীকরন করে মানব জাতির একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবন দর্শন ইসলামের আলোকে একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যই জরুরী। শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরন জন্য নিম্নে সংক্ষেপে প্রাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে বাস্তব পরিকল্পনা পরামর্শ পেশ করা হল।

১. প্রাথমিক স্তরেই প্রত্যেকটি ছাত্রের সামনে ইসলামের সহজবোধ্য একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে হবে । শিশুর মনে তৌহিদ আখেরাত ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাস জনকাতে হবে। ইসলাম যে নৈতিক ভাবধারা ও মূল্যবোধ পেশ করেছে তা নানা ভাবে পাঠ করে শিশুর মনে বৃদ্ধমূল করে দিহেত হবে। ইসলামের পছন্দনীয় কাজের প্রতি শিশুর মনে আগ্রহ ও অপছন্দনীয় কাজের প্রতি ঘৃনাবোধ জন্মাতে হবে। তদুপরি শিশুকে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের পন্থা যথা পাক পোষাক পরিচ্ছেদ নিয়মাবলী পিতা মাতা আত্নীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে এবং সাথে সাথে দেশের ভৌগোলিক বর্ণনা ও অবস্থা সমাজের পরিচয় নবীদের জীবনী মহৎ ব্যক্তিদের আত্নকাহিনী ইত্যাদি সহজভাবে শিশুদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।

www.icsbook.info

২. মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে কোরআনকে তরজমা সহ বুঝতে পারে এতটুক আরবী শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ স্তরে প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ কোরআন হাদীস ইসলামী আকায়েদ বা ন্যায়শাস্ত্র এবং ইসলামী ইতিহাসের প্রামান্য পুস্তকসমূহ সিলেবাসের অন্তর্ভক্ত করতে হবে। এ পর্যায়ে তাদেরকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সমাজ সভ্যতা এবং আর্থিক আদান প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় নিয়ম কানুন শিখাতে হবে । অন্য কথায় ইসলামী জীবন দর্শনের পূর্ণ ধারনা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যসহ সব প্রকার কল্যাণকর বিদ্যাঅর্জনের ব্যবস্থা ও থাকবে যেগুলো পরোক্ষ নীতির মাধ্যমে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা আলোচিত হবে।

৩. উচ্চ শিক্ষাস্তরে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী জীবনাদর্শকে গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ থাকতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত কলা, সমাজ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদে যাবতীয় বিষয়াবলী অধ্যয়নের সাথে সাথে পবিত্র কোরআনকে অনুবাদ ছাড়া বুঝায় এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ নকশা অধিকভাবে জানার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। শুধু তাইনয় মাস্টার্স ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে একটি বিশেষ বিষয়ের সাথে যেমন অর্থনিতি ও বাণিজ্যের ছাত্রকে ইসলামের অর্থনীতি ও ইসলামের ব্যবসা বাণিজ্য দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রদেরকে ইসলামী দর্শন ইতিহাসের ছাত্রদের দুনিয়ার ইতিহাস জানার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যায়নের প্রকৃত জ্ঞানী হবার সুযোগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং ইসলামী বিষয়াবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. উচ্চতর গবেষনা তথা (এম, ফিল, ও পি এইচ ডি ডিগ্রী) স্তরে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ গবেষনা প্রতিষ্ঠান থাকবে যেখানে উচ্চতর তাত্বিক গবেষনা পরিচালিত হবে। এসব প্রতিষ্ঠান এমন সব জ্ঞানী ও দক্ষলোক নিয়োজিত থাকবেন যারা জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষনার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষকগন শুধু মুসলমানদের নয় বরং যারা দুনিয়ায় ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে তাত্বিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ পাশ্চত্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মত তাদেরকে এম ফিল এম এস ও পি এইচ ডি ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি অগ্রগামী ভূমিকা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

সমাপনী কথা :

প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার সাধনপূর্বক সেগুলোকে ইসলামের সুদৃঢ় নীতির ভিত্তিতে পূর্ণগঠন করেই উল্লেখিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর তথা প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতির আলোকে প্রণীত শিক্ষা

www.icsbook.info

পাঠ্যক্রমই ইসলামী চেতনার সৃষ্টি ও লালনে সাহায্য করতে পারে। প্রসঙ্গত উলেখযোগ্য যে খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী উমাইয়া এবং আব্বাসিয়া মুসলিম শাসনামলে সুদুর আটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়ার প্রান্তসীমানা পর্যন্ত ব্যপক রাজ্যে গড়ে ওঠা বহুজাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস ছিল মানবকল্যাণমুখী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। মধ্য এশিয়ার ভাস্কর্য গ্রীক দর্শন ইরানী সৌকর্য ভারতীয় সাহিত্য ইত্যাদি ছিল তৎকালিন মুসলিম সভ্যতা ও ইসলামী শিক্ষার ফলশ্রুত । রসায়ন শাস্ত্রের উচ্চতর গবষেনা বীজ গনিত আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় মুসলিম মনীষীদের অবদান স্মরনীয় । কিন্তু অহী বিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অস্বীকার করে বতস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোকে গড়ে উঠা শিক্ষাব্যবস্থা ও সভ্যতা মানুষের শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণ ও উন্নতি সাধন আলহামরা কলরোডা সেভিল ও গ্রানাডার বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাও আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে স্থান পেয়েছে। শিক্ষায় অহী ভিত্তিক মূল্যবোদের সামগ্রিক অনুপস্তিতিই এর আসল কারন তবে ইমাম বোখারী রা থেকে শুরু করে ইমাম গাজ্জালী রা ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রা পর্যন্ত অগহনিত মুহাদ্দিস ফকিহ মুজাদ্দিদ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ বস্বত্তান্তিক সভ্যতার যাতাকল থেকে বের হয়ে এসে বেসরকারী উদ্যেগ শিক্ষায় অহী ভিত্তিক মূল্যবোধের অবয়বকে উদ্ধার করার সাধনা করেছেন বলেই আজও বিংশ শতাব্দীর ও যুগ সন্ধিক্ষনে আমরা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মডেল তৈরীর জন্যে চেষ্টা করতে পারি। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সব কিছুই আপন স্থানে কল্যাণকর। এর কোনটার সাথেই ইসলামী শিক্ষার বৈরিতা নেই। জ্ঞানগত বাস্তবতার উপস্থিতি থাকলে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মধ্যে কোন গরমিল বা সংঘর্ষের থাকবে না। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবতার সমর্থক কিন্তু বিশেষ ধরনের মনমানসিকতা যথা পাশ্চত্যপনার বিরোধী মাওলানা মওদুদী তার শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী দৃষ্টিকোন বইতে বলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে গ্রহন করাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে গোমরাহীর মূল কারন নয় বরং গোমরাহীর মূল কারন হল পাশ্চাত্যের নিকট থেকে তাদের বিশেষ ধাচের মানসিকতাই হুবহুগ্রহন করা। সুতারং আধুনিকজ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখা প্রশাখা গুলোতে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে এগুলোকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার দাবী।

উপরোক্ত প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্তা প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে পরীক্ষামূলক কেননা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কোন পূর্ণাঙ্গ ও হুবহু মডেল বর্তমানে আমাদের সামনে নেই এ কারনেই প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রুটি বিচ্যূতি দেখা দেবে তা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা অশেষে একটি স্থায়ী ও কল্যাণময় শিক্ষাব্যবস্তার পূর্ণাঙ্গ মডেলে উপনিত হতে পারবে। প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে যেমনিভাবে আমাদের দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূরন হবে এবং মানসিক দৈন্যের বিলুপ্তি

www.icsbook.info

ঘটবে তেমনিভাবে জাতীয় উন্নতি অগ্রগতি নিরাপত্তা এবং সমৃদি। নিশ্চিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শুধু তাই নয় মুসলিম বিশ্বকে তার বর্তমান নৈতিক অবক্ষয় ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দীনতা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে এটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। এককালে ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা অথবা ইসলামী বীমা ব্যবস্থা যেমন অকল্প নীয় ছিল অথচ তা আজ বাস্তব সত্য এবং অধিকতর কল্যাণকর ব্যবস। তা হিসেবে বৈজ্ঞানিজক ও মানবকলণ্যানমুখি ব্যবস্থা হিসাবে ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে গ্রহন যোগ্য হবে। উল্লেখ্য ঢাকাস্থ ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি শিক্ষায় ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে একটি মডিল তৈরী সিলেবাস কারিকুলাম প্রনয়ন বইপুস্তক লিখা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বেসরকারী ভাবে একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারী ও সংস্কার সাধনে সাঠিকভাবে নেতৃত্ব দেবে বলে সর্বমহলের প্রত্যাশা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা মুসলিম কার্যকরি পদ্ধতি পেশ করে অবদাণ রাখতে পারে।

শিক্ষার প্রচলিত ওইসলামী মূল্যবোধ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থিত হল। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার প্রচলিত মূল্যবোধই প্রনীত এবং তা ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির আদৌ সহায়ক নয়। আমাদের দেশের সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার কোনটাই মুসলমান হিসেবে এমনকি মানুষহিসেবে আমাদের প্রয়োজন পূরন করতে ব্যর্থ প্রমানিত হয়েছে। যেহেতু শিক্ষার ইসলামী মুল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ মডেল আমাদের সামনে নেই তাই অত্যাবশ্যক হচ্ছে এ ব্যাপারে গভীর গবেষনা চিন্তা ভাবনার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো। প্রবন্ধে আলোচিত শিক্ষার ইসলামী মূল্যবোধ একটি তাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা হিসাবে চলতে পারে এ নির্দেশনার আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষার বাস্তব রুপরেখা ও কাঠামো বিভিন্ন দেশ ও জাতির প্রেক্ষাপট প্রনয়নের দাবি রাখে ।স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত রুপরেখা ও বাস্তবায়নের পন্থা পরীক্ষা মূলক ভাবে গ্রহন করার আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী :

১. উইলিয়াম হান্টার ঃ দি ইন্ডিয়ান মোসলমানস দি প্রিমিয়ার বুক হাউস লাহোর ১৯৬৮

২. আবদুল কাদের মোল্লা ও অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত) ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ইসলামীক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা ১৯৮৭

৩. বাংলাদেশের সাধারন কৃষি প্রকৌশল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি (কলা সমাজবিজ্ঞান বানিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক)

৪. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা।

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের শিক্ষা দর্শন জাহানে নও ঢাকা মার্চ ১৯৬৯

www.icsbook.info

৬. বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঢাকা মে ১৯৪৭

৭. শিক্ষাক্রম ১৯৮৫ , ৮৬ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা

৮. ঢাকা কুমিল্লা যশোর ও রাজশাহী বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসুচি (কলা বিজ্ঞান ও বানিজ্য) ১৯৮৯

৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী দৃষ্টিকোন, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা ১৯৮৫

১০. অধ্যাপক খুরশীদ আহম্মদ, ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা ১৯৯০

১১. professor mohammad qutub, the concept of islamic education

১২. অধ্যক্ষ মুঃ আবদুর রব, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রুপরেখা, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা ১৯৯০

১৩. ডঃ মোহাম্মদ লোকমান, শিক্ষা নীতিতে মূল্যবোধ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ একটি মূল্যায়ন শিক্ষা সেমিনার স্মরনিকা ৯২ বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ঢাকা ১৯৯২

১৪. ডঃ মোহাম্মদ লোকমান ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা রুপকাঠামো ও বাস্তব পরিকল্পনা স্মারক সংকলন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ৮৮ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৮

১৫. ডঃ মোহাম্মদ লোকমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা :

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সভাপতি বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ

www.icsbook.info

সময়ের পরিক্রমায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

মুহাম্মদ শামীমুল বারি

মানব সভ্যতার ইতিহাস যতদিনের শিক্ষার ইতিহাসও ততদিনের। মানুষ সর্বপ্রথম আল্লাহতায়ালার নিকট থেকেই প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করে। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টির করার পর মহান আল্লাহ যেদিন তাঁকে সবকিছুর নাম শেখালেন সেদিন থেকে মানব সভ্যতায় জ্ঞানের সূত্রপাত। তিনি সবকিছুর নাম শেখানোর মাধ্যমে বাস্তবিক পক্ষে আদমকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। কোনটির কি ব্যবহার তার মৌলিক জ্ঞান শুরু হয় ঐ বস্তু বা প্রাণীকে জানার মধ্যে দিয়ে। এভাবে স্রষ্টার পক্ষ থেকে সরাসরি জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসেবে আবির্ভূত হয়। আদি পিতার অর্জিত জ্ঞান ও শিক্ষাই বণ্টিত হতে থাকল কালে কালে, সঞ্চিত হতে হতে প্রবৃদ্ধি ঘটল জ্ঞান ভাণ্ডারের তারপর আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) কে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং সাথে দিয়ে দিলেন জীবন যাপনের সামগ্রিক হিদায়াতের জন্য জীবন বিধান বা দ্বীন। আর এই দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার মূল উৎস হলো অহি, আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদের মানবতার পদপ্রদর্শক হিসেবে যতজন নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের সকলেই ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন বা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দ্বীনের আলোকে লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দ্বীনের আলোকে লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। খাতামান্নাবী হিসেবে মহানবী (সা) এর ওপর সর্বশেষে আল কুরআন নাযিল হয়। তিনি কুরআনের আলোকে জনসাধারণকে শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহর সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই হলো ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা। কালক্রমে এ শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্রমবিকাশ ঘটে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তা আলোকপাত করা হয়েছে।

www.icsbook.info

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা) এসেছেন বিশ্ববাসীর জন্য একজন শিক্ষক হিসেবে। (২) তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা ছিল সবচেয়ে কার্যকরী ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা। তিনি এমন এক সমাজকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে সুসভ্য হিসেবে গড়ে তোলেন, যে সমন্বিত উন্নয়ন। (৩) সবচেয়ে সার্থকভাবে একথা বাস্তবায়ন করেন রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যারাই তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন তাদের সকলকেই প্রশিক্ষিত করেন, নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলেন। এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমরা এখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের স্বাক্ষর জ্ঞান দান করতে কত শত প্রচেষ্টা চালায় তারপরও কতটুকুই বা তারা সফল হন। অথচ রাসূল (সা) ছোট-বড়, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ তাঁর অনুসারী সকলকেই একই শিক্ষায়, একই চিন্তাধারায় গড়ে তোলেন। তাঁর শিক্ষানীতি এমন বলিষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্ট ছিল যে, যার আলোকে একমুখী সংগঠিত একটি সমাজ, জাতি গঠন করা সম্ভব হয়। যার প্রভাব এতটাই স্থায়ী ছিল যে শত-সহস্র বছর সে শিক্ষা আলোকবর্তিকার মত বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে।

১.১. শিক্ষার বিষয়বস্তু

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সময়ে পবিত্র কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। তখন ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হতো আর রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসারীগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতেন। সে সময় কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জাগতিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হতো। হাদীস গ্রন্থগুলোতে দেখলে আমরা উপলব্ধি করব, সে সময় কত রকমারি বিষয়ে শিক্ষাদান করেছিলেন রাসূল (সা)। আকিদা বিশ্বাস, ইবাদতের নিয়ম-নীতি, চুক্তি-সাক্ষ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিচার বিভাগীয় ও প্রসাশনিক আইন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তজাতিক আইন, যুদ্ধ ও সমরনীতি, চিকিৎসা ও কৃষি বিজ্ঞান, অতীত জাতির ইতিহাস, সমাজ কল্যাণ, অর্থনীতিসহ প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষাও বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে সুরিয়ানী, ফার্সী, হাবসী, হিব্রুও রোমান ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এসব ভাষায় তখন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১.২ শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনা

অশিক্ষিত, মূর্খ, বর্বর আরব সমাজকে একটি আদর্শে শিক্ষিত করে তুলতে রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ কতগুলো পদক্ষেপ নেন। যেমন,

১. বাসস্থানকেন্দ্রিক শিক্ষা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে বাসস্থানকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। এ সময় হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের (রা) বাসস্থানই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এটি দারুল আরকাম নামে পরিচিত। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট

www.icsbook.info

সাহাবীদের বাড়িকে কেন্দ্র করে স্বঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা প্রদান ও পাঠদান করা হতো।

২. মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ মদীনায় পদার্পণের পর মসজিদে নববী এবং পরবর্তী সময়ে মদীনা ও এর আশেপাশের অন্য আটটি মসজিদে নিয়মিত শিক্ষাদান করা হতো। মসজিদে নববী ছাড়া অন্যান্য মসজিদগুলোতে বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি শিক্ষাদান করলেও এসব মসজিদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষক নির্ধারিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর মক্কাতে অনুপম আরেকটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

৩. সুফফার শিক্ষায়তন : রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেই যে শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেন তা ছিল মসজিদে নববীর একটি অংশকে শিক্ষায়তন হিসেবে নির্ধারণ করা, যার নাম ছিল সুফফা। এটি ইসলামের প্রথম জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়। রাসূল (সা) নিজেই সুফফার যাবতীয় বিষয় দেখাশুনা করতেন। তবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা)। সুফফার শিক্ষার্থীদেরকে রাসূল (সা) নিজেই ইবনুল আস, উবাদা ইবনে সামেত (রা) প্রমুখকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে লাগাতেন।

৪. শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দী মুক্তি : রাসূলুল্লাহ (সা) নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের নিয়োজিত করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদিরা এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বদর যুদ্ধে যে সত্তর জন অমুসলিম গ্রেফতার হয় তন্মধ্যে যারা লেখাপড়া জানতেন তাদের মুক্তিপণ ছিল প্রত্যেকে দশজন নিরক্ষর লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেবে। এভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দী মুক্তি লাভ করে। এ ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

৫. শিক্ষা বিস্তারের জন্য লোক প্রেরণ ঃ ইসলামী শিক্ষা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়লে সুফফার শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবীদের শিক্ষক বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আত্তাব ইবনে উসাইদ ও মুআজ (রা) কে লোকদের কুরআন শেখানো এবং দীনের জ্ঞান দান করার জন্য মক্কায় রেখে যান। এমনিভাবে নাজরান এলাকায় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) কে, ইয়ামনে মুআয ইবনে জাবাল ও আবু মুসা আশআরি (রা) কে প্রশাসনিক কাজ ও শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন। এভাবে বিভিন্ন লোকেরা রাসূল (সা) এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে শিক্ষক চেয়ে পাঠাতেন এবং তিনি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষক সে এলাকায় পাঠাতেন। ফলে দ্রুত ইসলামী শিক্ষা আরবের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

১.৩. শিক্ষার অন্যান্য দিক

ক. প্রাথমিক শিক্ষা ঃ রাসূল (সা) বয়স্কদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার সাথে সাথে শিশু শিক্ষার প্রতিও নজর দেন। ফলে বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিশু শিক্ষা নিকেতন গড়ে ওঠে। তিনি বদর যুদ্ধের শিক্ষিত বন্দীদেরকে শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠক হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সমধিক খ্যাত ছিলেন।

www.icsbook.info

খ. নারী শিক্ষা ঃ একটি সফল, পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সমাজ বিপ্লব সাধন করতে হলে নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে, এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা) ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি নারী শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন। তিনি পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও আলাদাভাবে নির্দিষ্ট সময়ে তালীম দিতেন। ঈদের মাঠে দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে গিয়ে বক্তব্য রাখতেন। নারী শিক্ষার প্রতি তিনি ভীষণভাবে তাগিদ দিতেন, উৎসাহ জোগাতেন। এ কারণে হযরত সুফিয়া, খানসা, আতিকা, জয়নব, মাইমুনা, রুকাইয়া (রা) এর মত বড় বড় কবি, হযরত আয়েশা (রা) এর মত প্রসিদ্ধ নারীদের দেখা যায়। যাদের জ্ঞান-গরিমা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশি মনে করা হতো। যে আটজন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) হলেন দ্বিতীয়। কারো কারো মতে ইসলামী শরিয়তের বিধানে এক-চতুর্থাংশে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। (তাবাকাতে ইবনে সাদ ২য় খণ্ড পৃ : ৭২১)

হাদীস বর্ণনাকারীদের গ্রন্থ 'আসমাউস বিজাল'। এতে প্রায় এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একশ পঞ্চাশ জন হচ্ছেন মহিলা সাহাবী। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, সে যুগে নারি শিক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

গ. ক্রীতদাস-দাসীদের শিক্ষা : সমাজের সকল স্তরে যাতে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয় সে দিকেও রাসূল (সা) নজর দেন। তিনি ক্রীতদাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার সাথে সাথে তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দেন। হযরত বেলাল, সালমান ফরর্সি, খাব্বাব, ইয়াসার, আম্মার, যায়েদ ইবনে হারেসা, সুমাইয়া (রা) সহ এমন নারী-পুরুষ সাহাবা পাওয়া যায়, যারা শিক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, যোগ্যতার কারণে ইতিহাস খ্যাত হয়েছেন, অথচ তারা ছিলেন ক্রীতদাস-দাসী মাত্র।

১.৪. শিক্ষাদান পদ্ধতি

আল্লাহর নিদর্শন, কিতাবের জ্ঞান, হিকমত শিক্ষাদান এবং অন্তরকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা) কে পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) অত্যন্ত আকর্ষণীয়, প্রভাবশালী পদ্ধতিতে কার্যকরভাবে শিক্ষাদানের এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি মৌখিকভাবে এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। মূলত কার্যকর এ দু'পদ্ধতিতেই তিনি শিক্ষাদান করেন, শুধুমাত্র বক্তব্য দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না, তা বাস্তবে আমল করে দেখাতেন। ফলে তার সকল শিক্ষাই হতো অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রাণবন্ত এবং প্রভাবশালী। তাই তার অনুসারীগণ একটি শিক্ষাকে খুব সহজেই দৃঢ়তার সাথে আত্মস্থ করতে পারতেন। মূলত রাসূল (সা) এর সাথীরা তাঁর কাছে শুনে মৌখিক (Theoritical) জ্ঞানার্জন করতেন, আর তাঁর জীবন চরিত্র দেখে বাস্তব (Practical) শিক্ষাগ্রহণ করতেন। যেমন তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু বলেছেন, 'তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।'

www.icsbook.info

২. খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রদর্শিত শিক্ষাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন তাঁর চার খলিফা। নতুন নতুন এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁরাও ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলেন সেসব এলাকায়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতার কারণে শিক্ষিত লোকদের প্রয়োজন বেড়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (৬৩২-৬৪৪ খৃ.), হযরত উমর ফারুক (৬৪৪ খৃ.), হযরত উসমান (৬৫৬ খৃ.) এবং হযতর আলী (রা) (৬৬১ খৃ.) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন খ্যাত রাসূলুলল্লাহর (সা) চার খলিফা। চার খলিফাই ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও পণ্ডিত। এ সময় ইসলামী শিক্ষা এক প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিজিত এলাকার লোকদের অতি সহজে এবং দ্রর্ত ইসলামী শিক্ষায় কিভাবে দীক্ষিত করা যায় এ ব্যাপারে তারা কার্যকরী উদ্যোগ নেন।

২.১. কুরআন গ্রন্থবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ও সম্প্রচার : ইয়ামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজে কুরআন শহীদ হলে আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবিতের (রা) মাধ্যমে কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একটি প্রামাণ্য সংকলন তৈরি করেন। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রা) তার শাসনামলে সাম্রাজ্যের সকল স্থানে এই নির্ভুল কপি বিতরণ করে কুরআনকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন।

২.২. মসজিদভিত্তিক শিক্ষা : এ সময়ে রাষ্ট্রের সকল মসজিদগুলোই ছিল একাধারে ইবাদাত, জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, প্রশাসনিক কার্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে গণশিক্ষা চালু হয়। হযরত উসামন (রা) রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মসজিদগুলোতে বক্তৃতা (Lecture) পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হযরত উমর (রা) মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বায়তুলমাল থেকে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

২.৩. গণশিক্ষা : শিক্ষা সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য খলিফাগণ এ সময় ব্যাপক উদ্যোগ নেন। হযরত উমর (রা) বেদুঈনের শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিজিত এলাকার লোকদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করার জন্য তিনি শিক্ষক প্রেরণ করেন।

২.৪. হযরত উমর (রা) শিক্ষিত ব্যক্তিদের- সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং হস্তলিখন, অংক শিক্ষা, অশ্ব চালানা, বিশুদ্ধ কোরআন পাঠ, আরবি সাহিত্য পাঠ, প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন।

২.৫. অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা :

হযরত উসমান (রা) কুরআন মজিদত শিক্ষাদানের পাশাপাশি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, কাব্য চর্চা, ভুগোলসহ অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা

www.icsbook.info

করেন। হযরত আলী (রা) কে আরবি বাকরণের জনক বলা হয়। তার রচিত 'দিওয়ানে আলী' আরবি সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি।

৩. উমাইয়া আমল

খুলাফায়ে রাশেদীনের পরে ৬৬১-৭৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪ জন শাসকের উমাইয়া শাসনামলেও ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এ আমলের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন খলিফা যেমন খলিফা আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, ওমর বিন আবদুল আজিজ এক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। এ সময় মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা এবং মিসর প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো হলো ঃ

১. আরবি ভাষা রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা লাভ করে।

২. আরবি ভাষায় হরকত নুকতা প্রবর্তিত হয় এবং উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে।

৩. প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে সুমাইয়ের কর্তৃক কুরআনের তাফসীর রচিত হয়।

৪. ফরাসিতে লিখিত অনেক মৌলিক ও বিখ্যাত গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়।

৫. ছাত্রবৃত্তি ও শিক্ষকদের বেতন নীতি ঘোষিত হয়।

৬. হাদিস সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হয়।

৭. চিকিৎসা, রসায়ন, ফলিত বিজ্ঞান, জ্যোতির্বদ্যার ওপর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৮. হাসপাতাল, অবৈতনিক বিদ্যালয়, মক্তব প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

৯. ইলমে ক্বিরআত ও ফিকহ্ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।

১০. সাহিত্য চর্চা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

১১. গ্রন্থাগার (Library) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২. গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে বাড়িতেই শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আব্বাসীয় আমল

আব্বাসীয় ৩৭ জন খলিফার শাসনামল (৭৫০-১২৫৮) মুসলিম শাসনের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম সময়। কাজেই এ সময়ে ইসলামী শিক্ষার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটে তাকে ঐতিহ-াসিকগণ 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ আমলের খলিফাগণ তাদের সামরিক বিজয়াভিযানের পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেন। ফলে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্ব অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ আমলেই ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটি সিস্টেম হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষার বিবর্তনে আব্বাসীয় শাসনামলের যেসব পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য তা সংক্ষেপে নিন্মরূপ :

১. ধ্বংসপ্রায় ইরাকি, মিসরীয়, গ্রিক ও পারস্য শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংরক্ষণ এবং বিকাশ সাধন করা হয়।

২. শিক্ষা, চিকিৎসা, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, মহাকাশ, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাপক গবেষণা ও উন্নয়ন ঘটানো হয়।

৩. উল্লেখিত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন প্রাধান্য পায় এবং আরবি বর্ণ পরিচয় হস্তলিপি বিদ্যাসহ কুরআনের বিশেষ অংশ মুখস্থ করানো হতো।

৫. গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবন (Innovation) এবং আবিষ্কার (Invention) উৎসাহিত হয়।

৬. শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চ ও দু'স্তরে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।

৭. গৃহশিক্ষক ও সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি, পল্লী ও শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধান এবং নারী শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৮. চিকিৎসা রসায়ন, গণিত, ফলিত বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতি বিজ্ঞানের ওপর অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৯. দেশের বিভিন্ন স্থানে মাযহাব ভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১০. মসজিদভিত্তিক পাঠ দানের প্রবর্তন করা হয়।

এ আমলের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

১. বায়তুল হিকমা : খলিফা আল মামুন উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদে ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মধ্য যুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব দাবি করতে পারে। এর সাথে একটি বিরাট গ্রন্থাগারও ছিল। বিখ্যাত গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-খারিযমী ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক।

২. নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় : সেলজুক বংশের খলিফা আলাপ আরসালান কাজা হাসান নামক জনৈক পণ্ডিতকে নিযামুল মূলক উপাধিতে ভূষিত করে উজিরে আযম নিযুক্ত কনের। তিনি ১০৬৫-১০৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাগদাদে বিখ্যাত। নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ইসলামের প্রকৃত উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীও দীর্ঘ চার বছর নিযামিয়ায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এখানে অধ্যাপকগণকে উচ্চহারে বেতন দেয়া হত এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

www.icsbook.info

৩. তাজিয়া কলেজ ঃ সেলজুকদের অন্যতম উযীর তাজ-উ-দ্দৌলা বিখ্যাত তাজিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য উচ্চ হারে বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় : স্পেনে উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হতো। বিভিন্ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল বিধায় কর্ডোভাকে 'পণ্ডিত প্রসূ' বলা হতো। এটি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র।

৫. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় : ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমী বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহার মিসরে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এটি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ লাভ করে। এ বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এখনও চলছে।

৬. মুস্তনসিরিয়া : খলিফা আল মস্তানসির ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত মুস্তানসিরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠিনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অধ্যাপকগণ সরকারি তহবিল থেকে মাসিক ভাতা পেতেন তেমনি ছাত্রগণও ভাতা এবং খাবারের রেশন পেতো।

৫. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

৭১২ খিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্দু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে ভারতে মুসলিম শাসনের বিস্তৃতি ঘটে। একই সাথে ইসলামী শিক্ষাও বিস্তার লাভ করে। সুলতান মাহমুদের (১০০১-১০৩০) সতের বার ভারত বিজয় পুরো ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুক্ত করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুলতান মাহমুদের অবদান অনস্বীকার্য। গজনীকে তিনি তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি তখনকার জগৎ-সেরা প্রায় চারশয়ের অধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রখ্যাত ফেরদৌসী, আল-বেরুনী ছিলেন তার দরবারেরই ব্যক্তিত্ব।

সুলতান শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরি (১১৭৪-১২১০)– (মুহাম্মদ ঘোরির জামাতা) মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, মক্তব, খানকা পরিচালনা, কুরআন-হাদীস, ফিকহ, উসুল শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজে অবদান রাখেন।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বাংলা বিজয়ের পরে এখানে মসজিদ, মাদরাসা নির্মিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬), তার সুযোগ্য কন্যা সুলতানা রাজিয়া, পুত্র নাসির

www.icsbook.info

উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬-৬৬) ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা, সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান গিয়াজ উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৬), খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দীন খিলজী, সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী, তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩১৫-৫১), ফিরোজ শাহ্ তুঘলক (১৩৫১-৮৮) প্রমুখের আমলেও এ উপমহাদেশে ইসলাম শিক্ষার বেশ উন্নতি সাধিত হয়। কুরআন-হাদিস ছাড়া তারা তর্কশাস্ত্র, গ্রিক ও মুসলিম দর্শন, শরীরবিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং বেশ অগ্রগতিও পরীক্ষিত হয়।

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী এবং সেন শাহী বংশের জনক আলাউদ্দীন সেন শাহ্ বাংলায় শিক্ষার যে সুযোগ সৃষ্টি করেন তা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেউ কোন দিন ভুলবে না। তাদের আমলেই সামরিক শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং টোল প্রথা চালুর মাধ্যমে হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর মুঘল সম্রাটগণ এ উপমহাদেশ দীর্ঘদিন শাসন করে। প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১), সম্রাট হুমায়ুন, সম্রাট শের শাহ (১৫৪০-৪৫) প্রমুখ রাস্তাঘাট নির্মাণে বিদেশী নিয়োগ, মসজিদ, মাদরাসা, বিদ্যালয় নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৫), শাহাজাহন (১৬২৭-১৬৫৮ এবং আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) নিজেরা যেমন উচ্চ শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন তেমনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতেও কসুর করেন নি। তাদের আমলে মসজিদ-মাদরাসার সংস্কার সাধিত হয় ব্যাপকভাবে। বিশেষত সম্রাট আওরঙ্গজেব (আলমগীর) পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্টে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' ইসলামী আইন ও ফিক্হ শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃ হিসেবে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে।

৫.২ শিক্ষাস্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সেসময় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মকতব, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ফার্সী মাদরাসা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য আরবি মাদরাসা ছিল। সুলতান মাহমুদ গজনবীর শাসনকাল থেকে কোম্পানির শাসনকাল পর্যন্ত (১০০১-১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) ফার্সি ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ ভাষা শিখতো।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে শিহাবুদ্দিন ঘুরি (মূল নাম : মুয়েজুদ্দীন মুহাম্মদ সাম) ভারতে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের পর দিল্লিতে সর্বপ্রথম বড় আকারের ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসায়ে মুয়েযীয়া নামে এটি খ্যাতি পায়। পরবর্তী বাদশাহ কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) আজমিরে 'আড়াই দিনের ঝুপড়ি' নামে খ্যাত একটি

www.icsbook.info

বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। (হিন্দু ও পাকিস্তান যে মুসলমানুঁকা নিযামে তালীম ও প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম)। সুলতাম মুহাম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১) আমলে শুধু দিল্লিতেই এক হাজার মাদরাসা ছিল। ম্যাকস মুলায়ের শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবল বাংলাদেশেই আশি হাজার বিদ্যালয় ছিল। স্যার জন এডামের রিপোর্ট অনুসারে বাংলা-বিহার ১ লক্ষ বিদ্যালয় এবং প্রতি ৪০০ জনের একটি করে বিদ্যালয় ছিল।' এ ধরনের অসংখ্য পরিসখ্যানে দেখা যায় সে সময় শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং শিক্ষা ছিল সার্বজনীন্।

৫.৩. পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

কুরআন তেলাওয়াত, কিরাআত, অক্ষর পরিচয়, হস্তাক্ষর শিক্ষা, প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা দান ছিল প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয়। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বিষয় ছিল ব্যাপক। এ সময়কার পাঠ্য সকল বিষয়কে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। ১. আল ইলুমুল নাকলিয়া, যাকে উলুমে শরিয়া বলা হতো। ২. আল উলুমুল আকলিয়া, যাকে ইলুমে নাজরিয়া বা তাত্ত্বিক জ্ঞান বিভাগ বলা হতো। উলুমে শারিয়া বিভাগে থাকতো, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, মিরাজ, আরবি ও ফার্সি সাহিত্য, ইলমে বয়ান-ইলমে তাসাউফ, ইতিহাস ইত্যাদি। আর উলুমে নাজরিয়া বিভাগে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গণিত, কৃষি ও চিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের সকল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝ থেকেই বের হয়ে আসতো গবেষক, চিন্তাবিদ, বিচারক, প্রশাসক, টেকনিশিয়ান, চিকিৎসক এবং বিভিন্ন পেশার লোক।

এ সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অতি চমৎকার। শিক্ষক যে বিষয়ে, ক্লাসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন সে বিষয়টিই পুনরায় ক্লাসের একজন ভালো ছাত্র পড়াতো। একে সর্দার পড়ুয়া পদ্ধতি বলা হতো। এ পদ্ধতির অনুকরণে Dr. Andrew Bell উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে Monitor System' না দিয়ে তা প্রয়োগ করেন, যা এখন এক আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। ক্লাসেই ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন পাঠ প্রস্তুত করে নিত এবং ক্লাস শেষে বিরতির মাঝে সবাই মিলে গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা করত। যাকে 'মুতায়ালা' বলা হতো।

এছাড়া উপরের ক্লাসের ভালো ছাত্ররা নিচের ক্লাসে শিক্ষাদান করতো। এ সময় পাঠ্য গ্রন্থাবলির গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে তিনভাগে ভাগ করে পড়ানো হতো। এক. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি : আধুনিককালের lecture Method-এর মত শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্য বুঝাতেন। দুই, মধ্যম পদ্ধতি ঃ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হতো এবং বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংশয় নিরসন করা হতো। তিন. ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি : উপরিউক্ত দু'পদ্ধতি ছাড়াও ব্যাপক ব্যাক্যা এবং উপমা-উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্তপ্রসারিত করার চেষ্টা চলতো।

www.icsbook.info

৫.৪. শিক্ষা সমাপন ও উপাধি

১৪/১৫ বছর বয়সেই শিক্ষা সমাপন হতো। শিক্ষা শেষে শিক্ষা সমাপনী সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। সেদিন 'ফাতেহা ফেরাগ' পাঠ করে শিক্ষা সম্পাদনকারি ছাত্রদের জন্য দোয়া করা হতো। এ অনুষ্ঠানকে 'ফাতেহা ফেরাগ' বলা হতো। আধুনিক সমাবর্তন বা convocation- এর ধারণা এই 'ফাতেহা ফেরাগ' থেকে হয়।

ফার্সি মাদরাসার সমাপনকারিকে মুন্সী এবং আরবি মাদরাসা সমাপনকারিকে আলিম খেতাব দেয়া হতো। মুঘল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম হাসিলকারীকে 'দানিশ মান্দ' বলা হতো। পরবর্তীতে একে মৌলভি বলা হতো। ফার্সি মাদরাসার শিক্ষকদের মিয়াজী, আখন্দজী কিংবা মোল্লাজী বলা হতো। আর আরবি মাদরাসার শিক্ষকদের মৌলভী বা মোল্লা সাহেব বলা হতো।

সমাপ্তি কথা

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসের ওপর ব্যাপক আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উপনৈবেশিক শাসনামলের পূর্বেকার ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খোলাফায়ে রাশেদিন, উমাইয়া, আব্বাসীয় অথবা উসমানীয় খেলাফত এমনকি মুঘল সাম্রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল Integrated, সেখানে একজন মিলিটারি অফিসার কিংবা সিভিল সার্জেন্টস একদিকে যেমন কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ্ জানতেন, অপরদিকে তেমনি অন্যান্য সাধারণ বৈষয়িক বিষয়ও জানতেন। অর্থাৎ অনুর্ধ দু'শ বছরের আগ পর্যন্তও শিক্ষাব্যবস্থা Unified System-এ ছিল। অথচ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় Ethics & Moality কে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই নীতি নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা জাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থ। এর এক সোনালি অতীত রয়েছে। দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয়ে গড়া এ শিক্ষাব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আবারো ইসলামের সেই গৌরবময় দিনগুলো ফিরে পাবে মুসলিম বিশ্ব।

১. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব ও এ. এস. এম. আলাউদ্দীন, ইসলামী এডুকেশন সোসাইটি।
২. হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুঁকা নিযামে তালীম ও তারবিয়াত, প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম।
৩. শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী
৪. Education in Early Islamic Period, Dr. Zafar Alam
৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।
৬. শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৭. ইসলামী শিক্ষা সংকলন, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
৮. তাবাকাতে ইবনে সাদ, ২য় খণ্ড।

লেখক, রিসার্চ স্কলার, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

www.icsbook.info

এক নজরে বিগত সময়ের শিক্ষানীতি ও কমিশন রিপোর্ট

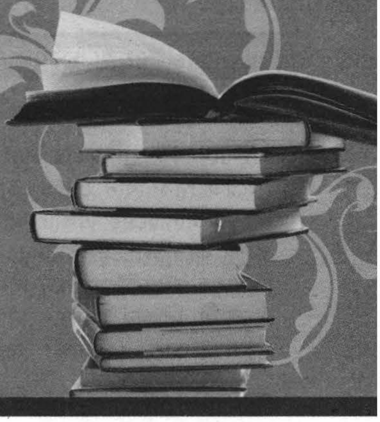

মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

শিক্ষাই আলো, শিক্ষাহীনতা হলো অন্ধকার (আল-ইলমু নূরুন ওয়াল কুফরু যুলুমাত)। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষের জীবন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হজরত আদম (আ)-কে মহান রাব্বুল আলামিন জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়েছেন। দুনিয়াতে রাব্বুল আলামিন ১৮ হাজার মাখলুকাত (সৃষ্টি) পাঠিয়েছেন, তন্মধ্যে একমাত্র সৃষ্টি মানুষকে সেরা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন। সতের হাজার নয়শত নিরানব্বইটি সৃষ্টির মধ্যে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, মহিষ, গড়িয়াল ইত্যাদি অসংখ্য প্রাণী আছে যেগুলো শক্তি ও হিংস্রতার দিক থেকে মানুষের চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু এ পর্যন্ত সব ধরনের প্রাণীকেই মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে কেবলমাত্র জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। পঞ্চম শতাব্দীতে আরবের মানুষগুলো জাহিলিয়াতের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল শুধুমাত্র জ্ঞানের অভাবের কারণে। পরবর্তী সময়ের সকল ঐতিহাসিকরাই ঐ সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আইয়ামে জাহিলিয়াতকে আলোকিত সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য রাসূলে করীম (সা)-কে যে ঐশী নির্দেশনা দিয়ে পাঠালেন তার প্রথম কথাই ছিল "ইক্বরা" পড়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই নির্দেশের আলোকে মানবতার মহান শিক্ষক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই দুনিয়াবাসীকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। মানুষের শিক্ষার এই ধারা সূচিত হয়েছে মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে। সূচনাতে জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান প্রদানের বিষয়টি নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। একজন ব্যক্তি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজে গিয়ে শিক্ষা দিতেন বা জ্ঞান পিপাসুরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদ্বানের কাছে আসতেন, যা ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিকুলাম থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পর্যায়ে

www.icsbook.info

এসে উপনীত হয়েছে। আমরা এখানে গোড়ার দিকে না গিয়ে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতায় আধুনিক শিক্ষানীতি ও কমিশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি।

বাংলাদেশ-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা ও কমিশন রিপোর্ট

বাংলাদেশের বয়স ৪০ বছর হলেও শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পুরনো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের ২৫ বছর এবং তার পূর্ববর্তী ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনাধীন ভারত, তারও পূর্বের শত বছরের মুসলিম শাসনাধীন নিখিল ভারত বিশ্বের মানচিত্রের একটি অতিপরিচিত নাম। ভারতের ঐশ্বর্য যুগে যুগে বিদেশীদের প্রলুব্ধ করেছিল। মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন কাশিম এদেশে আসেন। মুসলমানরা এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। এরপর ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজরা আসে। এর পরপরই আসে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরা। তারা শিক্ষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

পর্তুগিজরা ধর্মীয় শিক্ষার (খ্রিস্টান ধর্ম), ওলন্দাজদের শিক্ষায় প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী তৈরি করার প্রতি এবং ফরাসিরা ভাষা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়। দিনেমাররা প্রথম কিছুটা আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। তারপর ইংরেজরা এদেশে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণয়নের ইতিহাস আমাদের বেশ উজ্জ্বল। ব্রিটিশ ভারতে ১৭৯২ সালে সর্বপ্রথম চার্লস গ্রান্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। প্রায় দুইশত বছরের শাসনামলে নিজেদের আদর্শিক প্রয়োজন ও স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেন-

১. ১৭৭২ : চার্লস গ্রান্ট শিক্ষা কমিশন

২. ১৮১৩ : কোম্পানি সনদ

৩. ১৮৩৫ : লর্ড ম্যাকলে কমিটি

৪. ১৮৩৮ : উইলিয়ামস অ্যাডামস কমিটি

৫. ১৮৫৪ : উডস এডুকেশন ডেসপাচ

৬. ১৮৮২ : স্যার উইলিয়াম হান্টার শিক্ষা কমিশন

৭. ১৯০৪ : লর্ড কার্জন শিক্ষা কমিটি

৮. ১৯১২ : স্যার রবার্ট নাথান শিক্ষা কমিটি

৯. ১৯১৯ : এম ই স্যাডলার শিক্ষা কমিশন

১০. ১৯২১ : স্যার সৈয়দ শামছুল হুদা কমিটি

১১. ১৯২৯ : স্যার ফিলিপ হার্টোগ কমিটি।

www.icsbook.info

১২. ১৯৩১ : খান বাহাদুর খিলজী মোহাম্মদ আব্দুল মোমিন কমিশন

১৩. ১৯৩৪ : স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু কমিটি

১৪. ১৯৩৭ : উড এ্যাবোর্ট রিপোর্ট ও ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা

১৫. ১৯৪৪ : জন সার্জেন্ট শিক্ষা কমিশন।

পূর্ব পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ আগস্ট তারিখে এ উপমহাদেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ সদ্যজাত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তন অবস্থার চাহিদা পূরণার্থে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বহু কমিশন ও কমিটি গঠন করে দেশে প্রচলিত বৃটিশ ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য প্রয়াস চালান। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তায় ইসলামী ভাবধারার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণও সোচ্চার দাবি তোলেন।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছরের মধ্যে পাকিস্তান শাসন আমলে নিম্নোক্ত কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়।

১. ১৯৪৯ : মাওলানা আকরম খান শিক্ষা কমিটি

২. ১৯৫৬ : উপদেষ্টা আশরাফুদ্দিন চৌধুরী পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি

৩. ১৯৫৭ : আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন

৪. ১৯৫৯ : এস এম শরীফ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

৫. ১৯৬৩ : ড. এস এম হোসাইন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

৬. ১৯৬৬ : হামুদুর রহমান (ছাত্র-সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয়) কমিশন রিপোর্ট

৭. ১৯৬৯ : এয়ার মার্শাল এম নুর খান শিক্ষানীতি

৮. ১৯৭০ : শামসুল হক শিক্ষা কমিটি

১৯৪৯ : মাওলানা আকরম খান শিক্ষা কমিটি

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে সুপারিশমালার আলোকে দেশের সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সময়োপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে সরকার প্রয়াসী হন, জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকূল

www.icsbook.info

সাড়া দিতে গিয়ে সরকার ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ মার্চ শিক্ষাসমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা আকরম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি আকরম খান শিক্ষা কমিটির নামে পরিচিত ।

১৯৫৬ : উপদেষ্টা আশরাফুদ্দিন চৌধুরী পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি

পূর্ব বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটির নাম ছিল পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি। জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরী এ কমিটির চেয়্যারমান মনোনীত হন। তার নামানুসারে এ কমিটি আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি নামে খ্যাত।

যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল : ১. পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা চিহ্নিত করত তা দূরীকরণ ও দেশের জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করা। ২. দেশের উভয় ধারার শিক্ষা সমন্বিত করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা কোন স্তর প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের সমান হবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা। ৩. মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রমে কিভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমাবেশ ঘটানো যায় সে ব্যাপারেও সুপারিশ করা যাতে এ ধারার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সমাপনান্তে সম্মানজনকভাবে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৫৭ : আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বাস্তবিকভাবে শিক্ষার কোন উন্নয়ন হয়নি। এমনকি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দেই মাওলানা আকরম খান কমিশনে বহু মূল্যবান সুপারিশ করা হলেও সুপারিশসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি।

পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত পুঁথিকেন্দ্রিক ও সেকেলে প্রকৃতির, জীবন ও যুগের চাহিদার নিরিখে পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ৫২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয় । এ কমিশনের চেয়্যারমান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। চেয়ারমান নামানুসারে এ কমিশন রিপোর্ট আতাউর রহমান খান কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সংস্থার মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ওপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন।

www.icsbook.info

১৯৫৯ : এস এম শরীফ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি পাকিস্তান তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দেন এবং আধ্যাত্মিক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যমানসমূহ আরো সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এমন একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন তা কৃষিবিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নে সহায়তা করত জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারে। চরিত্র গঠন উন্নতমান অর্জন এবং শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টির দিকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত। তিনি আরো বলেন, কমিশনকে দেশের সমগ্র জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদ সর্বতোভাবে কাজে লাগাবার উপায় কী তার পন্থা নির্দেশ করতে হবে। কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়ঃ যে প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশন নিযুক্ত হয় তার ভূমিকায় বলা হয়েছে পাকিস্তানের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা জাতির অভাব পূরণের ও প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা দেশের আর্থ কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সমন্বয় ও সুষম উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানার্থে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের যথাযোগ্য পন্থা সুপারিশ করার জন্য একটি উপযুক্ত কমিশন গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অতএব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নিম্নোক্ত সদস্যদেরকে নিয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন-

১. চেয়ারম্যান: এস এম শরীফ, সেক্রেটারি- শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম পাকিস্তান

২. সদস্য: ড. রাজিউদ্দিন সিদ্দিকী, সদস্য-আণবিক শক্তি কমিশন

৩. " কর্নেল এম কে আফ্রিদী, ভাইস-চ্যান্সেলর- পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

৪. " বি এ হাশমী, ভাইস চ্যান্সেলর- করাচি বিশ্ববিদ্যালয়

৫. " ড. মোমতাজুদ্দিন আহমেদ, ভাইস-চ্যান্সেলর- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৬. " এ এফ এম আব্দুল হক, প্রেসিডেন্ট- এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা

৭. " প্রফেসর আতোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮. " ড. রশীদ, অধ্যক্ষ- ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

৯. " ড. আর এম উইং, ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর

১০. " কর্নেল মোহাম্মদ খান, পরিচালক- সামরিক শিক্ষা বিভাগ

১১. " ব্রিগেডিয়ার এস হামিদ শাহ, ডাইরেক্টর অব অর্গানাইজেশন- জেনারেল হেড কোয়ার্টার

www.icsbook.info

১৯৬৩ : ড. এস এম হোসাইন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ হিসেবে দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে দেশের মাদরাসা ছাত্র ও ইসলাম দরদি জনতার আন্দোলন দিনদিন তীব্রতর হতে থাকে। এ আন্দোলনের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তদানীন্তন সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করে। তারই প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে মে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করে।

কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

১. চেয়ারম্যান ড. এস এম হোসাইন, ডি ফিল বিভাগীয় প্রধান- আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২. সদস্য ড. এ ও গনী- ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩. " ড. মমতাজ উদ্দিন আহমদ- প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৪. " ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ- প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫. " অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা ও রেজিস্ট্রার পূর্বপাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

৬. " আলহাজ্জ সুফী আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ, পীর সাহেব শর্ষিনা

৭. " মোঃ সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া, এম এ

৮. " মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ- সিলেট আলিয়া মাদরাসা

১৯৬৬ : হামুদুর রহমান (ছাত্র-সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয়) কমিশন রিপোর্ট

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তার রিপোর্ট জমা দেন ও কমিশন কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের সুপারিশমালা ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল পাকিস্তান সরকার অনুমোদন করে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে সুপারিশমালার আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন শুরু করেন। এদিকে কমিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে সুপারিশকৃত পূর্ব পাকিস্তান এবং সেপ্টেম্বর মাস পশ্চিম পাকিস্তানের অধ্যাদেশ আকারে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। সরকারি ঘোষণার পরই এক বছরের মধ্যে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ভাগেই প্রথমে পূর্বপাকিস্তান এবং কিছু পরে পশ্চিম পাকিস্তানে আগুনঝরা ছাত্র আন্দোলন খুব জোরেশোরে শুরু হয়। তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে সংস্কার সাধন শুরু করা হয় তার বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হতে লাগলো। ফলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এইসব আন্দোলনমুখী ছাত্রদের হটাবার জন্য আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহারে বাধ্য হতে হল। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণভাবে এ শিক্ষা

www.icsbook.info

সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। এই ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে এক হরতালের আহবান করা হয়। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অনুসরণে পশ্চিম পাকিস্তানেও ছাত্র আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং হরতাল ও অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলতে থাকলে দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যথাক্রমেই সরকার বিরোধী রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। ফলে সরকার পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে তিন বছর মেয়াদি প্রস্তাবিত ডিগ্রি পাস কোর্স পরিহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর তারিখে সর্বপ্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পেশোয়ার শহরে এমনি এক দুর্যোগ মুহর্তেও দেশের সংকটাপন্ন ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুলতানে ঘোষণা করেন যে ছাত্রদের সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করবে। এ পরিস্থিতিতে সরকার এ কমিশন গঠন করেন এবং তাদের কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেন।

কমিশনের সদস্যবৃন্দ হলেন

১. চেয়ারম্যানঃ মি. জাস্টিস হামুদুর রহমান, বিচারপতি- পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট

২. সদস্য জাস্টিস এম এ মাহমুদ, বিচারপতি- হাইকোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান

৩. সদস্য কাজী আনওয়ারুল হক, চেয়ারম্যান- সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন

৪. সদস্য ড. মুমতাজুদ্দিন আহমেদ, ভাইস চ্যান্সেলর- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৫. সদস্য মি. নাসির আহমদ, চেয়ারম্যান-পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন

১৯৬৯ : এয়ার মার্শাল এম নুর খান শিক্ষানীতি

ব্রিটিশ শাসকদের কতৃক প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশে চলে আসছে। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ দেশের শিক্ষিতের হার খুবই নিচু মানের। অবৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কলা বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই বললেই চলে। তাছাড়া যথাযথ শিক্ষা পরিকল্পনার অভাব ও প্রচলিত শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব খবই প্রকট। এমনি এক পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী জাতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যাতে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেশের উভয় অংশে সমভাবে বণ্টিত হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসমতা দূরীভূত করা সহজতর হয়। এই বিষয়কে সামনে রেখে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ

www.icsbook.info

আইউব খানের নির্দেশনায় কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশের কয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে 'স্টাডি গ্রুপ' নিয়োগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গঠিত কয়েকটি স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম নূর খানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে।

প্রতিক্রিয়া

উক্ত শিক্ষানীতিতে ইসলামী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি তোলে। ১৯৬৯ সালের ২ আগস্ট 'নিপা' কর্তৃক প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি আবদুল মালেক ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি কী হবে তার ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উপস্থিত আয়োজক ও দর্শকরা আবদুল মালেকের বক্তব্যের পক্ষ্যে সমর্থন জানান। এই ঘটনায় সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অতঃপর ১২ই আগস্ট ঢাকসু'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে প্রস্তাবিত শিক্ষনীতির ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদাররা মঞ্চ অধিকার করে রাখে এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে বক্তব্য দিতে থাকে। বার বার অনুরোধের পরও ইসলামী শিক্ষানীতির সমর্থক বৃহত্তর ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিদেরকে বক্তব্য দানের সুযোগ দেয়া হয়নি। উপরন্তু এক পর্যায়ে জনৈক বক্তা ইসলামিয়াতের ওপর কটাক্ষ করলে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদাররা প্রথমেই গণতান্ত্রিক নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়। এবার তারা ন্যায়নীতির মাথায় কুঠারাঘাত করে শক্তি প্রয়োগে প্রতিবাদকে দমিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ফলে সভায় গোলযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু শান্তি প্রিয় ছাত্রদের দৃঢ়তার কারণে গোলযোগকারীরা অবশেষে কেটে পড়ে। এভাবে গোলযোগের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়ে গেলে আবদুল মালেক সাথীদেরকে নিরাপদে বিদায় দিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্যখানে জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির দৌড়ে পরাজিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আবদুল মালেককে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেলে রেখে যায়। সব ধরনের চেষ্টাকে পেছনে ফেলে ১৫ আগস্ট মাগরিবের সময় আবদুল মালেক পাড়ি জমান মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে। অর্জন করেন ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম শহীদের মর্যাদা।

১৯৭০ : শামসুল হক শিক্ষা কমিটি

১৯৬৯ খ্রিষ্টব্দে ২৬ শে মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট তার জাতীয় বেতার ভাষণে এবং পরবর্তীতে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে তার সরকার অতীতের

www.icsbook.info

তুলনায় অধিকহারে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করেছে। শিক্ষার সমস্যা নিরসনে শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রচেষ্টা চালাবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি নিবিড় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে কয়েকটি অনুধ্যান কমিটি গঠন করে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সরকার সংশোধিত প্রস্তাবাবলির পূর্ণর্বিবেচনা করে দেখার পর কেবিনেট কমিটির রিপোর্ট পরবর্তী মন্ত্রি পরিষদ সভায় পেশ করা হয়। উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ১২ ও ২৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় গৃহীত হয় এবং ২৬ মার্চ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করে।

বাংলাদেশ আমলে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলো হচ্ছে

১. ১৯৭৪: বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (সভাপতি- ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা)

২. ১৯৭৬: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট (সভাপতি- প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক)

৩. ১৯৭৭: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম কমিটি (চেয়ারম্যান- ড. এম এ বারী)

৪. ১৯৭৯: অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি : জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ (সভাপতি- কাজী জাফর আহমদ/ আব্দুল বাতেন)

৫. ১৯৮৮: শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনা কমিশন (সভাপতি- মফিজউদ্দিন আহমেদ)

৬. ১৯৮৯: মাদরাসা শিক্ষা কমিটি (চেয়ারম্যান- ড. এম এ বারী)

৭. ১৯৯৭: জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (সভাপতি- প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক)

৮. ২০০০: জাতীয় শিক্ষা কমিটি (সভাপতি- প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক)

৯. ২০০২: শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি (সভাপতি- মুহাম্মদ আব্দুল বারী)

১০. ২০০৩: শিক্ষা কমিশন (সভাপতি- প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা)

১১. ২০০৯: জাতীয় শিক্ষানীতি (সভাপতি- অধ্যাপক কবীর চৌধুরী)

১. ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ হতে স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় এদেশের মানুষের নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনার তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এই নবজীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিহিত, সে **সত্য এদেশের জনগণ পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এজন্যই শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ তাদের নিষ্ঠুর শোষণের স্বার্থে এদেশের শিক্ষা বিস্তারের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ বার বার এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাই স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষা**

www.icsbook.info

ব্যবস্থার পুনর্গঠন জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্ব রূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ জুলাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দেশের কৃতী সন্তান, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকদের নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। এটি সঙ্গত কারণেই খুদা কমিশন নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এর প্রতিবেদনাটিও খুদা কমিশন রিপোর্ট নামে অভিহিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কমিশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। স্বাধীনতার পর প্রথম সরকার নিজেদের দলীয় আদর্শের ভিত্তিতে দেশের পরবর্তী জেনারেশনকে তৈরির লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে শিক্ষানীতি প্রণয়নে সচেষ্ট হয়।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশন সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সফর করেন। প্রায় এক মাসব্যাপী এই সফরে তারা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাছাড়া রিপোর্ট সম্পর্কে জনমত যাচাইও করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করে সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

কমিশনের গভীর চিন্তা দীর্ঘ আলোচনা ও মতামত বিশ্লেষণের পর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত পৌছেছেন প্রায় চারশো জন সদস্য সম্বলিত ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষাবিদ ও সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে সহায়তা করে।

সরকারি প্রস্তাবের নির্দেশক্রমে ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করা হয়। রিপোর্ট গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৩০শে মে ১৯৭৪ সালে ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার (মুদ্রিত) এ রিপোর্টি প্রকাশিত হয়। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তনের ফলে প্রদত্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশ্য পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য যে কমিটিসমূহ করেছে তারা প্রত্যেকেই এই ড কুদরত-এ-খুদা কমিশনকে আদর্শ ধরেই প্রস্তাবনা সমূহ তৈরি করে।

কমিটির সদস্যবৃন্দ (পূর্ণকালীন) :

১. সভাপতি- ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা

২. সহ-সভাপতি- ড. সূরত আলী খান

৩. সদস্য সম্পাদক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী,

৪. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান

www.icsbook.info

৫. এম ইউ আহমেদ

৬. মাহমুদ মোকাররম হোসেন

৭. মোহাম্মদ নুরুস সাফা

৮. এম এ সাত্তার

খণ্ডকালীন সদস্যবৃন্দ

১. অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক

২. ড. ফজলে হালীম চৌধুরী

৩. ড. এম আব্দুল হক

৪. ড. আনিসুজ্জামান

৫. ড. স্বদেশ রঞ্জন বসু

৬. ড. নুরুল ইসলাম

৭. ড. এম শামসুল ইসলাম

৮. ড. আ. ম জহুরুল হক

৯. ড. সিরাজুল হক

১০. শ্রীমতী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা

১১. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান

১২. ড. মাযহারুল ইসলাম

১৩. ড. এস এম শরফুদ্দিন

১৪. ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

১৫. শ্রীমতী হেনা দাস

১৬. আশরাফ উদ্দিন খান।

২. প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট : ১৯৭৬

জাতীয় আদর্শ সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি সংস্কার ও ক্রমপরিবর্তন যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় তার গতিশীলতার জন্য অপরিহার্য শিক্ষার বিষয়বস্তুর উন্নতি ও আধুনিকীকরণ যদি কোন কারণে বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়, তা হল দেশের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এক

www.icsbook.info

অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। এ পটভূমিতে কমিশনের প্রস্তাবাবলি ও সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হকসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৭ জন।

কমিটিকে ১৯৭৪ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রমের প্রচলিত শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাসূচির ওপর উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য কমিটির কর্ম-পরিধি নির্ধারণ করা হয়। ৪৭ সদস্যের জাতীয় কমিটি ছাড়াও ১০টি সাব-কমিটি এবং ৩১টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। মোটের ওপরে ২৫০ জন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রাথমিক থেকে শিক্ষকবৃন্দ তাদের দক্ষতা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নে সহযোগিতা করেন। এ কমিটির সভাপতি পরবর্তীকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জিল্লুর রহমানকে এ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

৩. ড. এম এ বারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম কমিটি : ১৯৭৭

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই অর্থকরী কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হলেও ইসলামী ভাবধারায় এবং ধর্মীয় আচার আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়ই উদাসীন বলে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রবেশ না থাকাই হয়তো এর মূল কারণ। তাই এই অসংগতি দূরীকরণার্থে একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ করতে হবে, তেমনি ইসলামী শিক্ষাকে করতে হবে আধুনিক জীবন চাহিদার উপযোগী।

এ ধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা শুধু আজকের নয়, এ দেশে অতীতে অনেক কমিটিই এ বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে- ১৯৩৮-৪১ সালের মাওলা বখশ কমিটি, ১৯৪৬-৪৭ সালের অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মুয়ায্যম উদ্দিন কমিটি, ১৯৪৯ সালের মাওলানা আকরম খান কমিটিতেও অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকা এবং করাচিতে কয়েকটি কমিটি ও কমিশন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মূল্যবান সুপারিশ করে। এতসব সুপারিশের সবগুলোই ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশেষে স্বাধীনতার বিশ বছর পর ১৯৭৬ সালে ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট (চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর) জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন যে, দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা জাতির লক্ষ্য ও আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে যুগপৎ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করবে।

www.icsbook.info

কমিটি গঠন

১৯৭৭ সালের ২৭ জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এম এ বারীকে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠণ করেন।

১. চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম এ বারী

২. সদস্য আহমদ হোসাইন

৩. ” আব্দুল হাদী তালুকদার

৪. ” ড. এ মুক্তাদির

৫. ” ড. ইখলাস উদ্দিন আহমদ

৬. ” ড. এ কে এম আইউব আলী, অধ্যক্ষ- মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

৭. ” মাওলানা আব্দুস সালাম, অধ্যক্ষ- আহমাদিয়া আলিয়া মাদরাসা, মাদারীপুর

৪. কাজী জাফর আহমদ/ আব্দুল বাতেন অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ : ১৯৭৯

কোন দেশ বা জাতি যে ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তা রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিতেই রচিত হয় শিক্ষানীতি। তাই জাতীয় জীবনে শিক্ষানীতির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু তাই বলে এ থেকে নিবৃত্ত থাকার কোন সুযোগ নেই , বিধায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন যে পরিমাণে হয়েছে বাস্তবায়নের নজির সেই অনুপাতে নিতান্তই ক্ষীণ। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত শিক্ষানীতিও আর্থিক অসুবিধা হেতু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ দিকে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি না থাকায়, শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে ক্রমাগত শিক্ষার মান কমতে তাকে। তাই এসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে।

কমিটি :

১. চেয়ারম্যান : কাজী জাফর আহমদ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (১১ অক্টোবর ১৯৭৮ পর্যন্ত)

আব্দুল বাতেন, মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী (১২ আক্টোবর ১৯৭৮ হতে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ পর্যন্ত)

এছাড়া ৪২ জন সদস্যসহ মোট ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

www.icsbook.info

৫. মফিজউদ্দিন আহমেদ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনা কমিশন : ১৯৮৮

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকল স্তরে ও সকল প্রকার শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য সরকার ২৩ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করে।

কমিটি :

চেয়ারম্যান: অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর), সদস্য সংখ্যা ২৯ জনসহ মোট ৩০ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়।

৬. ড. এম এ বারী মাদরাসা শিক্ষা কমিটি : ১৯৮৯

দেশের মাদরাসা শিক্ষার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৪.০৭.১৯৮৯ সালে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে ০১.১১.৮৯ইং এবং ০৯.০৫.৮৯ ইং তারিখে ২জন করে আরো ৪জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যান : ড. এম এ বারী (অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়) সহ ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

৭. প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি : ১৯৯৭

প্রেক্ষাপট

শিক্ষাকে জাতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৭৪ সালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর আর কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবশেষে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার জানুয়ারি মাসে প্রফেসর সামসুল হককে সভাপতি করে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে আরো দুজনকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রদিবেদনকে গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্য দেশের সর্বপ্রথম ও সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে তা অনুমোদনের জন্য দাখিল করে।

www.icsbook.info

কমিটি

১. চেয়ারম্যান : অধ্যাপক শামসুল হক (সাবেক উপদেষ্টা)

২. সদস্য সচিব : মুহাম্মদ ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)
অন্যান্য সদস্য সংখ্যা ৫২ জনসহ ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি।

পর্যালোচনা

১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব যুগোপযোগী ও গণমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গঠিত হয় এই শিক্ষানীতি। কিন্তু এই শিক্ষানীতি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণয়ন হলেও আ'লীগ সরকার এবং পরবর্তীতে বিএনপি সরকার এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করেনি। এই শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই।

এই শিক্ষা কমিশন মনে করেছে যে প্রাথমিক শিক্ষাটা প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত হওয়া উচিত কিন্তু কিসের ভিত্তিতে সেই সুপারিশ করেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এ সম্পর্কে কোন গবেষণাও চোখে পড়েনি।

এই শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এটি একটি ভালো দিক। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়েছে যা অতন্ত পরিতাপের্ বিষয়।

মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি ধরন কওমি মাদ্রাসাব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরিতে সভা সেমিনার ওয়ার্কশপ করে জনগণের মতামত জেনে করা হয়েছে, কিন্তু গবেষণা করে শিক্ষার কোন স্তরে কী ধরনের কর্মকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন বা কোথায় কী চাহিদা রয়েছে সেটি নিরূপণ করা হয়নি।

নারীশিক্ষা ও গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বা শিক্ষানীতিকে আরও তাৎপর্য পূর্ণ করেছে।

দেশের জনসংখ্যা সম্পদ ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিরিখে নিকট ও দূরঅতীতে কোন সেক্টরে কী পরিমাণ জনসম্পদের প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা রিপোর্টগুলোতে পাওয়া যায়নি।

অন্যান্য শিক্ষানীতিতে শুধু সুপারিশ করা হয় সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন কিভাবে হবে সে কথা বলা হয়নি । কিন্তু এই শিক্ষানীতিতে সে কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতিগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতিটি শিক্ষানীতির কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। কোন শিক্ষানীতিই পূর্ণাঙ্গতা পায়নি ।

www.icsbook.info

৮. প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক জাতীয় শিক্ষা কমিটি : ২০০০

আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৭ সালের গঠিত জাতীয় শিক্ষাকমিটি বিস্তারিত রিপোর্ট একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষানীতি হিসেবে ২০০০ সালে গৃহীত। ২০০১ সালে সরকার পরির্বতন হয়ে যাওয়ায় এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়নি।

৯. মুহাম্মদ আব্দুল বারী শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি : ২০০২

২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠনের পর শিক্ষাক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ২৪-১২-২০০১ এর অফিস আদেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি

১. সভাপতি ড. এম এ বারী, প্রাক্তন উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২. সদস্য - প্রফেসর এমাজ উদ্দিন
৩. সদস্য - প্রফেসর ড. শমশের আলী
৪. সদস্য - প্রফেসর মাওলানা ড. মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
৫. সদস্য - প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানসহ ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট্য কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০-০১-২০০২ তারিখের শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির ২য় সভায় আরো ৬ জনকে কো-অপটেড সদস্যসহ মোট ৫২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এতে কমিটির একটি মাত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয় "কমিটি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করবে।" কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কুদরত-এ-খুদা কমিশন (১৯৭৪) বা মফিজ উদ্দিন আহম্মদ কমিশন (১৯৮৮) এর মত শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য এ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়নি। বরং এ কমিটিকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয় দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বর্তমান নৈরাজ্য ও উচ্ছৃংখলতা এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে এই অস্তির ও অসহনীয় অবস্থা থেকে কিভাবে আশু পরিত্রাণ লাভ করা যায়। সে বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা যায়।

১০. প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন : ২০০৩

২০০২ সালে ২১ শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যাস্থার সমস্যাবলী চিহ্নত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চয়ারম্যান মো: মনিরুজ্জামান মিয়াকে ১৫ জানুয়ারী ২০০৩ এ একটি বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে কমিশন গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ কমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল চেয়ারম্যান সহ ২৪ জন এরা হলো

www.icsbook.info

প্রফেসর ডাঃ মো: মনিরুজ্জামান মিয়া, সচিববৃন্দ শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বাংলাদেশের সচিবালয় প্রফেসর ডাঃ এস এম এ ফায়েজ, প্রফেসর ডাঃ এম শমশের আলী,

ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, প্রফেসর ডাঃ বজলুল মুরিয়া চৌধুরী প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমেদ, প্রফেসর ড. মো: আসাদুজ্জামান, জনাব আজিজ আহমেদ, চৌধুরী জনাব আব্দুর রফিক, প্রফেসর এম শরিফুল ইসলাম, প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অধ্যক্ষবৃন্দ আলিয়া মাদ্রাসা ও ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল ঢাকা ইয়াসমিন মোর্শেদ সালমা খান, সরদার আলী মো: সেলিম ভূইয়া এবং মো: আব্দুল ওয়াহাব।

পরবর্তীতে ২০০৩ সালের মে মাসে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্য হিসাবে যুক্ত করা হয়। জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে কমিশনের একটি সভা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আহবান করা হয় যেখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং মিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। কমিশনের পরবর্তী সভায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়নের উপকমিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো দাঁড় করান। চেয়ারম্যান পক্ষ থেকে পরবর্তীতে ৩০টি মূলনীতি সম্বলিত অপর একটি পরার্মশমালা বিতরণ করা হয়। এ নীতিমালা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় আলোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনীসহ গৃহীত হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশনের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সময় এসব নীতি পরিশীলিত করেন এবং এ গুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেন। এ শিক্ষা কমিশনের গঠনও কর্মপদ্ধতি পূর্ববর্তী সকল শিক্ষা কমিশন হতে ভিন্ন ছিল । কমিশন দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে কোন সফর যায়নি । তবে কমিশনের সদস্যবৃন্দ তাদের জ্ঞান দেশ-বিদেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তাদের দূরদৃষ্টি সবকিছুই পুর্ণ ব্যবহার করেছেন। তবে ২০০৩ সাল ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে যেসব শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্য যে সব ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এসেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান সে সব প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছেন। এ কমিশন সর্বমোট ১৫টি সভায় মিলিত হয়েছে।

পর্যালোচনা

২০০৩ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষা এর প্রতিবেদন অনুযায়ী একমুখী শিক্ষাতে গুরুত্বারোপ করা হলে ও কী কী কাঠামোর মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করা হবে এর কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। কারিগরি শিক্ষার ওপর অধিক সরকারি সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিন্তু তা শুধুমাত্র দেশের অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে যাতে দক্ষ কারিগর তৈরি হবে

www.icsbook.info

কিন্তু মেধার বিকাশ ও জীবন মানের উন্নয়ন ঘটবে না। নারী শিক্ষাকে এর যথাযথ গুরুত্ব দানের ক্ষেত্রে এ শিক্ষানীতিতে ঘাটতি রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশে নয় বরং উত্তম পার্থিব জীবন লাভের ওপরই গুরুত্বরোপ করেছে। কারিগরি শিক্ষাকে সমৃদ্ধিকরণে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা কেবল বিদেশে যেমন শ্রম দিতে পারে সেজন্য দেশীয় কাঁচামাল ও সুযোগ সুবিধার ব্যবহার হয় সে কারণে নয় অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় বিদেশের জন্য দক্ষ শ্রমিক তৈরি হচ্ছে উন্নয়নের সেবক নয়। এ শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো যুগান্তকারী প্রস্তাব করা হলেও এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বস্তনিষ্ঠ কোন তথ্য উপাত্ত সংযোজিত হয়নি। এর কারণ আমার মতে যেহেতু শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সরেজমিনে দেশে বিদেশে কোথাও সফরে যায়নি। তাই এরূপ তথ্য জানা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞানই এক্ষেত্রে মুখ্য ছিল এবং বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি রয়েছে।

১১. অধ্যাপক কবির চৌধুরী জাতীয় শিক্ষানীতিঃ ২০০৯*

কমিটি :

১.	চেয়ারম্যান:	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক
২.	কো-চেয়ারম্যান:	ড. খলীকুজ্জমান আহমদ চয়ারম্যান- বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ও সভাপতি- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩.	সদস্য সচিব:	অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির
৪.	সদস্য	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ
৫.	"	অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশিদ
৬.	"	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
৭.	"	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল
৮.	"	অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম
৯.	"	অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান
১০.	"	অধ্যাপক ড. জরিনা রহমান খান
১১.	"	অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর
১২.	"	অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ
১৩.	"	মোঃ আবু হাফিজ

www.icsbook.info

১৪. " মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান

১৫. " বেগম নিহাদ কবির

১৬. " অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী

১৭. " অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবির

* জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (পরবর্তীতে সংশোধন আকারে উপস্থাপিত শিক্ষানীতি ২০১০) সম্পর্কে ইসলামী ছাত্রশিবিরের বক্তব্য (প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ও আমাদের বক্তব্য, যা বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল) বর্তমান সঙ্কলনে হুবহু ছাপা হয়েছে।

লেখক : কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.icsbook.info

www.icsbook.info

প্রশ্নবিদ্ধ

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

আমাদের বক্তব্য

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

প্রশ্নবিদ্ধ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

পূর্বকথা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জনগণকে স্বাধীনচেতা ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠন করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন। এরপর সময়ের ক্রমপরম্পরায় বিভিন্ন সময়ে আরো নয়টি শিক্ষা কমিশন/কমিটি/টাস্কফোর্স গঠিত হয়। সর্বশেষ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৬ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ গঠন করে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ কমিটি তাদের চূড়ান্ত খসড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করে। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৯ বছরে আমরা সর্বমোট ১০টি শিক্ষা কমিশন/শিক্ষা সংস্কার কমিটি/অন্তর্বর্তীকালীন টাস্কফোর্স/শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির বিশাল বিশাল রিপোর্ট পেয়েছি। এ সকল কমিশন/কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সামগ্রিকভাবে এসব কমিশন/কমিটি তাদের প্রতিবেদনে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশি জাতির শিক্ষার ভিত্তি নির্ধারণ তথা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের পরিবর্তে শিক্ষার

www.icsbook.info

কাঠামোগত বিন্যাস, গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের উপর তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। অধিকন্তু এসব কমিশন/কমিটির সুপারিশমালার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তাই আঙ্গিক দিক থেকে আমরা উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের মনন ও মানসজগতকে ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকল ও নব্য সাম্রাজ্যবাদী/নব্য উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারিনি। অক্টোবর-০৯, শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এবং তা নিয়ে সারাদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। এ বছর ৩১ মে ২০১০, মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। এরপর থেকেই সকলে গভীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন শিক্ষানীতিতে কি কি পরিবর্তন করা হয়েছে তা জানার জন্য। কিন্ত মে মাসে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলেও চার মাসে তা প্রকাশ না করায় বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ করা হতে থাকে সরকার হয়তো গোপনে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করবে। অবশেষে গত ৩ অক্টোবর-২০১০, জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সর্বসাধারণের জন্য সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন নিয়ে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তি। পুরো বিষয়টি অন্ধকারে ছেড়ে দেয়ার মত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচি অধ্যায়ের নম্বর বন্টন অধ্যায়টি রাখা হয়নি। ফলে খসড়া শিক্ষানীতির সাথে চূড়ান্ত শিক্ষানীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য কেউ খুঁজে বের করতে পারছেন না। এ শিক্ষানীতির এমন অনেক বিষয় যা অসংগতিপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী । তা ছাড়া এ শিক্ষানীতি গতানুগতিক ও নৈতিক দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ।

www.icsbook.info

সারসংক্ষেপ

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন হওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moedu.gov.bd -তে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং এ শিক্ষানীতির আলোকেই আগামী দিনের শিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতির-২০১০ পর্যালোচনা করার পর এর যে সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ:

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর চূড়ান্ত খসড়ায় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, "মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।"
- শিক্ষার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক শিক্ষা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ড় নির্ধারণ করা হয়েছে; উচ্চ শিক্ষার কাঠামো অপরিবর্তিত রয়েছে।

www.icsbook.info

- সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা উভয় ধারাতেই প্রাথমিক স্তর হবে বাধ্যতামূলক মৌলিক শিক্ষার স্তর এবং এতে অভিন্ন পাঠ্যসূচি অনুসৃত হবে। তবে মাদরাসার ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস, আরবি– এসব বিষয় অতিরিক্ত পড়তে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিখনকার্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ১ বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এর জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা উভয় ধারাতেই ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ **শিক্ষাধারার মানবিক শাখা ও ভোকেশনাল শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে; এমনকি বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার পাঠ্যক্রম থেকে তা পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছে।**
- মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষাধারায় তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও মাদরাসা শিক্ষাধারায় তা ঐচ্ছিক হিসেবে রাখা হয়েছে এবং প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষা-উপকরণ (Teaching aid) হিসেবে কম্পিউটার ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
- তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা উভয় ধারাতেই বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; কিন্তু মাদরাসা শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণীতে একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। শিক্ষানীতির কোথাও এর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু (Content) সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ নামের একটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর শেষে পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা হবে। এর উপর ভিত্তি করে সনদ প্রদান করা হবে। এর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পঞ্চম ও দশম শ্রেণী শেষে আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

- মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমে পূর্বের সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখার পাশাপাশি ব্যবসায় শিক্ষা শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; **কিন্তু হিফজুল কুরআন ও মুজাব্বিদ মাহির শাখা বাতিল করা হয়েছে।**
- সাধারণ শিক্ষাধারায় প্রাথমিক স্তর থেকেই ললিতকলা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে বিদেশী ধারার কারণে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে কোনো রূপ সংস্কারপ্রস্তাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাইরে রেখে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেয়া হয়েছে।
- মাদরাসা শিক্ষাধারার এ যাবতকাল পর্যন্ত চলমান স্বাতন্ত্র্যকে সমতায়ন (homogenization)-এর যুক্তিতে বহুলাংশে সংকুচিত করা হয়েছে।
- বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার কওমী ও আলিয়া এ দুটোকে পৃথক দেখানো হয়েছে এবং কওমী মাদ্রাসার জন্য আলাদা কওমী মদ্রাসা শিক্ষা কমিশন করার কথা বলা হয়েছে।

এ শিক্ষানীতি সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় শিক্ষানীতি-২০১০, মূলত একটি স্তরগত পরিবর্তনশীল শিক্ষানীতি। শিক্ষাব্যাবস্থার গুনগত বৈশিষ্ট ও মৌলিক নীতি সংক্রান্ত উন্নত দর্শন এ ব্যাবস্থায় স্থান পায়নি। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির চিন্তা ও বিশ্বাসের পুরোপুরি প্রতিফলন এতে হয়নি। এমনকি কাঠামোগত দিকেও খসড়া শিক্ষানীতির ন্যায় পাঠ্যসূচি মান বন্টন সংক্রান্ত সংযোজনীগুলো স্থাপন না করায় এ দিকটাও অসম্পুর্ণ থেকে যায়। এসব কারনে শিক্ষানীতির পুর্নাঙ্গতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

www.icsbook.info

খসড়া শিক্ষানীতি '০৯ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি '১০ কিছু পর্যবেক্ষণ

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

২০০৯ সালের যে খসড়া শিক্ষানীতি প্রকাশ করা হয় তার মূল বিষয় ছিল সংযোজনী ২ ও ৩ নামের অধ্যায়টি। প্রথম শ্রেণী থেকে এইচএসসি/ আলীম পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীতে কোন বিষয়ে কত নম্বরের কোর্স পড়ানো হবে তার বিস্তারিত উলেখ ছিল এই অধ্যায়ে। ফলে এই অধ্যায়ের মাধ্যমে শিক্ষানীতির মূল চরিত্র প্রকাশ পায় এবং সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য বুঝতে সক্ষম হয়। এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই সারাদেশের শিক্ষানীতি নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। কিন্তু চূড়ান্ত শিক্ষানীতি থেকে এই অধ্যায়টি বাদ দেওয়ায় খসড়া শিক্ষানীতির সাথে চূড়ান্ত শিক্ষানীতির তুলনার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। খসড়া শিক্ষানীতির সাথে চূড়ান্ত শিক্ষানীতির কতটুকু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং খসড়া শিক্ষানীতির যেসব বিষয় নিয়ে সারাদেশে প্রবল আপত্তি উঠেছিল তার কতটুকু রাখা বা বাদ দেয়া হয়েছে তা মিলিয়ে দেখার কোন সুযোগ রইল না।

খসড়া শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো আপত্তিকর বিষয় থাকলেও মূলত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়। এই তিনটি প্রধানতম বিষয়গুলো হল, (ক) শিক্ষানীতির শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অধ্যায়ে সেকুল্যার শব্দের প্রয়োগ, (খ) সাধারণ শিক্ষায় নবম ও দশম শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা উঠিয়ে দেয়া (গ) মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি থেকে কুরআন-হাদীস আর ইসলামী শিক্ষা ব্যাপকভাবে কাটছাট করা। এই তিনটি বিষয় ছিল মারাত্মক ভাবে আপত্তিকর।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের মত শতকারা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে জাতীয় শিক্ষানীতির দর্শন এভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী মূলত তাদের ধর্মীয় পরিচয় হারাবে এবং তারা তথাকথিত সেকুল্যার জাতির অভিশপ্ত জীবনে প্রবেশ করবে। তাই এই দর্শন এদেশের সর্বস্তরের মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রত্যাখান করেছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে সেকুল্যার শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে যেটি ইতবাক কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচির ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে যেসব বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা কতটুকু শিক্ষানীতিতে রাখা হয়েছে বা আপত্তিকর বিষয়ে শিক্ষানীতিতে কতটুকু সংশোধন করা হয়েছে সে বিষয়ে তুলনার কেউ সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচির সেই নম্বর বন্টন অধ্যায়টি নেই।

অতীতে সকল শিক্ষানীতিতে মান বন্টন অধ্যায় ছিল

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে তিনটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এগুলো হল কুদরাত-এ-খুদা কমিশন- ১৯৭২, মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন- ১৯৮৮ এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন- ২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন)। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি ১৯৮৯, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ (শামসুল হক শিক্ষানীতি), জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, ড. এম এ বারী কমিশন ২০০২ এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পাঠ্যসূচি এবং মানবন্টন। কোন কোন প্রতিবেদনে কোন বিষয়ে কতটি ক্লাস হবে সে বিষয়ও উলেখ ছিল। কিন্তু **সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচি অধ্যায়ে মানবন্টন বিষয়ের উলেখ নেই।**

www.icsbook.info

বর্তমান শিক্ষানীতি ও কুদরাত-এ-খুদা কমিশন এক এবং অভিন্ন পথের যাত্রী

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ শাসনামলে একটি শিক্ষা কমিশন এবং তিনটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে প্রণীত হয় কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। এরপর ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি" ২০০০ সালে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' এবং বর্তমানে প্রফেসর কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এর চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। খুদা কমিশনের **পর যে তিনটি শিক্ষানীতি আওয়ামীলীগ প্রণয়ন করেছে তার প্রত্যেকটি প্রণয়ন করা হয়েছে খুদা কমিশনকে ভিত্তি করেই**। খুদা কমিশনকে কিভাবে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়ন করা যায় সেটিই ছিল এ তিনটি শিক্ষানীতি কমিশন প্রণয়নের মূল লক্ষ্য। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় তা ছিল আসলে খুদা কমিশনেরই আধুনিক ভার্সন। আর সর্বশেষ যে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে তা করা হয়েছে "৯৭" সালের শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে যার মূল ভিত্তি ছিল খুদা কমিশন। যে কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তিনি ১৯৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায়

www.icsbook.info

এসেছে তখনই তারা চেয়েছে খুদা কমিশন বাস্তবায়ন করতে। সেজন্য তারা সবসময় সেটিকে সময়োপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় বসার পরপরই শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারী একটি অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে প্রণীত শামসুল হক শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। আর **খুদা কমিশন নিয়ে প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল ধর্ম শিক্ষাকে অবহেলা করা। আর পরের শিক্ষানীতি যেহেতু খুদা কমিশনকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে তাই সেক্ষেত্রে ধর্মকে গুরুত্বহীন করার বিষয়টি স্থান পেয়েছে ঘুরে ফিরে এবং আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ ধর্ম। সর্বশেষ শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।**

www.icsbook.info

এ শিক্ষানীতি ইঁদুর বিড়াল খেলার সাদৃশ্য

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে জনগনের পরামর্শ ও মতামতের নিমিত্তে যে খসড়া শিক্ষানীতি ২০০৯ চুড়ান্ত করা হয়েছিল মূলত এই শিক্ষানীতি ছিল শিক্ষার অবকাঠামোগত সংস্কারের ভিত্তি। যেখানে চিন্তা, চেতনা ও বিশ্বাসে সেক্যুলারপন্থী বানানোর নব কৌশল ইংরেজ আমলের প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র ফুটে উঠে। স্বাধীন বাংলাদেশ এবং দেশের মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাকে কেন্দ্রকরে এ শিক্ষানীতির দর্শন গড়ে উঠেনি। এটি জাতীয় শিক্ষানীতির একটি মৌলিক গলদ। অধিকন্তু চুড়ান্ত খসড়ায় পাঠ্যক্রম সংযোজনীর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার মূল চরিত্র সম্পর্কে যতটুকুন অবগত হওয়ার সুযোগ ছিল শিক্ষানীতি-২০১০ প্রনয়নের সময় সেটি ও প্রকাশ না করে শিক্ষানীতির মৌলিকত্ব যতটুকু ছিল তাও নষ্ট করা হয়েছে। মূলত শিক্ষানীতি নিয়ে এ ইঁদুর বিড়াল সাদৃশ্য কাজটি কেন করা হলো, এটি একটি বড় রহস্য। সুতরাং রহস্যপূর্ণ, অস্পষ্ট কোন শিক্ষানীতি জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান হতে পারেনা।

www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তরালে ধর্মবিমুখ নতুন প্রজন্ম তৈরী করাই মূল লক্ষ্য

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-র সংজ্ঞা

ধর্মনিরপেক্ষতা ইংরেজী (Secularism)-র বাংলা প্রতিশব্দ। Secularism রাষ্ট্র দর্শনের অপর নাম। Secularism. Secular অর্থ ইহলৌকিক, পার্থিব পরকাল বিমুখতা ইত্যাদি।

"র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয়" (Not perlaining toor connceted with religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)।

Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞা ও অনুরূপ। অর্থ্যাৎ যারা কেনো ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ।

চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থ্যাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

www.icsbook.info

Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে- Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life be exclusion of all consideration draw from belief in good or in future state.

অর্থ্যাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ্ বিশ্বাস ও পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ এর মতে "The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion"

অর্থ্যাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক রাষ্ট্র যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রে কোনো ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকেনা- ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করেনা। বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যানধারণা ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। রাষ্ট্রের নীতি ও পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করে না মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা।

www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি কোথায়

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ-সংঘাতের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথম Secular রাষ্ট্র দর্শনের প্রসার ঘটে। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিভিন্ন দার্শনিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এর বিকাশে সহায়তা করছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, শিল্প বিপ্লব, জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব, ফরাসী বিপ্লব এবং বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন- ম্যাকিয়াভেলি, থমাস, হবস, জর্জ জের, মার্ক্স এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিক্য, বস্তুবাদী, সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি চিন্তাধারা।

মুসলিম বিশ্বেও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল আল-ইসলাম। কিন্তু পশ্চিমা উপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে Secular ভাবধারার প্রসার ঘটে। মোস্তফা কামাল-এর নেতৃত্বে Secular তুর্কী গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে Secular রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রমকে ইসলামমুক্ত করে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার গোড়াপত্তন করেন। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে Secular রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

www.icsbook.info

সুতরাং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাবমুক্ত রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল লক্ষ্য। এ মহান উদারতার(!) খোলস পরেই মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত। এই চিরন্তন লড়াই রাসূলে করীম (সা) এর সময়েও ছিল। যখন আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মানব সমাজে কায়েমের আওয়াজ তুলেছেন ঠিক তখনই শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে নানা অজুহাতে বিরোধীতা করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সাথে নমরুদের, মুসা (আ)-এর সাথে ফেরাউনের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আবু লাহাব-আবু জেহেলদের দ্বন্দ্ব ছিল চিরন্তন। আজও সেই লড়াই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। তাদের অনুসারীদের ভাষা এবং কৌশলের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ইসলামের উপর আঘাত হানছে সমান গতিতেই এবং আরো অতিমাত্রায়।

www.icsbook.info

ইতিবাচক দিকসমূহ

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ পর্যালোচনার পর আমরা এর ভেতরে কতক আশাব্যঞ্জক দিক খুঁজে পাই। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের যে দাবি বহু দিন ধরে উত্থাপিত হচ্ছিল, তার অনেকখানি এ রিপোর্ট ধারণ করছে।

বিশেষ করে শিক্ষার কাঠামোগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে স্তরগত পুনর্বিন্যাস প্রবর্তন ছিল সময়ের দাবি। এর বাইরেও কতক বিষয় উঠে এসেছে, যা শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে একটি কল্যাণধর্মী উন্নত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যেমন–

- প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভে ১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।
- ৮ বছর মেয়াদী (১ম থেকে ৮ম শ্রেণী) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ।
- মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা সংযোজন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ।
- মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ নির্ধারণ।
- প্রাথমিক ্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষণ-শিখন (teaching-learning)-এর ব্যবস্থা করা।
- সমমর্যাদাভুক্ত বা একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা (inclusive education system) চালুকরণ।
- প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

www.icsbook.info

- প্রাথমিক স্তরে (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণী) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্তকরণ।
- উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতির কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল না করা।
- উচ্চ শিক্ষায় গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া।
- সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপন।
- সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি।
- জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন।
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক নির্বাচন ও উন্নয়ন কমিশন গঠন।
- প্রচলিত প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ ও নিরুৎসাহিত করে ক্রমে এর অবসান।
- বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ।
- কওমী মদ্রাসাগুলোর জন্য পৃথক কওমী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

www.icsbook.info

কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা ও আমাদের বক্তব্য

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনেক আশাব্যঞ্জক ও বাস্তবভিত্তিক হওয়ার পরও বিশেষ কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে তা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানীতিতে স্ব-বিরোধিতা ফুটে উঠেছে। তাই এ শিক্ষানীতিকে কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন শিক্ষানীতি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর কারণগুলো নিম্নরূপঃ

প্রশ্নবিদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

|1|

খসড়া রিপোর্টের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অধ্যায়ের ৪, ৫ ও ১৪ নম্বর পয়েন্টে যথাক্রমে বলা হয়েছে,

"জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।"

"দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ট বিকাশে সহায়তা করা।"

"সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা এবংজাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয় পড়ানো।"

www.icsbook.info

অথচ এ বিষয় বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে একটি বিদেশী ধারার শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে একে বিশেষ শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সকল প্রকার পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ায় অন্য সব বিষয়ের ব্যাখ্যায় পৃথক পৃথক অধ্যায় রাখা হলেও দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারা সম্পর্কে কয়েক বাক্যেই সমাপ্ত করা হয়েছে। অথচ এখানে অধ্যয়ন করছে এ দেশেরই বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে। আবার এ শিক্ষাধারায় এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়াও নেই।

বাস্তবতা হলো, এদেশীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রুচি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় না থাকায় ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরাই এদেশে অন্য একটি sub-culture গড়ে তুলছে– যা আমাদের সমাজের সাথে খাপ খায় না। তারা বেড়ে ওঠে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে, যা জাতিগত ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী।

সম-মৌলিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা ও সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির পাশাপাশি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও common set of cultural values প্রবর্তনের স্বার্থেই ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারাসহ প্রত্যেক ধারার সকল শিক্ষার্থীরই আমাদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা জরুরি। তাই ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারাসহ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যেক ধারাকেই সরকারি পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে। আমরা মনে করি, বর্তমান ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাধারাকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সংস্কার সাধন করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রমের ইংরেজি সংস্করণ (national curriculum in English version) অনুসরণ করা যেতে পারে।

www.icsbook.info

|2|

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ চূড়ান্ত খসড়া-২০০৯ এর সংযোজনী ৩-এর নম্বর বন্টন অধ্যায়টি না থাকায় নবম ও দশম শ্রেনীতে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক আছে কি নাই তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কারন খসড়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে চুড়ান্ত শিক্ষানীতির মাধ্যমিক অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ১২তে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক শিরোনামে বলা হয়েছে-সাধারণ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি সকল ধারায় বাংলা, ইংরেজী,বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত এবং তথ্য প্রযুক্তি বাধ্যতা মূলক হিসেবে থাকবে। এখানে ধর্মের উলেখ নেই। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে,

"শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা"।

আমরা উপর্যুক্ত মূল উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থেই প্রত্যেক শিক্ষাধারার সকল স্তরের সকল শাখা ও বিভাগে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায়, সাধারণত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম হলো নানাবিধ টানাপোড়নের সময়। এ বয়সে মনো-দৈহিক বিশেষ পরিবর্তনের ফলে তারা বিপথে পা বাড়ায়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে এ সময়টাতে খুব সহজেই বিকৃতি আর অনাচার বাসা বাঁধে তাদের মনে। এ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। **ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাই ব্যক্তিকে তার চিন্তা-চেতনা, কর্মকান্ড ও আচার-আচরণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সুপথে পরিচালনা করে। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবই ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়।** ফলে সে নানা রূপ অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের আজকের সমাজবাস্তবতা তারই প্রমাণ। কারণ, আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অপ্রতুলতা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই আজকের উত্তপ্ত পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে সব স্তরের জন্যই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.icsbook.info

সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় শ্রেণী থেকে ১০০ নম্বরের ধর্ম শিক্ষা রাখা হয়েছে, যা খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী গল্প ও জীবনীর মাধ্যমে শেখানো হবে। এটা ধর্ম শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যাতে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে এরূপ অনুশীলনমূলক অন্যান্য শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিও অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা না রেখে ললিতকলা শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত করার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্ট এবং শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু ও শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পাঁয়তারা করছেন। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দসহ এ প্রস্তাবের সমর্থক সকলেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁরা অবশ্যই ব্যক্তিক বিকাশে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করবেন না।

নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিমানুষকে তাঁর আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে। মূলতঃ নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ও পরিস্ফুটন ব্যাতীত একটি সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আজকের বিশ্বজুড়ে চলমান অরাজকতা ও অশান্তির মূল কারণও এ নৈতিক শিক্ষার অভাব। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষের মঙ্গলের কথা বলে, আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলে, ন্যায়-অন্যায় বোধের শিক্ষা দেয়। আর এসবই নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়। তাহলে কি ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাতীত নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা যায় না? হয়তো যায়; কিন্তু তা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত। নৈতিক শিক্ষার এসব বিক্ষিপ্ত স্রোতের আদি উৎসও বিভিন্ন ধর্ম। ধর্মীয় মূল্যবোধই এর মূল স্রোত। ধর্মীয় স্রোতবিহীন নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি দেয়াল থেকে যায়। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষা তাতে ব্যক্তি নিজের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার

www.icsbook.info

কারণে তার নৈতিক গতির বাইরে চলে যেতে পারে। তাছাড়া এখানে ব্যক্তি সৎ থাকার, নৈতিক আচরণে অটল থাকার কোনো কারণ খুঁজে পায় না। নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো। তাতে কারো ক্ষতি কি উপকার হলো তা দেখার প্রয়োজনই বা কিসের। দুনিয়ার সময়টুকু যেকোনো উপায়ে পার করতে পারলেই হলো। ব্যস খালাস!

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের ধর্মসমূহ ও ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে সামাজিক উপাদানসমূহের একটি যৌগিক সমন্বয়। ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এদের অবস্থান সর্বদাই পাশাপাশি। মূলত নৈতিকতার উৎপত্তি ধর্মের এমন জায়গা থেকে, যা কখনও আলাদা করার মতো নয়। নৈতিকতা মানুষের একটি সহজাত বিষয়। বয়সের সাথে সাথে এটা বিকশিত হয়ে কিছু বিষয়কে গ্রহণ এবং কিছু বিষয়কে বর্জন করে একটা মানদন্ডে পৌঁছায়, যাকে আমরা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক মানদন্ড বলি। মানুষে মানুষে এ আচরণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এসব কারণেই মানুষের বিবেক কিছু নৈতিক গুণাবলিকে ভালো বলে স্বীকৃতি দেয় এবং কিছু বিষয়কে মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করে।

ধর্মীয় শিক্ষার সকল বিষয়ই স্রষ্টা-কেন্দ্রিক। এখানে মানুষের সকল কাজ-কর্ম স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য উৎসর্গীকৃত। এ পৃথিবীই শেষ নয়; পৃথিবীর জীবন শেষ হলে আছে আরেক অনন্ত জীবন। সে জীবনের ভালো-মন্দ সবকিছু নির্ভর করে পৃথিবীতে ব্যক্তির কৃত সকল কাজ-কর্মের উপর। ফলে সেই অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাস থেকে এর সাফল্যের জন্য ব্যক্তি নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত রাখে; মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বাস করেন যে, স্রষ্টা সর্বদ্রষ্টা; প্রতিটি ভালো ও মন্দ কাজের তিনি সাক্ষী এবং সকল কাজ-কর্মের জন্য পরকালীন জীবনে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ***এ বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত*** হতে পারে না; কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয়নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ফলে তাকে শত নৈতিক শিক্ষা দেয়া হলেও তা বিস্মৃত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ব্যক্তিক ও

www.icsbook.info

সামষ্টিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা।

এখানে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, আচ্ছা, বেশ ভালো কথা! মানলাম, ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু তা তো পারিবারিক পরিবেশেই দেয়া যায়– কেন এটি আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হ্যাঁ, উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা সবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং অতি আবশ্যক একটি বিষয়, যা কোনোভাবেই বাদ দেয়া যায় না। ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষাবিবর্জিত সর্বোত্তম শিক্ষাক্রমও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে তা আমাদের সামনে আজ সুস্পষ্ট। ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতা, জালিয়াতি-কালোবাজারির ছড়াছড়ি। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে সত্যিকার অর্থে আলোকিত মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষা। আর এর আয়োজন রাষ্ট্রকেই করতে হবে সর্বজনীন প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কেননা, অনেক পরিবারের পক্ষে পৃথকভাবে এর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটি শিশুর অধিকার। সুতরাং মা-বাবার অনিচ্ছা বা অলসতার কারণে যেন শিশু এ অধিকার হতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্যই প্রয়োজন ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষাকে অন্যান্য জাগতিক শিক্ষার সাথে বাধ্যতামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা।

ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী মানস গঠনের উপযুক্ত সময় শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে সেভাবে তার মানসজগৎ গঠিত হবে; শিশুর গন্তব্যও সেদিকেই নির্ধারিত হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় হোক অনন্য। সেই সাথে এ-ও চাই যে, তারা তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতার কল্যাণকর ব্যবহার নিশ্চিত করুক। আর এর জন্য যে উদ্দীপক দরকার তা সরবরাহ করবে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা।

এ জন্যই পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর The Philosophy of the Modern Education গ্রন্থে অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেছেন,

"বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের

www.icsbook.info

উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।”

|3|

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ী(প্রাথমিক)স্তরের পাঠ্যসূচি নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। চূড়ান্ত খসড়ানীতি-২০০৯এ শিক্ষানীতির যে সব বিষয়গুলো আপত্তিকর হিসেবে বিবেচিত হয় তার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি ব্যাপকভাবে কমিয়ে সাধারণ শিক্ষা চালুর প্রস্তাব অন্যতম। কিন্তু গৃহীত চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে সংযোজনী-২এর মানবন্টন অধ্যায়টি না থাকায় এসব বিতর্কিত বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট।

আমরা মাদরাসা শিক্ষাধারার ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তরের শিক্ষাক্রমে কতিপয় সংশোধনী আনার দাবি জানাচ্ছি।

(ক) মাদরাসা শিক্ষাধারার ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) স্তরে যেসব বিষয় অতিরিক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেগুলো মাদরাসা শিক্ষাধারার স্বকীয়তা রক্ষার স্বার্থে মাদরাসার জন্য আবশ্যিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(খ) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে কুরআন মাজীদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(গ) ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত যেহেতু আকাইদ ও ফিক্‌হ এবং কুরআন মাজীদ ও তাজবিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেহেতু একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির কারণে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

(ঘ) ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবিতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে আরবি ১ম পত্র ১০০ নম্বর ও আরবি ২য় পত্র ১০০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

|4|

জাতীয় শিক্ষানীতি -২০১০এ মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচি নিয়েও রহস্য ও বিভ্রান্তি রয়েছে। তার মূল কারণ খসড়া শিক্ষানীতির ন্যায় চূড়ান্ত শিক্ষানীতিতে পাঠ্যসূচি সম্বলিত সংযোজনী-৩ অন্তর্ভূক্ত না করা। আর এর মাধ্যমে যদি খসড়া শিক্ষানীতির প্রদত্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে মাদ্রাসা শিক্ষা **মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এইখানে তাই খসড়া শিক্ষানীতির অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ**

খসড়া রিপোর্টের সংযোজনী ৩-এ উলিখিত মাদরাসা শিক্ষাধারার

www.icsbook.info

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কতিপয় মৌলিক বিষয়কে সংকোচন/পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কিংবা ঐচ্ছিক হিসেবে রাখা হয়েছে অথবা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে। যার ফলে মাদরাসা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল বাধাগ্রস্থ হবে এবং এর মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। উলেখ্য, এ কথা সর্বজনবিদিত এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)-এর ২৭ পৃষ্ঠায় মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে,

"শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম করে গড়ে তোলা, তারা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আর্দশ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বুঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।"

নিম্নে খসড়া রিপোর্টের সংযোজনী ৩-এর আলোকে মাদরাসা পাঠ্যক্রমের বাতিলকৃত/সংকুচিত/পুনরাবৃত্তিকৃত চিত্র দেখানো হলো–

শ্রেণী	বর্তমানে পঠিত যেসব মৌলিক বিষয় খসড়া রিপোর্টে বাতিল/সংকোচন/পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে
১ম ও ২য়	কুরআন মাজীদ বাতিল করা হয়েছে
৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম	আরবি ২০০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর করা হয়েছে
৯ম-১০ম (মানবিক)	ইসলামের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় থেকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে
	আরবি ২০০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর করা হয়েছে
	হাদীস ও ফিক্ হ-এর ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (আবশ্যিক বিষয় হিসেবে হাদীস ও ফিক্হ ১০০ নম্বর, আবার নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে হাদীস ১০০ নম্বর এবং ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ১০০ নম্বর)
	মানতিক (ঐচ্ছিক) বাতিল করা হয়েছে
৯ম-১০ম (বিজ্ঞান)	হাদীস এবং ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ পৃথকভাবে ১০০ নম্বর করে ২০০ নম্বরের স্থলে একত্রে ১০০ নম্বর করা হয়েছে
একাদশ-দ্বাদশ (মানবিক)	ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ ২০০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর করা হয়েছে
	আরবি ২০০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর করা হয়েছে
	ইসলামের ইতিহাস ১০০ নম্বরের স্থলে ২০০ নম্বর করা হয়েছে
	বালাগাত ও মানতিক ১০০ নম্বরের স্থলে ২০০ নম্বর করা হয়েছে
একাদশ-দ্বাদশ (বিজ্ঞান)	১০০ নম্বরের ফিক্হ বাতিল করা হয়েছে
	১০০ নম্বরের আরবি বাতিল করা হয়েছে
দাখিল	হিফজুল কুরআন ও মুজাব্বিদ মাহির শাখা বাতিল করা হয়েছে
আলিম	মুজাব্বিদ মাহির শাখা বাতিল করা হয়েছে

www.icsbook.info

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ায় একদিকে বলা হয়েছে যে মাদরাসা শিক্ষাধারার স্বকীয়তা রক্ষা করা হবে, অন্যদিকে খসড়া রিপোর্টে প্রমবদাবিত শিক্ষাক্রমে এর মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের উপর অপরিণামদর্শী হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটি মাদরাসা শিক্ষাধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কারো সাথে আলাপ-আলোচনা করে নি। মাদরাসা শিক্ষাধারা সম্পর্কে অভিজ্ঞদর সাথে আলোচনা করে সময়ের চাহিদার আলোকে এর স্বকীয়তা বহাল রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার জন্য আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে দেওবন্দ মাদরাসা, সাহারানপুর মাদরাসা এবং একই ধরনের আরো বিখ্যাত কতিপয় মাদরাসা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচি ও টেক্সট চালু রেখেছে; এবং সরকার কোনো প্রকার হস্ড়ক্ষেপ ছাড়াই তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্ধারিত যোগ্যতার মানদন্ডের ভিত্তিতে সকল ধারার শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ প্রদান করে। (এক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.jnu.ac.in ভিজিট করা যেতে পারে।)

এছাড়া পশ্চিমা অনেক উন্নত দেশে সনাতন শিক্ষাব্যাবস্থা রয়েছে, যা তাদের নিজস্ব ধারায় পরিচালিত এবং স্বীকৃত। সুতরাং আমরা মাদরাসা শিক্ষাক্রমে এর মৌলিক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত রেখে পুনরায় শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জোর দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে বর্তমান শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি বিস্তারিত প্রনয়ন করে স্পষ্ট ও সন্দেহ মুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

|5|

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০এর ৩৯ নং পৃষ্ঠায় নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে,

> “নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা, এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।”

www.icsbook.info

এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে শুধু দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করলেই হবে না, নারীর স্বকীয়তা বজায় রেখে তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

6

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০এর ৪০ নং পৃষ্ঠায় নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বলা হয়েছে,

> "উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদ মুক্ত/স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমাদের সমাজবাস্তবতায় দেখা যায়, সুদের চক্রবৃদ্ধি হারের কারণে ঋণগ্রহীতার পক্ষে আসল ফেরত দেয়া সম্ভব হয় না এবং এটা ঋণগ্রহীতার জন্য ক্রমবর্ধমান বোঝা হিসেবে বিবেচিত। ফলে ইচ্ছা থাকলেও এ ধরনের ঋণ গ্রহণে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হবে না। তাই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করতে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি সুদমুক্ত উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) প্রদান করতে হবে। শিক্ষা সাথে সুদের মত অনৈতিক বিষয়কে জড়ানো সম্পুর্ণ পরিহার করতে হবে।

7

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০এর ৪১ নং পৃষ্ঠায় ললিতকলা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত, ও নৃত্য অ্যাকাডেমি, নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়।"
>
> এ সম্পর্কে একই পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে,
>
> "সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমরা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে ললিতকলা শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সুস্থ, সুন্দর ও মৌলিক সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে- যা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

8

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ৪৫ নং পৃষ্ঠায় ব্রতচারী কার্যক্রমকে

www.icsbook.info

নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেয়া ও আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। ব্রতচারীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

> "এটি গীত ও নৃত্য-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম যা বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ... ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে।"

ব্রতচারী কার্যক্রম কোনোভাবেই ঢালাওভাবে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে চালু করার মতো বিষয় নয়। এটি কোনো সর্বজনীন, স্বীকৃত ও নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল আচার-প্রথাও নয়; বরং এটি একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত প্রথা। এরূপ গোষ্ঠীগত (local) কোনো চর্চাকে সাধারণভাবে (universally) উৎসাহিত কিংবা চালু করা শুধু অযৌক্তিকই নয়, বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। ব্রতচারীর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে যা বলা হয়েছে, তা স্কাউটিং ও গার্লস গাইডিং এবং ক্রীড়া শিক্ষার কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

www.icsbook.info

প্রশ্নবিদ্ধ

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

কিছু সুপারিশ

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার জন্য নিম্নে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো। যেহেতু মুখবন্ধে বলা হয়েছে শিক্ষানীতি কোন অপরিবর্তনীয় জিনিস নয় এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সবসময় উন্মুক্ত থাকবে কোন ভুল ত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে সবসময়েই এর পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ অব্যাহত থাকবে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অব্যাহত উন্নয়ন ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা শিক্ষানীতিকে অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধ করবে।

■ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৯%। নিরক্ষরদের অধিকাংশই আবার বয়স্ক। দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে উন্নত ও স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বয়স্ক সাক্ষরতার কথা বলা

www.icsbook.info

হলেও এর পূর্ণ সাফল্যের জন্য কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকায় আমরা সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করছি– দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূর করে শত ভাগ সাক্ষর জাতি হিসেবে পথ চলার লক্ষ্যে এবং সাংবিধানিক (১৭ নং অনুচ্ছেদ) দায়বদ্ধতা পূরণার্থে উচ্ছশিক্ষা স্তরে (সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহ ও মেডিক্যাল কলেজসমূহে) নিদিষ্ট সময়ের জন্য summer/winter schooling program প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ program-এর আওতায় সংশিষ্ট শিক্ষার্থীরা সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সম্মানীর বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। এ অভিযানে অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অ্যাকাডেমিক ক্রেডিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

■ সমকালীন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে medium of instruction হিসেবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

■ মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা উৎসাহিত ও গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এতে উন্নত যোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা স্তরে বাধ্যতামূলক বাংলা সংযোজন করা সময়ের দাবি।

■ অনার্স পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের ন্যায় বিগত স্তরের শিক্ষাধারা ও ফলাফলের চেয়েও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বাস্তব যোগ্যতার বিচারকেই মুখ্য করে তোলা উচিত। এক্ষেত্রে IELTS, TOEFL, GRE-এর মতো প্রামাণিক মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা (standard & reliable test) চালু করা যেতে পারে।

■ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর ৭নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

> "মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।"

এক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে উত্যক্তকারীর জন্য শাস্তির বিধান রাখার পাশাপাশি আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শালীন ও মার্জিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন ড্রেস কোড প্রবর্তন করা যেতে পারে।

■ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০এর ৩৯ নং পৃষ্ঠায় নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

www.icsbook.info

ও লক্ষ্যের ৫ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে,

> "প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।"

আমরা মনে করি, নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন আনয়নের জন্য সকল প্রকার গণমাধ্যমে নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে; আকাশ সংস্কৃতিকে সর্বজনীন শালীনতা, স্বকীয়তা ও আমাদের মূল্যবোধের মানদন্ডে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির ওয়েবসাইটসমূহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

■ শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতি প্রবর্তন করতে হবে। ছাত্ররাজনীতির নামে অ-ছাত্রদের রাজনীতি, চাঁদাবাজি ও সাধারণ ছাত্রদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় নয় বরং যোগ্যতাকেই একমাত্র মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কোমলমতি ছাত্রদের ক্ষমতার সিড়ি ও পতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিদেশে মেধা পাচার বন্ধ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরিবর্তন বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় মন্ত্রী-এমপি ও নেতা-নেত্রীদের অনৈতিক ও অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রসংসদ সচল করতে হবে। শিক্ষানীতিতে এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বাস্তব সম্মত দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

■ জাতীয় শিক্ষানীতির ২০১০ এর সামগ্রিক পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন কাঠামোতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ (centralization) প্রবণতা লক্ষণীয়, যা দুর্নীতি ও অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

■ সাধারণ শিক্ষাধারার মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় তালিকায় আরবির পাশাপাশি সংস্কৃত ও পালি রাখা হয়েছে। একই সাথে আমাদের এ অঞ্চলের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং চলমান বিশ্বের সাথে

www.icsbook.info

সম্পর্ক বিচারে ফ্রেঞ্চ অথবা স্প্যানিশ ও ফার্সি বিবেচনা করা যেতে পারে।

■ সামগ্রিকভাবে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি দ্বিভাষী (bilingual) নীতি তথা ইংরেজি বনাম বাংলা গ্রহণ করেছে, যা মূলত উপনিবেশিক শাসনামলের ফল। একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ও বহুমাত্রিক চেতনাসম্পন্ন জাতি গঠনে এ থেকে বেরিয়ে এসে বহুভাষী (multilingual) নীতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এবং সময়ও হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আদলে মাধ্যমিক স্তরে পর্যায়ক্রমে দেশের ইতিহাস ও চলমান বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি তৃতীয় ভাষা নেয়ার অপশন চালু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরবি ভাষা অগ্রাধিকার বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা, বর্তমানে আরব দেশগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজারে উর্বর কর্মক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত।

■ শিক্ষানীতি সম্পর্কে শেষ যে কথাটি না বললেই নয়– স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৩টি শিক্ষা কমিশন, ২টি অন্তর্বর্তীকালীন কমিশন, ২টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি এবং কতক শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করা হলেও এর কোনোটিই এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যে বিভিন্ন সময় নিত্য-নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতি যেমন– ১৯৯২ সালে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি, ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি, ২০০৬ সালে একমুখী শিক্ষা, ২০০৯ সালে কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্নপদ্ধতির মতো বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানানো হচ্ছে। ফলে এর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠছে আর অভিভাবকগণ দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছেন। সরকার পরিবর্তনের সাথে শিক্ষাপদ্ধতিতে ও পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আসছে। এক সরকার কোনো একটি পদ্ধতি চালু করে তো অন্য সরকার এসে তা বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করে; তাদের মতবাদ পাঠ্যবিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে শিক্ষার্থীরা হয় বিভ্রান্ত। তারা কোনটা বিশ্বাস করবে? আজ যেটা আছে তো কাল সেটা পাল্টে গেল। ফলে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়ে স্থির হতে পারছে না; তাদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হচ্ছে। অথচ

www.icsbook.info

শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক যে সমস্যা তা সমস্যাই রয়ে গেছে।

আমরা কি এটাই চাই? আমরা কি চাই আমাদের শিশুরা বেড়ে উঠুক বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে? ভুল ইতিহাস আর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে হোক দ্বিধান্বিত? তারা একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার যাঁতকালে পিষ্ট হোক? ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত হয়ে তারা ডুবে যাক দুর্নীতি, অন্যায় আর পাপ-পঙ্কিলতার পাকে?

আমরা তা চাই না। আমরা চাই না আমাদের শিশুরা গিনিপিগ হোক। আমরা চাই আমাদের সব শিশু বেড়ে উঠুক সমান সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে; কোনো দলীয় মতবাদ নয়, তারা জানুক ইতিহাসের সত্যকে; বাস্তবিক ও ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠুক তাদের মন ও মানস, যার মধ্য দিয়ে অঙ্কুরোদ্গম ঘটবে মানবিক মূল্যবোধ, আত্মিক পরিশুদ্ধি আর পারস্পরিক কল্যাণবোধের। আশা করি আমাদের সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলো পুনরায় বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

এদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখে বর্তমান সরকার মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে একটি সার্বজনিন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

www.icsbook.info

১২ আগস্ট ১৯৬৯'র সেই নির্মম দৃশ্য। শহীদ আবদুল মালেকের ইসলামী শিক্ষাণীতির উপর বক্তৃতার যুক্তিযুক্ত মোকাবেলা করতে না পেরে ইসলামের শত্রু ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের ঘাতকচক্র নৃশংসভাবে আহত করে, তিনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন সোহরাওয়ার্দী পার্কের মাঝে, এরপর তাঁর চেতনা আর ফেরেনী

ছবি : পাকিস্তান অবজারভার ১৩ আগস্ট ১৯৬৯

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট

- সুপারিশ মালা
- জাতীয় শিক্ষা সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি
- এ্যালবাম

www.icsbook.info

বিগত সময়ের শিক্ষানীতি বিষয়ক সুপারিশমালা

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৮ এর সুপারিশমালা

১. দু'দিনব্যাপী এই শিক্ষা সেমিনার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক শূন্যতা দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের আলোকে আমূল পরিবর্তন করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।

২. 'শিক্ষা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন'। এই শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে জনগণের জন্য তা সহজলভ্য করে তুলতে হবে। আগামী ১৯৮০ সালের মধ্যেই কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য সহশিক্ষাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবশ্যই বাতিল করতে হবে। নারীদের জন্য তাদের দৈহিক গঠন, মানসিক প্রবণতা এবং কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতাকে সামনে রেখে বিশেষ কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও প্রয়োজনানুপাতে বাড়াতে হবে।

৩. ইসলামী শিক্ষার বাস্তব মডেল হিসেবে পেশ করার জন্য অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা উভয়েই আকাঙ্ক্ষিত সংশোধন করে আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই এককেন্দ্রিক ও পূর্ণ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. বৈষম্য দূরীকরণ ও জাতীয় ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে হবে। বেতন, চাকরি অনুদান, উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বেলায় সাধারণ শিক্ষার মতই তাদেরকে সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৫. প্রাথমিক স্তর হতে কাজ শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ের কারিকুলাম সংশোধনের কাজ ১৯৭৯ সাল থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। সেই আলোকে পাঠ্যসূচি

www.icsbook.info

প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক লিখনের কাজও শুরু করতে হবে। এই কাজ সমাপ্ত করার জন্য তিন বৎসরের অধিক কাল সময় ক্ষেপণ করা কোন মতেই উচিত হবে না।

৬. মাধ্যমিক স্তর হতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। কেননা দেশকে বেকারত্বের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এটা এক কার্যকরী পদক্ষেপ। উচ্চ শিক্ষাকে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিভাগের পুনর্গঠন প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র ভর্তি এমন ভাবে করতে হবে যাতে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হওয়ার পর একজন যুবককেও বেকারত্বের শিকার না হতে হয়। শিক্ষাকে অবশ্যই উৎপাদন ও কর্মমুখী করার কার্যকরী ব্যবস্থা এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

৭. শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার পুস্তকের যে অভাব রয়েছে তা জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান শিক্ষার জন্য একটি বিষয় সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য পাঠ্য হিসেবে চালু করতে হবে। পাঠ্যসূচি এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কুরআনের ভাষার সাথে এতটা পরিচিত হয় যে কুরআনকে সরাসরি পাঠ করে অন্তত তার সরলার্থ উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

৯. উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করে তাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। কমিটি সমকালীন মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মেলনের বিশেষ করে ১৯৭৭ সালে মক্কা মোয়াজ্জমায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের গৃহীত সুপারিশগুলোর আলোকে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা নিতে পারে।

১০. বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ হয়, অকৃতকার্যতার হার ক্রমশ হ্রাস পায়।

১১. গণমাধ্যমগুলোকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করতে হবে যাতে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর কাজে শিক্ষাব্যবস্থার সহযোগিতা করতে পারে।

১২. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সঠিকভাবে ইসলামী আদর্শের অনুকূলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য আদর্শিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য বিষয়াদিসহ শিক্ষকতার পেশাকে এতটা আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে শিক্ষিতদের সবচেয়ে মেধাবী অংশ শিক্ষকতাকে আনন্দের সহিত একটা মহৎ পেশা হিসাবে গ্রহণ করে।

১৩. শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ জোগান দেয়ার জন্য জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্দ করতে হবে।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার
১৯৮৮ এর গৃহীত সুপারিশমালা

যেহেতু ২৬, ২৭ আগস্ট ১৯৮৮ দু'দিনব্যাপী ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ৬টি অধিবেশনে ৬টি নিবন্ধে এবং ৩৭ জন আলোচক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতগণ দেশের বিভিন্ন দিক গভীরভাবে পর্যালোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শ ইসলামের প্রতিফলন ঘটেনি এবং আদর্শ ও দিগদর্শনহীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতির জন্য প্রয়োজন পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

যেহেতু আদর্শিক দেউলিয়াপনাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ক্রটি এবং প্রচলিত কারিকুলাম, সিলেবাস, পরীক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন।

যেহেতু শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে দেশের বৃহত্তর জনগণ বঞ্চিত।

যেহেতু অপরিকল্পিত শিক্ষার ফলে শিক্ষিত যুবসমাজ বেকারত্বের অভিশাপে দিশেহারা।

যেহেতু দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করেছে, শিক্ষার অধঃগতি অব্যাহত রয়েছে, সেশন জটের মত নতুন নতুন সমস্যা স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে, উচ্চতর শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা চর্চার বাধাসমূহ রুদ্ধ হয়নি, দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা। জাতীয় সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যা ও বেতন ভাতার বৈষম্য বিদ্যমান, শিক্ষাখাত বর্তমান ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন পূরণে অপর্যাপ্ত এবং যেহেতু ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নই বড় সমস্যা।

সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও

www.icsbook.info

ক্রমান্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকল্পে সেমিনারের এই সমাপ্তি অধিবেশনে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ পেশ করা হচ্ছে :

১. দু'দিনব্যাপী এই সেমিনার সুপারিশ করছে যে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ শূন্যতা দূর করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐতিহ্য ধরে রেখে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষার পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২. এই সেমিনার মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজলভ্য করার তীব্র প্রয়োজনে অবিলম্বে ৮ম পর্যন্ত শ্রেণী বাধ্যতামূলক এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার সুপারিশ করছে।

৩. সেমিনার জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে মহিলা শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত আলাদা স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করছে।

৪. এই সেমিনার জাতীয় ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশে বিরাজমান দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি এককেন্দ্রিক ও পুর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা এবং মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে বেতন, চাকরি, অনুদান, উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জোর সুপারিশ করছে।

৫. এই সেমিনার মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে জাতীয়করণ, পৃথক মাদ্রাসা টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করে মাদ্রাসা কারিকুলাম ও সিলেবাসকে পুর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে এফিলিয়েশন ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করছে।

৬. সেমিনার বর্তমান কারিকুলাম পরিবর্তন করে অবিলম্বে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক কারিকুলাম পরিবর্তন করে অবিলম্বে ইসলামী আদর্শভিত্তিক কারিকুলাম ও সে আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

৭. সেমিনার মাতৃভাষায় উচ্চতর শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের পুস্তকের যে অভাব রয়েছে দ্রুত তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছে।

৮. সেমিনার মনে করে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে অন্তত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শ্রেণীতে সুপরিকল্পিত ইসলামী বই পাঠ্য রাখা দরকার যাতে করে কুরআন বোঝা ও কুরআন সুন্নাহর সাথে পরিচিত হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়।

৯. এই সেমিনার উপরের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি মুসলিম বিশ্বের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য মক্কা ঘোষণাসহ ১৯৭৭

www.icsbook.info

হতে অনুষ্ঠিত চারটি আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ মালার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০. শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মান ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেমিনার শিক্ষাকে প্রশিক্ষণে নৈতিক প্রশিক্ষণের উপর জোর প্রদান, শিক্ষকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করছে যাতে করে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে উৎসাহ পান।

১১. সেমিনার ক্রমবর্ধমান দূরীকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তর হতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করার প্রয়োজন অনুভব করছে এবং উচ্চ শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠিত করে বেকারত্বের হাত হতে রক্ষা করার সুপারিশ করছে।

১২. সেমিনার পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে নকল প্রবণতা রোধ এবং যথা সময়ে পরীক্ষাসমূহ গ্রহণের জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেশন জট নিরসনের সুপারিশ করছে।

১৩. সেমিনার রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল জাতীয় প্রচার ও গণমাধ্যমসমূহের কর্মসূচিকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এমনভাবে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ করছে যাতে এসব মাধ্যম গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৪. সেমিনার জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০% শিক্ষা খাতে বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিশ্চয়তা বিধানের সুপারিশ করছে।

www.icsbook.info

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার
১৯৯৭ এর গৃহীত সুপারিশমালা

উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতি বিজড়িত ইসলমী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক আয়োজিত ১৭ ও ১৮ আগস্ট ১৯৯৭ এ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে ৫টি অধিবেশনে ৫টি নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতগণ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের একটি পর্যালোচনা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার, শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি, ইসলামে নারী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে,

১. স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর জাতীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আকিদা, বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ভারসাম্যপূর্ণ, উৎপাদনমুখী ও যুগোপযোগী কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। ড. কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সুদীর্ঘ ২৩ বছর পূর্বে গঠিত চার মূলনীতি (ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র) এর ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান প্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির জ্যামিতিক বিকাশের ফলে ইতোমধ্যে অনেক নতুন নতুন বিষয় ও প্রেক্ষিতের উদ্ভব হয়েছে, শিক্ষা কাঠামো উন্নত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটারসহ শিক্ষা জগতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। অপরদিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন ব্যতিরেকে সমাজকে বর্তমান মূল্যবোধহীনতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা যে সম্ভব নয় তা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্যে ইসলামের ক্রমশ প্রসার ও চর্চা প্রমাণবহ্।

www.icsbook.info

এমতাবস্থায় এদেশের অধিকাংশ মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার বিপরীতে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র ও দেশের সংবিধানবিরোধী।

২. বর্তমানে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আদর্শ ইসলামের যথার্থ প্রতিফলন না থাকায় শিক্ষার্থীদের নৈতিক অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। অহরহ সংঘটিত হচেছ শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার মত ন্যক্কারজনক ঘটনা। একজন শিক্ষার্থীর জীবন বিপন্ন হচ্ছে সহপাঠীর নির্মম অস্ত্রাঘাতে। শিক্ষার্থীদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক রাজনীতির অশুভ প্রভাবে সন্ত্রাস জিইয়ে রয়েছে। নকল প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধ করে মানুষ গড়ার আঙিনায় মানুষ হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা না গেলে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্রসমাজকে যোগ্য ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষাব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে উচ্চতর জ্ঞান গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ এ শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে সমমান দানের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অপরদিকে, আমাদের জনসমষ্টির অর্ধেক নারী। অথচ ইসলামপ্রদত্ত নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় নারীরা নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছেন। নারীদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার পৃথক পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সুযোগ সৃষ্টি সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে, সেমিনারে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করে জাতীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালাসমূহ পেশ করছি :

১. জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে।

২. ঈমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে।

৩. মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ, সমকালীন বিজ্ঞান

www.icsbook.info

প্রযুক্তি, উন্নয়নশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থকরণ, শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণবিকাশ সাধন করে তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার সাথে সাথে আরবি ভাষার পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে এবং শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে সর্বস্তরে জাতীয় ভাষা বাংলাকে গ্রহণ করার পর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৫. মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে আরো উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করে সাধারণ শিক্ষার সমমান দিতে হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্তকরণ ও এফিলিয়েটেড ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. শিক্ষক নিয়োগে মেধার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র ও শিক্ষকতার প্রতি ব্যক্তির কমিটমেন্টের প্রতি নজর দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণসহ উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. বাংলাদেশের সকল মসজিদকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজে লাগাতে হবে।

৮. রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার মাধ্যমসমূহকে গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

৯. জাতীয় অগ্রগতির সাথে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে নারীদের জন্য অধিক হারে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রয়োজনে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলাদা শিফট চালুর মাধ্যমে সহশিক্ষা বিলুপ্ত করে নারীদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার পৃথক পূর্ণাঙ্গ যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি বিশ্বব্যাপী লব্ধ নব নব জ্ঞান সামাজিক রাষ্ট্রিয় প্রয়োজন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করতে হবে।

১১. শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করে দেশের সর্বজন স্বীকৃত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষাপ্রশাসনের ভার অর্পণ করতে হবে।

১২. পরীক্ষা পদ্ধতি ও একাডেমিক কারিকুলাম এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে নকল প্রবণতা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়, পরীক্ষার্থীর মেধা ও অধীত জ্ঞানের যথার্থ মূল্যায়ন

www.icsbook.info

সম্ভব হয় এবং শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক শুধুমাত্র শিক্ষামূলক কার্যক্রমেই ব্যস্ত রাখার উপযোগী করতে হবে।

১৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক সিংহভাগ মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৫. উচ্চশিক্ষার সকল ডিসিপ্লিনে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ধারণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ইসলামী বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

www.icsbook.info

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার

২০০৪ এর গৃহীত প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা বিশ্বাস ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকৃত নাগরিক তৈরি হতে পারে। এই প্রত্যয়দীপ্ত আহবান জানিয়ে সমাপ্ত হলো ইসলামী শিক্ষাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার '০৪। উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতিবিজড়িত ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী এ সেমিনার ৪টি অধিবেশনে ৪টি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতগণ অংশগ্রহণ করেন। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, শিক্ষা সঙ্কট ও তার থেকে উত্তরণের উপায়, শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি ইসলামে নারী শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাসহ অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে জাতিকে রক্ষা করতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গৃহীত হয় :

১. শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশমালা

যেহেতু দু'দিনব্যাপী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ৪টি অধিবেশনে ৪টি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খ্যাতিমান আলোচকবৃন্দ ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদগণ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামোগত ত্রুটি এবং সিলেবাস প্রণয়নে সমন্বয়হীনতা আজ আমাদের নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়ও নেই কোন উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা।

www.icsbook.info

সেহেতু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সেমিনারে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ পর্যালোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধে তথা ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস পুনর্গঠন ও ক্রমান্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন আনয়নকল্পে সেমিনারের এই সমাপ্তি অধিবেশনে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা হলোঃ

১। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শশূন্যতা দূর করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐতিহ্য ধরে রেখে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং আদর্শ নাগরিক তৈরির জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বস্তরের শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

২। জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী স্কলার, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে কার্যকর শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে।

৩। সেমিনার মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সহজলভ্য করার বাস্তব প্রয়োজনে অবিলম্বে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুপারিশ করছে।

৪। জাতীয় ঐক্য অর্জনের বাস্তব ও সময়োপযোগী প্রয়োজনকে সামনে রেখে দেশে বিরাজমান দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার চালু করতে হবে। যার মাধ্যমে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ সমকালীন বিজ্ঞান প্রযুক্তি, উন্নয়নশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বোপরি দৈহিক মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার সাথে সাথে আরবি ভাষার পরিচিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সর্বস্তরে জাতীয় ভাষা বাংলাকে গ্রহণ করার পর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবি ও ইংরেজিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬। সেমিনার মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে আরো উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে বেতন, অনুদান, চাকরি উন্নতকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জোর সুপারিশ করছে।

৭। এই সেমিনার মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি শিক্ষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে জাতীয়করণ, পৃথক মাদ্রাসা টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করে মাদ্রাসা কারিকুলাম ও সিলেবাসকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রণয়নের জোর সুপারিশ করছে।

৮। শিক্ষক নিয়োগে মেধার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে

www.icsbook.info

কমিটমেন্টের প্রতি নজর দিতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিমাত্রায় রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধকরণ উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

৯। মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করে দেশের সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষাবিদদের হাতে শিক্ষা প্রশাসনের ভার অর্পণ করতে হবে।

১১। উচ্চ শিক্ষার সকল ডিসিপ্লিনে সংশ্লিষ্ট ইসলামী ধারণ তথা সকল ক্ষেত্রে Islamiztion of knowledge ধারণাটি কার্যকর করতে হবে।

১২। জাতীয় বাজেট হতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথার্থ প্রয়োগ এবং এর প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২. সাংস্কৃতিক বিষয়ে গৃহীত সুপারিশমালা

প্রস্তাবনা : ১

আধুনিক সভ্যতার নামে পাশ্চাত্য নগ্ন সংস্কৃতি আজকের বিশ্বকে যেভাবে গ্রাস করছে মানবিক মূল্যবোধ তাতে হুমকির সম্মুখীন। মানব সভ্যতায় আজকের এ বিপর্যয়ের মূল কারণ হল নীতি নৈতিকতাবোধহীনতা তথা ধর্মীয় নীতিমালার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। নীতিহীনতার কারণেই জন্ম নিচ্ছে মানুষ হত্যা উন্মাদনা, প্রসার ঘটছে দুর্নীতির, বিশ্ব সভ্যতায় সৃষ্টি হচেছ সীমাহীন সঙ্কট, ভোগবাদী জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ থেকে নামিয়ে এনে তাদেরকে পরিণত করছে সস্তা পণ্যে। পরকীয়া, বহুমাত্রিকতা, সমকামিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা তথা অপসংস্কৃতির ছোবল মানুষের সুকুমার বৃত্তিকেই কেবল ধ্বংস করেনি, বিশ্বকে উপহার দিয়েছে মরণব্যাধি এইডস। এইডস এর মত ঘাতক ব্যাধির মহাছোবল থেকে পরিত্রাণ পেতে বিশ্ববিবেক আজ হন্যে হয়ে ছুটছে। গত এপ্রিল '০৪ থাইল্যান্ডের এইডস বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা তাই এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। নৈতিকতার বন্ধন এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া বিপন্ন মানবতার মুক্তির যে আর কোন বিকল্প পথ নেই এ সত্য আজ বিশ্ববাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। আজকের এ সম্মেলন মনে করে নৈতিকতার বন্ধনই বিশ্বকে বাঁচাতে পারে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে ভোগসর্বস্ব অপসংস্কৃতির পথ পরিহার করে নৈতিকতা তথা ধর্মীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মেলন উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।

www.icsbook.info

প্রস্তাবনা : ২

A Man is known by the company he keeps এ কথাটি যেমন সত্য Nation is known by his culture এ কথাটিও তেমনি সত্য। মূলত একটি জাতির আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে তার দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। অনেক সোনালি ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়ে আজকের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের গর্বিত বাংলাদেশ। আমাদের আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং বর্ণালি অতীত। কিন্তু অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় স্বাধীনতা অর্জনের তেত্রিশ বছর পার হলেও প্রণীত হয়নি জাতির জন্য সুস্থ ও সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক নীতিমালা। এই সম্মেলন সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে অনতিবিলম্বে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক নীতিমালার ভিত্তিতে ১৯৮৮ সালের জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রস্তাবনা : ৩

আন্তর্জাতিক অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাসবাদী চক্র মুসলমানদের ঈমান আকিদা ধ্বংসের জন্য সর্বগ্রাসী হামলা শুরু করেছে। ইন্টারনেটের অপপ্রয়োগ, স্যাটেলাইট চ্যানেলের অপব্যবহার, পর্নোপত্রিকা ও অশ্লীল সাহিত্যসহ সব ধরনের মিডিয়া ব্যবহার করে তারা মুসলিম বিশ্বে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা তথা অপসংস্কৃতির সয়লাভ ঘটিয়েছে। এভাবে তারা মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিনষ্ট এবং যুবসমাজের চরিত্র হননের জঘন্য অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র, সংস্থা ও সংগঠনকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এ সেমিনার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে

প্রস্তাবনা : ৪

একটি দেশের আর্থ সামাজিক ও নৈতিকতাবোধের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে দেশ মুক্ত রাখা এবং নীতি নৈতিকতার মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা। আর এটা সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভুদের ইঙ্গিতে দেশে সামাজিক জীবনে নৈরাজ্য ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আজ প্রয়োজন সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য, নিজস্ব কর্মসূচির বাইরেও জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপহার দেয়া।

তাই এ সম্মেলন সকল সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক প্লাট ফরমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপকভিত্তিক নব নব উদ্যোগ গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছে।

www.icsbook.info

প্রস্তাবনা : ৫

সন্ত্রাস, দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি নিজেদের ঈমান আকিদা হেফাজতের প্রত্যাশা নিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ চারদলীয় জোট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাই সরকারে কাছে ইসলামপ্রিয় জনতার প্রাণের দাবি হল শুধুমাত্র সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমন নয় যেকোন মূল্যেই জনগণের ঈমান আকিদা বিরোধী সকল অপতৎরতা বন্ধ করতে হবে।

দাবিসমূহ :

তাই উপরোক্ত সকল প্রস্তাবনার আলোকে আজকের এ সম্মেলন জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে :

১. মুসলমানদের ঈমান আকিদাবিরোধী চরিত্র ধ্বংসকারী স্যাটেলাইট মিডিয়াগুলোর অশ্লীল সম্প্রচারগুলো বন্ধ করতে হবে।

২. অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে হবে এবং পত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীলতা বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. সিনেমা হলগুলোতে ইংরেজি ছবির ছদ্মাবরণে নীল ছবির প্রদর্শন বন্ধ এবং প্রচার প্রজ্ঞাপনের নামে অশ্লীল পোস্টার ও নগ্ন ছবির প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

৪. টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের নাচ-গানে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ ও যৌন উত্তেজক দৃশ্য বন্ধ করতে হবে।

৫. অশ্লীল সিডি, ভিসিডি, প্রচার ও বিপণনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৬. ফটোজনিত প্রদর্শন ও ফ্যাশন শো'র নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে। নারীদেরকে ভোগপণ্যে রূপান্তরিত না করে তাদেরকে মাতা-ভগ্নি ও কন্যার মর্যাদা দিতে হবে।

৭. শিক্ষার নামে বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কুরুচিপূর্ণ ছবি সম্বলিত এবং যৌন উত্তেজনাকর বিভিন্ন বই পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ এবং আমদানি বন্ধ করতে হবে। ব্যাপকহারে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা এবং যুবসমাজের মেধা ও মনন বিকাশের লক্ষ্যে সরকারিভাবে রাজধানীসহ সারাদেশে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

www.icsbook.info

বিগত সময়ের জাতীয় শিক্ষা সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি সমূহ

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৭৮

তারিখ : ২৯ ও ৩০ জুলাই
স্থান : ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তন

প্রথম দিন ২৯ জুলাই

উদ্বোধনী অধিবেশন :

সকাল ৮.০০- বেলা ১২.০০

স্বাগত ভাষন :	মুহাম্মদ কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
উদ্বোধন :	ড: সৈয়দ মোয়েজ্জেম হোসেন প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি :	অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ আবুজর গেফারী কলেজ ঢাকা।

আলোচ্য বিষয় ঃ শিক্ষা দর্শন

মূল প্রবন্ধ	প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রবন্ধ পাঠ	অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রকল্প অধ্যক্ষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা
আলোচনা	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

www.icsbook.info

দ্বিতীয় অধিবেশন :

বিকেল ০৩.০০ থেকে সন্ধা ০৬.৩০ মি:

বিষয়	**প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা**
সভাপতি	ড.এম এ রহিম চেয়ারম্যান ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়
মূলপ্রবন্ধ পাঠ:	অধ্যাক্ষ শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইসাহাক অধ্যাক্ষ, বাংলা কলেজ চট্টগ্রাম
প্রবন্ধ	আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ অধ্যাক্ষ, আদর্শ স্কুল নারায়নগঞ্জ আবদুল কাদের মোল্লা পরিচালক শিক্ষা বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
আলোচনা :	ড. হামিদ উদ্দিন খান চেয়ারম্যান আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবদুল কাদের বাচ্চু

তৃতীয় অধিবেশন :

সন্ধা ০৭.০০ থেকে রাত ০৯.০০

বিষয় :	**উচ্চতর শিক্ষা**
সভাপতি	ড. মীর ফখরুজ্জামান মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মূল প্রবন্ধপাঠ :	ড. কাজী দীন মোহাম্মদ বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রবন্ধ :	অধ্যাপক আ ন ম নুরুল করিম চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর জাকির হোসেন প্রানীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক আবদুর রহমান গনিত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আলোচনা :	ড. রমজান আলী সরদার চেয়ারম্যান গনিত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় দিন ঃ ৩০ জুলাই প্রথম অধিবেশন

সকাল ০৮.০০থেকে বেলা ১২.০০

বিষয় :	**মাদ্রাসা শিক্ষা**

www.icsbook.info

সভাপতি : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

মূল প্রবন্ধ পাঠ : ড. মুস্তাফিজুর রহমান
আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ : অধ্যাপক আলী আহমদ রুশদী
অর্থনিতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা : ড.সৈয়দ লুৎফুল হক
চেয়ারম্যান আরবীও ইসলাম শিক্ষা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আহমদ শরীফ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
অধ্যাপক আফছার উদ্দীন
চেয়ারম্যান সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
মতিউর রহমান নিজামী
অধ্যাপক তাজুল ইসলাম
আবদুল কাদের মোল্লা
মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ

দ্বিতীয় অধিবেশন :
বিকাল ০৩.০০ থেকে রাত ০৯.০০

বিষয় : **ইসলামী শিক্ষার রুপরেখা ও তার বাস্তবায়ন।**

সভাপতি : ড কাজী দীন মুহাম্মদ
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল প্রবন্ধ পাঠ: ড. মীর ফখরুজ্জামান
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ : অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহাদাত আলী শেখ
শিক্ষা ইসস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
অধ্যাপক মোহাম্মদ লোকমান
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা : মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ড.তৌফিক আহমদ আল কুসায়ের
প্রফেসর নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি সৌদি আরব।

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৮৮

তারিখ : ২৬ ও ২৭ আগষ্ট

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট

প্রথম দিন ঃ ২৬ আগষ্ট ১৯৮৮

উদ্বোধনী অধিবেশন

সময়: সকাল ৯:০০-১০.০০টা

সভাপতি : **প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম**

প্রধান অথিতি : অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

অথিতিবৃন্দ : এ কে এম নাজির আহমদ
পরিচালক. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কবি তালিম হোসেন
রুহুল আমীন খান
নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

কর্মসূচি :

তেলাওয়াতে কালামে পাক সাইফুল্লাহ মানসুর

স্বাগত ভাষন : মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

অতিথিবৃন্দের ভাষন :

সভাপতির ভাষন :

প্রধান অতিথির উদ্বোধনী বক্তব্য :

www.icsbook.info

আলোচনা অধিবেশন- এক

সময়- ১০.৩০-১২.৩০মিঃ

বিষয়: শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি

সভাপতি : এ.এফ.এম ইয়াহিয়া
প্রাক্তন মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রবন্ধ উপস্থাপনা :

১. অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান — শিক্ষার আদর্শ

২. আবুল আসাদ — শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি
সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম

আলোচনা :

১. আবদুল কাদের মোল্লা — শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক

২. ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান — সহযোগী অধ্যাপক ফার্মেসী বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. অধ্যাপক মোহাম্মদ তাহের — অধ্যাক্ষ শাহ ওয়ালীউলাহ উনস্টিটিউট চট্টগ্রাম।

৪. আমিনুল ইসলাম মুকুল — সেক্রিটারি জেনারেল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

আলোচনা অধিবেশন- দুই

বিকাল ৪.০০- রাত্রি ০৯.০০মিঃ

বিষয় : বাংলাদেশ শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন সাধারন শিক্ষা।

সভাপতি — ড. সাজ্জাদ হোসাইন
প্রাক্তন ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ উপস্থাপনা :

১. এ মে এম মহিউদ্দিন — বাংলাদেশের বর্তমান সাধারন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন
চেয়ারম্যান ইংরাজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২. অধ্যাপক আবদুল গফুর — আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ বিজ্ঞান
সম্পাদক , অগ্রপথিক

আলোচনা — ড. শাব্বির আহমদ
চেয়ারম্যান ইসলারে ইতিহাস বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

ড.আবুল বাশার কাজী
সহযোগী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ ফজলুল হক
সহকারী অধ্যাপক ভূতত্ত্ব বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আবদুল কাদের মোল্লা
শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক
ড.সিরাজুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ইংরাজী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল
মুহাম্মদ আবুল কাশেম
কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

দ্বিতীয় দিন ঃ ২৭আগষ্ট ১৯৮৮
আলোচনা অধিবেশন- **তিন**
সময় সকাল ০৯.০০- ১২.০০ মি:
বিষয় : বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার মূল্যায়ন
সভাপতি : মো: এয়াকুব শরীফ প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকা।

প্রবন্ধ উপস্থাপনা :
অধ্যাপক আবু বকর রফিক আহমদ — আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা
ডীন শরীয়াহ অনুষদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ।

আলোচনা : মাওলানা কামালউদ্দিন জাফরী
অধ্যক্ষ জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদী ঢাকা।
মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুলাহ
ইসলামী চিন্তবীদ ও শিক্ষাবিদ
জুলফিকার আহমদ কিসমতী
সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম
মাওলানা আবু তাহের
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশছাত্রশিবির
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাহের
অধ্যক্ষ শাহ ওয়ালিউলাহ ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম
এ কে এম মহিউদ্দিন
চেয়ারম্যান ইংরাজী বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.icsbook.info

আলোচনা অধিবেশন- চার

সময়ঃ ০৪.০০- সন্ধা ০৬.৩০মিঃ

বিষয় : বাংলাদেশ শিক্ষা সমস্যা

সভাপতি : ড. রমজান আলী সরদার

প্রবন্ধ উপস্থাপনা :

ড মোহাম্মদ লোকমান বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা

সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা : ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

সহযোগী অধ্যাপক ফার্মেসী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড.আবদুল করিম

সহযোগী অধ্যাপক ফসল ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল কাদের মোল্লা

শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক

মুহাম্মদ ওমর ফারুক

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রশিবির

সমাপ্তি অধিবেশন :

সময়ঃ সন্ধা ০৭.০০- রাত ০৯.০০ মিঃ

সভাপতি: ড.ইন্নাছ আলী

প্রাক্তন ভিসি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুপারিশমালা পেশ: এ কে এম নাজির আহমদ

পরিচালক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

আলোচনা : মীর কাশেম আলী

পরিচালক বাংলাদেশ রাবিতায়ে আলম আল ইসলামী

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম

আ.জ.ম ওবায়েদুলাহ

কার্যকরী পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : মুহাম্মদ শামছুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

www.icsbook.info

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭

সেমিনার বাস্তাবায়ন কমিটি :

আহবায়ক : আ.স.ম মামুন শাহীন

সদস্য : এ.এইচ.এম হামিদুর রহমান আযাদ
আবদুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস
কামাল আহমদ শিকদার
মুহাম্মদ আসলাম হাকীম
মুহাম্মদ আবদুর রহীম
সিরাজুল ইসলাম শাহীন
এ.এফ.এম মহসীন
শাহ আলম ভূইয়া
মুহাম্মদ মর্তুজা
আনিছুর রহমান

হল ও ডেকোরেশন :

আহবায়ক : মুহাম্মদ মর্তুজা

সদস্য : আ.স.ম ফারুক
লুৎফুর রহমান
আখতার হোসেন
শরীফ মাসুম বিল্লাহ
মুরাদ হোসেন

www.icsbook.info

অভ্যার্থনা ও শৃঙ্খলা

আহবায়ক : মুহাম্মদ শাহআলম ভূইয়া
সদস্য : মুহাম্মদ আছাদুজ্জামান
লুৎফুর রহমান
মফিজুল ইসলাম
জহিরুল ইসলাম
নূরে আলম সুবজ
আবদুল্লাহ আল আরিফ

সাব কমিটি সমূহ :

স্মরনিকা সাব কমিটি

আহবায়ক : আবদুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস
সদস্য : হামিদুর রহমান আযাদ
সিরাজুল ইসলাম শাহীন
আনিসুর রহমান
কামাল আহমদ শিকদার
ইব্রাহীম বাহারী
লোকমান হোসাইন
রুহুল আমীন মল্লিক

বিজ্ঞাপন সাব কমিটি :

আহবায়ক : মুহাম্মদ আসলাম হাকীম
সদস্য : আলম শরীফ
এ.এফ.এম মহসিন
ইব্রাহীম বাহারী
আবুল কালাম আযাদ
মিফতাহুল কবির চৌধূরী

মেহমান যোগাযোগ :

আহবায়ক : আনিছুর রহমান
সদস্য : কামাল আহমদ শিকদার
এ.এফ.এম মহসীন
মুহাম্মদ মুহিব্বুলাহ
বুলবুল চৌধুরী

অর্থ বিভাগ :

আহবায়ক : আবদুদ দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস
সদস্য : হামিদুর রহমান আযাদ
মুহাম্মদ আবদুর রহীম
সিরাজুল ইসলাম শাহীন
আলম শরীফ

প্রচার বিভাগ :

আহবায়ক : কামাল আহমদ শিকদার
সদস্য : মুহাম্মদ মহসীন
আবুল কালাম আযাদ
লোকমান হোসাইন
এনায়েত হোসেইন জাকারিয়া

প্রকাশনা :

আহবায়ক : মুহাম্মদ আবদুর রহীম
সদস্য : মঈনুল ইসলাম
আবু বকর সিদ্দিক
ইব্রাহিম বাহারী
এ.এইচ.এম ফয়েজুর রহমান
রুহুল আমিন মল্লিক
আব্দুল আজিজ

www.icsbook.info

জাতিয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭

তারিখ : ১৭ ও ১৮ আগষ্ট

স্থান : জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তন

কর্মসূচি

প্রথম দিন ঃ ১৭ আগষ্ট

উদ্বোধনী অধিবেশনঃ সকাল ০৯.০০ থেকে ১০.৩০

তেলাওয়াত কালামে পাক	ক্বারী আব্দুল আলীম
অনুবাদ :	মুহাম্মদ ওমর ফারুকি
আসন গ্রহন :	
হামদে বারী তালা :	হাসনাত আব্দুল কাদের
স্বাগত ভাষন :	মুহাম্মদ শাহজাহান কেন্দ্রীয় সভাপতি
অথিতিবৃন্দের বক্তব্য :	মাওলানা মহিদ্দিন খান সম্পাদক, মাসিক মদিনা
	অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার
	গিয়াস কামাল চৌধুরী বিশেষ সংবাদদাতা বাসস
	ড.চৌধুরী মাহমুদ হাসান প্রফেসর ফামের্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল
	কবি আল মাহমুদ সম্পাদক দৈনিক কর্নফুলি
	ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

www.icsbook.info

প্রধান অথিতি : প্রফেসর ইউসুফ আলী
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড.কাজী দীন মুহাম্মদ
সাবেক মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী

সেমিনার অধিবেশন- এক

বেলা ১১.০০থেকে ০১.০০

বিষয় : কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট : একটি পর্যালোচনা

প্রবন্ধকার : অধ্যক্ষ হারুনু রশীদ
বিশিষ্ট কলামিষ্ট

সভাপতি : প্রফেসর ইউসুফ আলী
সাবেক ভাইস চ্যান্সলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান অতিথি : ড এস এম লুৎফর রহমান
প্রফেসর বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচক বৃন্দ : জনাব আবুল কালাম পাটোয়ারী
সাবেক চেয়ারম্যান দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ইবি
জনাব মুজাহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ফিন্যান্স ব্যাংকিং বিভাগ ঢা.বি
জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
সম্পাদক সাপ্তাহিক সোনার বাংলা
জনাব এনামুল হক মঞ্জু
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি
জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি
জনাব এহসানুল মাহবুব জুবায়ের
কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি
জি এম রহিমুল্লাহ
কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক

সেমিনার অধিবেশন- দুই

বিকাল ০৪.০০ থেকে ০৬.০০

বিষয় : ইসলামে নারী শিক্ষা

প্রবন্ধকার : জনাব আবুল কালাম পাটোয়ারী
সাবেক চেয়ারম্যান দাওয়াহ ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ই,বি

সভাপতি : প্রফেসর ডা: গোলাম মোয়াযযম
সাবেক অধ্যাক্ষ মোমেনশাহী ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

প্রধান অতিথি : ড: মুহাম্মদ লোকমান
প্রফেসর ফিন্যান্স বিভাব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ

www.icsbook.info

আলোচকবৃন্দ : প্রফেসর আ ন ম আব্দুল মান্নান খান
সাবেক চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলানা মোজাহের আহমদ
রেক্টর হাশিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কক্সবাজার

আতাউর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব নূর মোহাম্মদ আকন
সাবেক অতিরিক্ত সচিব

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আ.ব.ম হিযবুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক আল কোরআন ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ই.বি

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব
পরিচালক বাংলাদেশ ইসলামীক এডুকেশন সোসাইটি

মাওলানা মুহাম্মদ শামছুল ইসলাম
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি

আহসান হাবীব ইমরোজ
কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়কক সম্পাদক

দ্বিতীয় দিন : ১৮ আগষ্ট

সেমিনার অধিবেশন- তিন

সকাল ০৯.০০ থেকে ১০.০০

বিষয় : শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

প্রবন্ধকার : জনাব আব্দুল কাদের মোলা
কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

সভাপতি : ড. রফিকুল ইসলাম সরকার
সাবেক ডীন কৃষিপ্রকৌশল বিভাগ বা.কৃ.বি

প্রধান অতিথি : ড.কাজী দীন মোহাম্মদ
সাবেক মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী

আলোকচকবৃন্দ : ড. চৌধুরী মাহমুদুল হাসান
প্রফেসর ফার্মেসী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড.বদিউল আলম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ড,মো: ইসমাইল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক প্রানীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মফিজুর রহমান
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ

www.icsbook.info

জনাব মীর কাশেম আলী
পরিচালক রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ

জনাব সাইফুল আলম খান
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি

জনাব আ স ম মামুন শাহীন
সেক্রেটারী জেনারেল

সেমিনার অধিবেশন- চার

বেলা ১১.০০ থেকে ০১.০০

বিষয় : শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

প্রবন্ধকার : প্রফেসর নজরুল ইসলাম
সিন্ডিকেট সদস্য ও সাবেক ডীন বিজ্ঞান অনুষদ রা,বি

সভাপতি : প্রফেসর এস এম লুৎফুর রহমান
বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান অতিথি : জনাব আবুল আসাদ
সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম

আলোচকবৃন্দ: ড. মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ বা, কৃ, বি

ড.আমিনুর রহমান মজুমদার
সহযোগী অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
সম্পাদক সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
পরিচালক ওয়ার্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ

জনাব সারোয়ার জাহান
সাধারন সম্পাদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

জনাব মতিউর রহমান আকন্দ
কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি

সেমিনার অধিবেশন- পাঁচ

বিকাল ০৪.০০ থেকে ০৬.৩০

বিষয় : মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রবন্ধকার : প্রফেসর আবুবকর রফিক আহমদ
প্রো ভাইস চ্যান্সেলার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

সভাপতি : এ এইচ এম ইয়াহ ইয়ার রহমান
আল কুরআন এন্ড ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ ই,বি

প্রধান অতিথি : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি

www.icsbook.info

আলোচকবৃন্দ :	প্রফেসর আবুল হাশেম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	
	প্রফেসর মুহাম্মদ শাহজাহান আলী দর্শন বিভাগ,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	
	মাওলানা আব্দুস সোবহান সাবেক এম.পি	
	প্রফেসর এ কে এম মহীউদ্দিন চেয়ারম্যান ইংরেজী বিভাগ দারুল এহছান বিশ্ববিদ্যালয়	
	মাওলানা সাইয়েদ এ কিউ এম সিফাতুলাহ উপাধ্যক্ষ তামিরুল মিলাত কামিল মাদ্রাসা	
	মাওলানা আবুল হাশেম সহযোগী অধ্যাপক ফলিত পদার্থ ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ রা.বি	
	জনাব রফিকুল ইসলাম খান সিনেট সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি	
	জনাব আব্দুল দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক	

সমাপনী অনুষ্ঠান :

০৭.১৫.০৯.০০

সভাপতি :	মুহাম্মদ শাহজাহান কেন্দ্রীয় সভাপতি
প্রধান অতিথি :	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সেক্রেটারি জেনারেল জামায়েত ইসলামী বাংলাদেশ
বিশেষ অতিথি :	মুহাম্মদ কামরুজ্জামান সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
	ড. আব্দুল খালেক শহীদ আব্দুল মালেকের বড় ভাই
অতিথিবৃন্দঃ	আব্দুল কাদের মোলা প্রচার সম্পাদক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
	মুহাম্মদ ইউনুস ভাইস চেয়ারম্যান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
	মাওলানা যাইনুল আবেদীন অধ্যক্ষ তামিরুল মিলাত মাদ্রাসা
	অধ্যাপক হারুন অর রশীদ সেক্রেটারি জেনারেল শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন।

www.icsbook.info

শিক্ষা সেমিনার
প্রবন্ধ সংকলন
কমিটি ২০১১

সম্পাদক মন্ডলীর

সভাপতি	ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক
সম্পাদক	মো : দেলাওয়ার হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক	মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম
সম্পাদনা সহযোগী	মু. আতাউর রহমান সরকার
	মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
	মো: সোহেল খান
	গোলাম মর্তুজা
	শামসুল আলম গোলাপ
	মো: আতিকুর রহমান
	মো: মনির উদ্দিন মনি
	মো: তারিকুজ্জামান
	মোহাম্মদ আবু নাছের
	আবু সালেহ্ মোঃ ইয়াহ্ইয়া
	মাসুদ পারভেজ রাসেল
	তৌহিদুর রহমান সুইট
	মো: মাকসুদুর রহমান
	আল মুত্তাকী বিল্লাহ
	নুরুল ইসলাম আকন্দ
	মাসুদুল ইসলাম বুলবুল
	স. ম. আব্দুল্যাহ আল মামুন

www.icsbook.info

www.icsbook.info

প্রস্তাবিত প্রশ্নবিদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষানীতি'০৯ বাতিলের দাবিতে আয়োজিত ছাত্রগণসমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম

ছাত্রগণসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল শিশির মো: মনির, ইসলামী ছাত্রমজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি তাওহিদুল ইসলাম তুহিন, ইসলামী ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইলিয়াছ আতহারী

ইসলামী ছাত্রমোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি আলতাফ হোসাইন, জাগপা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুল আলম, ইসলামী ছাত্রজমিয়তের সহ-সভাপতি রেদোয়ানুল বারী

প্রস্তাবিত প্রশ্নবিদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় শিক্ষানীতি'০৯ বাতিলের দাবিতে আয়োজিত ছাত্রগণসমাবেশে উপস্থিতির একাংশ

ধর্মহিন ও নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবীতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল।

www.icsbook.info

১৫ আগস্ট ২০১০ এ ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী পূর্ব আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারী জেনারেল ডা. ফখরুদ্দিন মানিক

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ২০০৪

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ২০০৪ এ মঞ্চে উপবিষ্ট মেহমানবৃন্দ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন : মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপি, কবি আল মাহমুদ, বিচারপতি আবদুর রউফ মীর কাশেম আলী মুহাম্মদ কামারুজামান, আব্দুর কাদের মোল্লা ও এটিএম আজহারুল ইসলাম

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন : শাহ আব্দুল হান্নান, আবুল আসাদ
প্রফেসর এম ইউসুফ আলী, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান
প্রফেসর এম ওমার আলী, অধ্যাপক আবু জাফর, আব্দুল মান্নান তালিব

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন : শাহজাহান চৌধুরী এমপি
মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, আব্দুস শহীদ নাসিম, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. নজরুল ইসলাম
সালেহ উদ্দিন জহুরী, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানসুর

www.icsbook.info

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন : মতিউর রহমান আকন্দ, নূরুল ইসলাম বুলবুল মুজিবুর রহমান মঞ্জু, মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, শফিকুল ইসলাম মাসুদ, মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান,

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ২০০৪ এ উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের একাংশ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার ২০০৪ এ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় শিল্পীবৃন্দ

www.icsbook.info

জাতীয় শিক্ষামেলা ২০০২ এ
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের
মেধাবী ছাত্রদের মুখোমুখি
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
ড. এম ওসমান ফারুক এমপি

জাতীয় শিক্ষামেলা ২০০২ এ
স্টল পরিদর্শন করছেন
মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ও
জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল
আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

জাতীয় শিক্ষামেলা ২০০২ এ
স্টল পরিদর্শন করছেন
আ ন ম আব্দুজ জাহের

জাতীয় শিক্ষামেলা ২০০২ এর
একটি স্টল

শিক্ষা সাপ্তাহ ২০০২ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালির একাংশ

www.icsbook.info

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপিসহ মেহমানদের একাংশ

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপি ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ঢাবি'র সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে ইসলামিক স্টাডিজকে বাধ্যতামুলক করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল

ঢাকা মহনাগরী দক্ষিণ আয়োজিত ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ২০০১এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা দিবস
উদযাপন ২০০০ এর
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
আমিরে জামায়াত
অধ্যাপক গোলাম আযম

শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদত
ইসলামী আন্দোলনের অনিবার্য
বাস্তবতা শীর্ষক
সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
সাবেক আমিরে জামায়াত
অধ্যাপক গোলাম আযম

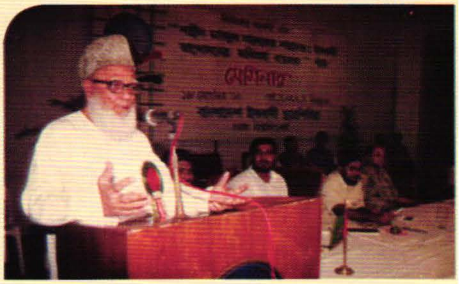

ইসলামী শিক্ষা দিবস ও শহীদ
আবদুল মালেকের শাহদাত
শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান
অতিথির বক্তব্য রাখছেন
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

ইসলামী শিক্ষা দিবস ও কৃতী
ছাত্র সংবর্ধনা' ০৩ প্রধান
অতিথির বক্তব্য রাখছেন
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি
মুজিবুর রহমান মঞ্জু

www.icsbook.info

ইসলামী শিক্ষা দিবস উপলক্ষে
স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভায়
বক্তব্য রাখছেন
সম্মানিত অতিথি

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭
এ উপস্থিতি মেহমানদের একাংশ

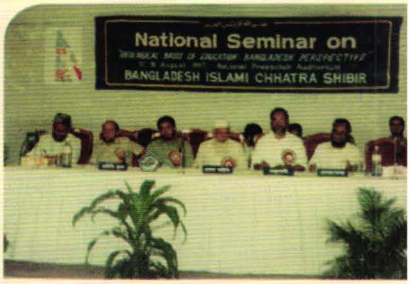

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭ এ
বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি
মোহাম্মদ শাহজাহান

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭ এ উপস্থিতির একাংশ

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭ এ বক্তব্য রাখছেন : কাজী দীন মুহাম্মদ, কবি আল মাহমুদ, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, মাওলানা আব্দুস সোবহান, প্রফেসর আবুল হাসেম, মাওলানা আবু তাহের, ড. এ এইচ এম ওয়াহিউর রহমান, ড. আবু বকর রফিক আহমদ

এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ, রফিকুল ইসলাম খান, আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল সাইয়্যেদ আবু নোমান, প্রফেসর একেএম মহিউদ্দিন, প্রফেসর হারুন অর- রশিদ, প্রিন্সিপাল মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ডা: আবদুল খালেক, এম কামারুজ্জামান, এ ডি এম ইউনূছ

www.icsbook.info

জাতীয় শিক্ষা সেমিনার ১৯৯৭ এ
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন :
রাবি'র সাবেক ভিসি
প্রফেসর এম ইউসূফ আলী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া কর্তৃক
আয়োজিত শিক্ষা সেমিনার ১৯৯২ এ
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
প্রফেসর মো: নূরুল ইসলাম

অবিলম্বে স্কুল ছাত্রদের পাঠ্যবই প্রদানের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল

ইসলামী শিক্ষা সেমিনার ১৯৮৮ এ বক্তব্য রাখছেন মেহমানবৃন্দ

বিজ্ঞান সিরিজের প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

বিজ্ঞান সিরিজের প্রকাশ উপলক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত বিজ্ঞান শিক্ষকদের একাংশ

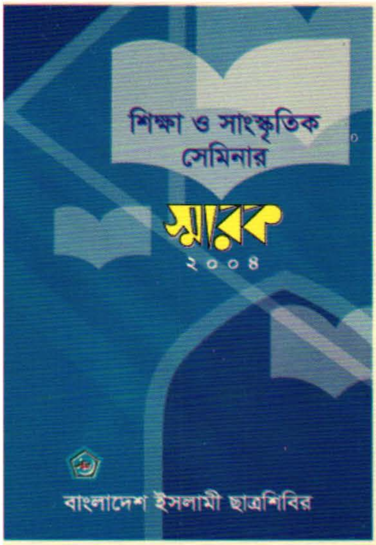

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০৪
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

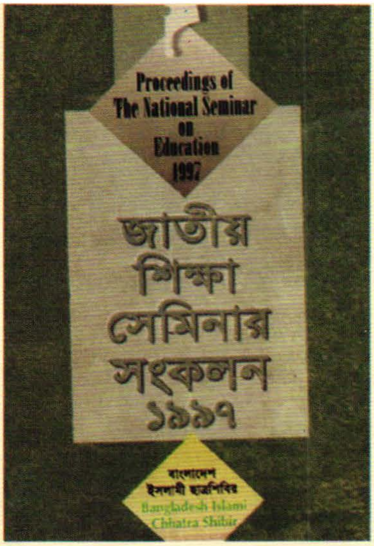

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

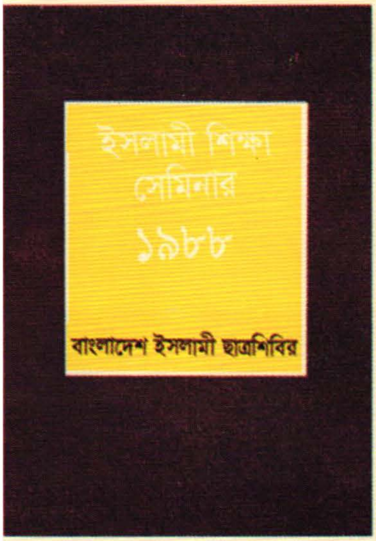

প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯১
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

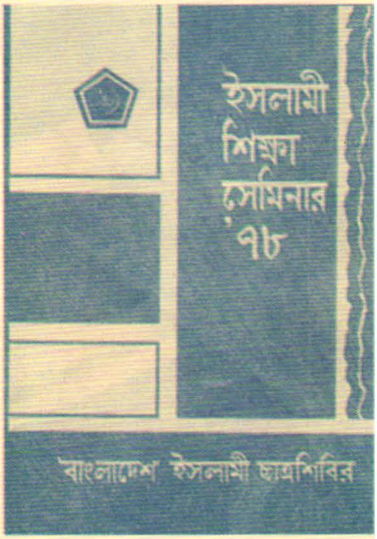

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৫৭ আগা মসিহ লেন, ঢাকা-২

www.icsbook.info

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০২
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ
২৪৪ আল্লামা কাশগরী হল, মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০২
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০১
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

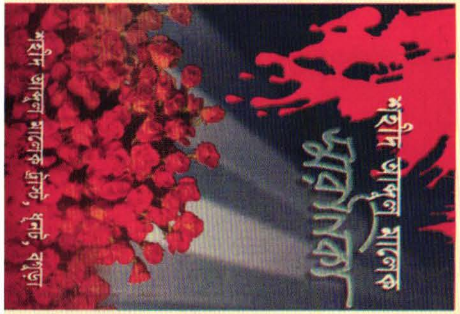

প্রকাশকাল : ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশনায় : শহীদ আবদুল মালেক ট্রাস্ট
থানা রোড, ধুনট, বগুড়া।

প্রকাশকাল :১৫ আগষ্ট ১৯৯০
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
চট্টগ্রাম মহানগরী।

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯২
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

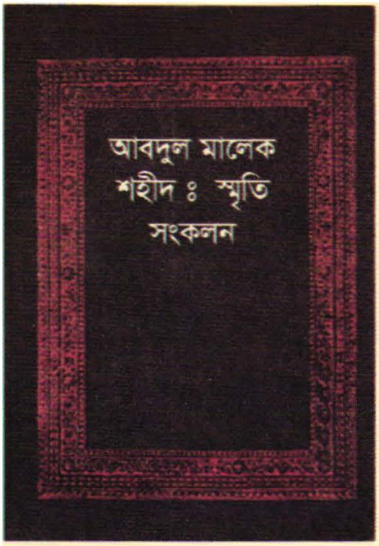

প্রকাশকাল : ১৫ আগস্ট ১৯৮৩
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৩৭, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫

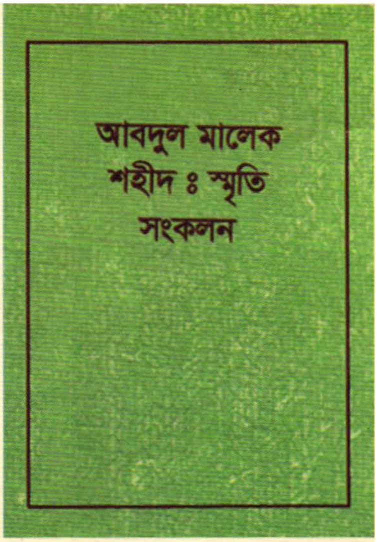

প্রকাশকাল : ১৯ আগস্ট ১৯৯৫
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
চট্টগ্রাম মহানগরী

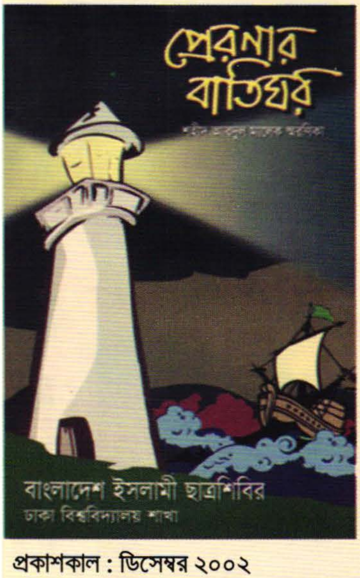

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০২
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

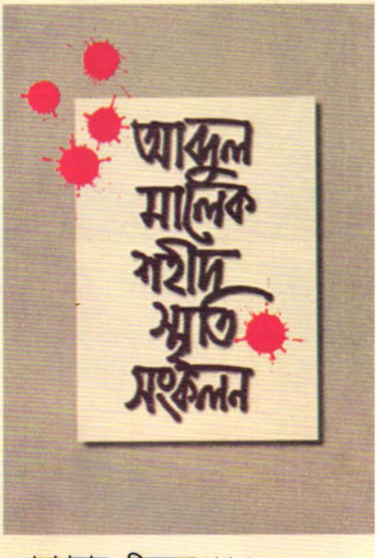

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

"জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার

আদর্শিক ভিত্তি

সঠিকভাবে যদি নির্ধারিত না হয়,
তাহলে সে শিক্ষাব্যবস্থা
জাতীকে আগামী দিনের
কাঙ্ক্ষিত নাগরিক ও নেতৃত্ব
সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে"

– শহীদ আবদুল মালেক